পরিমার্জিত সংস্করণ

বয়ান ও খুতবা

(৩য় খণ্ড)

গ্রন্থকার
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
সিনিয়র মুহাদ্দিস-জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া,
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১১০০
গ্রন্থকার: "আহকামে যিন্দেগী", "ফাযায়েলে যিন্দেগী",
"ফিকহুন নিছা", "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ"
ও "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" প্রভৃতি।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪
www.maktabatulabrar.com
www.facebook/maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান ও খুতবা (৩য় খণ্ড)

গ্রন্থকার:
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রথম প্রকাশ:
যিলকদ, ১৪২৯ হিজরী
নভেম্বর, ২০০৮ ইংরেজি
অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ বাংলা

দ্বিতীয় প্রকাশ:
.....
.....
.....

প্রকাশনায়:
মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

www.maktabatulabrar.com
www.facebook/maktabatulabrar.com

মূল্য: ৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা মাত্র)
US$ 20.00

(সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু — পৃষ্ঠা নং

❑ মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ-এর আমীর
হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম)-এর কথা ৮
❑ গ্রন্থকার- মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন-এর কথা (ভূমিকা) ১০

বয়ানসমূহ

* বয়ান নং ১ : মন ও চিন্তা-চেতনাকে দোরস্ত করা (১ম পর্ব) ১৩
* বয়ান নং ২ : মন ও চিন্তা-চেতনাকে দোরস্ত করা (২য় পর্ব) ২০
* বয়ান নং ৩ : কী মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে (১ম পর্ব) ২৭
* বয়ান নং ৪ : কী মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে (২য় পর্ব) ৩৪
* বয়ান নং ৫ : কী মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে (৩য় পর্ব) ৪১
* বয়ান নং ৬ : তওবা-এস্তেগফার প্রসঙ্গ ৪৮
* বয়ান নং ৭ : ১ টি বিশেষ নছীহত ৫৬
* বয়ান নং ৮ : ২ টি বিশেষ নছীহত ৬২
* বয়ান নং ৯ : ৩ টি বিশেষ নছীহত ৬৯
* বয়ান নং ১০ : ৪ টি বিশেষ নছীহত ৭৬
* বয়ান নং ১১ : ৫ টি বিশেষ নছীহত ৮৩
* বয়ান নং ১২ : ৬ টি বিশেষ নছীহত ৯০
* বয়ান নং ১৩ : ৭ টি বিশেষ নছীহত..... ৯৬
* বয়ান নং ১৪ : আরও ৭টা বিশেষ নছীহত..... ১০৩
* বয়ান নং ১৫ : ৭ শ্রেণীর মানুষ যারা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়া পাবে..... ১১০
* বয়ান নং ১৬ : ৮ টি বিশেষ নছীহত ১১৭
* বয়ান নং ১৭ : ৯ টি বিশেষ নছীহত ১২৪
* বয়ান নং ১৮ : সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণ প্রসঙ্গ ১৩১
* বয়ান নং ১৯ : আল্লাহর ওলী হওয়ার উপায় ১৩৮
* বয়ান নং ২০ : সুন্নাত ও মুস্তাহাবের গুরুত্ব ১৪৫
* বয়ান নং ২১ : আদব তাজীমের গুরুত্ব (১ম পর্ব) ১৫২
* বয়ান নং ২২ : আদব তাজীমের গুরুত্ব (২য় পর্ব) ১৫৯
* বয়ান নং ২৩ : মানব সেবা ও মানব প্রেম প্রসঙ্গ (১ম পর্ব) ১৬৬

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

* বয়ান নং ২৪ : মানব সেবা ও মানব প্রেম প্রসঙ্গ (২য় পব..... ১৭৩
* বয়ান নং ২৫ : হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ প্রসঙ্গ ১৮০
* বয়ান নং ২৬ : কুসংস্কার বর্জন প্রসঙ্গ (১ম পর্ব) ১৮৭
* বয়ান নং ২৭ : কুসংস্কার বর্জন প্রসঙ্গ (২য় পর্ব) ১৯৪
* বয়ান নং ২৮ : অন্ধ-অনুকরণ বর্জন প্রসঙ্গ ২০১
* বয়ান নং ২৯ : ইসলামী লেবাস-পোশাক প্রসঙ্গ ২০৮
* বয়ান নং ৩০ : গোফ, দাড়ি ও চুল প্রসঙ্গ ২১৫
* বয়ান নং ৩১ : পর্দা প্রসঙ্গ ২২১
* বয়ান নং ৩২ : ছওয়াব অর্জন করার সহজ উপায় ২২৯
* বয়ান নং ৩৩ : জান্নাত অর্জন করার সহজ উপায় ২৩৬
* বয়ান নং ৩৪ : আমাদের আসল পরিচয় ও দুনিয়ার আসল স্বরূপ কি? ২৪৩
* বয়ান নং ৩৫ : অভাব বোধ ও মনের পেরেশানী দূর করার উপায় ২৪৯
* বয়ান নং ৩৬ : মুসলমান জাতির বিপদ-আপদের কারণ ২৫৬
* বয়ান নং ৩৭ : আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়া চাই ২৬৩
* বয়ান নং ৩৮ : গোনাহমুক্ত জীবন গড়া চাই ২৬৯
* বয়ান নং ৩৯ : সুদ-ঘুষ মুক্ত জীবন গড়া চাই ২৭৭
* বয়ান নং ৪০ : সন্দেহমুক্ত জীবন গড়া চাই ২৮৪
* বয়ান নং ৪১ : গাফলতমুক্ত জীবন গড়া চাই ২৯০
* বয়ান নং ৪২ : পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন গড়া চাই ২৯৭
* বয়ান নং ৪৩ : জীবনের লেন-দেন দোরস্ত করা চাই ৩০৪
* বয়ান নং ৪৪ : জীবন গড়ার জন্য হিসাব-নিকাশ থাকা চাই ৩১০
* বয়ান নং ৪৫ : আল্লাহর দেয়া সকল নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা চাই ৩১৬
* বয়ান নং ৪৬ : কছম ও মান্নত প্রসঙ্গ ৩২৩
* বয়ান নং ৪৭ : নিদ্রা ও স্বপ্ন প্রসঙ্গ ৩৩০
* বয়ান নং ৪৮ : ওছিয়ত প্রসঙ্গ ৩৩৭
* বয়ান নং ৪৮ : মীরাছ প্রসঙ্গ ৩৪৪
* বয়ান নং ৫০ : ঈমান-আমলের উপর অটল থাকার উপায় ৩৫১

খুতবাসমূহ

খুতবা সংক্রান্ত মাসায়েল ৩৬০
ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার সুন্নাত, আদব ও শর্তসমূহ ৩৬২
ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান শ্রবণ করার আদব তরীকা ৩৬৩

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

জুমুআর প্রথম খুতবাসমূহ

* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (১) ৩৬৫
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (২) ৩৬৮
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (৩) ৩৭০
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (৪) ৩৭২
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (৫) ৩৭৫
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (৬) ৩৭৭
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (৭) ৩৮০
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (৮) ৩৮৩
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (৯) ৩৮৫
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (১০) ৩৮৭
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (১১) ৩৮৯
* রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (১২) [বিদায় হজ্জের ভাষণ] ... ৩৯১
* হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খুতবা (১) ৩৯৫
* হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খুতবা (২) ৩৯৮
* হযরত ওমর (রা.)-এর খুতবা (১) ৪০১
* হযরত ওমর (রা.)-এর খুতবা (২) ৪০৪
* হযরত উছমান (রা.)-এর খুতবা ৪০৯
* হযরত আলী (রা.)-এর খুতবা (১) ৪১০
* হযরত আলী (রা.)-এর খুতবা (২) ৪১২
* হযরত আলী (রা.)-এর খুতবা (৩) [জেহাদ বিষয়ক] ৪১৪
* হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর খুতবা ৪১৮
* হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) রচিত জুমুআর খুতবা ৪২০
* হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) রচিত জুমুআর খুতবা ৪২৩
* হযরত শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) রচিত জুমুআর খুতবা ... ৪২৬
* হযরত শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) রচিত জুমুআর খুতবা ৪৩০
* হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী (রহ.) রচিত জুমুআর খুতবা ৪৩৩

জুমুআর ছানী খুতবাসমূহ

* হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর জুমুআর ছানী খুতবা ৪৩৭
* হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর জুমআর ছানী খুতবা ৪৩৯
* হযরত সাইয়্যেদ হুছাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর জুমুআর ছানী খুতবা ৪৪১
* হযরত শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর জুমুআর ছানী খুতবা ৪৪৪

www.maktabatulabrar.com

অন্যান্য খুতবা

* ঈদুল ফিতরের প্রথম খুতবা ৪৪৬
* ঈদুল আযহার প্রথম খুতবা ৪৫০
* ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছানী খুতবা ৪৫৫
* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পঠিত এস্তেস্কার খুতবা ৪৫৭
* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পঠিত বিবাহের খুতবা (১) ... ৪৫৯
* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পঠিত বিবাহের খুতবা (২) ... ৪৬০
* হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী (রহ.) রচিত বিবাহের খুতবা ৪৬১

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর আমীর
হযরত মাওলানা **মাহমূদুল হাসান** সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)-এর কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ
الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ،
اَمَّا بَعْدُ! :

ইসলামের পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে সমাজের সংশোধন বা এসলাহ হতে পারে। এই সমাজ সংশোধনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই "বয়ান ও খুতবা" নামক গ্রন্থখানা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কেননা ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য প্রয়োজন ইসলামের পূর্ণ জ্ঞান থাকা। ইসলামী জীবন বিধান এবং ইসলামী হুকুম-আহকামের ব্যাপক জ্ঞান ব্যতীত ঈমান ও ইসলামের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে সাজানো সম্ভব নয়। সেই সাথে প্রয়োজন, সমসাময়িক আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর জানা থাকার। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জ্ঞান চর্চার। কিন্তু একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিতাবাদি পাঠ করে বা উলামায়ে কেরামের নিয়মিত ছাত্র হয়ে প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করার লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষ দ্বীনী কথা-বার্তা যা শোনে বা শেখে তার অনেকটাই মসজিদ থেকে শোনে বা শেখে। জুমুআ, ঈদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ইমাম সাহেবান মসজিদে যে বয়ান পেশ করেন তা থেকেই তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। কোন কোন মসজিদে অবশ্য ইমাম সাহেবান কুরআনে কারীমের তাফসীরের মাধ্যমেও জ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করে চলেছেন। তবে সেখানে সাধারণ জনগণের উপস্থিতি আরও বেশী হওয়া কাম্য। এ হিসেবে আমাদের সমাজে মসজিদ হল সাধারণ মানুষের জন্য দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের একটি অন্যতম মারকাজ। আইম্মা হযারাতের বয়ানের আলোকেই মুসল্লিদের ধ্যান-ধারণা এবং তাদের মন-মানসিকতা গড়ে উঠছে। আইম্মা হযারাত যেমন দ্বীনী রূহানী খোরাক দিচ্ছেন, তাদের মুসল্লীগণের দ্বীনী রূহানী শাস্থ্য সেভাবেই গড়ে উঠছে।

এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ইমাম সাহেবান গোটা সমাজকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী মেজাযে গড়ে তুলতে পারেন, গোটা সমাজকে পূর্ণ দ্বীনী ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারেন। এর জন্য তাদের বয়ান ও বক্তব্যকে সেভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। তাদের বয়ান বক্তব্যে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা থাকতে হবে, জীবন জগত সম্পর্কে সব জিজ্ঞাসার জবাব থাকতে হবে। যাতে করে মানুষ তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের পূর্ণ জীবন ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাতে পারে। আর একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু বয়ান ও বক্তব্য দ্বারাই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

সহীহ আমল গড়ে ওঠে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান ও তা'লীমের সাথে সাথে প্রত্যেকটা আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণও দিতেন। তাই বয়ান ও বক্তব্যের সাথে সাথে মুসল্লীদেরকে আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণও দিতে হবে। ইমাম সাহেবদের বয়ান ও ওয়াজের সহযোগিতার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইতিপূর্বে "বয়ান ও খুতবা" নামক গ্রন্থখানার ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশ করা হয়েছিল। এখন তার ৩য় খণ্ড প্রকাশ করা হল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের মেহনতকে কবূল করুন। আমীন!

মাহমূদুল হাসান
আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ।
মুহ্তামিম ও শায়খুল হাদীছ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

লেখকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! :

ইল্‌ম বা দ্বীনী জ্ঞান হচ্ছে আমলের বুনিয়াদ। সহীহ ইল্‌ম ছাড়া সহীহ আমল সম্ভব নয়। এজন্য ইল্‌ম শিক্ষা করাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে। একজন মানুষের সারা জীবনের সব কিছু- নামায, রোযা, ধনী হলে হজ্জ, যাকাত, কুরবানী সহ উঠা-বসা চলা-ফেরা, আহার-নিদ্রা, শয়ন-স্বপ্ন ইত্যাদি যা কিছু তার জীবনের অংশ এই সব কিছু-এর মাসআলা-মাসায়েল ও তরীকা শিক্ষা করা জরূরী। মানুষ এই শিক্ষা অর্জন করতে পারে দ্বীনী কিতাবাদি পাঠ করে কিংবা উস্তাদ এবং ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগগণের মুখে শুনে। তবে আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিতাবাদি পাঠ করে বা ওয়াজের মজলিসে নিয়ে ওয়াজ শুনে শিক্ষা অর্জন করার লোকের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষ দ্বীনী কথা-বার্তা যা শোনেন বা শেখেন তা প্রায়শঃই মসজিদ থেকেই শোনেন বা শেখেন। জুমুআ, ঈদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ইমাম সাহেবান মসজিদে যে বয়ান পেশ করেন তা থেকেই তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। এ হিসেবে আমাদের সমাজে মসজিদ হল সাধারণ মানুষের জন্য দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের একটি অন্যতম মারকাজ।

এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ইমাম সাহেবগণ গোটা সমাজকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী মেজাযে গড়ে তুলতে পারেন, গোটা সমাজকে পূর্ণ দ্বীনী ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারেন। আইম্মায়ে কেরাম হলেন সমাজ সংস্কারকের আসনে সমাসীন। তাঁরা পারেন গোটা সমাজের সংস্কার সাধন করতে। এর জন্য প্রয়োজন বয়ান ও বক্তব্যকে সেভাবে ঢেলে সাজানো। তাদের বয়ান বক্তব্যে ঈমান-আকীদা ইবাদত-বন্দেগী, মু'আমালা, মু'আশারা, আমল-আখলাক ইত্যাদি জীবনের সব দিকের দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। এরূপ দিকনির্দেশনা মূলক বয়ানসমূহ সমন্বয়ে "বয়ান ও খুতবা" নামক এ গ্রন্থখানা রচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন। দ্বীনী জ্ঞান ও উপদেশ অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের জন্যও সরাসরি গ্রন্থখানা পাঠ উপকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

বয়ান ও খুতবার ১ম ও ২য় খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এখন ৩য় খণ্ড পেশ করা হল। ১ম খণ্ডে মানুষের ঈমান-আমলের জন্য মানসিকতা গঠনের সহযোগী বিষয়বস্তু এবং ইবাদত সম্পর্কিত বয়ান সন্নিবেশিত হয়েছিল। ২য় খণ্ডে ঈমান, মুআশারা ও আখলাক বা তাসাওউফ বিষয়ক বিষয়ভিত্তিক বয়ান

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পেশ করা হয়েছে। এখন জীবনের অন্যান্য বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ও বিশেষ বিশেষ নছীহত সম্বলিত বয়ানের সমন্বয়ে ৩য় খণ্ড পেশ করা হল। ৩য় খণ্ডে একটু ব্যতিক্রম এই রাখা হয়েছে যে, ১ম ও ২য় খণ্ডে প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে উক্ত বয়ানের সারসংক্ষেপ নিয়ে রচিত আরবী খুতবা পেশ করা হয়েছিল আর ৩য় খণ্ডে অনুরূপ না করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও প্রসিদ্ধ আকাবির আসলাফ কর্তৃক পঠিত ও রচিত খুতবাসমূহ সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। যাতে করে খুতবায়ে মাছুরা-র লুত্‌ফ অর্জনে আগ্রহীগণ মাহ্‌যূয হতে পারেন।

সবকটি খণ্ড সামনে রাখলে একজন ইমাম, মুবাল্লিগ ও বক্তা জীবনের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সব দিক নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা লাভ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন এবং এই গ্রন্থখানা দ্বারা সমাজের সংস্কার সাধন করুন আর এই পাপী গ্রন্থকারের জন্য এটিকে নাজাতের ওছীলা করুন। আমীন!

বিনীত
মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
তাং ৮/১০/২০০৮ ইং

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ১

মন ও চিন্তা চেতনাকে দোরস্ত করা (১ম পর্ব)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মানুষ কীভাবে প্রকৃত দ্বীনদার হতে পারে, একজন মানুষ কীভাবে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারে এবং এর জন্য কি কি প্রয়োজনীয়– এ বিষয়টি জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরূরী। মানুষ যদি প্রকৃত দ্বীনদার হতে চায়, মানুষ যদি পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে নিজের মনকে দ্বীনদার বানাতে হবে। অর্থাৎ, নিজের মন-মানসিকতা, নিজের চিন্তা-চেতনা, নিজের বিচার-বিবেচনা, এগুলোকে দ্বীদের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। এভাবে মন যদি দ্বীনদার হয়ে যায়, তাহলে মানুষ দ্বীনদার হতে পারবে। আর মন যদি এভাবে দ্বীনের চেতনায় গড়ে না উঠে, তাহলে সে দ্বীনদার হতে পারবে না। ইসলাম তাই প্রথমে মনকে দুরস্ত করার উপর জোর দিয়েছে। হাদীছে এসেছে, রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري برقم ٥٢ ومسلم برقم ٤١٧٨)

অর্থাৎ, জেনে রাখ! তোমার দেহের মধ্যে একটা মাংসখণ্ড আছে সেটা যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে তোমার গোটা দেহ ঠিক হয়ে যাবে। আর সেটা যদি ঠিক না থাকে, তাহলে তোমার গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। জেনে রাখ সেটা হল হৃৎপিণ্ড।

এখানে বোঝানো হয়েছে হৃৎপিণ্ড ঠিক না থাকলে যেমন গোটা দেহ অঠিক হয়ে যায়, কারণ হৃৎপিণ্ড হল গোটা দেহের পরিচালক। তদ্রূপ ঐ হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত মন হল গোটা চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার পরিচালক, সেই মন ঠিক না হলে চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতাও ঠিক হবে না। আর চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা ঠিক না হলে মানুষ ঠিক হবে না।

অতএব আমার মন যদি ঠিক হয়, তাহলে আমি ঠিক হতে পারব, আর মন যদি ঠিক না হয় তাহলে আমি ঠিক হতে পারব না। তাই একজন মুসলমানের উপর প্রথম ফরয হল ঈমান আনা। ঈমানের দ্বারা মন ঠিক হয়, ঈমানী চেতনা দ্বারা মনের চিন্তা-চেতনা দোরস্ত হয়। মনের চিন্তা-চেতনা দোরস্ত হলে আমলও দোরস্ত হয়।

ঈমানের মধ্যে কী শিক্ষা দেয়া হয়েছে? ঈমানের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আকীদা-বিশ্বাস হল মনের বিষয়। অতএব আগে ঈমান-বিশ্বাসকে দোরস্ত করার নীতি রাখা থেকে বুঝে আসে আগে মনকে দোরস্ত করতে হবে, আগে মনের বিষয় দোরস্ত করতে হবে। ঈমান-বিশ্বাস ও মনের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে অনেক কিছু গলদ থাকে, সেই গলদকে দোরস্ত করতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ঈমান-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটা গলদ হল ঈমান-বিশ্বাসের অনেক কিছু সাধারণ যুক্তির বাইরে মনে হয়, এ ক্ষেত্রে যুক্তিতে ধরে না বলে বিশ্বাস করতে মনে চায় না। এটা হল একটা গলদ। এটা ছোট খাট গলদ নয় বরং বড় একটা গলদ। কারণ, এটা ঈমানের বিষয়ে তথা মৌলিক বিষয়ে গলদ। এই গলদকে দূর করতে হবে। ঈমান-বিশ্বাসের বিষয় যদি যুক্তিতে না ধরে, তবুও তা বিশ্বাস করতে হবে। যেমন ঈমানের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হল আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। এ বিষয়টা যুক্তিতে নাও ধরতে পারে। মনে হতে পারে সবকিছুর একজন সৃষ্টিকর্তা আছে এবং থাকতে হয়, অথচ আল্লাহ তা'আলার কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কীভাবে হয়ে গেলেন? এভাবে এ বিষয়টা যুক্তিতে না ধরলেও আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ পাকের সত্তা আছে, এটা যুক্তিতে না ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে। এমনিভাবে ফেরেশতা আছে তা বিশ্বাস করতে হবে। ফেরেশতাদের সম্পর্কে এমনও অনেক বর্ণনা রয়েছে যা শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। তবুও তা বিশ্বাস করতে হবে। হযরত জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, তা শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন, তবুও তা বিশ্বাস করতে হবে। হযরত জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে হাদীছে এসেছে– রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আ.)কে তাঁর আসল রূপে দেখেছেন। তার ছয়শত ডানা আছে। দেখে রয়ান করেছেন,

فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ. (رواه مسلم برقم ٤٦٠)

অর্থাৎ, তাঁর দেহ এত বড় যে, দেখে মনে হয়েছে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত গোটা শূণ্যস্থান ভরে গেছে।

এভাবে ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ের অনেক কিছুই এমন রয়েছে, যা সাধারণ যুক্তিতে না ধরলেও, সাধারণভাবে অসম্ভব মনে হলেও আমাদেরকে তা বিশ্বাস করতে হবে। জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কিত এমন সব বর্ণনা রয়েছে, যা সাধারণভাবে আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও তা বিশ্বাস করতে হবে। জান্নাতে যেসব নাজ-নেয়ামত রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

(متفق عليه رواه البخاري برقم ٣٢٤٤ ومسلم برقم ٧٣١٠)

অর্থাৎ, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব নাজ-নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি যে, এমন কোন চোখ নেই যে চোখ তা দেখেছে, এমন কোন কান নেই যে কান তার যর্থার্থ বর্ণনা শুনেছে, মানুষের এমন চিন্তা শক্তি নেই যা দ্বারা সে তা উপলব্ধি করতে পারে। এই সব নাজ-নেয়ামত সম্পর্কে বিশ্বাস করতে হবে। যুক্তিতে না আসলেও বিশ্বাস করতে হবে। কারও বিবেচনায় ঠিক মনে না হলেও বিশ্বাস করতে হবে। এসব বিশ্বাসে গলদ থাকলে তা দোরস্ত করতে হবে।

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ.

অর্থাৎ, নগরবাসীর যদি ঈমান আনে এবং পরহেজগারী অবলম্বন করে, অর্থাৎ, নেক কাজ করে ও গোনাহ্ বর্জন করে, গুনাহ্ থেকে বিরত থাকে, তাহলে আমি তাদের উপর আসমান ও জমিন থেকে বরকতের দুয়ার খুলে দিব। (সূরা আ'রাফ: ৯৬)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আর এক আয়াতে এসেছে–

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, জীবনকে পাপমুক্ত কর, জীবনকে পূত-পবিত্র কর তাহলে আল্লাহ পাক আকাশ থেকে বরকতের বৃষ্টি দিবেন, সেই বৃষ্টি তোমাদের জন্য বরকত বয়ে আনবে। তোমাদের সন্তানাদির মধ্যেও আল্লাহ পাক বরকত দিবেন এবং তোমাদের ফসলের বাগান ফলে ফুলে ভরে উঠবে, বরকতে ভরে উঠবে।

এখানে বোঝানো হয়েছে ঈমান-আমলের উপর উঠে আসলে ফসলে বরকত হতে থাকবে, সব রকম বরকতের দুয়ার খুলে যাবে। যদিও আমার যুক্তিতে ধরে না যে, ঈমান আমলের সাথে ফসলের কী সম্পর্ক, ঈমান আমলের দ্বারা ফসল কেন বেশী হবে? আমাদের তো বুঝে আসে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে, বেশী শ্রম দিলে ফসল বেশী হবে। ঈমান আনলে, নেক আমল করলে ফসল বেশী হবে তা আমাদের যুক্তিতে ধরে না, তা আমাদের বুঝে আসে না। কিন্তু কুরআনের কথা আমাদের যুক্তিতে না ধরলেও আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে।

তবে এখানে মনে রাখতে হবে ঈমান-আমলের দ্বারা ফল ফসলে বরকত হয়– একথার দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তাহলে আমরা আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করব না বা শ্রম দিব না। হ্যাঁ, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করব, সাধ্যমত শ্রম দিব। কিন্তু সেই সাথে সাথে এ কথার উপরও বিশ্বাস রাখব যে, এই সবকিছু ব্যবহার করার পরও, এতসব শ্রম দেয়ার পরও বরকত হবে না যদি আমাদের ঈমান-আমল ঠিক না থাকে।

ঈমান-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আর একটা গলদ হল আমরা সবকিছু বিচার করি বস্তু দিয়ে। অথচ দ্বীনের এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর ব্যতিক্রম। সেগুলোকে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগিতে বিচার করা গলদ। বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগিতে বিচার করলে সেগুলো সঠিক বলে মনে হবে না, তবুও সেগুলো বিশ্বাস করতে হবে। মনের মধ্যে এরকম গলদ থাকলে সেই গলদকে দূর করতে হবে। মনকে দোরস্ত করতে হবে। আমরা তো দুনিয়ার সবকিছু চিন্তা করি বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগি দিয়ে। বস্তু দিয়ে আমরা সবকিছু বিচার করি। কিন্তু ইসলাম সবকিছুকে বস্তুর ভিত্তিতে বিচার করেনি। যেমন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্মানী কে– এ বিষয়টা আমরা বিচার করি বস্তু দিয়ে। তাই যার টাকা-পয়সা সবচেয়ে বেশী, সমাজে যার প্রভাব-প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী, সমাজে যার পদ সবচেয়ে বড় তাকেই আমরা সবচেয়ে সম্মানী মনে করি, সে-ই সমাজে সবচেয়ে সম্মান বেশী পায়। এভাবে বিষয়টাকে আমরা বস্তু দিয়ে বিচার করি। কিন্তু কুরআনে কারীম বলেছে,

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ.

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় পরহেযগার সে হল তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্মানী ব্যাক্তি। (সূরা হুজুরাত: ১৩)

দুনিয়াতে ধনী বা গরীব কে তা আমরা বিচার করি বস্তু দিয়ে অর্থাৎ, অর্থ দিয়ে, টাকা-পয়সা দিয়ে। যার টাকা-পয়সা আছে তাকে আমরা ধনী মনে করি, আর যার টাকা-পয়সা নেই তাকে গরীব

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

মনে করি। অথচ ইসলাম কি বলছে শুনুন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اَتَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَّا دِرْهَمَ لَهٗ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَّاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكٰوةٍ، وَيَاْتِيْ قَدْشَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ، فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ. (رواه مسلم برقم ٦٧٤٤)

অর্থাৎ, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা গরীব কাকে মনে কর? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ইয়া রসূলাল্লাহ! গরীবতো সেই, যার দেরহাম-দীনার নেই অর্থাৎ, যার টাকা-পয়সা নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (না, তোমাদের বিচার করার মানসিকতা এখনও ঠিক হয়নি।) গরীব হল সেই, যে কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে নামায পড়ে এসেছে, সদকা দিয়ে এসেছে, যাকাত দিয়ে এসেছে কিন্তু আবার গোনাহের কাজও করে এসেছে– কাউকে গালি দিয়ে এসেছে, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এসেছে, অন্যায়ভাবে কারও মাল গ্রাস করে এসেছে, অন্যায়ভাবে কারও রক্তপাত করে এসেছে, অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত করে এসেছে। তখন যাদেরকে গালি দিয়েছে, যাদের উপর যুলুম করে এসেছে, তাদেরকে এর নেকি দেয়া হবে। দিতে দিতে যখন তার নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন ওদের গোনাহ এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (এ-ই হল আসল গরীব।)

আর এক হাদীছে এসেছে–

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ. (متفق عليه – البخاري ٦٤٤٦ ومسلم ٢٤٦٧)

অর্থাৎ, টাকা-পয়সা সামান থাকলে ধনী হওয়া যায় না। বরং মনের ধনী হওয়াই আসল ধনী হওয়া।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকলেই সে ধনী নয়। বরং যার মন ধনী হয়ে গেছে, আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই সে তৃপ্ত আছে, সেই হল আসল ধনী।

এক রেওয়ায়েতে এসেছে– এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল আমরা কি মুহাজিরদের মধ্যে গরীব নই? রেওয়ায়েতে এসেছে–

فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ اللّٰهِ اَلَكَ اِمْرَاَةٌ تَاْوِيْ اِلَيْهَا؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ اَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهٗ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَاَنْتَ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ. قَالَ فَاِنَّ لِيْ خَادِمًا. قَالَ فَاَنْتَ مِنَ الْمُلُوْكِ. (رواه مسلم برقم ٧٦٥٣)

অর্থাৎ, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইবনুল আস (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বিবি আছে কি, যার কাছে আশ্রয় নিতে পার? সে বলল, আছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তোমার এমন কোন ঘর আছে কি, যেখানে মাথা গুজতে পার? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। তখন লোকটা বলল, আমার একজন চাকরও আছে? তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন, তাহলে তো তুমি সম্রাট? তোমার আবার অভাব কিসের? তুমি তো সম্রাটের জীবন যাপন করছ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দুনিয়াতে সফল ব্যক্তি কে আর ব্যর্থ কে তাও আমরা বিচার করি বস্তু দিয়ে। যে অনেক অনেক টাকা-পয়সা করতে পেরেছে, গাড়ী-বাড়ি করতে পেরেছে আমরা মনে করি সে সফল। আর যে টাকা-পয়সা করতে পারেনি, গাড়ী-বাড়ি করতে পারেনি তাকে মনে করি ব্যর্থ, যদিও সে ঈমান আমল ও তাকওয়া পরহেযগারীতে অনেক অগ্রসর হয়ে থাকে। অথচ ইসলাম কাদেরকে সফল এবং কাদেরকে ব্যর্থ বলেছে তা শুনুন। কুরআনে কারীমের প্রথম সূরার শুরুতে অর্থাৎ, সূরা বাকারার শুরুতে ঈমান আমল ইত্যাদি গুণের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে,

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থাৎ, তারাই সফল অর্থাৎ, যাদের মধ্যে এই সব গুণ আছে– ঈমান আছে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ইত্যাদি আছে তারাই সফল। (সূরা বাকারা : ৫)

সারকথা– যার দ্বীনদারী আছে সে সফল ব্যক্তি, যার দ্বীনদারী নেই সে ব্যর্থ ব্যক্তি। সফলতার মাপকাঠি টাকা-পয়সা গাড়ী-বাড়ি নয় বরং সফলতার মাপকাঠি হল ঈমান আমল তথা দ্বীনদারী পরহেযগারী। অথচ আমরা মনে করছি সফলতা হল টাকা-পয়সা ও গাড়ী-বাড়ির মধ্যে। এজন্য এক জন মানুষ যে গাড়ী-বাড়ি করতে পারেনি, টাকা-পয়সা করতে পারেনি কিন্তু পুরো দ্বীনের উপরে চলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আমরা তার সম্পর্কে বলি যে, লোকটা জীবনে কিছুই করে যেতে পারল না, ছেলে সন্তানের জন্যও কিছু করে যেতে পারল না, নিজেও কোন সুখ-শান্তিতে থেকে যেতে পারল না। লোকটার পুরো জীবনই ব্যর্থ। তাকে আমরা কামিয়াব তথা সফল মনে করিনা। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সে কামিয়াব, ইসলামের দৃষ্টিতে সে সফল। কারণ, সে পুরো দ্বীনের উপর চলেছে। দ্বীনের উপর যে চলে সে-ই কামিয়াব বা সফল।

আমরা বস্তু দিয়ে ভাল-মন্দ বিচার করি। তাই যদি কেউ তার মেয়েকে বিবাহ দিতে পারে এমন ছেলের কাছে যার একটা বড় চাকুরী আছে, যার অনেক টাকা-পয়সা আছে, গাড়ী-বাড়ি আছে, তাহলে মনে করে মেয়েকে ভাল বিবাহ দিতে পারলাম, সুন্দর বিবাহ দিতে পারলাম। ছেলেকে বিবাহ করানোর সময়ও এরকম মনে করা হয়। ভাল টাকা-পয়সা ওয়ালা বা পার্থিব মর্যাদাওয়ালার মেয়ে আনতে পারলে মনে করে ছেলেকে ভাল বিবাহ করাতে পারলাম, সুন্দর বিবাহ করাতে পারলাম। অথচ গরীবের দ্বীনদার মেয়ে আনতে পারলে সেটাকে কামিয়াবী মনে করিনা। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন তা শুনুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ. تربت يداك.

(رواه البخاري برقم ٥٠٩٠ ومسلم برقم ٣٧٠٨)

অর্থাৎ, নারীকে বিবাহ করা হয় অনেক কিছু দেখে টাকা-পয়সা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে, বংশ দেখে, আবার দ্বীনদারী দেখেও বিবাহ করা হয়। (এভাবে অনেক কিছু দেখেই বিবাহ করা হয়। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন,) তোমরা দ্বীনদারীর দিকটাকে প্রাধান্য দাও।

দ্বীনদারী দেখে বিবাহ দিতে পারলে সেটাই হবে সফল বিবাহ। দ্বীনদারীর বিষয়টা দেখা বর্জন করে বিবাহ হলে সেটা সফল বিবাহ নয়, সেটা ভাল বিবাহ নয়।

এভাবে অনেক বিষয়ে আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতাকে দোরস্ত করা হয়েছে। আমরা সবকিছুকে বস্তু দিয়ে চিন্তা করি, আমাদের চিন্তার এই ধারাকে দোরস্ত করা হয়েছে। মনের এই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অবস্থাকে দোরস্ত করা হয়েছে। সবক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা চলে বস্তুকে ঘিরে, বস্তুকে কেন্দ্র করে আমরা সবকিছু বিচার করি। অথচ ইসলাম বলেছে, বস্তুকে দিয়েই সবকিছু বিচার হবে না, সবকিছুর আসল বিচার হবে দ্বীন দিয়ে। কাজেই কোন্ বিবাহ ভাল? যে বিবাহে দ্বীনদারী আছে। কোন্ সন্তান ভাল? যে সন্তান দ্বীনের লাইনে চলে। যে সন্তান দ্বীনের উপর চলে সে সন্তান আমার জন্য ভাল, যদিও সে আয়-উপার্জন কম করতে পারে। আরেক সন্তান দ্বীনের লাইনে চলে না, অথচ সে লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে, সে ছেলে ভাল ছেলে নয়। কোন্ শিক্ষা ভাল? যে শিক্ষার ভিতরে দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয়। যে শিক্ষার মধ্যে দ্বীন বর্জন করা হয় সে শিক্ষা ভাল শিক্ষা নয়, যদি আমরা সেই শিক্ষাকে ভাল শিক্ষা বলে মনে করি, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের চিন্তা-চেতনা এখনও দোরস্ত হয়নি। কারণ, আমরা বস্তু দিয়ে সবকিছুর বিচার করি, অথচ বিচার করতে হবে দ্বীন দিয়ে। সবকিছুর আসল বিচার হবে দ্বীন দিয়ে।

দ্বীনের আলোকে সবকিছু বিচার করতে না শিখলে আমরা দ্বীনের উপর উঠে আসতে পারব না। দ্বীনের আলোকে সবকিছু বিচার না করলে আমরা দ্বীন থেকে সরে যাব। আমরা যদি টাকা-পয়সা ও গাড়ী-বাড়ির মধ্যে আমাদের জীবনের সফলতা মনে করি, তাহলে সফলতার জন্য আমরা টাকা-পয়সার লাইনেই চেষ্টা করব। সন্তানাদিকেও সেভাবেই গড়ে তুলব। দ্বীনের লাইনে কামিয়াবী মনে না করলে নিজেও দ্বীনের লাইনে চলব না, সন্তানাদিকেও সেভাবে গড়ে তুলব না। আমরা টাকা-পয়সা ও গাড়ী-বাড়ির লাইনে কামিয়াবী মনে করছি, তাই সন্তানাদিকেও সেভাবে গড়ে তুলছি। টাকা-পয়সার লাইনে কোন অসুবিধা বোধ করলে তখন পেরেশানী বোধ করছি। যখন সন্তানাদির ভাল চাকুরী হচ্ছে না তখন পেরেশান হচ্ছি, যখন সন্তানাদির ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল হচ্ছে না তখন পেরেশান হচ্ছি, কিন্তু সন্তানাদি দ্বীনের উপর চলছে না তাতে আমাদের কোন পেরেশানী হয় না। আপনজন কীভাবে একটা ভাল চাকুরী পেতে পারে তার জন্য তাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছি, কীভাবে স্কুল কলেজের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারবে তার জন্য বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছি। এসবের জন্য আমাদের পেরেশানীর অন্ত নেই। কিন্তু সন্তানাদি দ্বীনের লাইনে চলছে না, আপনজন দ্বীনের লাইনে চলছে না, তাদের জীবন প্রকৃত অর্থে ব্যর্থ হতে চলছে এজন্য আমাদের ভিতরে কোন পেরেশানী আসছে না। কারণ সেটাকে আমি ব্যর্থতাই মনে করছি না। দ্বীনের আলোকে আমাদের মন গড়ে উঠছে না বলেই এমন হচ্ছে, মন দোরস্ত হচ্ছে না বলেই পদে পদে আমরা এভাবে দ্বীন থেকে সরে যাচ্ছি। আমরা যখন সবকিছুকে দ্বীনের আলোকে চিন্তা করব তখন বুঝতে হবে আমাদের চিন্তা-চেতনা দোরস্ত হয়েছে। তখন দ্বীনের উপরে চলা আমাদের জন্য সহজ হবে।

তাই মনকে দোরস্ত করতে হবে, মনের চিন্তা-চেতনাকে দোরস্ত করতে হবে। মনের চিন্তা-চেতনা ইসলামের আলোকে চলছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। মনকে ইসলামের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মনকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া যাবে না। মনের উপরেও ইসলামের অনেক বিধান রয়েছে। মন অহংকার করতে পারবে না এটা মনের উপরে একটা বিধান। মন হিংসা করতে পারবে না এটা মনের উপরে একটা বিধান। মন কারোর ভাল কিছু দেখে হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা বোধ করতে পারবে না এটা মনের উপরে একটা বিধান। মন কোন পাপের চিন্তা করতে পারবে না এটা মনের উপরে একটা বিধান। মন কারও ক্ষতির চিন্তা করতে পারবে না এটা মনের উপরে একটা বিধান। দ্বীনের কাজ করার ক্ষেত্রে মন মানুষকে খুশি করার চিন্তা রাখতে পারবে না এটা আমার মনের উপরে একটা বিধান। এভাবে মনের উপর পদে পদে বহু বিধান আছে। এই বিধানগুলো কেন রাখা হয়েছে? এজন্য রাখা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হয়েছে যেন মন দোরস্ত থাকে। মন দোরস্ত থাকলে সমস্ত আমল দোরস্ত হবে। মন হল মানুষের পরিচালক। মন হল দেহের সম্রাট। সম্রাট যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে পুরো রাজত্ব ঠিক হয়ে যায়। দেশের পরিচালক ঠিক হয়ে গেলে গোটা দেশ ঠিক হয়ে যায়। পরিচালক গোষ্ঠির ভিতরে গলদ থাকলে গোটা সমাজের মধ্যে, গোটা দেশের সমস্ত মানুষের ভিতরে গলদ এসে যায়। তদ্রূপ মনের ভিতরে গলদ থাকলে সবকিছুর ভিতরে গলদ এসে যায়।

আমরা আবার রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ হাদীছটি স্মরণ করি–

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري برقم ٥٢ ومسلم برقم ٤١٧٨)

অর্থাৎ, জেনে রাখ! তোমার দেহের মধ্যে একটা মাংসখণ্ড আছে সেটা যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে তোমার গোটা দেহ ঠিক হয়ে যাবে। আর সেটা যদি ঠিক না থাকে, তাহলে তোমার গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। জেনে রাখ সেটা হল হৃৎপিণ্ড।

হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত মন হল গোটা চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার পরিচালক, সেই মন ঠিক না হলে চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতাও ঠিক হবে না। আর চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা ঠিক না হলে মানুষ ঠিক হবে না।

আল্লাহ্ পাক আমাদের মনকে দোরস্ত করার তাওফীক দান করেন, আমাদের চিন্তা-চেতনাকে দোরস্ত করার তাওফীক দান করেন। আমরা যেন জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে সবকিছুকে দ্বীনের আলোকে বিচার করতে পারি, দ্বীনের আলোকে চিন্তা করতে পারি তার জন্য তাওফীক দান করেন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং– ২

মন ও চিন্তা চেতনাকে দোরস্ত করা (২য় পর্ব)

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا. الاية. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল দ্বীনদার হওয়ার জন্য মানুষের মন দোরস্ত করা প্রথম শর্ত। মন যদি দোরস্ত হয় তাহলে সব আমল দোরস্ত হবে। মন যদি দ্বীনদার হয় তাহলে মানুষ দ্বীনদার হতে পারবে। আর মন যদি দোরস্ত না হয়, তাহলে হাজার ওয়াজ-নছীহত শুনব, হাজার কুরআন-হাদীছের বয়ান শুনব কিন্তু মানার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হবে না। কারণ, মনের ভিতরে গলদ রয়ে গেছে। মনের ভিতরে গলদ থাকলে সব জায়গায় গলদ থেকে যাবে। মন হচ্ছে মানুষের এই দেহরূপ গাড়ির পরিচালক। পরিচালক যদি ঠিক হয়, তাহলে গাড়ি ঠিকমত চলবে। পরিচালক ঠিক না হলে গাড়ী ঠিকমত চলবে না। মানুষের মন দোরস্ত করার জন্য সর্বপ্রথম জরুরী হল ঈমান ঠিক করা। ঈমান হল কতগুলো আকীদা-বিশ্বাসের নাম। এই আকীদা-বিশ্বাস দোরস্ত হলে মন দোরস্ত হয়। মন দোরস্ত হলে অন্যান্য আমল দোরস্ত হয়। আর আমল দোরস্ত হলে সেই আমল কবূল হয়। এ জন্য কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ. (সূরা নূর : ৩৯)

অর্থাৎ, যাদের ঈমান ঠিক নেই– যারা কাফের, তাদের আমল হল মরুভূমীর মরিচিকার মত।

মরিচিকার ব্যাপার হল দূরের থেকে দেখলে মনে হবে অনেক পানি, কিন্তু আসলে কিছুই না, সব হাওয়া। তদ্রূপ একজন মানুষের ঈমান-আকীদা দোরস্ত না হলে সে বাহ্যিকভাবে মনে করবে অনেক আমল করছে, কিন্তু সেই আমলের কোন মূল্য নেই, সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

মানুষের মনে নানান রকম গলত আকীদা-বিশ্বাস, নানান রকম গলত ধ্যান-ধারণা এবং নানান রকম গলত মন-মানসিকতা ঢুকতে পারে। এইসব গলত আকীদা-বিশ্বাস ও গলত ধ্যান-ধারণা হল মনের জঞ্জাল। মনের মধ্যে এই সব জঞ্জাল থাকলে তা সাফ করতে হবে। এই সব জঞ্জাল সাফ করার তরীকাও ইসলামে বলে দেয়া হয়েছে। যখনই কোন জঞ্জাল ঢুকবে ইসলামের বলে দেয়া তরীকা অনুযায়ী সেই জঞ্জাল সাফ করে ফেলতে হবে। এই জঞ্জাল সাফ করার প্রধান তরীকা হল আকীদা-বিশ্বাস দোরস্ত করা। যে সম্পর্কে গত জুমুআয় বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। আর একটা তরীকা হল যিকির করা। এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. (رواه البيهقى فى الدعوات الكبير. كذا فى المشكاة)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, সব ধরনের ঝং দূর করার জন্য রেত থাকে। মনের ঝং দূর করার রেত হল আল্লাহর যিকির।

রেত হল একটা যন্ত্র, যা দিয়ে ঘষলে ঝং দূর হয়ে যায়। মনের ভিতরে যে জঞ্জাল ঢোকে, মনের মধ্যে যে ঝং ধরে সেই ঝং দূর করার জন্যও রেত আছে। সেটা হল যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর যিকির।

যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর যিকির অর্থ আল্লাহকে স্মরণ করা। এই যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর স্মরণ হয় তিন ভাবে। কলবের যিকির, যবানের যিকির আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিকির।

প্রথমটা হল কলবের যিকির। কলব অর্থ মন। কলবের যিকির অর্থ মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ রাখা, প্রত্যেকটা পদে পদে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ রাখা। প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর কি হুকুম, প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর কি নির্দেশ তা স্মরণ রাখা। এটা হল কলবের যিকির বা মনের স্মরণ। কলব বা মন সবসময় যিকির করতে থাকবে অর্থাৎ, সব সময় আল্লাহ পাকের স্মরণ করতে থাকবে। প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে। এটা হল কলবের যিকির বা মনের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ।

দ্বিতীয়টা হল যবানের যিকির অর্থাৎ, মুখে মুখে যিকির করা।

তৃতীয়টা হল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিকির। অর্থাৎ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা। আমলের মাধ্যমেও আল্লাহকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। যেমন নামায পড়িতো আল্লাহর স্মরণ থেকেই নামায পড়ি, রোযা রাখি তো আল্লাহর স্মরণ থেকেই রোযা রাখি। এভাবে নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমেও আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। এটা হল আমলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিকির।

কেউ যদি এই তিনভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে অর্থাৎ, প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর কি হুকুম, আল্লাহ্ কিভাবে চলতে বলেছেন সেটা যদি স্মরণ করে আর মুখেও আল্লাহকে স্মরণ করে এবং বাহ্যিকভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমেও আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে তার মনের ভিতরে ঝঞ্জাল ঢুকতে পারবে না, কোন জঞ্জাল থাকলে তাও দূর হয়ে যাবে। অর্থাৎ, মনের ঝং দূর হয়ে যাবে।

যিকির বা আল্লাহর স্মরণ যদিও এই তিনভাবেই হয়ে থাকে, কিন্তু সাধারণত যিকির বলতে বোঝায় মুখের দ্বারা যিকির। মুখের যিকির অনেকটা মৌলিক গুরুত্ব রাখে। কারণ, মুখে যিকির করলে মুখে যা বলা হবে অন্তরে তার আছর পড়বে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তার আছর পড়বে। মুখের কথা মনের উপর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আছর ফেলে থাকে। যেমন আমরা মুখের দ্বারা খুব বেশী দুনিয়ার কথা বলে থাকি। সারাদিন এই যবান দ্বারা দুনিয়াবী আলোচনা করে থাকি। এজন্য কলবের ভিতরেও সব সময় দুনিয়া থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দুনিয়ার লাইনে চলে। যে কথা মানুষ বেশী আলোচনা করে, মনের ভিতর তার আছর বা প্রভাব বেশী পড়তে থাকে। তাই যখন মুখে সবসময় যিকির করা হবে অন্তরেও সেই যিকিরের আছর পড়তে থাকবে অর্থাৎ, অন্তরে আল্লাহর আছর পড়তে থাকবে, অন্তরে আল্লাহর স্মরণ বদ্ধমূল হতে থাকবে।

যিকির দ্বারা কলব পরিস্কার হয়, কলবের ঝং দূর হয়। কলব বা মন কি জিনিস তা আমরা কেউ বুঝি না। আমরা শুধু উপলব্ধি করি যে, কলব বা মন বলে একটা জিনিস ভিতরে আছে, কিন্তু তা কেমন তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। কলব কি তা যেমন বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, তেমনি কলবের ঝং কিরকম তাও বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যাবে না, কীভাবে সেই ঝং পরিস্কার হবে তাও বুদ্ধি দিয়ে নির্ধারণ করা যাবে না। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ঝং দূর করার যে পদ্ধতি বলে দিয়েছেন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তা-ই বিশ্বাস করতে হবে। আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যিকির দ্বারা কলবের ঝং দুর হয়, যিকির দ্বারা কলব পরিস্কার হয়, অতএব এটাই বিশ্বাস করতে হবে, এই বিশ্বাস নিয়েই যিকির করতে হবে।

মুখের যিকিরের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় জানার রয়েছে। এক নং– কি কি যিকির করতে হবে, দুই নং– কি পরিমাণ যিকির করতে হবে, তিন নং– কখন কখন যিকির করতে হবে অর্থাৎ, যিকিরের সময় কোনটা? এসব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে পরিষ্কার দিক নির্দেশনা রয়েছে।

প্রথম বিষয় হল কি কি যিকির করতে হবে? এ ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের জীবনে যত কাজ রয়েছে তার বহুক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ দোয়া রয়েছে। যেমন ঘর থেকে বের হব দোয়া আছে, ঘরে প্রবেশ করব দোয়া আছে, রাস্তায় পথ চলব দোয়া আছে, যখন সমতল জায়গায় চলব দোয়া আছে, উঁচুতে উঠব দোয়া আছে, নীচুতে নামব দোয়া আছে। সমতল জায়গায় চলার সময় সুন্নাত হল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে পড়তে চলা। যখন নিচের দিকে নামব, যেমন দোতলা থেকে নিচের দিকে নামব বা যে কোন উচুঁ জায়গা থেকে নিচের দিকে নামব তখন সুবহানাল্লাহ পড়তে পড়তে নামা সুন্নাত। উপর দিকে উঠার সময় যেমন নীচতলা থেকে উপর তালায় উঠার সময় বা যেকোনভাবে উপর দিতে উঠার সময় আল্লাহু আকবর পড়তে পড়তে উঠা সুন্নাত। মসজিদে ঢুকব দোয়া আছে, মসজিদ থেকে বের হব দোয়া আছে, কাপড়-চোপড় পরিধান করব দোয়া আছে, কাপড়-চোপড় খোলার সময় দোয়া আছে। এমনিভাবে পান করা, আহার করা, পেশাব-পায়খানা, নিদ্রা-জাগরণ ইত্যাদি জীবনের বহুক্ষেত্রে দোয়া আছে। জীবনের সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এইসব দোয়া পাঠ করা দ্বারাও যিকির তথা আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। এসব দোয়া পাঠ করার মাধ্যমেও ভিতরে আল্লাহর স্মরণ আসবে, এটাও যিকির। এ হল এক ধরনের যিকির। এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ যিকির আছে। যেমন 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া' আল্লাহু আকবার ইত্যাদি যিকির রয়েছে। এক হাদীছে এসেছে–

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. (سنن الترمذي برقم ٣٣٨٣ وقال حديث حسن)

অর্থাৎ, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যিকির হল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

কুরআন তেলাওয়াত করাও একটি শ্রেষ্ঠ যিকির। আল্লামা নববী বলেছেন,

اِعْلَمْ أَنَّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ هِيَ أَفْضَلُ الْأَذْكَارِ. (كتاب الأذكار)

অর্থাৎ, জেনে রাখো কুরআন তেলাওয়াত একটা শ্রেষ্ঠ যিকির।

কুরআন তেলাওয়াত করা উত্তম যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন তেলাওয়াত একটি অত্যন্ত ফযীলত ও ছওয়াবের আমল। কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা প্রত্যেকটা হরফে কম পক্ষে ১০টা করে নেকী পাওয়া যায়। আর নামাযের ভিতরে তেলাওয়াত হলে প্রত্যেকটা হরফে কমপক্ষে একশত করে নেকী পাওয়া যায়। অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করলেও ছওয়াব হবে। কেউ কেউ বলে, না বুঝে পড়লে কোন ফায়দা নেই। যখন বুঝিই না তখন পড়ে কি লাভ? একথা ভুল। অর্থ না বুঝে পড়লেও ছওয়াব হয়। কুরআনে কারীমের অর্থ বোঝা একটা আমল, কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করা আর একটি আমল। একটা আমল করতে না পারলে আর একটা আমল কেন ছাড়ব। তবে হ্যাঁ, অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করলে ফায়দা বেশী হয়, কলবে আছর বেশী হয়। আমরা পুরো কুরআন সম্ভব না হলেও দুই চারটা সূরার অর্থ বাংলা দেখেও মুখস্ত করে নিতে পারি। এটা এমন কঠিন কিছু নয়। দুনিয়ার কতকিছুই তো মুখস্ত করি, কতকিছুই তো মনে রাখি, কয়েকটা সূরার অর্থ কেন মনে রাখতে পারব না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য উযূ থাকা জরুরী নয়। উযূ না থাকলেও মুখস্ত তেলাওয়াত করা যায়। শুধু মাত্র গোসল ফরজ থাকা অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয নয়। এছাড়া হাটতে চলতে উঠতে বসতে সবসময় আমরা কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি। তবে হ্যাঁ কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে গেলে উযূর দরকার, যখন কুরআন শরীফ স্পর্শ করে তেলাওয়াত করা হবে তখন উযূ থাকতে হবে। এছাড়া উযূ না থাকলেও উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সব সময় কুরআন তেলাওয়াত করা যায়।

কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য যিকিরের জন্যও উযূ থাকতে হবে বা নিদৃষ্ট জায়গায় বসে যিকির করতে হবে– এটা জরুরী নয়। চলতে-ফিরতে উযূ থাকুক বা না থাকুক সব সময় যিকির করা যায়। তবে হ্যাঁ উযূ সহকারে নির্জনে বসে কেবলা মুখী হয়ে বসে আল্লাহর ধ্যানকে মজবূত রেখে ইখলাছের সাথে যিকির করা হলে যিকিরের সব আদব পূর্ণ রক্ষা হয়। ঐ যিকিরে কলবে আছর বেশী হয়। এরকম কিছু যিকির করা সম্ভব হলে উত্তম।

দ্বিতীয় বিষয় হল **কি পরিমাণ যিকির করতে হবে?** কুরআনে কারীমে যিকির সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা, তোমরা অনেক বেশী আল্লাহর যিকির কর অর্থাৎ, অনেক বেশী আল্লাহকে স্মরণ কর। (সূরা আহযাব : ৪১)

এ আয়াতে অনেক বেশী যিকিরের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কত বেশী তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। যিকিরের সীমা কি তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এত বেশী যিকির কর যার কোন সীমানা নেই। যিকির করতেই থাক, করতেই থাক। যত বেশী সম্ভব যিকির করতে থাক। মানুষ সর্বাবস্থায় যদি যিকির করে তারপরেও একথা থেকে যায় হয়তো আমি আরও বেশী যিকির করতে পারতাম, তাহলে আমার দ্বারা যিকিরের হুকুম এখনও পুরোপুরি পালন হচ্ছে না। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ. (السنن الكبرى للبيهقي برقم ١٨٣٩)

অর্থাৎ, এত বেশী যিকির কর যে, মানুষ বলবে লোকটা পাগল।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে যে, চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সর্বাবস্থায় এত বেশী পরিমাণে যিকির করতে থাকবে যে, মানুষে বলবে লোকটা কি পাগল হয়ে গেল সারা দিন-রাত শুধু যিকির করেই যাচ্ছে। এতটা যিকির করতে বলা হয়েছে।

একবার একজন বেদুঈন অর্থাৎ, একজন পল্লিবাসী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করেছিল ইয়া রসূলাল্লাহ্! শরীয়তের অনেক আমল আছে, যথাসময়ে যথাসাধ্য আমি সেগুলো করব, কিন্তু এমন একটা আমলের কথা আমাকে বলে দেন যেটা আমি সর্বাবস্থায় করতে থাকব। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. (رواه أحمد في مسنده برقم ١٧٧١٦ وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে তাজা থাকে।

অর্থাৎ, সবসময় যেন তোমার জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে নড়তে থাকে। সর্বদা যিকির করতে থাকা কোন অসম্ভব বিষয় নয়। কেউ অভ্যাস করলে সর্বদা যিকির জারি রাখতে পারে। সে সমস্ত স্থানে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা নিষেধ সেই স্থানগুলি ছাড়া সর্বদা যিকির করা যায়। যেমন:– পেশাব পায়খানায় রত অবস্থায়, যিকির করা নিষেধ। এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে এই ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অন্যান্য কাজের ফাকে ফাকেও মানুষ যিকির করতে পারে। যারা যিকির করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় যিকির মুখে চলতে থাকলে তাদের কাজের কোন ব্যাঘাত হয় না। যেমন আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নেই, এই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে আমাদের কোনচিন্তা করতে হয় না আটোমেটিক শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকে। জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে জান্নাতীদের শ্বাস-প্রশ্বাস হবে যিকির। যিকিরের সাথে শ্বাস প্রবেশ করবে, যিকিরের সাথে শ্বাস বের হবে। মানুষ যখন বেশী যিকির করে, যিকির করতে করতে এটা তার স্বভাবে পরিণত হয়, তখন যিকিরের জন্য তাকে অতিরিক্ত কোন বেগ পেতে হয় না।

যাহোক যথাসাধ্য যত বেশী পরিমাণ সম্ভব যিকির করতে বলা হয়েছে।

তৃতীয় বিষয় হল যিকিরের সময় কোনটা? পূর্বে যে আয়াতখানা পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা খুব বেশী যিকিরের কথা বলেছেন। ঐ আয়াতের পরের আয়াতে বলা হয়েছে,

وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا. (সূরা আহযাব : ৪২)

অর্থাৎ, সকাল বিকাল তাঁর তাসবীহ পাঠ কর।

এ আয়াতে যিকিরের সময়ের মধ্যে সকাল-বিকালের সময়টা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধায় বিশেষভাবে যিকিরের অভ্যাস রাখতে হবে। হাদীছে সকাল সন্ধায় একশত বার করে সুবহানাল্লাহ', আলহামদুলিল্লাহ', লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও আল্লাহু আকবার পড়ার কথা এসেছে। প্রতিদিন একশত বার করে ইস্তেগফারের কথা এসেছে। এছাড়া দুরূদ শরীফের ফযীলতও অনেক বেশী। তাই বুযুর্গানে দ্বীন সকাল-সন্ধায় একশত বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ইস্তেগফার ও যে কোন একটা দুরূদ শরীফ ওজীফা করার কথা বলেছেন। তাহলে অনেক হাদীছের উপরে আমল হয়ে যায়।

এছাড়াও চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সবসময় এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির চলতে থাকবে। কুরআন শরীফের এক আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا.

অর্থাৎ, জ্ঞানীতো তারা, যারা সর্বাবস্থায় যিকির করে– দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায় সব অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে। তারা আসমান জমিনের সৃষ্টি নিয়ে তথা আল্লাহর কুদরত ও শক্তিমত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আলে ইমরান: ১৯১)

এ আয়াত দ্বারা একদিকে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায় তথা সর্বাবস্থায় যিকির করার কথা বোঝা যায়। আর একদিকে বোঝা যায় যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় যিকির করে এবং আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারা জ্ঞানী মানুষ। যদিও সমাজের কেউ কেউ তাদেরকে নির্বোধ মনে করুক। মনে করুক যে, এরা বেকার মানুষ– কোন কাজ নেই বসে বসে শুধু যিকির করে। এই শ্রেণীর লোকদেরকে ওরা নির্বোধ মনে করে, অথচ আল্লাহ বলছেন, এরাই হল জ্ঞানী মানুষ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যিকির দ্বারা যেমন কলবের উপর আছর হয়, নফল নামায দ্বারাও কলবের উপর আছর হয়। বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে–

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا.

অর্থা, রাতের বেলায় জাগরণ করে যে নামায পড়া হয় এটা মনের উপরে অনেক চাপ সৃষ্টি করে। (সূরা মুযযাম্মিল: ৬)

এই চাপ সৃষ্টি হওয়ার দ্বারা মন দোরস্ত হয়। রাতের আরামের ঘুম ত্যাগ করে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে মনে চায় না কষ্ট লাগে। এই মনে না চাওয়া এবং কষ্ট লাগাকে উপেক্ষা করে যখন তাহাজ্জুদ পড়া হয় তখন মন আস্তে আস্তে বুঝে যায় যে, আমাকে আল্লাহর সমস্ত হুকুম মানতে হবে, আমার ভাল না লাগলেও মানতে হবে, আমার কষ্ট লাগলেও মানতে হবে। মনের এই অবস্থাই হল মনের সঠিক অবস্থা। এভাবেই মন দোরস্ত হয়ে যায়।

তাহাজ্জুদের আরও বড় একটা ফায়দা হল তাহাজ্জুদের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য বেশী লাভ হয়। এছাড়া অন্যান্য নফল দ্বারাও আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়। হাদীছে এসেছে–

وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ. (رواه البخارى في صحيحه برقم ٦٥٠٢)

অর্থাৎ, নফল নামাযের মাধ্যমে বান্দা আমার কাছে এসে যায়। কাছে আসতে আসতে এমন কাছে আসে যে, বান্দা আমার প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়, আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি।

তাই নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া চাই। বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া চাই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। ইশার পর থেকে নিয়ে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ, সুবহে সাদেক হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন নফল নামায পড়া হলে সেটাই হবে তাহাজ্জুদ। যারা ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে অভ্যস্ত নন তারা ঘুমানোর পূর্বেও তাহাজ্জুদ পড়ে নিতে পারেন। তবে গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে পড়লে আছর বেশী হবে। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর নাম আমরা জানি। অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক মুরীদ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হুজুর! আপনার কী অবস্থা? তখন তিনি বলেছেন,

طَاحَتِ الْعِبَادَاتُ وَفَنِيَتِ الْاِشَارَاتُ وَمَانَفَعَنِيْ اِلَّا رَكْعَاتٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

অর্থাৎ, যত ইবাদাত করেছি কোন ইবাদাত মনে হয় কাজে লাগেনি। কত ওয়াজ-নছীহত করেছি, মুরিদদেরকে তা'লীম তালকীন করেছি, মনে হয় কোনটাই কাজে আসেনি। ঐ রাতের বেলায় ঘুম থেকে জেগে কয়েক রাকাত নামায পড়তাম সেটাই কাজে লেগেছে।

তাহাজ্জুদের নামায ছাড়াও আরও কিছু বিশেষ নফল নামায রয়েছে, সেগুলির ব্যাপারেও যত্নবান হওয়া চাই। তার মধ্যে একটা হল ইশরাকের নামায। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর সাধারণভাবে ২৩ মিনিটের কথা বলা হয়, তবে ১২ মিনিট পরও ইশরাকের ওয়াক্ত হয়ে যায়। এই সময় চার রাকাত নামায পড়া চাই। না পারলে অন্তত দুই রাকাত পড়া চাই। যদি কেউ ইশরাকের নামায পড়েন, তার এক হজ্জ ও এক ওমরার ছওয়াব হয়। আর একটা হল আওয়াবীন-এর নামায। মাগরিবের নামাযের পর যদি কেউ ছয় রাকাত নফল নামায পড়েন তাহলে তার বার বছর ইবাদতের ছওয়াব হয়। এই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

তিনটা নামায– তাহাজ্জুদের নামায, ইশারাকের নামায, আওয়াবীনের নামায এই তিন প্রকার নফল নামাযের ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া চাই। পারলে অন্যান্য নফলও পড়া চাই। এই সব নফল নামায পড়লেও কলবের হালাত ভাল হয়।

যিকির ও নফল নামায দ্বারা কলব কীভাবে দোরস্ত হয়, কলবে কীভাবে আছর হয় এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। যিনি আমল করবেন তিনি বুঝবেন তার কলবের অবস্থা কেমন ছিল আর আমলের পরে তার কলবের অবস্থা কেমন হচ্ছে। কিছু দিন নিয়মিত যিকির করার পর নিজের মনের আবস্থা নিজেই উপলব্ধি করা যায়।

মনের অবস্থা দোরস্ত হলে ইবাদত ও নেক কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, গোনাহের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়, ইবাদতে মজা লাগে, দ্বীনের কথা ভাল লাগে, দ্বীনের কাজ ভাল লাগে, কলবে এতমীনান আসে, কলবের বিভিন্ন রকম টেনশান পেরেশানী কমে যায়। কিছুদিন আপনি নিয়মিত যিকির করলে যিকিরের এই ফায়দাগুলো উপলব্ধি করা যায়। আবার যদি কিছুদিন ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে কলবের অবস্থা ডাউন হচ্ছে তাও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু আমল করার আগে এসব বিষয় বোঝানো যায় না।

সারকথা মনকে দোরস্ত করার জন্য, কলবের অবস্থা উন্নত করার জন্য আকীদা-বিশ্বাস দোরস্ত করা চাই, যিকির করা চাই এবং নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া চাই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার ও আমল করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৩

কী মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে (১ম পর্ব)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের জীবনের সবক্ষেত্রের জন্য বিধি-বিধান দিয়ে রেখেছেন। জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানের আল্লাহর দেয়া বিধান নেই। সবক্ষেত্রের জন্য আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান রয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা রয়েছে। জীবনের কোন কিছু আমার খেয়াল খুশি মত চালানোর অবকাশ নেই। বরং সবকিছু চালাতে হবে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা মোতাবেক। এজন্য একথা মনে করা যাবে না যে, আমার স্বাধীনতা নষ্ট করা হয়েছে, আমাকে মুসীবতে ফেলে দেয়া হয়েছে, আমি আমার নিজের ইচ্ছামত চলব সেই সুযোগ রাখা হয়নি। বরং মনে করতে হবে আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা মানার মধ্যে আমার ফায়দা, আল্লাহর কোন ফায়দা নেই, রসূলের কোন ফায়দা নেই। আমি আল্লাহর কথা মানব, রসূলের তরীকা মানব এজন্য আমি ঠেকা, আল্লাহর কোন ঠেকা নেই। আমি আমার প্রয়োজনে করছি আল্লাহর প্রয়োজনে নয়, রসূলের প্রয়োজনে নয়। এই মনোভাব থাকলে ঈমান-আমল সুন্দর হবে। আর যদি মনোভাব এই থাকে যে, আমি ঠেকায় পড়ে করছি, তাহলে ঈমান-আমল সুন্দর হবে না।

একজন মানুষ যদি মনে করে আমি ঠেকায় পড়ে করছি, এটা আমার কাজ নয়, তাহলে তার কাজ সুন্দর হয় না। আর যদি মনে করে এটা আমার কাজ, না করলে আর কারও ক্ষতি নয় বরং আমার ক্ষতি, আমি আমার প্রয়োজনে করছি, যখন এই মনোভাব নিয়ে কাজ করে তখন তার কাজ সুন্দর হয়। একজন রাজমিস্ত্রি যখন অন্যের বাড়িতে কাজ করে, অন্যের কাজ করে, তখন সে এমনভাবে কাজ করে যে, কোন রকম জবাব দিতে পারলেই সারে। সুন্দর করার চিন্তা তার ভিতর তেমন আসে না। আর সে যখন নিজের বাড়ির কাজ করে এবং মনোভাব এই থাকে যে, এটা আমার নিজের কাজ, তখন খুব সুন্দরভাবে কাজ করে। তখন সে খেয়াল রাখে সিমেন্ট বালু সুন্দরভাবে মেলানো হল কি না, ইট লাগানোটা খুব সুন্দরভাবে সোজা হল কি না, ইটগুলো সুন্দরভাবে ভেজানো হয়েছে কি না। ইত্যাদি অনেক কিছুর দিকে সে খেয়াল রাখে। যার ফলে তার এই কাজ খুব সুন্দর হয়। এখানে নিজের কাজ– এই মনোভাব থাকার কারণেই তার সবকিছু সুন্দর হয়। কেন সুন্দর হয়? কারণ, সে মনে করছে এটা আমার নিজের কাজ। তদ্রূপ আমরা যখন আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকাম পালন করব, ইবাদত-বন্দেগী করব তখন যদি এই মনোভাব রাখি যে, এটা আমার নিজের কাজ, তাহলে তা সুন্দর হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

আমরা যখন নামায পড়তে আসি, কোন রকম কয়েকটা ঠোকর দিয়েই নামায সেরে ফেলি। রুকু ঠিকমত হল কি না, সাজদা ঠিকমত হল কি না, সূরা-কেরাত ঠিকমত হল কি না, ফরয, সুন্নাত, ওয়াজিব, মোস্তাহাব এগুলো ঠিকমত আদায় হল কি না– এগুলির প্রতি আমাদের তেমন যত্ন আসে না। কারণ, এটা যে আমার প্রয়োজন, এটা যে আমি আমার নিজের লাভের জন্য করছি, এটা যে আমি আমার নিজের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য করছি, এটা যে আমার নিজের কাজ– এই মনোভাব থাকে না। এই মনোভাব না থাকার কারণেই আমাদের ইবাদত-বন্দেগী সুন্দর হয় না বরং কোন রকম জবাব দিতে পারলেই সারে এমন দায়সারা গোছের হয়ে যায়। ভাবখানা এমন যেন ইবাদত-বন্দেগীর জন্য আমার কোন ঠেকা নেই বরং আল্লাহই আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর জন্য ঠেকা। তার কাছে কোন রকম জবাব দিতে পারলেই সারে যে, আমিতো করেছি। এজন্য আল্লাহ পাক এক আয়াতে বলে দিয়েছেন,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

অর্থাৎ, জেনে রাখ। আল্লাহ কিন্তু জগৎবাসীর কাছে ঠেকা নন। (সূরা বাকারা: ২৬৭)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

অর্থাৎ, মানুষ এবং জিন জতিকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোন খাওয়া-পরা চাই না বরং আমি আল্লাহই তাদেরকে খাওয়া-পরা দেই। (সূরা যারিয়াত : ৫৬-৫৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বোঝাতে চেয়েছেন তার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, হে মানুষ! তোমাদের কাছে আমার কোন ঠেকা নেই, তোমরা আমাকে খাওয়াও দিবে না, পারাও দিবে না। বরং আমি তোমাদেরকে খাওয়া পরা দেই। আমি তোমাদের কাছে ঠেকা নই, বরং তোমরা আমার কাছে ঠেকা। তোমরা যে আমার ইবাদত করছ এটা আমার স্বার্থে নয় বরং তোমাদের নিজেদেরই স্বার্থে।

হজ্জের সময় মানুষের মনের উপরে খুব চাপ যায় যে, এত বিরাট অংকের টাকা খরচ করে ফেলব, কতগুলো টাকা চলে যাবে। যেন ঠেকায় পড়েই এত টাকা খরচ করতে হচ্ছে। হজ্জ প্রসংগে তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। যাদের ওখানে যাওয়ার সামর্থ আছে, তাদের উপর ফরয। এখন যদি কেউ মনে করে যে, কেন হজ্জ করব, এত পয়সা খরচ করে কী লাভ? অর্থাৎ, যদি কেউ মনে করে যে, এতে আমার কোন লাভ নেই, আমার কোন ঠেকা নেই, কেন আমি এটা করব। তাই এর পরে আল্লাহ পাক বলেছেন, যদি কেউ হজ্জকে অস্বীকার করে; সে জেনে রাখুক জগৎবাসীর কাছে আল্লাহর কোন ঠেকা নেই।

এই যে বিভিন্ন বিধি-বিধান বলে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, জগৎবাসীর কাছে আমার কোন ঠেকা নেই। একথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি হোক যে, আমার ইবাদতের জন্য আল্লাহর কোন ঠেকা নেই, আল্লাহর কোন স্বার্থ নেই। আমি ইবাদত করব এজন্য যে, আমি ঠেকা,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এটা আমার প্রয়োজনে করছি, আমার স্বার্থে করছি, এটা আমার নিজেরই কাজ। এটা করলে আমার লাভ, আল্লাহর কোন লাভ নেই, ইবাদত না করলে আমার ক্ষতি, আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই।

অতএব এই মনোভাব নিয়ে আমাদের ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে যে, এটা আমার নিজের কাজ, আমি কাউকে বুঝ দেয়ার জন্য করছি না যে, দায়সারা গোছের করলেই সারবে। বরং এটা আমার নিজের স্বার্থে করছি; অতএব সুন্দরভাবে করা চাই।

এক হাদীছে কুদসীর ভিতরে আল্লাহ পাক খুব সুন্দর করে একথাটিই বলেছেন,

يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا. (رواه مسلم برقم ٦٧٣٧)

অর্থাৎ, হে আমার বান্দা! দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত জিন, সমস্ত ইনসান যদি সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া পরহেযগারীর অধিকারী হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্বে একটুকুও কিছু বাড়বে না অর্থাৎ, তাতে আমার কিছু লাভ হবে না। এর বিপরীত দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত জিন, সমস্ত ইনসান যদি সর্বনিম্ন পর্যায়ের পাপী হয়ে যায়, চূড়ান্ত অবাধ্য হয়ে যায়, তাতে আমার রাজত্বের একটুকুও কিছু কমবে না অর্থাৎ, তাতে আমার কোনই ক্ষতি হবে না।

ইবাদত-বন্দেগী করলে আল্লাহর কোন লাভ নেই, না করলে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই, করলে আমাদের লাভ না করলে আমাদের ক্ষতি। যদি এই মনোভাব থাকে তাহলে আমরা কি করে আল্লাহর হুকুমকে অসুন্দর ভাবে করতে পারি? আমি নামায পড়ছি, সুন্দর ভাবে পড়ছি না, এতে কার ক্ষতি? আমারই তো ক্ষতি। আমি পড়ছি এতে আমার লাভ। যদি এই অনুভূতি থাকে তাহলে ইবাদত অসুন্দর হতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ পাক বিভিন্ন হুকুম বয়ান করার পর একথা বলছেন যে, দেখ আল্লাহর কোন ঠেকা নেই। অর্থাৎ, এটা তোমার কাজ, তোমার প্রয়োজনে তুমি করছ। না করলে তোমার ক্ষতি করলে তোমার লাভ, আমার কোন লাভ লোকসান নেই। কাজেই এখন করবে কি করবে না, আর করলে কিভাবে করবে চিন্তা করে দেখ।

সারকথা ইবাদতের ক্ষেত্রে একটা মনোভাব এই রাখতে হবে যে, ইবাদত করলে আমার লাভ, না করলে আমার ক্ষতি। এই লাভ অর্জন করার জন্য এবং ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ইবাদত করব। ইবাদত করলে সবচেয়ে বড় এবং চূড়ান্ত লাভ হল এর দ্বারা জান্নাত অর্জিত হবে। আর ইবাদত না করলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল আমাকে জাহান্নামে জ্বলতে হবে। এছাড়া ইবাদত দ্বারা দুনিয়ার কিছু লাভ এবং না করলে দুনিয়ার কিছু ক্ষতিও রয়েছে। ইবাদত করলে যেমন দুনিয়ার লাভ, তেমনি আখেরাতের লাভ তথা উভয় জগতের লাভ হয়, না করলে দুনিয়ারও ক্ষতি আখেরাতেরও ক্ষতি তথা উভয় জগতের ক্ষতি হয়। আমি ইবাদত দ্বারা এই উভয় ধরনের লাভ অর্জন করতে চাই এবং উভয় ধরনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাই।

ইবাদতের ক্ষেত্রে আর একটা মনোভাব হল ইবাদত করতে হবে শোকর আদায় করার জন্য অর্থাৎ, কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য। আমি ইবাদত করব শোকর আদায় করার জন্য। কিসের শোকর? শোকর হল আল্লাহ পাক আমাকে যত নায-নেয়ামত দিয়েছেন সেই সব নায-নেয়ামতের শোকর। শুধু মুখে শোকর আদায় করলেই শোকর আদায় হয়ে যায় না। বরং আসল শোকর হয়ে থাকে আমলের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

মাধ্যমে। অমি মুখে বললাম আল্লাহ পাক আমাকে খুব সুখে-শান্তিতে রেখেছেন, অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছেন, আলহাম্‌দুল লিল্লাহ! কিন্তু আল্লাহর হুকুম মান্য করলাম না, তাহলে এটা হবে শুধু মৌখিক জমা-খরচ। এরূপ মৌখিক জমা-খরচের কোন দাম নেই। এই শোকরের কোন অর্থ নেই। সত্যিকার অর্থে শোকর আদায় হবে যদি আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা স্মরণ করে তাঁর হুকুম-আহকাম মান্য করা হয়। শুধু কথায় নয়, কথায় এবং কাজে উভয়ভাবে অনুগ্রহদাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে।

আল্লাহর দেয়া নায-নেয়ামতকে আল্লাহর হুকুমমত কাজে লাগালেই কার্যত শোকর আদায় হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাকে সম্পদ দিয়েছেন, এখন আমি আল্লাহর দেয়া সম্পদকে আল্লাহর হুকুমমত ব্যয় করলাম, এটাই হবে এই ক্ষেত্রের কার্যত শোকর, এটাই হবে মালের শোকর। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুস্থ্য রেখেছেন, এই সুস্থ্যতাকে আল্লাহর কাজে লাগালাম, এটাই হবে এই ক্ষেত্রের কার্যত শোকর, এটাই হবে দৈহিক শোকর। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়েছেন, এটাকে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ব্যবহার করলাম, এটাই হবে এ ক্ষেত্রের কার্যত শোকর। এভাবে সব আমলের কার্যত শোকর আদায় করতে হবে। এটাই হল আসল শোকর। এই আসল শোকর আদায় করার সাথে সাথে মুখেও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, মুখেও আল্লাহর না শোকরী করা যাবে না।

সারকথা– ইবাদত করতে হবে শোকর আদায় করার নিয়তে। এক হাদীছে এসেছে। একদিন ইশার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়শা (রা.)-এর ঘরে আসলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবি ছিল একাধিক, এজন্য ঘুরে ঘুরে কয়েকদিন পর এক এক বিবির ঘরে আসা হত। বিবিরা অত্যন্ত আগ্রহভরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের দিনের অপেক্ষায় থাকতেন। হযরত আয়েশা (রা.) তো তার পালার দিন ঘরে বসে বসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে কবিতা চর্চা করতেন। এরকম একটা কবিতা আছে যার অর্থ হল–

"দুনিয়ার জগতের একটা সূর্য আছে। আমার জগতেরও একটা সূর্য আছে। দুনিয়ার আকাশে সূর্য উদিত হয় সকাল বেলায়, আর আমার আকাশে সূর্য উদিত হয় ইশার পরে।"

এভাবে হযরত আয়েশা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে বসে বসে কবিতা চর্চা করতেন। এভাবে একদিন তিনি কবিতা চর্চা করছেন, ইতিমধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.) কে খুব আদর করতেন। আদর করে সাধারণত তাকে ইয়া আয়েশা! পুরাপুরি না বলে ছোট্ট করে বলতেন আয়েশ। মাঝে মধ্যে বলতেন হুমায়রা। এটা ছিল হযরত আয়েশা (রা.)-এর আর এক নাম। হযরত আয়েশা (রা.) ডাকের ভিতর বুঝতে পারতেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদর করে ডাকছেন কি না। তো একদিন ইশার পরে রসূল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। এসে বললেন ইয়া আয়েশ বলে ডাক না দিয়ে ইয়া ইবনাতা আমি বাকরিন! অর্থাৎ, হে আবূ বকরের কন্যা! বলে ডাক দিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) এই ডাক শুনেই বুঝে ফেললেন আজকে তো ব্যাপারটা অন্য রকম। আবূ বকরের কন্যা বলে ডাক দিলেন কেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "হে আবূ বকরের কন্যা" বলে ডাক দিয়ে অনেক কিছু বুঝাতে চেয়েছেন। তার মধ্যে একটা হল হযরত আবূ বকর সিদ্দিক ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সবচেয়ে বেশী ফেদা অর্থাৎ,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আত্মত্যাগী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তিনি তার নিজের জীবনের সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন, কিছু রাখেননি। তিনি ছিলেন আরবের একজন বিরাট ধনী। অথচ শেষ পর্যন্ত তার অবস্থা এমন হয়েছে যে, তালি দেয়া জামা গায়ে দিয়েছেন। এই আবূ বকরের কন্যা বলে ডাক দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চেয়েছেন যে, তুমি আবূ বকরের কন্যা। তোমাকেও পিতার মত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। হযরত আয়েশা (রা.) এত বুদ্ধিমতি ছিলেন যে, এই শব্দ শুনেই সব বুঝে নিলেন। তাই ইয়া ইবনাতা আবী বকরিন ডাক শুনেই সাথে সাথে বললেন, আমি সব ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে আজ ছেড়ে দাও। আমি শুধু আমার মাওলার সান্নিধ্যে থাকি। হযরত আয়েশা (রা.) মনকে বুঝালেন। তারপর বললেন, অনুমতি দিলাম, আজ রাতের জন্য আমার হক ছেড়ে দিলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখছেন কিভাবে ইবাদত করেন। তিনি লম্বা লম্বা রুকু, লম্বা লম্বা সাজদা দিয়ে নামায পড়ছিলেন। নফল নামায এরকম পড়াই ভাল। নফল নামাযে ঘন ঘন রুকু সাজদা করে তাড়াতাড়ি করে পড়ে রাকাতের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে লম্বা লম্বা কেরাত, লম্বা লম্বা রুকু, লম্বা লম্বা সাজদা দিয়ে ধীরে সুস্থে পড়াই উত্তম। যদি তাতে রাকাতের সংখ্যা কম হয়। অর্থাৎ, নফল নামাযের ক্ষেত্রে, কোয়ান্টিটি বা সংখ্যার চেয়ে কোয়ালিটি বা গুণগত মান বেশী হওয়ার মর্যাদা বেশী। গুণগত মান যদি বেশী হয় সেটার মর্যাদা বেশী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম নফল পড়ছিলেন। সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত এভাবে নফল পড়তে থাকলেন। যখন নামায শেষ হল তখন আয়শা (রা.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার তো সব গোনাহ মাফের ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়েছে। একেতো নবীদের কোন গোনাহ্ হয় না, যদির পর্যায়ে যদি ধরে নেয়া হয় যে, গোনাহ হয়েছে বা হবে তবুও আল্লাহ তা'আলা সেটা মাফের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। এরকম ঘোষণা দেয়ার পরও আপনার এত ইবাদত করার কী প্রয়োজন? তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟ (صحيح البخاري حديث رقم ٤٨٣٦)

অর্থাৎ, আমি কি আল্লাহর শোকর আদায়কারী বান্দা হব না?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন আল্লাহ আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করেছেন– আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল বানিয়েছেন, এটা তার অনুগ্রহ। আমার অতীতের, ভবিষ্যতের সব কিছু মাফের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, এটাও তাঁর অনুগ্রহ। তাহলে আমি কি ঐ অনুগ্রহকারী আল্লাহর শোকর আদায়কারী বান্দা হব না? এই হাদীছ বোঝা যায় যে, আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করার নিয়তেও ইবাদত করতে হবে।

সাধারনত আমরা নেয়ামত বলতে বুঝি যে, আমার টাকা-পয়সা কি পরিমাণ আছে, গাড়ি-বাড়ী কি পরিমান আছে, এগুলোই নেয়ামত। টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি না থাকলে মনে করি আল্লাহ পাক আমাকে আর কী নেয়ামত দিয়েছেন? শুধু টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়িই নেয়ামত নয়। এর বাইরেও আমাদের প্রতি বহু নেয়ামত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন এও এক একটা বিরাট নেয়ামত। এক একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে চিন্তা করলে বুঝে আসবে যে, এগুলি কত বড় নেয়ামত। আল্লাহ আমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন, স্মৃতি শক্তি দিয়েছেন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এগুলিও আল্লাহর দেয়া বড় বড় নেয়ামত। মানুষ এর এক একটা নেয়ামতের শোকরও সারা জীবন আদায় করতে পারবে না। তাই আল্লাহ পাক যত নেয়ামত দিয়েছেন সেই সব নেয়ামতের শোকর আদায় করার জন্য চব্বিশ ঘন্টাও যদি আল্লাহর জন্য সাজদায় পড়ে থাকা হয় তবুও শোকর আদায় হবে না। আমরা যতটুকু ইবাদত-বন্দেগী করি তা আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামতের শোকর আদায় করার জন্য যতটুকু করা দরকার ছিল তার তুলনায় বহু বহু গুণে অল্প।

যাহোক ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। সাথে সাথে এই শোকর আদায় করলে আরো ফায়দা রয়েছে। নেয়ামতের শোকর আদায় করলে আল্লাহ পাক নেয়ামতকে আরো বৃদ্ধি করে দেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা শোকর আদায় কর আমি তোমাদের নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইবরাহীম : ৭)

দুনিয়াতেও দেখা যায় মানুষের কোন দানের জন্য শোকর আদায় করলে মানুষ সেটা আরও বেশী দেয়। যদি কোন মানুষকে আমি এক টাকা দেই, আর সে যদি বলে আলহামদু লিল্লাহ! তাহলে আমি খুশী হব এবং পরে আমি তাকে আরও বেশী দিব। কিন্তু যদি সে বলে কী দিলেন হুজুর! এটা কোন দেয়া হল! তাহলে পরে হয়তো ওকে আর কিছুই দিব না। মনে করব, ওর মত অকৃতজ্ঞ লোককে না দেয়াই উচিত। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াত বা অন্য কোন উপলক্ষে খেতে যাই। সেই সব বাসার মহিলারা কত কষ্ট করে আমাদের জন্য রান্না বান্না করে। খেয়ে যদি বলি খুব সুন্দর পাক হয়েছে, আল হামদুলিল্লাহ। তাহলে ভিতরের মহিলারা খুব খুশী হয়। পরে আরেকদিন গেলে আরও সুন্দর করে রান্না করে খাওয়ানোর জন্য মনে মনে উদ্বুদ্ধ হয়। আর যদি খেয়ে বলি ধূর কী বাজে রান্না! তাহলে মনে মনে বলবে আচ্ছা দেখি সামনে তোমাকে কে রান্না করে খাওয়ায়! সামনে আর ভাল খাওয়ানো বন্ধ হয়ে যাবে। দেখা গেল নেয়ামতের শোকর আদায় না করলে নেয়ামতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এমনিভাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যাকিছুই দিয়েছেন তার শোকর আদায় করলে আল্লাহ পাক তা আরও বৃদ্ধি করে দেন। সম্পদের শোকর আদায় করলে সম্পদ বেড়ে যাবে। সম্পদের পরিমাণ না বাড়লেও তার গুণগত মান বেড়ে যাবে, উপকারিতা বেড়ে যাবে।

যাহোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝালেন আমি শোকর আদায় করার জন্যই আল্লাহর ইবাদত করছি। অতএব ইবাদত করার সময় শোকর আদায় করার নিয়ত রাখা চাই।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ ঘটনায় দেখা যায় তিনি খুশী হয়ে নিজের হক ছেড়ে দিয়েছেন। দ্বীনী কাজে স্বামীকে সহযোগিতা করেছেন। নিয়ম হল স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে দ্বীনী কাজে সহযোগিতা করবে। হযরত আয়েশা (রা.) যদি বলতেন, আপনি শুধু আল্লাহর হক-ই চেনেন, আমাদের হক আর চিনেন না? তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওরকম মুক্ত মনে, খোলা মনে আর ইবাদত করতে পারতেন না। বরং তিনি ভাবতেন যে, আমার বিবির হক আদায় করতে হবে। বিবি সহযোগিতা করায় এভাবে ইবাদত করা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আছান হয়েছে।

এভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে দ্বীনী কাজে সহযোগিতা করলে সে দম্পতি দ্বীনের ক্ষেত্রে অনেক আগে বেড়ে যেতে পারে। আমরা প্রত্যেকে নিজের পরিবার সম্পর্কে অবগত আছি। যদি সহযোগিতা করে, তাহলে অনেক দ্বীনের কাজ করা সহজ হয়। সহযোগিতা না করলে কঠিন হয়। নামায, রোযা,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হজ্জ, যাকাত, দাড়ি, টুপি, পর্দা ইত্যাদি অনেক ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগিতা করলে সেগুলি করা সহজ হয়। এজন্যই বিবাহের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই দেখা হয়, আমরা অনেক কিছুই দেখে থাকি, কিন্তু সবচেয়ে মুখ্যভাবে, সবচেয়ে বড় করে যেটা দেখতে বলা হয়েছে সেটা হল পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে দ্বীনদারীকে বড় করে দেখা। এক হাদীছে বলা হয়েছে,

تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ. (متفق عليه. البخاري ٥٠٩٠ ومسلم ٣٧٠٨)

অর্থাৎ, নারীদেরকে বিবাহ করা হয়ে থাকে ধন-সম্পদ দেখে, বংশ দেখে, সৌন্দর্য দেখে, আর দ্বীনদারী দেখে। মৌলিক এই চারটা জিনিস দেখা হয়ে থাকে, কিন্তু তোমরা দ্বীনদারীর বিষয়টাকে প্রাধান্য দিবে। যাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, কিংবা যে ছেলের সাথে বা যে মেয়ের সাথে আমি আমার ছেলেমেয়েদেরকে বা আমার ভাই বোনকে বিবাহ দিতে যাচ্ছি তারা দ্বীনদার কিনা এ বিষয়টাকেই বড় করে দেখতে হবে।

কাফের-অমুসলিম নারীকে বিবাহ করা নিষেধ, কাফের-অমুসলিম ছেলের সাথে আমাদের মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়া নিষেধ। এটা কেন? আল্লাহ পাক তার কারণ এই বলেছেন,

اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ.

অর্থাৎ, কাফের-অমুসলিমরাতো জাহান্নামের দিকে ডাকে। (সূরা বাকারা : ২২১)

এখানে বোঝানো হয়েছে– স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের উপরে আরেকজনের প্রভাব খুব বেশী পড়ে। একজনের চিন্তা-চেতনা, একজনের মন-মানসিকতার প্রভাব আরেকজনের উপরে অত্যন্ত বেশী পড়ে থাকে। তাই যদি স্বামী স্ত্রীর একজন বদদ্বীন হয় তাহলে আরেকজনও বদদ্বীন হয়ে যাবে। যদিও এরকম হতে পারে যে, একজন দ্বীনদার আরেকজন বদদ্বীন আর দ্বীনদার বদদ্বীনকে ভাল বানাবে। এটারও সম্ভাবনা আছে কিন্তু এই সম্ভাবনাটা ক্ষীণ। যখন ভাল আর মন্দ মিলে যায় তখন মন্দের প্রভাবই বেশী পড়ে। দুধের ভিতরে যদি এক ফোটা পেশাব পড়ে, সেই এক ফোটা পেশাবই সমস্ত ভাল দুধকে খারাপ করে দেয়। তাই আল্লাহ পাক বলেছেন যে, এই যে দ্বীনদারীর বিষয়টাকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে সেটা এজন্য যে, দ্বীনদারী না থাকলে খারাপজন ভালজনকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। পারিবারিক জীবনে, দাম্পত্য জীবনে এটা একটা মৌলিক বিষয়। আমরা যখন বিবাহ করি, কিংবা ভাইবোনকে বা ছেলে মেয়েদেরকে বিবাহ দেই, তখন এই দ্বীনদারীর বিষয়টাকে বড় করে দেখি না। শুধু দুনিয়ার অন্যান্য দিকগুলিকেই বড় করে দেখি। এই মনোভাব পরিত্যাগ করা চাই।

যাহোক আলোচনা করা হচ্ছিল যে, ইবাদত করতে হবে এই মনোভাব নিয়ে যে, ইবাদতের দ্বারা আমারই লাভ। ইবাদত করতে হবে আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করার মনোভাব নিয়ে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সবকিছু সহীহভাবে বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে আগামী জুমুআয় আরও কিছু আলোচনা পেশ করা হবে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং -৪

কী মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে (২য় পর্ব)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুয়ায় আমরা আলোচনা করেছিলাম কি মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে, ইবাদত করার সময় এই মনো ভাব রাখতে হবে যে, আমরা আল্লাহর কাছে ঠেকা, আল্লাহ আমাদের কাছে ঠেকা নয়। আমরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মানি আমাদের প্রয়োজনে। এই মনোভাব রাখতে হবে যে, ইবদাত করলে আমার লাভ, আল্লাহর কোন লাভ নেই। আর না করলে আমাদের ক্ষতি, আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই। এই মনোভাব রাখতে হবে যে, আল্লাহ পাক আমাকে যত নায-নেয়ামত দান করেছেন সেই নায-নেয়ামতের শোকর আদায় করার জন্য আমি ইবাদত করছি।

মানুষ যদি সারা জীবন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে থাকে, তবুও আল্লাহর একটা নেয়ামতের শোকরও আদায় হবে না। মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ডে একটা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আগের যুগে এক ব্যক্তি পাঁচ শত বৎসর একাধারে ইবাদত করেছেন। তিনি একটা পাহাড়ের নির্জন গুহায় ইবাদত করতেন, সেখান থেকে আর বের হতেন না। আল্লাহ পাক সেখানেই তার খাওয়া পান করার ব্যবস্থা করে দিতেন। প্রতিদিন সকাল বিকাল দুই বার তার কাছে খাবার আসত। দুইটা ফল আসত, একটা ফলের ভিতরে খাবার, আরেকটার ভিতরে পানি থাকত। এভাবে সেই বুযুর্গ পাঁচশত বৎসর ইবাদত করেছেন। এটা সহীহ হাদীছের ঘটনা, কোন কাল্পনিক ঘটনা নয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনাটি বয়ান করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সেই লোকটাকে বলবেন যে, আমার রহমতে অর্থাৎ, আমার দয়ায় তুমি জান্নাতে যাও। লোকটা তখন মনে মনে বলবে, নিছক আল্লাহর দয়ায় জান্নাতে যাব, এত বছর ইবাদত করলাম তার তো কোন উল্লেখ-ই আসল না। তাঁর ধারণা যে, আমি এত বছর ইবাদত করেছি এই ইবাদতের বদৌলতেই আমি জান্নাতে যাব। তাই লোকটা ভাবতে থাকবে যে, নিছক আল্লাহর দয়ায় জান্নাতে যাব, এত ইবাদত করলাম তার কথা তো কিছুই বলা হল না। আল্লাহ পাক অন্তরের গোপন কথাও জানেন। আমরা যা কল্পনা করি সেই কল্পনাও আল্লাহর অজানা নয়। দুনিয়ার মানুষের কাছে আমরা আমাদের কল্পনা লুকাতে পারি, মনে মনে কতকিছু ভাবি কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তুআল্লাহর কাছে কোন কিছু লুকানোর উপায় নেই। আল্লাহ পাক দিলের কথাও জানেন। তাই আল্লাহ পাক এক ফেরেশতাকে হুকুম দিবেন যে, তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও! তাকে আস্তে আস্তে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা হবে। জাহান্নামের তাপের কারণে তার প্রচণ্ড পিপাসা লাগবে। এমন সময় একজন ফেরেশতা তার সামনে দিয়ে এক পেয়ালা পানি নিয়ে হেটে যাবে। লোকটা বলবে, ভাই! আমাকে একটু পানি খাওয়ান। ঐ ফেরেশতা জওয়াব দিবে এই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পানির মূল্য অনেক, তুমি এত মূল্য দিতে পারবে কি? সেই জগতে দাম বলতে বোঝায় ইবাদত। এই টাকা-পয়সা সেখানে থাকবে না। থাকবে শুধু ইবাদত। তাই লোকটা তখন বলবে, আমার কাছে অনেক মূল্য আছে– পাঁচশত বছরের ইবাদত আছে। ফেরেশতা বলবে, এই এক পেয়ালা পানির মূল্য পাঁচশত বৎসরের ইবাদত। তখন লোকটা ঐ পাঁচশত বৎসরের ইবাদত দিয়ে ঐ এক পেয়ালা পানি পান করতে রাজি হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ পাক বলবেন, বান্দা! তোমার ইবাদতের জোরে তুমি জান্নাতে যেতে চেয়েছিলে। আমি যে প্রতিদিন তোমাকে সকাল বিকাল দুই গ্লাস পানি খাওয়াতাম, আর দুই ওয়াক্ত খানা খাওয়াতাম, সেগুলোর মূল্য আগে দাও। অন্য নেয়ামতের কথা বাদ দিলাম শুধু সেগুলোর মূল্য দিয়ে তারপরে পারলে ইবাদতের জোরে জান্নাতে যাও। লোকটা তখন তার চিন্তার ভুল বুঝতে পারবে। অবশেষে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এই ঘটনায় বোঝানো হয়েছে যে, আমরা যত ইবাদতই করি না কেন তা আল্লাহর যে সব নেয়ামত আমরা ভোগ করি তার তুলনায় নিতান্তই নগন্য। আমাদের সারা জীবনের ইবাদতও আল্লাহর একটা নেয়ামতের শোকর আদায় হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে আমাদের ব্যাপারে নিয়ম রাখা হয়েছে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে শোকর আদায় করার চেষ্টা করব, বাকিটা আল্লাহর রহমতে আল্লাহ আমাদেরকে পার করে নিবেন। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সাধ্যের বাইরে চাপ দেন না। (সূরা বাকারা : ২৮৬)

অতএব যতটুকু সাধ্য আছে সে অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী করে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকলে আটকে যেতে হবে। যাহোক আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করার জন্য সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে যেতে হবে।

ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে আর একটা মনোভাব এই থাকবে যে, ইবাদত না করলে আমি ক্ষতিগ্রস্থ হব, আল্লাহর হুকুম-আহকাম না মানলে আমার পার হওয়ার কোন উপায় হবে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলছেন,

وَ الْعَصْرِ، اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সময়ের কসম দিয়ে বলছেন, যে সময়ের কসম!, অবশ্যই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি সে চারটা কাজ না করে। নিজেরা ঈমান আনবে, নেক আমল করবে। অন্যকে ঈমানের কথা বলবে, আমলের কথা বলবে। এই মোট চারটা কাজ– নিজের ঈমান, নিজের আমল, অন্যের ঈমানের জন্য চেষ্টা করা ও অন্যের আমল-এর জন্য চেষ্টা করা। এই চারটা কাজ না করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লাহ পাক সময়ের কসম দিয়ে কথাগুলো বলেছেন। সময়ের কসম দিয়ে বলা হল এ জন্য যে, মানুষ যদি সময়কে কাজে না লাগায় তাহলেই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর আমাদের সময় লাগাতে হবে এই চারটা কাজে। নিজের ঈমান আমলের কাজে, অন্যের ঈমান আমলের কাজে। এর বাইরে যদি আমাদের সময় ব্যয় হয়, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। সময়ের গুরুত্ব এত বেশী যে, এই সময়কে কাজে লাগানোর দ্বারাই আমাদের রক্ষা হবে, সময়কে কাজে না লাগালে আমাদের জীবন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সময়ের এই গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই এখানে সময়ের কসম দিয়ে কথাগুলো বলা হয়েছে। কসম ঐ জিনিসের দেয়া হয় যে জিনিসের গুরুত্ব মনে থাকে। গ্রাম দেশের মা বোনেরা বাচ্চার মাথায় হাত রেখে কসম করে, কারণ বাচ্চার গুরুত্ব তার মনে বেশী। যদিও এরূপ কসম করা নিষেধ। আল্লাহর কসম ছাড়া আর কোন রকম কসম করা যাবে না। আল্লাহর কসম ছাড়া অন্য কোন কিছুর কসম খাওয়া যাবে না। বাচ্চার মাথায় হাত রেখে কসম খাওয়া, কুরআন শরীফ ধরে কসম খাওয়া, আল্লাহর ঘর মসজিদ বা বায়তুল্লাহ ধরে কসম খাওয়া, এভাবে মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর যত কিছুর কসম খায়, তা নিষেধ।

যাহোক আল্লাহ পাক সময়ের কসম দিয়ে কথাগুলো বলেছেন। আল্লাহ পাক বোঝাতে চেয়েছেন সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন হে মানুষ! তোমাদের সময় খুবই মূল্যবান জিনিস, অতএব সময়কে নষ্ট করো না। তোমাদের সময় লাগাবে চার কাজে, এছাড়া অন্য কোন কিছুর পেছনে তোমার সময় লাগাবে না।

কুরআনের ছোট্ট একটা সূরা। মাত্র দুই লাইনের এক সূরা। এর ভিতরে জীবনের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে দেয়া হয়েছে। হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলতেন, যদি কেউ কুরআন শরীফের এই একটা সূরার উপরে আমল করে, এই একটা সূরার বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে, তাহলে তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমাদের সময় লাগতে হবে এই চার কাজে, এর বাইরে কোথাও আমাদের সময় লাগবে না।

কেউ যদি বলেন, আমরা কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করি, কেউ ক্ষেত-খামার করি, কেউ চাকরী-নওকরী করি, এগুলিতো এই চার কাজের বাইরে। তাহলে কি এগুলো কিছুই করা যাবে না? হাঁ এগুলিও করা যাবে। এগুলিও এক হিসেবে নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর আমাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার দেয়া এই দায়িত্ব পালন করার নিয়তে আয়-উপার্জন করলে সেই আয়-উপার্জনের জন্য যা কিছু করা হবে তাও ছওয়াবের কাজ তথা নেক আমল বলে গণ্য হবে। এসব কাজ করার নিয়ত ঠিক করে নিতে হবে। আমি যে ব্যবসা-বাণিজ্য করব, চাকরী-নওকরী করব, খেত-খামার করব, কি নিয়তে করব? এই নিয়তে করব যে, এ দ্বারা আমার যে আয়-উপার্জন হবে তা দিয়ে আমার অধীনস্তদের ভরন-পোষণের ব্যবস্থা করব, এটা আমার যিম্মাদারী বা দায়িত্ব, আমি এই দায়িত্ব পালন করার নিয়তে এগুলি করব। এরূপ নিয়তে এসব কাজ করলে এগুলিও নেক আমলে পরিণত হবে। এভাবে এগুলি হবে নিজের আমলের কাজে সময় লাগানো।

এভাবে দুনিয়ার অনেক কাজই আমলে পরিণত হবে, দ্বীনের কাজে পরিণত হবে। নিয়তটা ঠিক করে নিতে হবে। নিয়ত এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে, নিয়ত সহীহ হলে সেই নিয়তের কারণে দুনিয়ার কাজও দ্বীনের কাজে পরিণত হয়। আর যদি নিয়ত গলত হয় তাহলে দ্বীনের কাজও দুনিয়ায় পরিণত হয়ে যায়। যেমন যাকাত ও দান-খয়রাত সরাসরি দ্বীনের কাজ। এখন আমি যাকাত দিলাম, দান-খয়রাত করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষে আমাকে দানশীল বলবে যে, লোকটা খুব দান-খয়রাত করে। তাহলে মানুষের কাছে সম্মান পাওয়ার জন্য এগুলি করা হল। দুনিয়ার উদ্দেশ্যে এগুলি করা হল। তাহলে এরূপ গলত নিয়তের কারণে এগুলি দ্বীনের কাজ হিসেবে গণ্য হবে না বরং দুনিয়া হয়ে যাবে। নিয়ত বড়ই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তাই হাদীছে এসেছে–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, সব আমলের হিসাব হবে নিয়তের ভিত্তিতে। সব আমল পরিগণিত হবে নিয়তের ভিত্তিতে। নিয়ত যেমন হবে আমলের মূল্যায়ন সেভাবে হবে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে আর একটা মনোভাব থাকতে হবে জবাবদিহিতার মনোভাব। জবাবদিহিতার চেতনায় ইবাদত করতে হবে। ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমাদের মনোভাব এরকম থাকতে হবে যে, এর জন্য আল্লাহর কাছে আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। যতগুলো বিষয়ে আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে, তার জন্য আমরা প্রস্তুত হতে পেরেছি কি না ভেবে দেখতে হবে। আমাদের নিজেদের ঈমান-আমলের জন্য আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। আমরা অন্য মানুষের ঈমান-আমলের জন্য ফিকির করেছি কি না, মেহনত করেছি কিনা, তার জন্য আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। আমাদের যতটুকু ধর্মীয় জ্ঞান আছে, সে অনুযায়ী আমরা অন্য মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি কিনা, তার জন্য আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। এই জবাবদিহীর চেতনা নিয়ে কাজ করতে হবে। এই জবাবদিহিতার চেতনা মনে উপস্থিত রাখা একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমল এখলাসের সাথে হওয়ার ক্ষেত্রে এবং আমল সুন্দরভাবে হওয়ার ক্ষেত্রে এরূপ চেতনার বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

আমরা অনেক সময় ইবাদত-বন্দেগী করি মানুষকে বুঝ দেয়ার জন্য। প্রত্যেকে আমরা নিজেদের মনকে জিজ্ঞাসা করে দেখি আমরা যে নামায পড়ি, রোযা রাখি, যাকাত দেই, দান-খয়রাত করি, হজ্জ করি, এ সব ক্ষেত্রে আমাদের মনে এই চিন্তা আসে কি না যে, নামায পড়লে মানুষ কী বলবে! রোযা না রাখলে মানুষ কী বলবে! টাকা-পয়সা আছে হজ্জ না করলে মানুষ কী বলবে! এই চিন্তা আসলে বোঝা গেল আমরা মানুষকে বুঝ দেয়ার জন্য এগুলি করি। আল্লাহকে বুঝ দেয়ার জন্য করি না। ইবাদত করতে হবে মানুষকে বুঝ দেয়ার জন্য নয়, আল্লাহকে বুঝ দেয়ার জন্য। মানুষে কি বুঝল আর না বুঝল, মানুষ কী ভাবল আর না ভাবল, এই চিন্তার মধ্যে আমার কোন ফায়দা নেই। এর জন্য আমাকে কোন হিসাব নিকাশ দিতে হবে না। বরং আল্লাহকে বুঝ দেয়ার জন্য আমাকে আমল করতে হবে। এর জন্য আল্লাহর কাছে আমাকে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে, আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে এই মনোভাব নিয়ে, এই চেতনা নিয়ে ইবাদত করতে হবে। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চিন্তা থাকলে ইবাদতের এখলাস ঠিক থাকবে, মানুষের চিন্তায় ইবাদত করলে ইবাদতের এখলাস নষ্ট হবে। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চিন্তা থাকলে গোপনে সদরে সবস্থানে ইবাদত সুন্দর হবে। পক্ষান্তরে মানুষের চিন্তায় ইবাদত করলে মানুষের সামনে হলে ইবাদত সুন্দর হবে, কিন্তু মানুষের অগোচরে হলে ইবাদত সুন্দর হবে না।

সমস্ত আমলের ব্যাপারেই আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। এক হাদীছে বিশেষভাবে ছয়টা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। কেয়ামতের দিন এই ছয়টা বিষয়ের জওয়াব না দিয়ে কেউ এক পা-ও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। ইরশাদ হয়েছে–

لَاتَزُوْلُ قَدَمَا اِبْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهٖ حَتّٰى يُسْاَلَ عَنْ خَمْسٍ.

অর্থাৎ, পাঁচটা বিষয়ের জওয়াবদিহী না করে কোন বনি আদম-এর পা সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। সেই পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে প্রথমে যে বিষয়ে প্রশ্ন হবে তা হল–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ.

অর্থাৎ, বনী আদম তার জীবন কীভাবে ধ্বংস করেছে? তার জীবনটা কীভাবে কাঠিয়েছে? এই বিষয়ে জবাবদিহী করতে হবে। এটা একটা ব্যাপক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জওয়াবে তো অনেকেই আঁটকে যাবে।

দ্বিতীয় যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা হল–

وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ.

অর্থাৎ, বিশেষভাবে তার যৌবনের সময়টা কোন্ কাজে লেগেছে? এ ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে।

যৌবনের সময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়। এটাই হল কাজ করার সময়। আমাদের চেতনা হল উল্টো। আমরা ভাবি যৌবনে যাকিছু ফূর্তি-ফার্তি করার করে নেই, পরে শেষ বয়সে গিয়ে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইবাদত-বন্দেগী খুব করা যাবে। যখন কোমর বাঁকা হয়ে আসবে আর কিছু করার শক্তি থাকবে না, কোথাও কারও কাছে পাত্তা পাওয়া যাবে না, তখন আল্লাহর ঘর মসজিদে গিয়ে পড়ে থাকব। তখন সারাক্ষণ আল্লাহ-বিল্লাহ করতে থাকব। এটা হল উল্টো চেতনা। এটা হল শয়তানের একটা চক্রান্ত। শয়তান এভাবে মানুষকে আসল সময়ে ইবাদত থেকে সরিয়ে রাখে। ইবাদত করার আসল সময় হল যৌবন কাল। তাই আল্লাহ পাক বিশেষভাবে যৌবন সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যৌবনের সময়ে ইবাদতের গুরুত্ব বেশী বলেই যারা যৌবনে ইবাদত করে তাদের মর্যাদাও বেশী হবে। বার্ধক্যে যারা ইবাদত করে এই ইবাদত করে আল্লাহর কাছে যতটা মর্যাদা পাওয়া যাবে, যৌবনে ইবাদত করে আল্লাহর কাছে তার চেয়ে বেশী মর্যাদা পাওয়া যাবে। কেয়ামতের ময়দানে প্রচণ্ড গরমে মানুষের এত পরিমান ঘাম ছুটবে যে, কারও ঘাম তার কদম পর্যন্ত, কারও ঘাম তার হাটু পর্যন্ত আবার কারও ঘাম আরো বেশী উপর পর্যন্ত পৌছাবে। এই গরমের মধ্যে আল্লাহ পাকের আরশের নীচে যারা ছায়া পাবে, তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হল যারা যৌবনে ইবাদত করে। বোঝা গেল যৌবনে ইবাদত করা আল্লাহর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই যৌবন সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা হল–

وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ.

অর্থাৎ, মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে যে, কীভাবে তা উপার্জন করেছিল আর কোথায় ব্যয় করেছিল?

অর্থাৎ, উপার্জনটা বৈধ ছিল না অবৈধ, উপার্জনের পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত ছিল কি না এবং শরীয়ত সম্মত স্থানে ব্যয় করা হয়েছিল না কি শরীয়ত অনুমোদন দেয় না এমন স্থানেও ব্যয় করা হয়েছিল, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। অতএব যেমন ইচ্ছা তেমন কামাই করলাম তা চলবে না, যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যয় করলাম তা চলবে না। এর জন্যও আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহী করতে হবে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের ব্যাপারে আমাদের মনে চিন্তা আসে যে, এগুলির জন্য আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহী করতে হবে, কিন্তু আয়-উপার্জন ও ব্যয়ের ব্যাপারে আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে সে চিন্তা আমাদের মনে তেমন আসে না। অথচ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের জন্য আল্লাহর কাছে যেমন জবাবদিহতী করতে হবে আয়-উপার্জন ও ব্যয় বিষয়েও তেমনই জবাবদিহী করতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পঞ্চম যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা হল–

وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ. (رواه الترمذي برقم ٢٤١٦ و ٢٤١٧)

অর্থাৎ, যতটুকু দ্বীন শরীয়তের কথা জেনেছিলে ততটুকু আমল করেছিলে কিনা জিজ্ঞেস করা হবে।

আমরা কত দ্বীনের কথা শুনি জানি, কিন্তু আমল করি না। নিজেরটা নিজেই হিসাব নেয়া দরকার যে, আমি যতগুলো শরীয়তের কথা জানি, দ্বীনের যত কথা জানি সে অনুযায়ী আমল করি কি না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে দ্বীন শিক্ষা করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে দ্বীনের কথা শেখার যে কি মজা ছিল তারা বুঝতেন। কিন্তু এরপরও দেখা যেত কোন কোন দিন কোন কোন সাহাবী মজলিসে আসেননি। পরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, আপনি যাননি কেন? উত্তরে বলেছেন, গতকাল যা যা শিখেছিলাম এখনও তা আমলে আনতে পারিনি, এজন্য আজ যাওয়ার সাহস হচ্ছে না, যা শুনলাম তাই তো এখনও আমল করতে পারিনি। তবে এর থেকে আমাদের একথা বোঝা ঠিক হবে না যে, তাহলে আমরা এ পর্যন্ত যা যা শিখেছি তা আমলে না আনা পর্যন্ত আর নতুন কিছু শিখব না। এরূপ বোঝা ঠিক হবে না। কারণ, এটাও মনে রাখতে হবে যে, জানলেই মানার উৎসাহ সৃষ্টি হয়। জানা বন্ধ হয়ে গেলে আমলের উৎসাহ আসবে কোত্থেকে? তাছাড়া এভাবে শয়তানও ধোকায় ফেলে রাখতে পারে যে, এখনও তোমার পূরোপূরি আমল আসেনি, অতএব আর কিছু শিক্ষা কর না। তদুপরি মনে রাখতে হবে, শিখলেও ছওয়াব আছে, সেই ছওয়াব থেকে কেন বঞ্চিত থাকব। শিক্ষা করাও একটা জরুরী কাজ। দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয। হাদীছে এসেছে–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (ابن ماجة)

অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলমানের উপর দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয।

আমার জীবনের সবকিছু চালানোর জন্য যা যা জানা দরকার তা শিক্ষা করা ফরয। ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম-নীতি শিক্ষা করা ফরয। আমার পরিবার কিভাবে চালাতে হবে তা শিক্ষা করা আমার জন্য ফরয। আমার চাকরী-নওকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেত-খামার কীভাবে করতে হবে তা জানা আমার জন্য ফরয। আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে আমার কীভাবে চলতে হবে, তাদের সাথে কি নিয়ম-নীতি বাজায় রেখে চলতে হবে তা জানা আমার জন্য ফরয। আমার সমাজের সাথে কীভাবে চলা-ফেরা করতে হবে, সমাজের মানুষের সাথে কিভাবে লেন-দেন ও আচার-আচরণ করতে হবে তা জানা আমার জন্য ফরয। এভাবে একজন মানুষের জীবনে যত ধরনের ক্ষেত্র এবং যত ধরনের বিষয় আসতে পারে সব সম্পর্কে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের বিধি বিধান কি তা জানা ফরয। নিজের ব্যাপারে এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরযে আইন যা প্রত্যেককেই জানতে হবে। চিন্তা করলে দেখা যাবে এই ফরযের মধ্যে আমাদের অনেকের ত্রুটি রয়ে গেছে। কাজেই আমলের ভয়ে জানা বন্ধ করারও অবকাশ নেই। যাহোক এ ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করা হবে যে, যতটুকু আমি জেনেছি ততটুকু আমল করেছি কি না।

এই হল সর্বমোট পাঁচটা বিষয়। এই পাঁচটা বিষয়ে সকলকে প্রশ্ন করা হবে। এই পাঁচটা বিষয়ে সকলকে জবাবদিহী করতে হবে। অন্য এক হাদীছে বিশেষভাবে নামায সম্পর্কেও জবাবদিহী করতে হবে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلٰوتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَ خَسِرَ. (رواه الترمذى برقم ٤١٣ وحسنه)

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের সর্বপ্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেয়া হবে সেটা হল নামায। তাই নামায ঠিক হলে সে কামিয়াব হবে এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আর যদি তার নামায ঠিক না হয় তাহলে সে ব্যর্থ হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

যেহেতু ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নামায। তাই নামাযের হিসাব-ই প্রথমে নেয়া হবে এবং নামাযের হিসেবে পার হতে পারলে অন্য সবকিছুর হিসাব সহজ হবে, ফলে সে কামিয়াব হবে। নিয়ম হল যদি কেউ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাশ করে, তাহলে বাকি বিষয়গুলির প্রশ্ন একটু হালকা করা হয়। অনেক প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার নিয়মেও এরকম আছে যে, যেসব সাবজেক্ট বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোতে যদি কেউ পাশ করে যায় আর তুলনামূলক কম গুরুত্ব রাখে এমন বিষয়ে যদি পাশ নাও করে, তবুও তাকে পাশ দিয়ে দেয়া হয়। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি ফেল করে, তাহলে অন্য বিষয়ে নম্বর অনেক বেশী থাকলেও তাকে পাশ ধরা হয় না। আল্লাহর কাছেও এই নিয়ম। গুরুত্বপূর্ণ নামাযের বিষয়ে যখন কেউ জওয়াবে উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে বাকি অন্য সব বিষয়ে পাশ হওয়া তার জন্য আছান হয়ে যাবে। তাই নামাযের ব্যাপারে জবাবদিহিতায় যেন উত্তীর্ণ হতে পারি সেজন্য নামায খুব যত্নের সাথে খুব সুন্দরভাবে আদায় করা চাই।

নামায সুন্দর করার জন্য মনের মধ্যে যতগুলো চিন্তা রাখার কথা কুরআন-হাদীছে বলা হয়েছে, তার মধ্যে এটাও একটা যে, আমি নামায পড়ছি, এই নামাযের প্রত্যেকটা রোকন সুন্দরভাবে হচ্ছে কি না, আল্লাহর কাছে আমি এর জওয়াব দিতে পারব কি না এই চিন্তা নিয়ে নামায পড়তে হবে। আল্লাহ পাক যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমার রুকুটা ঠিকমত হয়েছিল কি? আমি যেন বলতে পারি যে, আমার রুকুটা সুন্দর হয়েছিল। আল্লাহ পাক যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমার সাজদাটা ঠিকমত হয়েছিল কি? আমি যেন বলতে পারি যে, আমার সাজদাটা সুন্দর হয়েছিল। আল্লাহ পাক যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমার সূরা কেরাত, নামাযের তাসবীহগুলো ঠিকমত হয়েছিল কি? আমি যেন বলতে পারি যে, আমার সূরা কেরাত ও তাসবীহগুলো সুন্দরভাবে হয়েছিল। এভাবে নামাযের প্রত্যকটা আমলের ক্ষেত্রে এই চিন্তা করতে হবে যে, এটা সম্পর্কে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে আমি যেন তার উত্তর দিতে পারি যে, হ্যাঁ আমি সঠিকভাবে, সুন্দরভাবে, নিয়ম অনুযায়ী করেছি, এখলাসের সাথে করেছি। শুধু নামায নয় প্রত্যেকটা ইবাদতের ক্ষেত্রে এই চিন্তা করা যে, এই সবকিছুর জন্য আল্লাহর কাছে আমাকে জওয়াবদিহী করতে হবে। এরকম মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে। ইনশাআল্লাহ এসম্পর্কে আগামীতে আরও কিছু আলোচনা করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন, আমল করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৫

কী মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে (৩য় পর্ব)

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض قَالَ نَهَانِيْ خَلِيْلِيْ عَنْ ثَلَاثٍ اَنْ اُقْعِيَ اِقْعَاءَ الْكَلْبِ وَاَنْ اَنْقُرَ نَقْرَ الدِّيْكِ وَاَنْ اَفْتَرِشَ اِفْتِرَاشَ الثَّعْلَبِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

ইবাদতের সময় কি মনোভাব রাখতে হবে, কী মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে– গত দুই জুমুআয় এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ইবাদতের সময় যতগুলি মনোভাব রাখতে হয় তার মধ্যে আর একটা হল ধীরস্থিরতার মনোভাব। আমাদের অবস্থা হল সাধারণত কোন ইবাদতে লিপ্ত হলেই আমাদের মধ্যে তাড়াহুড়োর মনোভাব এসে যায়। যেমন নামায শুরু করেছি তখন কী করে তাড়া-তাড়ি শেষ করা যায়– এই মনোভাব এসে যায়। এই তাড়াহুড়োর মনোভাব পরিত্যাগ করে ধীরস্থিরতার সাথে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে–

قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাযে দাঁড়াবে বিনয়ের সাথে। (সূরা বাকারা : ২৩৮)

এই বিনয় কথাটার মধ্যে ধীরস্থিরতার কথা এসে গেছে। ধীরস্থিরতার সাথে নামায না পড়লে নামায যত্নের সাথে হয় না। ধীরস্থিরতার মনোভাব না থাকলে নামায পড়তে আরাম বোধ হয় না বরং নামায পড়তে কষ্ট বোধ হয়। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে–

وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ.

অর্থাৎ, যাদের খুশু-খুযূ নেই তথা ধীরস্থিরতার মনোভাব নেই তাদের জন্য নামায কঠিন ও কষ্টকর বোধ হয়। (সূরা বাকারা: ৪৫)

আমাদের নামায পড়তে কষ্ট লাগে তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটা বিশেষ কারণ হল ধীরস্থিরতার মনোভাব না থাকা। নামায শুরু করলেই তাড়া-হুড়া করে শেষ করতে মনে চায়, মনে হয় আমার এই ব্যস্ততা রয়েছে, সেই ব্যস্ততা রয়েছে ইত্যাদি। অথচ বাস্তবে হয়তো তেমন কোনই ব্যস্ততা নেই, খামোখাই ব্যস্ততা আছে বলে মনে হচ্ছে। যেসব বিষয়ের ব্যস্ততা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তার অনেকটাই হল ভুয়া। যদি একটু চিন্তা করা হয় যে, আসলেই কি আমার ব্যস্ততা আছে? বাস্তবেই কি আমার ব্যস্ততা আছে? এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে আসলেই তেমন কোন ব্যস্ততা নেই। এই নামায পড়ে গিয়ে আমি কী করব? যে কাজই করব সে কাজটা দুই মিনিট পরে করলেই বা আমার কী অসুবিধা। দেখা যাবে তা করতে হলেও পরে করা যায়, পরে করলেও তেমন বিশেষ কোন অসুবিধা হওয়ার নয়। কিন্তু তবুও মনের ভিতরে তাড়া-হুড়া আসে। এরকম অবস্থায় তাড়াহুড়ার মনোভাব দূর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

করা এবং মনের মধ্যে ধীরস্থিরতার মনোভাব আনার উপায় হল মনকে বোঝাতে হবে যে, আসলে আমার কোনই ব্যস্ততা নেই, কেন আমি তাড়া-হুড়া করতে যাচ্ছি? আমি তাড়া-হুড়া করব না বরং ধীরস্থিরভাবেই নামায আদায় করব। এভাবে মনকে শক্ত করলে মন থেকে তাড়াহুড়ার মনোভাব দূর হবে, নামাযে ধীরস্থিরতা আসবে, নামায সুন্দর হবে। আর নামায সুন্দর হলে সেই নামাযের ভিতরে মজা লাগবে, নামাযের মধ্যে স্বাদ পাওয়া যাবে।

নামাযের যতগুলি ফায়দা তার ভিতরে একটি ফয়দা এটাও যে, নামাযের দ্বারা আল্লাহর সাথে মহব্বত পয়দা হয়। সমস্ত আমল দ্বারা আল্লাহর সাথে মহব্বত পয়দা হয়। বিশেষভাবে নফল নামায সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

وَلَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ. الحديث (رواه البخارى في صحيحه برقم ٦٥٠٢)

অর্থাৎ, বান্দা যত নফল নামায পড়তে থাকে তত আমার সাথে তার নৈকট্য হতে থাকে। এমনকি তাকে আমি ভালবাসতে শুরু করি।

এ হাদীছে নফলের কথা কেন বলা হল? কারণ, মানুষ যখন নফল নামায পড়ে তখন একাগ্রতার সাথে পড়ে। যখন মনের ভিতরে তাড়া-হুড়া থাকে তখন কেউ নফল পড়ে না। নফলটা সাধারণত এমন সময় পড়া হয় যখন মনের ভিতরে ধীরস্থিরতা থাকে, কোন তাড়া-হুড়া থাকে না। তাড়া-হুড়া থাকলে কেউ নফল পড়ে না। অবশ্য কিছু লোকের তো অভ্যাস এমনই যে, যা পড়ে তাই তাড়া-হুড়া করে পড়ে। এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বাস্তবে কোন তাড়া-হুড়া থাকুক আর না থাকুক সে দাঁড়ালেই তাড়া-হুড়া করবে। পাঁচ মিনিট সময় আছে, নফল পড়তে দাঁড়াল, সেই পাঁচ মিনিটে ছয় রাকআত পড়ে ফেলল। অথচ পাঁচ মিনিটে ধীরস্থির ভাবে দুই রাকআতও পড়া যেত। ওই পাঁচ মিনিটে তাড়া-হুড়া করে ছয় রাকআত পড়ার চেয়ে ধীরস্থিরতার সাথে দুই রাকআত পড়লে তার ফযীলত বেশী। নফল নামায যত ধীরস্থিরভাবে যত লম্বা লম্বা করে পড়া হবে চাই রাকআতের সংখ্যা কম হোক সেটার মর্যাদা বেশী। পাঁচ মিনিটে চার ছয় রাকআত নফল পড়ার চেয়ে ধীরস্থিরতা সহকারে লম্বা লম্বা কেরাত দিয়ে দুই রাকআত পড়ার ফযীলত বেশী। কিন্তু যার তাড়া-হুড়ার অভ্যাস যে দাঁড়ালেই তাড়া-হুড়া করে। হাদীছে এরকম তাড়া-হুড়া করে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

সাহাবী হযরত আবূ যর গেফারী (রা.) বলেছেন,

نَهَانِي خَلِيْلِي صَلَّى اللّٰه عَلَيه وسَلَّم عَنْ ثَلَاثٍ وَأَمَرَنِي بِثَلَاثٍ ، نَهَانِي أَنْ أَنْقُرَ نَقْرَ الدِّيْكِ ، وَأَنْ أَلْتَفِتَ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ، أَوْ أُقْعِيَ إِقْعَاءَ السَّبُعِ. (رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى كذا في إتحاف الخيرة المهرة برقم ٢/١٤٢٠)

অর্থাৎ, আমার বন্ধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নামাযের ভিতরে তিনটা কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটা হল– নামাযের মধ্যে আমি যেন মোরগের মত ঠোকর না দেই। মোরগের মত ঠোকর খাওয়া অর্থাৎ, ঠকা-ঠক সাজদা করা। এভাবে সাজদা করা নয় বরং ধীরস্থিরভাবে এতমীনানের সাথে সাজদা করতে হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়টা নিষেধ করেছেন তা হল আমি যেন নামাযের মধ্যে শিয়ালের মত এদিক-ওদিক না তাকাই। তৃতীয় যে বিষয়টা নিষেধ করেছেন তা হল হিংস্র প্রাণীর মত না বসি। হিংস্র প্রাণী বসার সময় সামনের দুই পা খাড়া রেখে পিছনের দুই পায়ের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উপরে বসে। এরকম বসতে নিষেধ করেছেন। বরং নামাযের মধ্যে বসার সুন্নাত তরীকা হল বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা হবে আর ডান পা খাড়া থাকবে। উভয় পা খাড়া রেখে দুই পায়ের গোড়ালীর উপরে বসা। যাহোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিনটা বিষয়ে নিষেধ করেছেন। এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে, নামায যেন তাড়া-হুড়া করে না হয় বরং ধীরস্থির ভাবে সুন্নাত মুস্তাহাবের প্রতি খেয়াল রেখে আদায় করা হয়।

যাহোক কিছু কিছু মানুষ স্বভাবগত ভাবে এরকম তাড়াহুড়ো করলেও অধিকাংশ মানুষ যখন নফল নামায পড়ে ধীরস্থিরভাবেই পড়ে। এজন্য হাদীছে কুদছীর মধ্যে আল্লাহ পাক বিশেষ ভাবে নফল নামাযের কথা বলেছেন যে, নফল নামায দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করে। আল্লাহ পাক বলেন, এভাবে নৈকট্য হতে হতে এক পর্যায়ে তার সাথে আমার ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাকে আমি ভালবাসতে শুরু করি।

নফল নামায সম্পর্কে যখন এটা বলা হয়েছে, ফরয নামায তো আরও গুরুত্বপূর্ণ, ফরয নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত আরও বেশী। তাই ফরয নামায দ্বারাও অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে। ফরয নামায সম্পর্কেও এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, ফরয নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়।

যাহোক নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়, নামায দ্বারা আল্লাহর সাথে মহব্বত পয়দা হয়। তাই নামায পড়ার সময় আমাদের যতগুলি মনোভাব থাকবে, যতগুলি নিয়ত থাকবে, তার ভিতরে এটাও থাকবে যে, এই নামায দ্বারা আল্লাহর সাথে আমার নৈকট্য ও মহব্বত পয়দা হবে। এই নামায দ্বারা আমি আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হব, আল্লাহর মহব্বতের বান্দায় পরিণত হব।

যখন আল্লাহর সাথে মহব্বত পয়দা হয়ে যাবে, তখন আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানতে কষ্ট লাগা দূর হবে, আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানতে ভাল লাগবে। কুরআন-হাদীছের আলোকে আল্লাহর সাথে এতটুকু মহব্বত থাকতেই হবে যেন, আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানতে আমার ভাল লাগে অর্থাৎ, ইবাদত করতে ভাল লাগে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এতটুকু মহব্বত থাকতেই হবে যেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ আমার কাছে ভাল লাগে, দ্বীনে ইসলামের সাথে এতটুকু মহব্বত থাকতেই হবে যেন, এই ধর্ম আমার কাছে অন্য সব ধর্মের চেয়ে ভাল লাগে। নতুবা ঈমানের স্বাদ পাওয়া যাবে না, আমলের স্বাদ পাওয়া যাবে না।

আলহামদু লিল্লাহ! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাদের অনেকের এতটুকু ভালবাসা হয়েছে যে, তাঁর আদর্শকে আমরা ভালবাসি। এমন ভালবাসি যে, কোন কুলাঙ্গার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের বিরুদ্ধে বললে তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেও প্রস্তুত আছি। দ্বীনে ইসলামের সাথে আমাদের অনেকের এতটুকু ভাললাগা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের জীবন চলে গেলেও আমরা ইসলাম ছেড়ে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে কোন মূল্যেই রাজি হব না। আল্লাহর সাথেও আমাদের অনেকের এতটুকু ভালবাসার সম্পর্ক হয়েছে যে, আমরা অন্তত আল্লাহর হুকুম-আহকামকে প্রাধান্য দিতে শিখেছি। যদিও আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানতে ভাল লাগা এখনও পুরোপুরি হয়ে উঠেনি। আল্লাহর সাথে পুরোপুরি মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠলেই তাঁর হুকুম-আহকাম মানতে অর্থাৎ, ইবাদত-বন্দেগী করতে ভাল লাগবে, মজা লাগবে। আমাদেরকে এ পর্যায়ে উপনীত হতে হবে যে, আমরা কোনক্রমেই ইবাদত ছাড়তে রাজী নয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ইবাদতের উপরে থাকতেই আমরা রাজী। ইবাদতের উপরে থাকতেই আমাদের ভাল লাগে। ইবাদত বর্জন করতে আমাদের খারাপ লাগে। মনের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত পয়দা করে মনের এই অবস্থায় উঠে আসতে হবে।

আল্লাহর সাথে মহব্বত পয়দা করতে হলে তার অনেকগুলি পন্থা রয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ তিনটি পন্থা সম্পর্কে আজ আমরা আলোচনা করছি। একটা হল ইবাদত করার সময় এই ইবাদত দ্বারা আল্লাহর সাথে মহব্বত পয়দা হবে এই মনোভাব নিয়ে ইবাদত করতে হবে। আর একটা হল আল্লাহর সাথে মহব্বত পয়দা করতে হলে আল্লাহর কাছে দোয়াও করা চাই। হাদীছে আমাদেরকে এরূপ দোয়াও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দোয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَاَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. (رواه الترمذي في سننه برقم ٣٤٩٠ وحسنه)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আবেদন করি, তোমার সাথে যেন আমারন ভালবাসা হয়ে যায়। যে আমলগুলি তুমি পছন্দ কর সে আমলের সাথে যেন ভালবাসা পয়দা হয়ে যায়। হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসা যেন আমার কাছে বেশী প্রিয় হয়ে যায় আমার পরিবারের প্রতি আমার যে ভালবাসা তার চেয়ে বেশী, ঠাণ্ডা পানির প্রতি আমার যে ভালবাসা তার চেয়ে বেশী।

এই ঠাণ্ডা পানির কথা কেন বলা হল? আরবদের কাছে তখন ঠাণ্ডা পানির গুরুত্ব ছিল। এখনতো আমাদের কাছে ঠাণ্ডা পানির গুরুত্ব নেই। ঘরে ঘরে পানি ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আছে। যদি ঘরে ঘরে এরকম ব্যবস্থা না থাকত বরং লক্ষ কোটির ভিতরে একজনের কাছে এক কাতরা ঠাণ্ডা পানি থাকত, তাহলে বুঝে আসত ঠাণ্ডা পানির কি গুরুত্ব। আরবদের কাছে ঠাণ্ডা পানির গুরুত্ব আরও বেশী ছিল। তাই বলা হয়েছে হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসা আমার কাছে যেন বেশী হয়ে যায় প্রচণ্ড গরমের মুহূর্তে ঐ ঠাণ্ডা পানির প্রতি যে আকর্ষণ, যে ভালবাসা, তার চেয়ে বেশী।

উলাময়ে কেরাম বলেছেন, আল্লাহর সাথে মহব্বত পয়দা করার আরও একটা পন্থা হল– নির্জনে বসে আল্লাহর যিকির করতে হবে আর মনে মনে চিন্তা করতে হবে যে, আল্লাহ পাক আমাকে কত ভালবেসেছেন, আল্লাহ পাক আমাকে কত কিছু দিয়েছেন– এই সুন্দর সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। এর একটাও আমাকে না-ও দিতে পারতেন। না দিলে আমি তো জোর করে আনতে পারতাম না। কত মানুষের কত অঙ্গ নেই, আল্লাহ পাক এই সব আমাকে দিয়েছেন, আল্লাহ পাক আমাকে কত এহসান করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন। যদি আল্লাহ পাক আমাকে ভাল না বাসতেন, তাহলে এটা করতেন না। বোঝা গেল আল্লাহ পাক আমাকে ভালবাসেন। তাই আমারও তাঁকে ভালবাসা উচিত। এভাবে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ স্মরণ করে করে, আমার প্রতি আল্লাহর ভালবাসা আছে এটা স্মরণ করে করে আল্লাহর যিকির করতে থাকা। এভাবে করলে আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত পয়দা হবে।

যাহোক আলোচনা করা হচ্ছিল, ইবাদতের সময় এই মনোভাব রাখতে হবে যে, ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর সাথে মহব্বত পয়দা হবে।। ইবাদতের অন্য যত ফায়দা রয়েছে গেগুলিরও নিয়ত রাখতে হবে। যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নামায দ্বারা মানুষের জীবন পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। কুরআন শরীফের ২১নং পারায় একেবারে শুরুর দিকে বলা হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

অর্থাৎ, অবশ্যই নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ তাআলা "অবশ্যই" শব্দ যোগ করে কথাটা বলেছেন। অর্থাৎ, নামায যে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে– এর ভিতরে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। নামাযের মধ্যে অবশ্যই এই ক্ষমতা আছে, অবশ্যই এমন প্রভাব আছে যে, সঠিকভাবে নামায পড়া হলে সেই নামায পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে, সেই নামায পাপমুক্ত জীবন গড়ে তুলবে। আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, কত নামাযী মানুষ দেখা যায় নামাযও পড়ে যাচ্ছে আবার সমানে পাপও করে যাচ্ছে, তাহলে নামায তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখল কৈ? এরকম প্রশ্ন আমাদের ভিতর জাগে। যখন কুরআন শরীফের এই আয়াত নাযেল হয়েছিল তখন সাহাবায়ে কেরামের মনেও এরকম প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ, অমুক লোক রাতের বেলায় নামায পড়ে আর সকাল হলে চুরি করে। অর্থাৎ, প্রশ্নকারী বোঝাতে চাইলেন যে, নামায পড়া সত্ত্বেও তো নামায তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখছে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন,

سَيَنْهَاهُ مَا يَقُوْلُ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٩٧٧٧ وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, অচিরেই নামায তুমি যা বলছ তা থেকে তাকে বিরত রাখবে।

অর্থাৎ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন, তোমরা এরকম বুঝনা যে, নামায পড়ে তারপরেও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে না কাজেই নামাযের কোন প্রভাব নেই, বরং এরকম বোঝ যে, নামায পড়া সত্ত্বেও যখন পাপ কাজ করছে বোঝা গেল তার নামাযটা যথার্থ হচ্ছে না। যথার্থ ভাবে নামায পড়তে থাকলে অবশ্যই একসময় নামায তাকে পাপ থেকে বিরত রাখবে।

এখন কুরআন ও হাদীছের বর্ণনাকে সামনে রেখে আমাদেরকে চিন্তা করতে যে, আমরা নামায পড়া সত্ত্বেও আমাদের ভিতরে সব পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মনোভাব আসছে কি না। আমাদের মধ্যে এই চেতনা আসছে কি না যে, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, পাপ কাজ খারাপ লাগছে কি না। যদি এমন মনোভাব এবং এমন চেতনা আমাদের ভিতরে জাগ্রত না হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের নামায সঠিকভাবে হচ্ছে না। আমরা নিজেদের ভুল ধরার চেষ্টা করি, আল্লাহর কথার ভুল ধরার চেষ্টা না করি। হ্যাঁ রয়ে গেল যে, নামায কিভাবে পাপ থেকে বিরত রাখে? এ রহস্য আমাদেরকে বোঝানো হয়নি। আল্লাহ পাক বলেছেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাজেই আমরা বিশ্বাস রাখব যে, নামাযের মধ্যে এই ক্ষমতা, এই প্রভাব আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছেন। অতএব নামায পড়ার সময় আমাদের এই নিয়তও থাকবে যে, এই নামায আমাদেরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

সবচেয়ে বড় কথা– নামায পড়ার সময় প্রধান যে মনোভাব থাকতে হবে সেটা হল এখলাস। অর্থাৎ, এই মনোভাব যে, এই নামায দ্বারা আল্লাহ পাক রাজী খুশী হবেন। আমি অন্য কাউকে রাজী করার জন্য নয়, অন্য কাউকে খুশী করার জন্য নয়, অন্য কাউকে দেখানোর জন্য নয়, অন্য কারোর কাছে ভাল হওয়ার জন্য নয়, অন্য কারোর থেকে শুনাম সুখ্যাতি লাভ করার জন্য নয়, বরং আমি নামায পড়ছি আল্লাহকে রাজী করার জন্য, আল্লাহকে খুশী করার জন্য। আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ইবাদত করা, এটাকেই বলা হয় এখলাস। এখলাস এর শাব্দিক অর্থ পিওর করা, খাঁটি করা, একান্ত করা। ইবাদতের নিয়তকে খাঁটি করা। নিয়ত ফ্রেশ হতে হবে, নিয়তের মধ্যে কোন ঝামেলা থাকতে পারবে না। নিয়ত হতে হবে একমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশী করা। নামায না পড়লে কে কি বলবে, কিংবা নামায পড়লে কে কি বলবে নিয়তের মধ্যে এসব ঝুট-ঝামেলা থাকতে পারবে না। আমি নামায পড়ব শুধু আল্লাহকে রাজি-খুশী করার জন্য। কেউ দেখুক বা না দেখুক, কেউ কিছু বলুক বা না বলুক, কে কি ভাবল আর না ভাবল– এসবের কোন পরওয়া থাকবে না। এরই নাম হল এখলাস। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে,

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ. (সূরা বাইয়্যেনাহ : ৫)

অর্থাৎ, মানুষকে একমাত্র এখলাসের সাথেই ইবাদত করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

এখলাস হল আমলের রূহ বা প্রাণ। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন মূল্যহীন, দেহের কোন দাম নেই, তদ্রূপ ইবাদতের ভিতরে ইখলাস না থাকলে সেই ইবাদতেরও কোন দাম নেই। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক এমন কিছু বড় বড় ইবাদতকারীকে ডাকবেন, যাদের ভিতরে রিয়া ছিল এখলাস ছিল না। এখলাসের বিপরীত অবস্থার নাম হল রিয়া। "রিয়া" শব্দের অর্থ হল লোক দেখানো মনোভাব। মানুষকে দেখানোর জন্য মানুষকে খুশী করার জন্য, মানুষ থেকে সুনাম অর্জন করার জন্য, মানুষে ভাল বলবে এসমস্ত নিয়তে ইবাদত করা হল রিয়া। কেয়ামতের ময়দানে এরকম বড় বড় কিছু ইবাদতকারী যাদের ভিতরে রিয়া ছিল আল্লাহ পাক তাদেরকে ডাকবেন। একজন বড় মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে নিজের জীবন দিয়ে দিয়েছেন। তাকে ডাকা হবে। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন যে, বান্দা তুমি আমার জন্য কি করেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমি আমার জীবনটা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ পাক বলবেন, আমার জন্য নয় বরং তুমি এজন্য করেছ যে, মানুষ তোমাকে বড় বাহাদূর বলবে, বড় যোদ্ধা বড় মুজাহিদ বলবে। দুনিয়াতে তা বলা হয়ে গেছে। যে উদ্দ্যেশ্যে তুমি এটা করেছিলে দুনিয়ায় তা পেয়ে গেছ। অতএব এখন আমার কাছে আর কিছু পাওয়ার নেই, যাও জাহান্নামে চলে যাও। একজন বড় দানশীলকে ডাকা হবে। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন যে, বান্দা আমার জন্য তুমি কি করেছিলে? সে বলবে, হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমার রক্ত পানি করে অর্জন করা সম্পদ, আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জন করা সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছি। এত এত টাকা তোমার রাস্তায় দান করেছি। আল্লাহ বলবেন, আমার জন্য করনি বরং তুমি এজন্য করেছিলে যে, দুনিয়াতে মানুষ তোমাকে বড় দানশীল বলবে, হাতেম তায়ী বলবে। দুনিয়াতে তা বলা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে তুমি করেছিলে সে উদ্দেশ্য তুমি পেয়ে গেছ, এখন আমার কাছে আর কিছু পাওয়ার নেই, যাও জাহান্নামে চলে যাও। এভাবে বড় বড় ইবাদতকারীদেরকে ডেকে ডেকে তাদেরকে জাহান্নামের ফয়সালা শুনিয়ে দেয়া হবে। তারা আমল অনেক করেছিল কিন্তু একটা জিনিস ছিল না সেটা হল এখলাস। তাই আল্লাহর কাছে তাদের আমলের কোন মূল্য পাওয়ার থাকবে না। এজন্য এখলাসকে বলা হয় আমলের রূহ বা প্রাণ।

অন্য কোন নিয়তে ইবাদত করার হুকুম দেয়া হয়নি। সেভাবে যদি করে তাহলে সেটা আল্লাহর হুকুম মানা হবে না। আল্লাহকে মানা হবে তখন, যখন আল্লাহর হুকুম মানাটা এখলাসের সাথে হবে। নামায দিয়ে বোঝাতে বেশী সুবিধা হয়। এজন্য নামাযের উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন আমি নামায পড়ার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সময় কে আমাকে দেখল বা না দেখল এই চিন্তা করলাম। তাই মানুষ দেখলে আমি খুব ধীরে সুস্থে নামায পড়লাম। আবার যখন কেউ থাকে না –যেমন ঘরে নামায পড়লে হয়ে থাকে– তখন খুব তাড়া-হুড়া করে নামায পড়লাম। এটা এখলাস পরিপন্থী। কারণ, মানুষ না দেখলে তখন তাড়া-হুড়া কেন করি? কারণ তখন কেউ দেখছে না। মানুষের সামনে তাড়া-হুড়া একটু কম হওয়ার কারণ হল তখন মনে হয় তাড়া-হুড়া করলে মানুষ কি মনে করবে? দেখা গেল আমার ইবাদত মানুষকে দেখানোর জন্য হল। আর মানুষকে দেখানের মনোভাব নিয়ে যে ইবাদত হয়, সেটা এখলাসের সাথে ইবাদত হয় না।

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, দুটো আমল করলে ধীরে ধীরে রিয়া দূর হয়ে যায়। একটা হল আমল শুরু করার আগে নিয়ত করে নিবে যে, আমি এখন নামায পড়ব, কার জন্য পড়ব? আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য পড়ব। অতএব কে দেখল আর কে না দেখল তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আরেকটা হল আমল শুরু করার পর যদি মনে হয় যে, মানুষে দেখছে অতএব সুন্দর করে করা দরকার। এরূপ চিন্তা আসলে তখন মনকে বোঝাতে হবে যে, মানুষকে খুশী করলে আমার কী ফায়দা? আল্লাহর কাছে যখন আমার হিসাব দিতে হবে তখন মানুষের এই সুন্দর বলা দ্বারা আমার কোন লাভ হবে না। আসল বিপদের সময় এই মানুষদের কেউ আমার কোন উপকারে আসবে না। তখন একমাত্র আল্লাহই আমার সহায়। অতএব আল্লাহকে খুশী করা দ্বারাই লাভ, অন্য কাউকে খুশী করে কোন লাভ নেই। এই দুটো পন্থা গ্রহণ করতে থাকলে ধীরে ধীরে মন থেকে রিয়ার চেতনা দূর হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করুন। সহীহ নিয়ত এবং সহীহ মনোভাব নিয়ে ইবাদত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং – ৬

তওবা-এস্তেগফার প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ، فَاِنِّيْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِاَةَ مَرَّةٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মানুষের জীবনে মৌলিক দুটি দায়িত্ব। এক হল নেক কাজ করা আর এক হল গোনাহ ও পাপের কাজ থেকে বিরত থাকা। যারা নেক আমলও করে এবং গোনাহ থেকেও বিরত থাকে, তারা হল খাঁটি মানুষ, খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগার মানুষ।

মুত্তাকী শব্দটি আরবী। ফার্সীতে বলা হল পরহেযগার। যারা খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগার তারা কখনও গোনাহ করবে না। যদি কখনো গোনাহ হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে গোনাহ থেকে তওবা-এস্তেগফার করে নিবে। তওবা অর্থ ফিরে আসা অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে এবং নেক আমলের দিকে ফিরে আসা। আর এস্তেগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। গোনাহ হয়ে গেলে খাঁটি মুত্তাকী পরহেযগাদের কাতার থেকে বের হয়ে যেতে হয়। তবে তওবা-এস্তেগফার করে নিলে আবার খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগারদের কাতারে শামিল হওয়া যায়।

একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত সকল মানুষ থেকেই গোনাহ হতে পারে। একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম গোনাহ থেকে মা'সূম অর্থাৎ, নিষ্পাপ। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত সকলের দ্বারাই গোনাহ হতে পারে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে গোনাহের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এক দিকে মানুষের স্বভাবে গোনাহের চাহিদা রাখা হয়েছে, আবার শয়তানকে গোনাহের উস্কানী দেয়ার জন্য রাখা হয়েছে। কাজেই মানুষ থেকে গোনাহ হয়েই যেতে পারে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে গোনাহের স্বভাব না দিলেই পারতেন, শয়তানকে সৃষ্টি না করলেই পারতেন, তাহলে আমাদের কোন গোনাহ-ই হতো না, আমরা সকলে গোনাহ মুক্ত থেকে ইবাদত করে নিশ্চিত জান্নাতী হতে পারতাম। এ প্রশ্নের জবাব হল– তাহলে মানুষকে তৈরী করারই প্রয়োজন ছিল না। ইবাদতের জন্য ফিরিশতারাই যথেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন যখন মানব জাতিকে সৃষ্টি করার এরাদা করলেন, তখন ফিরিশতাদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আমি দুনিয়াতে আমার খলীফা বানাতে চাই। ফিরিশতারা বললেন, হে আল্লাহ! তোমার ইবাদত করার জন্য তো আমরাই যথেষ্ঠ। আল্লাহ পাক কত সংখ্যক ফিরিশতা তৈরী করে রেখেছেন তা কেউ বলতে পারে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজে গিয়েছেন, একে একে সাত আসমান পার হয়েছেন, আল্লাহর আরশ পর্যন্ত, আল্লাহর দরবার পর্যন্ত গিয়েছেন, উর্ধ্ব জগতের সব ব্যাপার তিনি স্বচোখে দেখে এসেছেন। তিনি বলেছেন যে, আসমানে এত ফিরিশতা আছে যে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَاِطَّ. مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٢١٥٥٥ والحديث حسن لغيره)

অর্থাৎ, আসমান যেন ফিরিশতাদের পদভারে মচমচ করছে। আসমানে চার আঙ্গুল জায়গাও নেই যেখানে কোন ফেরেশতা সাজদারত নেই। অর্থাৎ, এত অসংখ্য ফিরিশতা আল্লাহ পাক তৈরী করে রেখেছেন। আর এই ফিরিশতাদের এক বিরাট শ্রেণী সদা সর্বদা সাজদায় পড়ে আছে। কিয়ামত পর্যন্ত তারা সাজদায় পড়ে থাকবে। অসংখ্য ফিরিশতা রুকুর মধ্যে আছে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা এই রুকুর অবস্থায় থাকবে। অসংখ্য ফিরিশতা নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় আছে। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এই ভাবে থাকবে। বোঝা গেল– ইবাদত করার জন্য মানুষকে তৈরী করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এর জন্য ফিরিশতারাই যথেষ্ট ছিলেন। তারপরও মানুষকে কেন তৈরী করা হল। ফিরিশতারা তাই বললেন যে, হে আল্লাহ! মানুষকে তৈরী করলে তারা পাপ করবে, গোনাহ করবে, আর আমরা তো নিস্পাপ, তোমার ইবাদতের জন্য আমরাই যথেষ্ট? আল্লাহ পাক বললেন,

اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ. (সূরা বাকারা: ৩০)

অর্থাৎ, আমি জানি যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, মানুষ তৈরি করার রহস্য কি তা তোমরা জাননা, আমি জানি।

সেই রহস্য হল মানুষের ভিতরে পাপ করারও স্বভাব থাকবে, এতদসত্ত্বেও সে পাপ থেকে বিরত থেকে আল্লাহর হুকুম মানবে, তাহলে ইবাদতের উৎকর্ষতা ফুটে উঠবে। তাহলে ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে তা ফুটে উঠবে। ফিরিশতাদের দ্বারা এটা হচ্ছে না, কারণ ফিরিশতাদের মধ্যে পাপের স্বভাব-ই নেই, পাপের চাহিদাই নেই। ফলে তারা যে আল্লাহর ইবাদত করছে সেটা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করছে, অন্য সব উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করছে তা প্রকাশ পাচ্ছে না। পক্ষান্তরে মানুষের ভিতরে যখন গোনাহের চাহিদা থাকবে, নফসের চাহিদা থাকবে, তা সত্ত্বেও সে নফসের চাহিদাকে উপেক্ষা করে আল্লাহর হুকুম মানবে, তাতে প্রকাশ পাবে যে, সে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সে করছে। আমার মধ্যে যদি গোনাহের চাহিদাই না থাকে, তাহলে তো আমি ইবাদত করবই কারণ এর বিপরীত চাহিদাই তো নেই। পাপের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সেটাকে উপেক্ষা করে আল্লাহর হুকুম মানলে তখন সেটার মূল্যায়ন হবে। কারও মধ্যে যদি অহংকার করার মত অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে অহংকারের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে বিনয়ী হয়, তাহলে তার বিনয়ের মূল্য দেয়া হয়। পক্ষান্তরে ফকীর-মিসকীন যদি বিনয় প্রদর্শন করে, তাহলে তার বিনয়ের কোন মূল্য দেয়া হয় না। কারণ, তার মধ্যে অহংকার করার মত অবস্থাই নেই। শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন,

تواضع ز گردن فرازاں نکوست + گداگر تواضع کند خوئے اوست

অর্থাৎ, যার ঘাড় উঁচু অর্থাৎ, যে অহংকার করার মত তার বিনয়ের মূল্য আছে। পক্ষান্তরে ভিখারী যদি তাওয়াজু বা বিনয় দেখায়, তাহলে সেই তাওয়াজুর কোন মূল্যায়ন হয় না। কেননা, তার মধ্যে তো অহংকার করার মত কিছুই নেই। যেহেতু তার মধ্যে অহংকার করার মত কিছু নেই, তাই তার তওয়াজুরও কোন মূল্যায়ন হয় না। কিন্তু এর বিপরীত একজন মানুষ ধনী, অর্থ-কড়ির মালিক, প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক, পদের মালিক যে অহংকার দেখাতে পারে, তা সত্ত্বেও সে যদি তাওয়াজু

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

দেখায়, তাহলে মানুষ তার তাওয়াজুর মূল্যায়ন করা হয় যে, লোকটির ভিতরে খুব তাওয়াজু আছে। ঠিক এরকম পার্থক্যই মানুষের ইবাদত আর ফিরিশতাদের ইবাদতের মধ্যে। মানুষের মধ্যে পাপের চাহিদা আছে বলেই তার ইবাদতের মূল্য বেশী। আর এই পাপের চাহিদাকে উস্কানী দেয়ার জন্যই রাখা হয়েছে শয়তানকে। এই হল মানুষকে সৃষ্টি করার রহস্য। নতুবা শুধু ইবাদত করার জন্য ফিরিশতারাই যথেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ পাক তাই বললেন যে, মানুষকে সৃষ্টি করার কি রহস্য তা তোমরা জান না আমি জানি।

আল্লাহ পাক মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই গোনাহের স্বভাব দিয়েছেন। আর সেই পরীক্ষাকে আরও জোরালো করার জন্য শয়তানকে তৈরি করেছেন। একদিকে রয়েছে গোনাহের স্বভাব, এটা হল এক প্রতিকূলতা। সেই সাথে শয়তানকে রেখেছেন, এটা হল আর এক প্রতিকূলতা। এই ডবল প্রতিকূলতার ভিতরে থেকেও কারা নফস ও শয়তানের সাথে মোজাহাদা করে একমাত্র আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে ইবাদতের জন্য উঠে আসে আল্লাহ পাক এই পরীক্ষা নিতে চান। দুনিয়া হল পরীক্ষাগার! এটা হল পরীক্ষার হল্। এখানে আমরা পরীক্ষা দিতে এসেছি।

যাহোক মানুষের স্বভাবের মধ্যে যেহেতু পাপের চাহিদা আছে, পাপ মানুষের হতেই পারে, পাপ হয়েই থাকবে, কিন্তু যখনই পাপ হবে, তওবা করে নিতে হবে। আল্লাহর কাছে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নিতে হবে। তাহলে মুত্তাকীদের কাতারে আমার নাম থাকবে। আর যদি এমন হয় যে, পাপ করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি, তওবা-ইস্তেগফার করছি না, তাহলে মুত্তাকীদের কাতার থেকে আমার নাম কাটা যাবে। কুরআনে কারীমে সূরা আলে ইমরানের মধ্যে আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে এ কথাগুলো বলেছেন। বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

অর্থাৎ, মুত্তাকী ঐসব লোক, যদি তাদের কখনো পাপ হয়ে যায়, তাহলে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়, ইস্তেগফার করে নেয়। পাপের উপরে তারা হঠকারিতা করে না। পাপ করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি ক্ষমা চাওয়ার নাম নিশানা নেই এমন তারা করে না। বরং পাপ হয়ে গেলে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেয়। আর আল্লাহ পাকে কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ. (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত ক্ষমা করার কে আছে?

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আমার কাছে ক্ষমা না চেয়ে তারা যাবে কোথায়? ক্ষমা করার তো আর কেউ নেই। একমাত্র আমিই ক্ষমাকারী। এ আয়াতে আল্লাহ পাক নিজেকে ক্ষমাকারী হিসেবে প্রকাশ করে আমাদেরকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করার নেই। তদুপরি আল্লাহ পাক ক্ষমা করতে ভালবাসেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَغْفِرُ لَهُمْ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٧١٤١)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! তোমাদের দ্বারা যদি পাপ নাই হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তুলে নিয়ে এমন আর গোষ্ঠিকে নিয়ে আসবেন যাদের পাপ হয়ে গেলে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করবে আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল আল্লাহ চান যে, পাপ হয়ে গেলে মানুষ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক আর তিনি ক্ষমা করেন। কারণ তিনি ক্ষমা করতে খুব ভালবাসেন। এ হাদীছ দ্বারা এটা বোঝানো হয়নি যে, তাহলে আমরা খুব পাপ করতে থাকি। এটা বোঝানো হয়নি। বরং বোঝানো হয়েছে যে, পাপ হওয়া স্বাভাবিক। অতএব পাপ হয়ে গেলে তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ সেটা মাফ করে দিবেন। মাফ করতে আল্লাহ তাআলা খুব ভালবাসেন।

বান্দা তওবা করলে আল্লাহ পাক কত খুশী হন তার বর্ণনা দিয়ে মুসলিম শরীফের দীর্ঘ এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় খুব খুশী হন, এমন খুশী হন যে, খুশীতে যেন আত্মহারা হয়ে যান। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। উদাহরণটি হল– মরুভূমির মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তি একটি উটের পিঠে সফর করছে। ঐ উটের পিঠে তার খাদ্য-খাবার পানি সবকিছু। লোকটা মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলছে। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে মরুভূমির ভিতরে একটা গাছ পেয়ে সেই গাছের সাথে উটটা বেধে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখে তার উট নেই। তখন তার কী পরিমাণ পেরেশানী হতে পারে! উট যখন নেই, তখন মরুভূমির ভিতর দিয়ে কী করে পথ চলবে? আর ক্ষুধা পিপাসা লাগলে তার কী উপায় হবে? খাদ্য, পানি সবই তো উটের পিঠে রয়ে গেছে। লোকটা ভাবতে লাগল নির্ঘাত মরণ ছাড়া আর কোন পথ নেই। এমন দুঃশ্চিন্তার মধ্যে বেহুশের মত তার ঘুম এসে গেল। ঘুম থেকে উঠে দেখল যে, তার উট সেখানে বাধা আছে, খাদ্য-পানীয় সবই আছে। তখন ঐ ব্যাক্তির খুশিতে বলার কথা যে, হে আল্লাহ! তুমি করবেনা তো আর কে করবে? তুমি যে আমার খোদা, আমি যে তোমার বান্দা! তুমিতো বান্দার জন্য এমন করবেই! কিন্তু সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উল্টো বলল। সে বলল যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার খোদা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তি যেমন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়, বান্দা তওবা করলে আল্লাহ পাক তার চেয়ে বেশী খুশি হন। আল্লাহ পাক কত বেশী খুশী হন তা বোঝানোর জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক অদ্ভূত উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তওবা করলে আল্লাহ পাক এত বেশী খুশী হন, এত বেশী খুশী হন। মুত্তাকী পরহেযগার মানুষদের থেকে পাপ হয়ে গেলে তারা যখন আল্লাহর কাছে তওবা-এস্তেগফার করে, তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি খুব খুশী হয়ে যান। তওবা-ইস্তেগফার দ্বারা তাদের মর্যাদা পূর্বের চেয়ে বেড়ে যায়।

অনেক সময় মানুষ একটা আমল করে যতটা আল্লাহর কাছে প্রিয় না হতে পারে, আল্লহর কাছে ক্ষমা চেয়ে, কান্নাকাটি করে তার চেয়ে বেশী নৈকট্য লাভ করতে পারে। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর একটা ঘটনা শুনুন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁর তাহাজ্জুদের নামায কাযা হত না। একদিন এরকম হল যে, শয়তান খুব আরামে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গল না। শয়তানের এই ক্ষমতা আছে যে, সে মানুষের ভিতরে ঢুকতে পারে। মানুষের মস্তিষ্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। যাহোক হযরত মুআবিয়া (রা.) এই তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার কারণে সারাদিন খুব কান্না-কাটি করেছেন যে, হে আল্লাহ! আমার এই আমলটা ছুটে গেল, তুমি আমাকে মাফ করে দাও!

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

আমার গাফলত এসে গেছে, গাফলতির সাথে ঘুম পড়ে রয়েছি, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। পরদিন তাহাজ্জুদের সময় বুযুর্গরূপী এক ব্যাক্তি এসে ডেকে দিল যে, হুজুর উঠেন, তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে। হযরত মুআবিয়া (রা.) আশ্চর্য হলেন যে, এই গভীর রাতে কে আমাকে ডেকে দিল, সে এখানে এলই বা কি করে! তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে, কিভাবে এখানে এলেন? বলল, আমি শয়তান। তিনি বললেন, কি ব্যাপার তুমি আমাকে তাহাজ্জুদের জন্য ডেকে দিলে? তোমার কাজতো গাফলতের মধ্যে ফেলানো, তোমার কাজ তো তাহাজ্জুদের জন্য ডাকা নয়। সে বলল, সেটা বলবনা, ডেকে দিলাম আপনি তাহাজ্জুদ পড়ে নিন। তিনি বললন, না বললে তো তোমাকে ছাড়ব না। অগত্যা সে বলল, হুজুর! গতকাল আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম, তার জন্য সারাদিন আপনি যে কান্না-কাটি করছেন ঐ একদিন তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর যতটা নৈকট্য লাভ হত তার চেয়ে বেশী হয়ে গেছে। ফলে এতে তো আমার লস হয়েছে। তাই আজ অপনাকে ঘুম থেকে ডেকে দিলাম যাতে আপনি বেশী লাভবান হতে না পারেন। এ ঘটনাতেও বোঝা যায় আল্লাহর কাছে কান্না-কাটি করলে মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা কান্নাকাটি ও তওবা-ইস্তেগফারকে খুব বেশী পছন্দ করেন।

তওবার আমল সব সময় জারী রাখতে হবে। যতবার গোনাহ হবে, ততবার তওবা করতে হবে। তওবার জন্য আল্লাহর দরবার সব সময় খোলা। ফার্সী কবি বলেছেন,

باز آ باز آ + صدبار اگر توبہ شکستی باز آ باز آ

অর্থাৎ, শতবার যদি তওবা ভঙ্গ করে থাক, তবুও ফিরে আস তবুও ফিরে আস। এই দরবার নিরাশ হওয়ার দরবার নয়। আল্লাহর কাছে তওবার দরজা সদা সর্বদা উন্মুক্ত।

খাঁটি তওবার জন্য চারটা শর্ত। আল্লাহর কাছে তওবা কবুল হওয়ার জন্য চারটা শর্ত পূরণ করতে হবে। এই চারটা শর্ত যদি পূরণ হয় তাহলে তওবা পূর্ণাঙ্গ হবে।

প্রথম নম্বর শর্ত হল– যে গোনাহ হয়ে গেছে সেই গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। যদি কেউ তার গোনাহের জন্য অনুতপ্ত না হয়, যে গোনাহ করেছে বা করে যাচ্ছে সেটা যে অন্যায় একারণে তার মনের ভিতরে কোন অনুসোচনা না আসে, মনে মনে অনুতপ্ত না হয়, তাহলে কোন দিন তার খাঁটি তওবা নছীব হবেনা। অনুসোচনা ছাড়া তওবা করলে সেই তওবা খাঁটি তওবা হবে না।

দ্বিতীয় নম্বর শর্ত হল– যে গোনাহের জন্য তওবা করতে হবে সেই গোনাহ এখনই ছেড়ে দিতে হবে।

অনেক সময় এরকম হতে পারে যে, যে গোনাহ থেকে তওবা করা হচ্ছে সে গোনাহ এখনই ছাড়া সম্ভব হচ্ছেনা, তার বাস্তব ওজর আছে তাহলে ভিন্ন কথা। তবে তার বাস্তবে ওজর আছে কি না সেটা আল্লাহ দেখবেন, বাস্তবে ওজর থাকলে এবং শরীয়ত সম্মত ওজর হলে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন। কিন্তু যদি বাস্তবে ওজর না থাকে, তাহলে এখনই সে গোনাহ ছেড়ে দিতে হবে। নতুবা খাঁটি তওবা হবেনা। বাস্তবেও অনেকের ওজর থাকতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে চাকুরী করে। সুদের হিসাব-পত্র কসা, সূদের কাজে যে কোন রকম সহযোগিতা করা কবীরা গোনাহ। কাজেই সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকুরী করা শরীয়ত সম্মত নয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, এই চাকুরী ছাড়া তার পরিবার চলছে না, এই চাকুরী ছাড়া তার জীবিকা চলছে না, তাহলে যতদিন পর্যন্ত বিকল্প হালাল জীবিকার ব্যবস্থা তার না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই চাকুরী তার জন্য বৈধ হবে। তবে বিকল্প হালাল

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

জীবিকার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। চেষ্টা জারী রাখা সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত বিকল্প ব্যবস্থা না হবে ততক্ষণ সে মা'জূর বলে গণ্য হবে। এটা হল বাস্তব ওজর, এটা হল শরীয়তসম্মত ওজর। এরকম বাস্তব ও শরীয়তসম্মত ওজর থাকলে সেই গোনাহ এখনই ছাড়তে না পারলেও তওবা কবূল হবে এবং আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিবেন। কিন্তু এরকম বাস্তব ও শরীয়ত সম্মত ওজর না থাকলে এখনই সে গোনাহ ছেড়ে দিতে হবে, নতুবা তওবা খাটি হবে না।

যদি এমন হয় যে, শরীয়ত সম্মত ওজর নেই কিন্তু নফসের সাথে পেরে উঠছি না, তাহলে সেই গোনাহ ছেড়ে দেয়ার জন্য নফসের সাথে বুঝা-পড়া করতে হবে আর আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দুআ করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে নফসের মোকাবেলা করার তাওফীক দান করুন। এভাবে করতে থাকলে হয়তো এক সময় আল্লাহ পাক তাকে গোনাহ ছাড়ার তাওফীক দিবেন।

তৃতীয় নম্বর শর্ত হল– যে গোনাহ আমি করছি এই গোনাহ সামনে আর করব না মনে মনে এরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিতে হবে।

যদি কেউ কোন গোনাহে চরমভাবে অভ্যস্ত থাকে, খুব গভীরভাবে কোন গোনাহের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে এই মুহূর্তে সেই গোনাহ আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেয়া অনেক সময় কঠিন হতে পারে। তাই যদি মনের মধ্যে এই মুহূর্তে এরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না আসে, তাহলে তার জন্যও আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমি প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি, কিন্তু আমার মজবূত প্রতিজ্ঞা আসছে না, তুমি আমাকে মজবূত প্রতিজ্ঞা নেয়ার তাওফীক দাও! সবকিছুই তো আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে। তওবার জন্য এই শর্ত যেন আমার পূরণ হয় সেটাও আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে দিতে হবে।

চতুর্থ নম্বর শর্ত হল– কোন বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে তার হক আদায় করে দিতে হবে, কারও অর্থ আত্মসাৎ করে থাকলে সে অর্থ তাকে ফেরত দিতে হবে। তাকে না পেলে তার ওয়ারিশদেরকে খুঁজে তাদের কাছে ফেরত দিতে হবে। ওয়ারিশদের কাউকেও যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, তবুও ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন সেই লোকের নামে ঐ পরিমাণ অর্থ দান করে দিতে হবে। কিয়ামতের দিন সেই হকদার ব্যক্তি এই দানের ছওয়াব পেয়ে তার হককে মাফ করে দিবে। দিয়ে হোক বা মাফ চেয়ে হোক যেকোন ভাবে বান্দার হক যদি মাফ করানো না যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন এর জন্য অনেক খেসারত দিতে হবে। মানুষের অবস্থা এমন হবে অসংখ্য নামায, রোযা, হজ্ব, যকাত, দান-সদকা নিয়ে আসছে কিন্তু মানুষের যে হক সে নষ্ট করে আসছে সে হক গুলো আদায় করেনি কিয়ামনের দিন আল্লাহ পাক কারোর প্রতি বিন্দু মাত্র জুলুম করবেন না। একজন মানুষের হক নষ্ট হয়েছে এটাও আল্লাহ দেয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। তার হক নিয়ে ওকে দিয়ে দেয়া হবে। এভাবে অনেক মানুষের অবস্থা এমন হবে বান্দার হক নষ্ট হওয়ার কারণে নিজের ছওয়াব ওদেরকে দিতে দিতে নিজে ছওয়াব শূণ্য হয়ে যাবে জাহান্নামে চলে যাবে। তাই বান্দার হক হয় দিয়ে না হয় মাফ চেয়ে যে কোন ভাবে বান্দার হক আদায় করে নিতে হবে, বান্দার হক নিষ্পত্তি করে নিতে হবে। এই চারটি জিনিস যদি পূর্ণ হয় অর্থাৎ, অনুশোচনা আসা, গোনাহ বর্জন করা, সামনে না করার প্রতিজ্ঞা করা আর বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে সেটার নিষ্পত্তি করে নেয়া– এই চারটা জিনিস যদি পূর্ণ হয়, তাহলে তওবা কবূল হবে। এটাকে বলা হয় খাঁটি তওবা। আরেকটা হল ক্ষমা চাওয়া। এই চারটার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে পিছনে যা হয়ে গেছে সে ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

তওবার অনেক গুলো পদ্ধতি আছে। তার ভিতরে একটা পদ্ধতি হল জীবনে অন্তত একবার তওবার নামায পড়ে নেয়া। তওবার নামাযের নিয়ম হল গোসল করে নিয়ে দুই রাকাত তওবার নামায পড়তে হবে। এই দুই রাকআত নামায যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যায়। এই নামায শুধু যিন্দেগীর গোনাহের জন্য তওবা করার উদ্দেশ্যে পড়া হবে। নামায শেষ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যখন-ই কোন নতুন তাজা গোনাহ হয়ে যায়, তখন এই নামায পড়ে নেয়া। তওবার নামাযের কথা হাদীসে এসেছে। এটা হল নামাযের মাধ্যমে তওবা। তওবার আর একটা পদ্ধতি হল তওবার নামায ব্যতীত শুধু মুখের তওবা। এই তওবা সব সময় চলতে থাকবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا اِلَى رَبِّكُمْ، فَاِنِّيْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِاَةَ مَرَّةٍ. (رواه أحمد في مسنده برقم ١٧٨٨٠ وإسناده صحيح على شرط مسلم)

আ

অর্থাৎ, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর। আমি প্রতিদিন শতবার আল্লাহর কাছে তওবা করি।

এখানে শতবার বলতে ৯৯-এর পরে ১০০, এই ১০০ বারও উদ্দেশ্য হতে পারে। কিংবা এখানে শতবার বলে বহুবার বোঝানো হয়েছে। বোখারী শরীফের এক হাদীছে ৭০ বারের চেয়ে বেশীবার তওবা করার কথা এসেছে। আরবী ভাষায় শতবার, সত্তরবার সংখ্যাগুলো বহু সংখ্যকবার বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বাংলা ভাষায় অনেক বেশী সময় বোঝানোর জন্য বলে থাকি, হাজার বছর ধরে, যুগ যুগ ধরে ইত্যাদি। এখানে দুই যুগ অর্থ ২৪ বৎসর বা ঠিক ৯৯৯-এর পর যে এক হাজার তা বোঝানো উদ্দেশ্য নয় বরং বহু সময় বা বহুবার বোঝানো উদ্দেশ্য।

এখানে একটা বিষয় বোঝার প্রয়োজন। তাহল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) হলেন মা'সূম বা নিষ্পাপ। নবীদের থেকে গোনাহ তো হয় না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও কোন গোনাহ হয়নি। তদুপরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গোনাহ হয়ে থাকেও বা ভবিষ্যতে হয়ও তবুও তা মাফ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগের পিছনের সব গোনাহ মাফ হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়েছিল। এরপরও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওবা ইস্তেগফার করতেন কি উদ্দেশ্যে? তাহল তওবার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এই মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে। আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে আমরা যেন প্রতিদিন বহুবার তওবা করি। হাদীছে যেহেতু একশত বার-এর কথা এসেছে, তাই বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, প্রতিদিন অন্তত একশত বার তওবা-ইস্তেগফার করে নেই।

তওবা যে কোন বাক্যে করা যায়। তবে বিশেষভাবে হাদীছে একটা ইস্তেগফার-এর কথা এসেছে। সেটাকে বলা হয় সায়্যিদুল ইস্তেগফার। অনেক বইতে সায়্যিদুল ইস্তেগফার-এর কথা আছে। আমার লিখিত আহকামে যিন্দিগীতেও আছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। সায়্যিদুল ইস্তেগফার হল–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ. اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. (رواه البخارى فى كتاب الدعوات – بَاب أَفْضَلِ الِاسْتِغْفَارِ برقم ٦٣٠٦)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ইস্তেগফারের বাক্যগুলি একটু দীর্ঘ। যদি মুখস্ত না থাকে, তাহলে দেখে দেখেও পড়া যায়। দেখে দেখে পড়তে থাকলে কিছুদিনে তা মুখস্ত হবেই ইনশাআল্লাহ। এর অর্থ মনের ভিতরে উপস্থিত করে পাঠ করলে সুন্দর হবে। এটা হল "সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার"। সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার অর্থ ইস্তেগফারের সরদার। কুরআন হাদীছে ইস্তেগফারের যত বাক্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার ভিতরে এটা হল শ্রেষ্ঠ বাক্য। এই হিসেবে এটা ইস্তেগফারের সরদার। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে ফযীলত বয়ান করেছেন তার উপর একীন রেখে কেউ যদি সকালে এটা একবার পাঠ করে, তাহলে ঐ দিন সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত তার ইন্তেকাল হলে এর ওছীলায় আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে পৌছে দিবেন। আর কেউ যদি সন্ধায় এটা একবার পাঠ করে, তাহলে ঐ দিন সকালের আগ পর্যন্ত তার ইন্তেকাল হলে এর ওছীলায় আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে পৌছে দিবেন। বোখারী শরীফে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

যাহোক আলোচনা করা হচ্ছিল যে, মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তি হল তারা, যারা সদা-সর্বদা তওবার উপরে থাকবে। যাতে যে কোন সময় তার মৃত্যু এসে গেলে সে গোনাহ থেকে মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে হাজির হতে পারে। মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তির যিন্দেগী থাকবে গোনাহ থেকে ফ্রেশ। যেন যে কোন সময় ডাক পড়লে সে হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। যে কোন সময় আমাদের মৃত্যু এসে যেতে পারে, এর অর্থ হল যে কোন সময় আমার কাছে হিসাব চাওয়া হতে পারে। আমাদের দুনিয়ার যিন্দেগীতে হিসাবের একটা অর্থ বছর আছে, বছরের মাথায় মালিককে হিসাব বুঝিয়ে দিতে পারলেই চলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে এরকম হিসাবের অর্থ বছর নেই। তিনি এমন মালিক যে, যেকোন মুহূর্তে আমার হিসাব নিতে পারেন। তাই মুমিন মুত্তাকীদের সব সময় হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। প্রতি মুহূর্তে তওবা-ইস্তেগফারের উপর থাকা চাই। যাতে তওবা ইস্তেগফারের মাধ্যমে গোনাহ থেকে ফ্রেশ থাকা যায় এবং যে কোন সময় ডাক এলে আমরা ফ্রেশ অবস্থায় আল্লাহর কাছে হাজির হতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তওবা এস্তেগফারের উপরে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং – ৭

১ টি বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ. وَفِى الْحَدِيْثِ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِيْ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ. قَالَ لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَاتَغْضَبْ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা নছীহত শোনার জন্য উলামায়ে কেরামের মজলিসে আসি। নছীহত শোনার জন্য উলামায়ে কেরামের বয়ান শুনি, বয়ান শুনি। নছীহত অর্থ উপদেশ। নছীহত বা উপদেশ শোনার মধ্যে আমাদের ফায়দা রয়েছে, তাই আমরা নছীহত শুনে থাকি। নছীহত বা উপদেশ শোনার মধ্যে যেহেতু আমাদের ফায়দা রয়েছে, তাই নছীহতের কথা শোনার জন্য আমাদের মধ্যে আগ্রহ থাকা চাই। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে নছীহতের কথা শুনতেন, উপদেশের কথা শুনতেন। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নছীহত চেয়ে নিতেন। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মানুষকে নছীহতের কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মানুষকে নছীহত করার নির্দেশও ছিল। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক হুকুম দিয়ে বলেছেন,

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. (সূরা যারিয়াত: ৫৫)

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি মানুষকে উপদেশ দাও। নিশ্চয় উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিন মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন। তাই তিনি সময় সুযোগ পেলেই সাহাবায়ে কেরামকে নছীহত করতেন। যেহেতু নছীহতের মধ্যে উপকার রয়েছে এই জন্য সাহাবায়ে কেরামও নছীহত চেয়ে চেয়ে নিতেন।

আমাদের অনেকের খাসলত হল আমাদেরকে কেউ নছীহত করলে আমরা অপছন্দ করি। কেউ নিজের থেকে আমাদেরকে নছীহত করলে আমরা বলে বসি আমাকে অত নছীহত করতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দিন। এভাবে নছীহতকে আমরা উপেক্ষা করি। অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় উপদেশ চেয়ে নেয়াতো দূরের কথা, কেউ স্বেচ্ছায় উপদেশ দিলে বা ভুল ধরে দিলে আমাদের রাগ আসে যে, উনি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন, আমার ভুল ধরতে এসেছেন, আমি কি উনার চেয়ে কম বুঝি! অথচ উপদেশের কথা শুনে রাগ নয় বরং খুশী হওয়া চাই। কেউ ভুল ধরে দিলে রাগ নয় বরং খুশী হওয়া চাই। কারণ যে আমাকে উপদেশ দিল বা আমার ভুল ধরে দিয়ে আমার ভুল সংশোধন করে দিল, সে আমার বিরাট উপকার করল। আমরা সকলেই নছীহতের মুখাপেক্ষী। নসীহত বা উপদেশ ছাড়া কে ভাল হতে পারে? নছীহত শুনেইতো আমরা নামায পড়তে শুরু করেছি। নছীহতের কথা শুনেই তো আমরা দ্বীনী লাইনে চলি। নছীহত শুনেই তো মানুষ দ্বীনের দিকে অগ্রসর হয়। কুরআন হাদীছ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পুরোটাইতো নছীহত। এক আয়াতে কুরআন শরীফের পরিচয় দেয়া হয়েছে "নছীহত" বলে। অতএব আমরা সকলেই নছীহতের মুখাপেক্ষী। কাজেই নসীহত শুনে রাগ হওয়া বুদ্ধিমত্তা নয় বরং ভাল মানুষ পেলে তাদের কাছ থেকে উপদেশ চেয়ে নেয়া দরকার। সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) সময় সুযোগ পেলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপদেশ চেয়ে নিতেন।

বোখারী শরীফের এক হাদীছে এসেছে– এক সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে আবেদন জানালেন যে,

اَوْصِنِيْ، وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ. قَالَ لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَاتَغْضَبْ. (رواه البخارى برقم ٦١١٦)

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ! অল্প কথায় আমাকে একটু উপদেশ দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাগ বর্জন কর। লোকটা কয়েকবার বলল, আরও একটু নছীহত করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবারই বললেন, রাগ বর্জন কর।

এ হাদীছ থেকে একটা ফায়দা এই বোঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) উপদেশ চেয়ে নিতেন। আর একটা ফায়দা এই বোঝা গেল যে, ঐ সাহাবী যখন বললেন ইয়া রসূলাল্লাহ! অল্প কথায় আমাকে একটু উপদেশ দান করুন। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললে, তুমি রাগ বর্জন কর! তখন তিনি এ নছীহতটুকু বেশী সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে আবার আরয করলেন– ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও একটু উপদেশ দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, রাগ বর্জন কর। তিনি আবার আরয করলেন আরও একটু উপদেশ শোনান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও বললেন, রাগ বর্জন কর। এভাবে ঐ সাহাবী কয়েকবার নছীহতের জন্য আবেদন করলেন, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই একই কথা বললেন যে, রাগ বর্জন কর। এ থেকে বোঝা যায়, রাগ বর্জন করার গুরুত্ব কতখানি। তাই দীনের পথে চলতে গেলে রাগ হজম করার অভ্যাস করতে হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের এক আয়াতে নেককার মানুষের গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেন,

وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ. (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

অর্থাৎ, নেককার মানুষের একটা বড় গুণ হল তারা ক্রোধ হজম করতে জানে।

রাগ বর্জন করার গুরুত্ব এত বেশী হওয়ার কারণ হল– নফ্সের যতগুলো রোগ আছে তার মধ্যে আর একটা বড় রোগ হল ক্রোধ বা রাগ। কারও রাগ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সেটা অনেক গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাগের কারণে মানুষ বে-সামাল হয়ে অন্যের প্রতি যুলুম বাড়াবাড়ি করে। রাগের কারণে মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে, তখন খুন খারাবী পর্যন্ত হয়ে যায়। রাগের কারণে ঘর ভেঙ্গে যায়, সংসার ভেঙ্গে যায়। রাগের কারণে অন্যায় ভাবে গালি-গালাজ করা হয়ে থাকে। গীবত সমালোচনার পেছনেও মানুষের ক্রোধ কাজ করে থাকে। একজনের ভাল কিছু দেখে আমার বরদাশত হল না, ভিতরে রাগ সৃষ্টি হল। সেই রাগ মিটানোর আর কোন পথ না পেয়ে তার সমালোচনা করে আমার নফসকে ঠান্ডা করলাম। দেখা গেল এরকম গীবত, সমালোচনার মূলেও রয়েছে রাগ। হাছাদ বা হিংসার মূলেও থাকে এক ধরনের রাগ। এভাবে রাগ থেকে অনেক গোনাহ সৃষ্টি হয়। এভাবে রাগের কারণে দ্বীনী দুনিয়াবী বহু ক্ষতি হয়ে থাকে। এসব কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে রাগ অত্যন্ত খারাপ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

তাই সুফিয়ায়ে কেরাম –যারা নফ্সের এসলাহের চিন্তা-ভাবনা করেন, যারা আধ্যাত্মিক সংশোধনের লাইনে কাজ করেন তাঁরা– বলেন, রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা আধ্যাত্মিক সাধনার লাইনে এক বিরাট সফলতা। বিবি-বাচ্চা, ছাত্র ও অধীন্তদেরকে শাসনের প্রয়োজনে যে রাগ করতে হবে, অফিস-আদালত সামলানোর জন্য যে রাগ করতে হবে, সে ক্ষেত্রেও রাগকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। দ্বীনের অবমাননা হতে দেখলে রাগ আসতে হবে, ধর্ম লংঘন হতে দেখলে রাগ আসতে হবে, তবে সব ক্ষেত্রেই রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে সে রাগ ক্ষতি ডেকে আনে, ধ্বংস ডেকে আনে।

যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তে রাগ করার অনুমতি আছে, সেই রাগও হতে হবে দ্বীনের উদ্দেশ্যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে, নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশে নয়। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَنْكَحَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهٗ. (رواه الترمذي برقم ٢٥٢١ وحسنه)

অর্থাৎ, ঈমান পূর্ণ করার চারটা আমল। তা হল- যা কিছু মানুষকে দিব আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য দিব অর্থাৎ, দ্বীনকে সামনে রেখে দিব। যা কিছু না নিব তাও আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য অর্থাৎ, দ্বীনকে সামনে রেখে নিব। যাকে ভালবাসব আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসব। আর যার প্রতি রাগ হব যাকে ভাল না বাসব, সেটাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে করব।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে মানুষের দেয়া, না দেয়া, ভালবাসা, রাগ হওয়া সবকিছু আবর্তিত হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ, দ্বীন ও শরীয়তকে কেন্দ্র করে। যে ব্যক্তি এরকম করে, সেই পূর্ণাঙ্গ ঈমানের উপর আছে, পূর্ণাঙ্গ সহীহ তরীকার উপরে আছে। অতএব পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও পূর্ণাঙ্গ সহীহ তরীকায় থাকার জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কুরআন-হাদীছে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার অনেকগুলো পন্থা বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ ৬ টি পন্থা সম্পর্কে আপনাদের সামনে বয়ান পেশ করছি।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার একটা পন্থা হল– দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ হলে আর রাগ দমন না হলে বসে পড়তে হবে। বসা অবস্থায় রাগ হলে শুয়ে পড়তে হবে। তাহলে নফসের উল্টা করা হবে। নফসকে দমন করতে হলে সব সময় নফসের উল্টা করতে হয়। নফসের স্বভাব হল যখন রাগ হয়, সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, শোয়া থাকলে বসে পড়ে, বসা থাকলে দাঁড়িয়ে ওঠে। অর্থাৎ, রাগের গতি হল উপরের দিকে। তাই বলা হচ্ছে রাগ দমন করার জন্য গতি নীচের দিকে করে দাও। দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়, বসা থাকলে শুয়ে পড়, তাহলে রাগ কমে যাবে। হাদীছে এসেছে, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ. فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. (رواه أحمد برقم ٢١٣٨٦ و ابو داود برقم ٤٧٨٤)

অর্থাৎ, তোমাদের কারও যখন রাগ আসে, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে পড়ে। তাতে যদি রাগ দমে যায় তাহলে ভাল। অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার আর একটা পন্থা হল– রাগ দমন না হলে উযূ করে নিবে। উযূ দ্বারাও অঙ্গ ঠান্ডা হয় এবং রাগের আগুনে পানি পড়ে। হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رواه ابو داود حديث رقم ٤٧٨٦)

অর্থাৎ, রাগ এসে থাকে শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তানকে তৈরী করা হয়েছে আগুন থেকে। আর আগুন নির্বাপিত হয় ঠান্ডা পানি দ্বারা। ঠান্ডা পানি পান করলে রাগের কারণে রক্তে যে উষ্ণতা সৃষ্টি হয়, সেই উষ্ণতা ঠান্ডা হয়ে যাবে। এভাবে রাগ পড়ে যাবে।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার আর একটা পন্থা হল– আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম পাঠ করা। কারণ রাগের মধ্যে শয়তানের ওয়াছওয়াছার দখল থাকে। যেমন পূর্বের হাদীছে এসেছে রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে এসে থাকে। আর শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার একটা উপায় হল "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম" পাঠ করা। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. (হা মীম সাজদা: ৩৬)

অর্থাৎ, যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন উস্কানী তোমাকে পায়, তাহলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম পড়ে নিও।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার আর একটা পন্থা হল– এই চিন্তা করা যে, রাগ বর্জন করা দ্বারা আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যারা উঁচু মাকাম-মর্যাদার লোক, তারা রাগ করতেও পারেন না। রাগ তাদের জন্য শোভাও পায় না। এক রেওয়ায়েতে এসেছে– একদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর গোলামের প্রতি রাগ হয়ে তাকে বকা ঝকা করেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে লক্ষ্য করে বললেন,

اَللَّعَّانُوْنَ وَالصِّدِّيْقُوْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! (الأدب المفرد للبخاري برقم ٣١٩ واسناده صحيح)

অর্থাৎ, রাগের কারণে তিরস্কারও করছ আবার অন্য দিকে সিদ্দীকও? কা'বার রবের কসম! এমন হতে পারে না।

অর্থাৎ, মানুষের প্রতি রাগ দেখাও, আবার তুমি আবূ বকর সিদ্দীক! "সিদ্দীক" বলা হয় দ্বীনের ক্ষেত্রে যার মর্যাদা অনেক উঁচু, ধর্মের ক্ষেত্রে যার মর্যাদা, যার মাকাম অনেক উপরে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সিদ্দীক হয়ে আবার মানুষের প্রতি রাগ? সিদ্দীক হবে আবার রাগও করবে, মানুষকে বকা ঝকা করবে, তিরস্কার করবে, তা কী করে হতে পারে? এ দুটোর ভিতর সমন্বয় হতে পারে না। তুমিতো আবূ বকর সিদ্দীক, তাই তুমি রাগ করতে পার না। তুমি ধর্মীয় বড় ব্যক্তিত্ব হয়ে মানুষের প্রতি রাগ করবে, রাগ হজম করতে পারবে না তা হতে পারে না।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করার আর একটা পন্থা হল– যখন তোমার রাগ হয়, তখন মনে করতে হবে যে, আমার চেয়ে উপরওয়ালা একজন আছেন, তিনি যদি আমার প্রতি রাগ করেন, তাহলে আমার কী উপায় হবে? আর যার প্রতি আমি রাগ করছি সে আমার নিকট যতটা অপরাধী হতে পারে আমি আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বেশী অপরাধী। অতএব আমি যদি তাকে ক্ষমা করতে না পারি তাহলে আল্লাহ পাকও যদি ক্ষমা না করেন তাহলে আমার কী উপায় হবে? আর যদি আমি তার উপর রাগ চরিতার্থ না করি বরং তাকে ক্ষমা করে দেই, তাহলে হতে পারে এই ওছীলায় আল্লাহও আমাকে ক্ষমা করে দিবেন যে, বান্দা আমার বান্দাকে ক্ষমা করেছে আমি কেন তাকে ক্ষমা করব না?

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে অবাধ্য স্ত্রীকে শাসন করার তিনটা পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। এক নম্বর-তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বোঝানো। দুই নম্বর উপদেশের পদ্ধতিতে কাজ না হলে, তাদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেওয়া। অর্থাৎ, এক বিছানায় থেকেও তাকে আলাদা করে দেয়া। তার উপায় হল এক বিছানায় থাক, কিন্তু অন্য দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে থাক। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাক, তাহলে তার আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে, এভাবে তার সংশোধন হয়ে যেতে পারে। তিন নম্বর তাদেরকে হালকা কিছু চড়-থাপ্পড় দিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা করা।

এই যে হালকা মারধরের কথা বলা হয়েছে এ ক্ষেত্রে যেন কেউ ব্যালেন্সহারা হয়ে না যায়, বে-সামাল হয়ে না যায়- এ জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন মার দেয়ার কথা বলার পর বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا. (সূরা নিছা: ৩৪)

অর্থাৎ, মনে রাখবে অবশ্যই আল্লাহ সুমহান, সমুচ্চ। তিনি অনেক বড়।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, তোমার উপরে আল্লাহ আছেন, তোমাকে যে শাসন করার কর্তৃত্ব দেয়া হল, এই কর্তৃত্ব পেয়ে তুমি লাগামহীন হয়ে যাবে না, বে-সামাল হয়ে যাবে না। মনে রাখবে তোমার উপরেও আরেকজন কর্তৃত্বকারী আছেন। তোমার অধীনস্তের ক্ষেত্রে বে-সামাল হয়ে জুলুম বাড়াবাড়ি করলে তোমার উপর ওয়ালাও তোমাকে শাস্তি দিতে পারেন। মানুষের ভিতরে ব্যালেন্স আনার উপায় হল এই যে, মনে করবে আমার চেয়ে উপরওয়ালা একজন আছেন। এটা মনে রাখলে মানুষ বে-সামাল হতে পারবে না। আমরা আমাদের অধীনস্তদের বিভিন্ন অপরাধের কারণে তাদের প্রতি রাগ হই এবং ধমকানী দেই, শাসানী দেই, মারধর দেই, এইসব ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে, আমার উপরওয়ালা একজন আছেন, আমি যদি রাগের মাথায়ও বে-ইনসাফী করি, তবুও আমার উপরওয়ালা তার প্রতিশোধ নিতে পারেন। আল্লাহর বান্দার সাথে আমি বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহও আমার সাথে কঠোরতা করতে পারেন। আল্লাহ পাকের নিয়মই এরকম। আল্লাহর বান্দার সাথে আমি যেমন করব, আল্লাহ পাকও আমার সাথে তেমন করবেন। আল্লাহর বান্দাকে আমি ক্ষমা করলে, আল্লাহও আমাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহর বান্দার প্রতি আমি রহম করলে আল্লাহও আমার প্রতি রহম করবেন। আল্লাহর বান্দার দোষ গোপন করলে আল্লাহও আমার দোষ গোপন করবেন। মোটকথা বান্দার সাথে বান্দার মু'আমালা যেমন হবে, ঐ বান্দার সাথে আল্লাহর মু'আমালাও তেমন হবে। তাই রাগের মাথায় বে-সামাল না হওয়া চাই। আমার চেয়ে উপরওয়ালা একজন আছেন এ কথা স্মরণ করে রাগকে দমন করা চাই, এভাবে রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা চাই।

রাগ দমন করার অনেক ফযীলত। পূর্বে কুরআনে কারীমের আয়াত পেশ করা হয়েছে যে, নেককার মানুষের গুণাগুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ. (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

অর্থাৎ, নেককার মানুষের একটা বড় গুণ হল তারা রাগ হজম করে। অতএব বোঝা গেল রাগ দমন করলে নেককার মানুষের গুণ অর্জিত হয়।

রাগ দমন করার আর একটি ফযীলত বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– হযরত সাহ্ল ইব্নে মুআয তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৮

২টি বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا اَنِّيْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِأَةَ مَرَّةٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত দুই জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল সাহাবায়ে কেরাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নছীহত তথা উপদেশ চেয়ে চেয়ে নিতেন। আমরা সকলেই নছীহতের মুহতাজ। আমাদের প্রয়োজনেই কুরআন হাদীছের সব নছীহত এসেছে। আল্লাহ পাকও আমাদেরকে নছীহত করেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদেরকে নছীহত করেছেন। কুরআনে কারীমের সবটাই নছীহত। তার মধ্যে একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাস করে দুইটা বিষয়ে নছীহত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى. (সূরা আ'লা: ১৪-১৫)

অর্থাৎ, অবশ্যই সফলকাম হবে সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পবিত্র রাখবে। আর আমাকে স্মরণ করে ইবাদত করবে। বিশেষভাবে নামাযের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করবে।

এ আয়াতে দুটো আমলের কথা বলা হয়েছে। এক হল নিজেকে পবিত্র রাখা অর্থাৎ, খারাপ আকীদা, খারাপ চরিত্র ও গোনাহ থেকে পবিত্র রাখা। আর এক হল আল্লাহকে স্মরণ করা বিশেষভাবে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা। যদি কখনও গোনাহ হয়ে যায় তাহলে তওবা করে নিতে হবে। তওবা করলে গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়া যাবে। আর আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। বিশেষভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নামাযের মাধ্যমে স্মরণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবাদতের ভিতরে সবচেয়ে বেশী যে ইবাদত করতে হয়, তাহল নামায। ইবাদতের মধ্যে সদা-সর্বদা যে ইবাদত করতে হয় তাহল নামায। তাই বিশেষভাবে নামাযের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য ইবাদত সব সময় করতে হয় না। রোযা বছরে একবার মাত্র এক মাস। যাকাত বছরে একবার, তাও সবার উপর নয়, যারা ধনী শুধু তাদের উপরে। হজ্জ যিন্দেগীতে মাত্র একবার ফরয হয়, তাও সকলের উপরে নয় বরং বিশেষ কিছু মানুষের উপরে। তাই একমাত্র নামায-ই এমন যা সকলকে করতে হয়, সব সময় করতে হয়। এজন্য কুরআন হাদীছে ইবাদতের মধ্যে বিশেষভাবে নামাযের কথা বেশী করে বলা হয়েছে। এই আয়াতেও আল্লাহ পাক তাই বলেছেন।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা গোনাহ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখল আর ইবাদত করল বিশেষভাবে নামায আদায় করল, তারা হল কামিয়াব তথা সফলকাম। বোঝা গেল, কামিয়াবী তথা সফলতা অর্জিত হবে দুটো আমলের ভিত্তিতে। একটা হল নিজেকে গোনাহ মুক্ত রাখা, আরেকটা হল

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُّنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ. (رواه ابو داود برقم ٤٧٧٩ واسناده حسن)

অর্থাৎ, ক্রোধ প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলূকের সামনে তাকে আহ্বান করে যে কোন হুর সে কামনা করে তা গ্রহণ করার অধিকার তাকে দিয়ে দিবেন।

রাগ দমন করার আর একটি ফযীলত হল রাগ দমন করা আল্লাহর কাছে একটি উত্তম আমল। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে– হযরত ইব্নে ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَّكْظِمُهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى. (رواه احمد فى مسنده حديث رقم: ٦١١٤)

অর্থাৎ, কোন বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাগের যে ঢোক গলাধঃকরণ করে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তার চেয়ে উত্তম আর কোন ঢোক বান্দা গলাধকরণ করে না।)

রাগ দমন করার আর একটি ফযীলত হল– রাগ দমন করা দ্বারা আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যারা উঁচু মাকাম মর্যাদার লোক, তারা রাগ করতেও পারেন না। রাগ তাদের জন্য শোভাও পায় না। এক রেওয়ায়েতে এসেছে– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا يَنْبَغِيْ لِصِدِّيْقٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَعَّانًا. (رواه مسلم برقم ٦٧٧٣)

অর্থাৎ, যারা "সিদ্দীক" (অর্থাৎ, দ্বীনের ক্ষেত্রে যার মর্যাদা ও মাকাম অনেক উপরে।) তাদের পক্ষে সংগত নয় অভিশাপ দেয়া। এটা মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত। মুস্তাদরকে হাকিমের রেওয়ায়েতে এসেছে– لَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا অর্থাৎ, মু'মিনের জন্য (চাই সে যে স্তরের হোক) অভিশাপ দেয়া সংগত নয়।

অভিশাপ সাধারণত রাগের কারণেই হয়ে থাকে। তাই এ হাদীছে যে বলা হয়েছে "সিদ্দীক অভিশাপ দিতে পারে না"–এ কথার মধ্যে তাঁদের রাগ না করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত।

যারা রাগ হজম করতে পারে না বরং রাগের বশবর্তী হয়ে অন্যকে অভিশাপ দেয়, তিরস্কার করে, তারা কেয়ামতের দিন অনেক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। যেমন এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم برقم ٦٧٧٥)

অর্থাৎ, তিরস্কারকারীগণ কেয়ামতের দিন সুপারিশকারীও হতে পারবে না, স্বাক্ষীও হতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাগ দমন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ইবাদত করা। যারা এই দুটো আমল করবে আল্লাহ পাক তাকীদ সহকারে বলেছেন যে, অবশ্যই তারা কামিয়াব হবে, অবশ্যই তারা সফলকাম হবে।

নিজেকে গোনাহ থেকে মুক্ত রাখার বড় উপায় হল তওবা করা। গোনাহ মানুষের হবেই। একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ছাড়া আর কোন মানুষ গোনাহ থেকে মুক্ত নয়। অতএব গোনাহ আমাদের হবেই তবে গোনাহ হলেই তওবা করে নিতে হবে। যখনই গোনাহ হবে তওবা করে নিতে হবে। তওবা করলে এমন হয়ে গেলাম যেন গোনাহই হয়নি। হাদীছ শরীফে এসেছে,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ. (رواه ابن ماجة وذكره صاحب الزوائد في زوائده وقال : إسناده صحيح. رجاله ثقات)

অর্থাৎ, গোনাহ থেকে যে তওবা করে, সে ঐই ব্যক্তির ন্যায় যার গোনাহই হয়নি।

যাহোক নিজেকে পবিত্র রাখা এবং ইবাদত করা– এই দুটো আমলের কথা আল্লাহ পাক বলেছেন। এই দুটো আমলের কথা বলার পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. (সূরা আ'লা: ১৬)

অর্থাৎ, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে অর্থাৎ, দুনিয়ার স্বার্থকে প্রধান্য দাও।

এই কথাটুকুর মধ্যে আল্লাহ পাক বোঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা পদে পদে গোনাহ থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখবে এবং ইবাদত করবে– এটা তোমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না এ কারণে যে, তোমরা পদে পদে দুনিয়াকে প্রাধান্য দাও। দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই তোমরা গোনাহে জড়িয়ে পড়, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই তোমরা দ্বীন ইবাদত থেকে সরে যাও।

আমাদের অভ্যাস হল প্রত্যেকটি পদে পদে আমরা দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেই। এ কারণে পদে পদে আমরা গোনাহে জড়িয়ে পড়ি এবং দ্বীন ও ইবাদত থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই। দুনিয়ার কাজতো আমরা দুনিয়ার স্বার্থে করিই, এমনকি আখেরাতের কাজ এবং ছওয়াবের কাজও দুনিয়ার স্বার্থকে সামনে রেখে করি, দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে করি। একবার আমার কাছে এক ভাই এসে বললেন যে, হুজূর! এক বছর হল আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছেন, এখন আব্বার জন্য মৃত্যুবর্ষিকী পালন করতে চাই, কীভাবে করব আমাকে একটু পরামর্শ দিন! আমি বললাম, আপনি এভাবে পরামর্শ চাইলেই ভাল হত যে, হুজূর! আমার আব্বার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে চাই এটা করা ঠিক হবে কি না? আদৌ এটা করা যাবে কি না এই পরামর্শ আগে। যদি করা যায় তারপরে এটা কীভাবে করা হবে তার পরামর্শ। আপনি তো সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন যে, মৃত্যু বার্ষিকী পালন করবেনই, এখন কীভাবে করবেন তার পরামর্শ চাচ্ছেন। মৃত্যু বার্ষিকী-ই তো শরীয়তে নেই। আপনারা এটা কেন করেন? লোকটা বলল, হুজূর! এক বৎসরের মাথায় আত্মীয়-স্বজন সবাই এক জায়গায় হব, দেখা-সাক্ষাৎ হবে। এতটুকুও না করলে আত্মীয়-স্বজন অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তখন আমি বললাম, তাহলে মৃত্যুবার্ষিকীর উদ্দেশ্য এটাই যে, আত্মীয়-স্বজনের দেখা সাক্ষাৎ হবে, তারা সন্তুষ্ট হবে! তাহলে আত্মীয়-স্বজনের সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যুবার্ষিকী করছেন? তাহলে তো এটা দুনিয়ার কাজ হয়ে যায়, দ্বীনের কাজ হয় না। মৃত ব্যক্তিদের জন্য আমরা যা কিছুই করব তা সহীহ তরীকা অনুযায়ী এবং সহীহ নিয়তে হতে হবে। তা না হলে তো আল্লাহর কাছে চওয়াব পাওয়া যাবে না। যাহোক দেখা গেল আমরা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করি আত্মীয়-স্বজনকে খুশী করার জন্য এবং এই চিন্তা করে যে, আত্মীয়-স্বজন এবং মানুষে কী বলবে যে, আমরা কিছুই করলাম না। এভাবে ছওয়াব রেছানীর মত একটা দ্বীনী কাজের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ক্ষেত্রেও আমরা দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করি। আমরা আখেরাতকে প্রাধান্য দেই না, বরং দুনিয়াকে প্রাধান্য দেই।

ফেকাহর কিতাবে লিখা হয়েছে মাইয়্যেতের জন্য কিছু করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল তার ঈছালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে সদকায়ে জারিয়া করা। মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতীমখানায় দান-সদকা করা হল সদকায়ে জারিয়া। এটা করতে অনেক সময় মনে চায় না কেন? কারণ এটা তো কেউ দেখে না। মাদ্রাসায় দশ হাজার টাকার কিতাব কিনে দিলাম কেউতো দেখলনা। আমি যে আমার বাপের জন্য করলাম কেউতো বুঝলই না। হাঁ সবাইকে ডেকে গরু মেরে খাওয়ালাম, দশ বিশ হাজার খরচ করলাম, তাহলে সবাই দেখল জানল যে, বিরাট কিছু করলাম, তাই এটা ভাল লাগে। এই দেখানো জানানোর চিন্তা হল দুনিয়ার স্বার্থ। এভাবে দ্বীনের কাজও আমরা দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে করি। তাই বলছিলাম যে, আমাদের অভ্যাস হল প্রত্যেকটি পদে পদে আমরা দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেই। এ কারণে পদে পদে আমরা গোনাহে জড়িয়ে পড়ি এবং দ্বীন ও ইবাদত থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই।

যখন একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে তখন প্রথম সামনে আসে তার নাম রাখার বিষয়টি। এ ক্ষেত্রেও আমরা দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেই। নামের ব্যাপারে হাদীছে বলা হয়েছে,

اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَائِكُمْ اِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. (رواه مسلم برقم ٥٧٠٩)

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।

"আব্দুল্লাহ" শব্দের অর্থ আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর দাস। আব্দুর রহমান শব্দের নামও অনুরূপ। অর্থাৎ, দয়াময় আল্লাহর গোলাম বা দাস।

এই দুটো নামই সবচেয়ে ভাল নাম। কারণ, এই নামের মাধ্যমে মানুষের আসল পরিচয়টা ফুটে উঠেছে। আমি আব্দুল্লাহ, তথা আল্লাহর গোলাম, এটাই আমার আসল পরিচয়, এটাই আমার সবচেয়ে ভাল পরিচয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন মে'রাজে নিয়ে যান, একদম নিজের দরবার পর্যন্ত নিয়ে যান। এটা ছিল মানব জীবনের জন্য সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার বিষয় যে, দুনিয়ায় থাকতে সরাসরি আল্লাহ পাক তাঁর দরবার পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এই মর্যাদা দান করেছেন। কুরআন শরীফের যেখানে এই মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেখানে আল্লাহ পাক বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে "আব্দ" শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁর আব্দকে তথা তাঁর গোলামকে তাঁর দরবারে নিয়ে গেছেন। এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর আব্দ বা "গোলাম" বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে। কারণ এটাইতো মানুষের জন্য সবচেয়ে মর্যাদার বিষয়। তাই সবচেয়ে ভাল নাম হল আব্দুল্লাহ, তারপর হল আব্দুর রহমান। তারপর আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর নামে নাম রাখা, সাহাবীদের নামে নাম রাখা, বুযুর্গানে দ্বীনের নামে নাম রাখা। এর বাইরে অন্তত একটা ভাল অর্থ দেখে নাম রাখা। এই হল নাম রাখার নীতি। কিন্তু আমরা যখন নাম রাখতে যাই, তখন এসব ভাল নাম বাদ দিয়ে আনকমন নাম খুঁজি, সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী নাম খুঁজি। এমন একটা নাম রাখতে চাই যে নাম কেউ রাখেনি, যেন মানুষে বলে সাংঘাতিক একটি নাম রেখেছে। মানুষে যেন আমার প্রশংসা করে যে, নাম নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আমার কোন জুড়ি নেই। এখানেও দেখা যায় যে, নিজের ভিতরে দুনিয়ার স্বার্থ ঢোকানো হচ্ছে। তাই বলছিলাম জন্ম থেকেই প্রত্যেকটা পদে পদে আমরা দুনিয়ার স্বার্থ চিন্তায় রাখি। দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেই।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এরপর যখন বাচ্চা বড় হয়, লেখা-পড়া শেখানোর প্রশ্ন আসে, তখনও দুনিয়ার স্বার্থ চিন্তায় রাখি। তখন চিন্তা করি যে বিদ্যা শেখালে টাকা-পয়সা বেশী হবে, দুনিয়ার বাড়ি-গাড়ী হবে সেই বিদ্যা শেখাব। আর কুরআন হাদীছ শেখালে কী হবে? কুরআন হাদীছ শেখালে তো মানুষের কাছে হাত পেতে খেতে হবে। এতো ফকীরী বিদ্যা! নাউজু বিল্লাহি মিন যালিক! অথচ যারা কুরআন-হাদীছ ভাল করে লিক্ষা করেন, তাঁরা কারও কাছে হাত পেতে খান না। কুরআন হাদীছের শিক্ষাকে ফকীরী বিদ্যা বললে ঈমানের উপরে আঘাত এসে যায়। এই শিক্ষার প্রবর্তনকারী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব এই বিদ্যাকে ফকীরী বিদ্যা বললে তার আঘাত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর গিয়ে পড়ে। এই শিক্ষার প্রবর্তনকারী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফকীর ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়া দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি দুনিয়া নেননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে, চাইলে আপনার জন্য মক্কার উপত্যকাকে স্বর্ণ বানিয়ে দেয়া হবে, উহুদ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তা চাই না। আমি চাই এক ওয়াক্ত খেয়ে থাকব তো শোকর আদায় করব, আরেক ওয়াক্ত না খেয়ে থাকব তখন ছবর করব। তিনি কেন এরকম অভাবের যিন্দেগী বেছে নিয়েছিলেন তার কারণ তিনি বলেছেন যে, সম্পদের যিন্দেগী মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, সম্পদের যিন্দেগী গোনাহের পথে আগে বাড়ায়। যাদের সম্পদ বেশী তারাই পাপ করতে পারে বেশী। যাদের সম্পদ নেই তারা ইচ্ছা করলেও অনেক পাপ করতে পারে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাবের যিন্দেগী পছন্দ করেছেন, আল্লাহর কাছেও এরূপ যিন্দেগী পছন্দনীয়, তাই যারাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথে আসে, রসূলের বিদ্যায় বিদ্যান হয়, আল্লাহ পাক সাধারণভাবে দুনিয়াতে তাদেরকে ধন-সম্পদ কম দেন। আবার অনেককে বেশীও দিয়ে থাকেন। অতএব কোনক্রমেই এই বিদ্যাকে ফকীরী বিদ্যা বলে তাচ্ছিল্য করার অবকাশ নেই। কুরআন হাদীছকে নিয়ে কোনভাবে তাচ্ছিল্য করা হলে, ইসলামের কোন আদর্শকে নিয়ে কোনভাবে তাচ্ছিল্য করা হলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

আমরা বাচ্চা-কাচ্চাকে দুনিয়া শেখাই, জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত করি, এটা জায়েয, যদি নিয়ত সহীহ হয়, নিয়ত ভাল হয়। কিন্তু সরাসরি গোনাহ– এমন কোন কিছু শেখানো কোনক্রমেই জায়েয নয়। যেমন অনেকে বাচ্চা-কাচ্চাদেরকে, বিশেষভাবে মেয়েদেরকে গান শেখায়। মুসলমান নিজের পয়সা ব্যয় করে কীভাবে বাচ্চাকে গান শেখায় যার পুরোটাই গোনাহ? আমার কষ্টের উপর্জিত পয়সা দিয়ে আমি আমার বাচ্চাকে হারাম জিনিস শেখাতে পারি? এর দ্বারা একদিকে আমার পয়সা হারাম পথে ব্যয় হল সেই গোনাহ হবে, সেই সাথে সাথে সে গান শিক্ষা করে যতদিন গাইবে, তার পাপ তারও হবে আমারও হবে। এই গান শেখানোও দুনিয়ার স্বার্থ চিন্তায় হয়ে থাকে। যারা বাচ্চাদেরকে গান শেখায় তারা মনে করে বাচ্চাদেরকে গান শেখালে মানুষ আমাদেরকে স্মার্ট মনে করবে, যুগ সচেতন মনে করবে, আমাদের বাচ্চাদেরকেও স্মার্ট মনে করবে। তাহলে দেখা গেল এখানেও আমরা দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেই বলে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই।

বাচ্চাদের লেবাস-পোশাক ও বেশ-ভূষার ক্ষেত্রেও আমরা মনে করি এমন লেবাস-পোশাক হওয়া চাই যার দ্বারা মানুষে আমাদেরকে স্মার্ট মনে করবে, যুগ সচেতন মনে করবে, আমাদের বাচ্চাদেরকেও স্মার্ট মনে করবে, প্রগতিশীল মনে করবে। বুযুর্গানে দ্বীনের লেবাস-পোশাক, উলামায়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

কেরামের লেবাস-পোশাক গ্রহণ করি না কেন? কারণ, আমরা ভাবি তাহলে মানুষে টিটকারী দিবে, টিপপনী কাটবে যে, হুজুর হয়ে গেছে! বলবে সেকেলে! পুরাতন চিন্তার অধিকারী!! ইত্যাদি। দেখা গেল এখানেও আমরা মানুষের কাছে ভাল থাকতে চাই। এটাই হল দুনিয়ার স্বার্থ চিন্তা। এখানেও আমরা দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেই বলে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই।

বিবাহ-শাদীর সময়ও আমরা দুনিয়ার দিককে প্রাধান্য দেই। বিবাহ করা হয় অনেক কিছু দেখে– রূপ লাবণন্য দেখে, বংশ গরীমা দেখে, বাপের কি কি সম্পদ আছে, গাড়ী-বাড়ি কয়টা আছে, বিয়ে করলে আমি কতটুকু পাব হিসাব-নিকাশ করে বিবাহ করা হয়। এভাবে অনেক কিছু দেখেই বিবাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা দুনিয়াকে প্রধান্য দেই। অথচ হাদীছে বলা হয়েছে,

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, তোমরা দ্বীনদারির বিষয়টাকে প্রাধান্য দাও।

এভাবে জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে আমরা দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেই, আখেরাতের স্বার্থকে প্রাধান্য দেই না এজন্য আমাদের যিন্দেগীর এই অবস্থা। আমরা গোনাহ থেকে ফিরে আসতে পারিনা, ইবাদত ও সহীহ তরীকার উপরেও উঠে আসতে পারি না। গোনাহ থেকে ফিরে থাকা এবং ইবাদতের উপর উঠে আসা– এই দুটোর মধ্যে ছিল কামিয়াবী ও সফলতা। কিন্তু আমরা এই কামিয়াবী ও সফলতার পথে উঠে আসতে পারছি না, তার কারণ আমরা পদে পদে দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেই।

এই দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া থেকে উঠে আসার উপায় কি তাও আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন। আর তা হল প্রত্যেকটা পদে পদে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাই আল্লাহ পাক দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বর্ণনা করার পর বলেছেন,

وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى. (সূরা আ'লা: ১৭)

অর্থাৎ, আখেরাত হল উত্তম ও চিরস্থায়ী।

এ আয়াতে প্রত্যেকটা পদে পদে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটা পদে পদে আখেরাতের ফিকির পয়দা করতে বলা হয়েছে। প্রত্যেকটা কাজ করার সময় আমরা যেন দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে আখেরাতের স্বার্থকে প্রাধান্য দেই। প্রত্যেকটা কাজ করার সময় আমরা যেন দুনিয়ার চিন্তাকে প্রাধান্য না দিয়ে আখেরাতের চিন্তাকে প্রাধান্য দেই। আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরকে প্রাধান্য দিলে দুনিয়ার চিন্তা-ফিকির চাপা পড়বে, আর তখনই আমরা গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারব এবং সহীহ তরীকায় থাকতে পারব।

আল্লাহ পাক বলেছেন, আখেরাত হল উত্তম। দুনিয়ার সুখ-সান্তি, আনন্দ যা কিছু আছে কোনটাই উত্তম নয়, বরং আখেরাতেরটাই উত্তম। দুনিয়ার সুখ-শান্তিতে ভেজাল আছে আখেরাতের সুখ-শান্তিতে কোন ভেজাল নেই। আখেরাতের সুখ-শান্তি নির্ভেজাল। দুনিয়ায় কেউ দ্যর্থহীন ভাবে সুখী হতে পারে না। একটা সুখ আছে তো আরেকটা দুঃখ লেগে আছে, একটা আনন্দ আছে তো আরেকটা বেদনা লেগে আছে। কিন্তু আখেরাতের সুখের সাথে কোন দুঃখ নেই, আখেরাতের আনন্দের সাথে কোন বেদনা নেই।

আল্লাহ পাক বলেছেন, আখেরাত হল স্থায়ী বা অনন্ত। অর্থাৎ, আখেরাতের সব সুখ-শান্তি হল স্থায়ী ও অনন্ত, যার কোন শেষ নেই। আখেরাত হচ্ছে অনন্তকালীন, যার কোন অন্ত নেই। এর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বিপরীত দুনিয়ার সুখ-শান্তি খুবই সামান্য সময়ের জন্য। কাজেই সামান্য সময়ের সুখ-শান্তির জন্য যদি আমরা আখেরাতের অনন্তকালীন সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়ে দেই, তাহলে সেটা হবে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মুকী। দুনিয়ার চিন্তায় আখেরাতকে বিসর্জন দেয়া হল নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মুকী। এর বিপরীত আখেরাতের চিন্তায় প্রয়োজনে দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়া হল বুদ্ধিমত্তা। অথচ আমরা মনে করি তার উল্টোটা।

একটা ঘটনা শুনুন। বাদশাহ হারুনূর রশীদের দরবারে একজন লোক যাতায়াত করত। সাধারণ ভাবে মানুষ তাকে বলত পাগল। সে প্রত্যেকটা পদে পদে শুধু আখেরাতের কথাই বলত! প্রত্যেকটা পদে পদে শুধু দ্বীনের কথাই বলত। তাই মানুষে মনে করত লোকটা পাগল– পৃথিবীর আর কিছুই বোঝে না। যেমন এখনও অনেক লোক বলে হুজুররা হল পাগল, হুজুররা প্রগতি বোঝে না, দুনিয়াও বোঝে না, কিছুই বোঝে না শুধু এক পরকালের কথাই বোঝে। বাদশাহ হারুনূর রশীদের দরবারে যাতায়াতকারী লোকটাও এরকমই পাগল ছিল। বাদশা হারুনূর রশীদ তার সাথে উপহাস করত। একদিন উপহাস করতে করতে বলল। এই যে হুজুর আপনাকে একটা লাঠি দিলাম। কোনদিন যদি দুনিয়ায় আপনার চেয়ে বড় আহাম্মক কাউকে পান, তাহলে লাঠিটা তাকে দিবেন। বাদশাহ বোঝাল যে, আপনার চেয়ে বড় আহাম্মক আর কেউ নেই। কাজেই আপনি এই লাঠিটা পাওয়ার যোগ্য। এই পাগলের নাম ছিল বাহলুল। সে লাঠিটা নিয়ে কাছে রেখে দিল। বাদশাহ হারুনূর রশীদ যখন মৃত্যু শয্যায় তখন বাহলূল বাদশাহ-র সাথে দেখা করতে এল। এসে বলল, বাদশাহ নামদার কেমন আছেন? বাদশাহ জবাব দিল হুজুর! আর কি, এখনতো পরকালে পাড়ি জমাচ্ছি এখনতো সময় শেষ! এখন আমার পরকালের সফর শুরু হবে। দোয়া করবেন হুজুর! বাহলুল জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কতদিনের সফর ? বাদশাহ বলল, এই সফরের তো কোন শেষ নেই আনন্তকালীন সফর। বাহলুল জিজ্ঞাসা করলেন, আগে সৈন্য-সামন্ত কি পরিমাণে প্রেরণ করেছেন ? এতদিন তো আপনার নিয়ম ছিল কোন জায়গায় সফরে গেলে আগে সৈন্য সামন্ত, পাইক-পিয়াদা অনেক কিছু পাঠাতেন, নিরাপত্তার অনেক ব্যবস্থাই সফরের আগে গ্রহণ করতেন। তখন বাদশাহ হারুনুর রশীদ বললেন, আরে পাগল এখানে আবার পাইক পেয়াদা পাঠানো যায় কি? এখানে তো একাই যেতে হয়, নিঃসঙ্গ যেতে হয়, কিছুই সাথে যায় না। তখন বাহলূল বলল, বাদশাহ নামদার! তাহলে এই নিঃসঙ্গ সফরের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছেন? বাদশাহ বলল, প্রস্তুতি তো কিছুই নিতে পারিনি। তখন বাহলুল বলল যে, বাদশাহ নামদার! তাহলে এই লাঠিটা আপনি-ই পাওয়ার যোগ্য। আপনি এটা আমাকে আমানত স্বরূপ দিয়েছিলেন যে, আমার চেয়ে বড় আহাম্মক কাউকে পেলে তাকে দিয়ে দিব। আমি এটা আপনাকেই দিয়ে দিলাম। আপনি দুনিয়ার সামান্য একটু সফরের জন্য এত প্রস্তুতি, এত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতেন, আর এই মহা সফরের জন্য কোন প্রস্তুতি নিলেন না, তাহলে তো আপনার চেয়ে আহম্মক আর কেউ নেই। আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনিই সবচেয়ে বড় আহাম্মক, তাই এই লাঠিটা আপনাকেই দিয়ে দিলাম।

আমরাও বড় আহাম্মক যে, দুনিয়ার সামান্য কিছু দিনের জন্য এত ফিকির এত চিন্তা, এত প্রস্তুতি, আর মহাকালের প্রস্তুতির জন্য কোন-ই চিন্তা নেই। দুনিয়ার সামান্য সময়ের জীবনে ভবিষ্যতে কখনও না খেয়ে কষ্ট পাব কি না, কখনও চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পাব কি না, ভবিষ্যতে বাসস্থানের কোন সংকটে যেন না পড়ি, এই চিন্তায় ব্যাংক ব্যালেঞ্চ কতকিছু করা দরকার বলে মনে করি। তার

www.maktabatulabrar.com

জন্য আমরা এত প্রস্তুতি নেই। সেই প্রস্তুতি নিতে গিয়ে কত কষ্ট স্বীকার করি। তার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শরীরের রক্ত পানি করে অর্থকড়ি সংগ্রহ করি। নিজের জীবনের আরাম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে সেই অর্থ-কড়ি সঞ্চিত করে রাখি। অথচ মহাকালের প্রস্তুতির জন্য ততটুকু ফিকিরও আসে না।

আল্লাহ পাক তাই বলেছেন, প্রত্যেকটা পদে পদে দুনিয়ার ফিকির নয় বরং আখেরাতের ফিকির আসতে হবে।

সারকথা আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই আয়াতের মধ্যে বলেছেন, যারা আকীদা-বিশ্বাসের খারাবী, আখলাক-চরিত্রের খারাবী এবং গোনাহ থেকে মুক্ত থাকবে আর ইবাদতের উপরে উঠে আসবে তারা হবে কামিয়াব। দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলে কামিয়াবী আসবেনা। এখন চিন্তা করে দেখুন আমরা কেন কামিয়াব হতে পারছিনা। আমরা কামিয়াব হতে পারছি না, কারণ প্রত্যেকটা পদে পদে আমরা দুনিয়ার চিন্তা করছি, প্রত্যেকটা পদে দুনিয়ার স্বার্থ চিন্তাকে প্রাধান্য দিচ্ছি। যখন আমরা প্রত্যেকটা পদে আখেরাত কে প্রাধান্য দিতে শিখব তখন আমরা কামিয়াবির পথে উঠে আসতে পারব।

বয়ানের শুরুতে যে আয়াতখানা তেলাওয়াত করেছিলাম, সেই আয়াতখানা আমরা আবার স্মরণ করি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى. (সূরা আ'লা: ১৪-১৫)

অর্থাৎ, অবশ্যই সফলকাম হবে সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পবিত্র রাখবে। আর আমাকে স্মরণ করে ইবাদত করবে। বিশেষভাবে নামাযের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করবে। তোমরা বরং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ আখেরাত হচ্ছে উত্তম ও স্থায়ী।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের মধ্যে এই আখেরাতের ফিকির পয়দা করে দিন, যাতে আমরা ইহাকাল পরকাল উভয় জগতে কামিয়াব হতে পারি। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৯

৩ টি বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত তিন জুমুআ যাবত কুরআন-হাদীছে উল্লেখিত বিভিন্ন নছীহতের কথা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে কুরআনে হাদীছের সবটাই নছীহত। তার মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদীছে আমাদেরকে খাস করে তিনটি বিষয়ে নছীহত করেছেন। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নছীহত করে তিনটি কথা বলেছেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন,

اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ١٧٨ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وتعليق الذهبي في التلخيص : على شرطهما)

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহকে ভয় কর যেখানেই থাক না কেন এবং কোন মন্দ কাজ হয়ে গেলে তারপর নেক কাজ করে নাও তাহলে সেই নেক কাজ সেই মন্দকে মিটিয়ে দিবে আর মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রের মোয়ামালা কর।

এ হাদীছে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহকে ভয় করা, কোন মন্দ কাজ হয়ে গেলে তারপর নেক কাজ করে নেয়া এবং মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রের ব্যবহার করা। আজ এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এক নম্বর: اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ অর্থাৎ, যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। এখানে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। কুরআন হাদীছে আল্লাহর ভয়কে বলা হয় তাক্ওয়া।

এই "তাক্ওয়া" কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক: ভয়। দুই: বিরত থাকা। মূলত এক নম্বরটা এসে গেলে দুই নম্বরটাও এসে যায়। অর্থাৎ, ভয় আসলেই বিরত থাকা অর্থাৎ, গোনাহ থেকে বিরত থাকা এসে যায়। অর্থাৎ, আল্লাহর ভয় আসলে গোনাহ থেকে বিরত থাকা হয়। তাই ভয় হল বিরত থাকার কারণ, আর বিরত থাকা অর্থাৎ গোনাহ থেকে বিরত থাকা হল আসল উদ্দেশ্য। যখন আল্লাহর ভয় তথা আল্লাহর আযাবের ভয় ভিতরে আসবে তখন মানুষ গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারবে।

আল্লাহর ভয় ভিতরে আসলে মানুষ কীভাবে গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে তার একটা ঘটনা শুনুন। একবার হযরত ওমর (রা.) সফরে বের হয়েছিলেন। সফরে একস্থানে তাঁর ক্ষুদা পেল। তিনি দেখলেন একজন রাখাল বকরী চরাচ্ছে। তিনি রাখালকে বললেন, আমাকে এক পেয়ালা দুধ পান

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

করাবে কি? রাখালটি বলল, আপনাকে দুধ পান করাতে পারলেতো ভাল ছিল, কিন্তু এই সব বকরীর মালিক আমি নই। কাউকে দুধ পান করানোর জন্য মালিক আমাকে অনুমতি দেয়নি। হযরত ওমর (রা.) -এর অভ্যাস ছিল তিনি ঘুরে ঘুরে মানুষের আমানতদারী, ঈমান আমলের অবস্থা পরীক্ষা করতেন। তিনি উক্ত রাখালের আমানতদারী পরীক্ষা করার জন্য বললেন, আচ্ছা এমন যদি করা হয় - আমি তোমাকে কিছু টাকা-পয়সা দিলাম, তুমি আমাকে বকরীটা দিয়ে দিলে, তাহলে আমি দুধও পান করতে পারব আবার প্রয়োজনে এটার গোশতও খেতে পারব। আবার তোমারও কিছু টাকা-পয়াসা হল। আর মালিক তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বলবে একটা হিংস্র প্রাণী সেটাকে খেয়ে ফেলেছে। তখন রাখালটি বলল,

يَا هٰذَا فَاَيْنَ اللّٰهُ؟

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্র বান্দা, তাহলে আল্লাহ কোথায়? তিনিতো দেখবেন।

হযরত উমর (রা.) তখন বললেন, তোমার মত মানুষ যতদিন পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন দুনিয়ার কোন অকল্যাণ হবে না। মূলত আল্লাহ আমার সব কিছু দেখেন -এই চিন্তা থাকলে মানুষ অপরাধ করতে পারে না। আল্লাহ সর্বদা দেখেন– এই চিন্তা এসে গেলে মানুষের মধ্যে তাক্ওয়া বা আল্লাহ্র ভয় এসে যায়। অতএব আল্লাহ আমার সবকিছু দেখেন এই চিন্তা মনের মধ্যে উপস্থিত রাখলে গোনাহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে।

আল্লাহ সবকিছু দেখেন এই চিন্তা মনের মধ্যে উপস্থিত রাখলে কীভাবে গোনাহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয় তার একটা ঘটনা শুনুন। হযরত ওমর (রা.) একবার প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য ভোর রাতে বের হয়েছেন। একটা তাবুর কাছে শুনছেন এক মা তার মেয়েকে ডেকে বলছে, ওঠ বকরীর দুধ দহন কর। আমাদের অভাব চলছে, তাই বেশী অর্থ পাওয়ার জন্য দুধে কিছু পানি মিশিয়ে দিও। তখন মেয়ে বলছে, মা! খলীফা ওমরতো দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন। মা বলল, খলীফা ওমর তো আর দেখবে না যে, আমরা পানি মিশালাম। তখন মেয়ে বলল, মা খলীফা ওমর না দেখলেও আল্লাহ পাকতো দেখবেন, তাঁর চোখ তো এড়ানো যাবেনা। হযরত ওমর (রা.) এই কথাবার্তা শুনে ফিরে এলেন। তিনি বললেন, এই মেয়ে আল্লাহর ওলী। তার গর্ভে নেককার সন্তান হবে। তিনি তার এক পুত্রের সাথে এই মেয়ের বিবাহ দিলেন। এই মেয়েরই বংশে খলীফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের জন্ম হয়।

যাহোক তাকওয়া বা খোদাভীতির সবচেয়ে বড় ফায়দা হল তাকওয়া মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে। এছাড়াও তাকওয়ার আরও অনেক ফায়দা রয়েছে। সুনানে দারিমী ও মুসনাদে আহমদ কিতাবদ্বয়ে বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে– তাকওয়ার ফায়দা বয়ান করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اٰيَةً لَوْ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ. وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا، وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (رواه الدارمي في كتاب الرقاق. باب في تقوى الله برقم ٢٧٢٥ وإسناده ضعيف)

অর্থাৎ, আমি এমন একটি আয়াত জানি, যদি লোকেরা তার প্রতি আমল করত, তাহলে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হত। আয়াতটি হল–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (সূরা তালাক্: ২-৩)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে, আল্লাহ তার মুক্তির পথ করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা হতে রিযিক দান প্রদান করেন যার সে ধারণাও করতে পারে না।

তাক্ওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যথা–

(১) কুফ্র ও শির্ক থেকে বিরত থাকা,

(২) হারাম ও গোনাহে কবীরা থেকে বিরত থাকা,

(৩) গোনাহে ছগীরা থেকে বিরত থাকা,

(৪) যেখানে হালাল না হারাম–এই সন্দেহ থাকে সেখান থেকে বিরত থাকা,

(৫) অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং

(৬) যে সব মোবাহ কাজ গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে তা থেকেও বিরত থাকা।

এই সব রকম তাকওয়া যার মধ্যে আছে সে–ই হল কামেল মুত্তাকী। অতএব কামেল মুত্তাকী হওয়ার জন্য শুধু গোনাহ থেকেই বিরত থাকলে হবেনা বরং গোনাহের সন্দেহ আছে এমন স্থান থেকেও বিরত থাকতে হবে। বুযুর্গানে দ্বীনের তাকওয়ার ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় তাঁরা কীভাবে সন্দেহের স্থান থেকেও বিরত থাকতেন।

আমাদের নিকট অতীতের বুযুর্গানে দ্বীনের তাকওয়ার যে ঘটনা জানা যায় তা থেকেও আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা নেয়ার রয়েছে। বোখারী, তিরমিযী প্রভৃতি কিতাবের টীকাকার হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপূরী (রহ.) একবার মুজাহিরুল উলূম সাহারানপূর মাদ্রাসার চাঁদা কালেকশনের জন্য কলিকাতা গিয়েছিলেন। সেখানকার অনেকের সাথে হযরতের জানা শোনা ছিল। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি যাতায়াত খরচের বিস্তারিত হিসাব মাদ্রাসায় দাখেল করেন। তার মধ্যে একস্থানে লেখা ছিল। কলিকাতার অমুক স্থানে আমি আমার এক দোস্তের সাথে মুলাকাতের জন্য গিয়েছিলাম। যদিও সেখানে গিয়ে মাদ্রাসার জন্য অনেক চাঁদা কালেকশন হয়েছে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পেছনে আমার নিয়ত ছিল দোস্তের সাথে সাক্ষাত করা। তাই সেখানে যাতায়াতের এতটাকা ভাড়া সর্বমোট যাতায়াতের ব্যয় থেকে বাদ দেয়া হোক।

হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর পিতা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (রহ.) শীতের মওসূমে প্রয়োজনে মাদ্রাসার চুলার পাশে খানা রেখে সেই তাপে খানা গরম করতেন আর এ কারণে প্রতি মাসে দুই তিন টাকা মাদ্রাসায় দিয়ে দিতেন এই বলে যে, মাদ্রাসার আগুণ থেকে আমি উপকৃত হয়েছি, এরও বিনিময় হওয়া চাই।

একবার এক সফরে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বৃষ্টির কারণে একটা ছোট্ট রেল স্টেশনে অবস্থান করছিলেন। স্টেশন মাষ্টার একটা গুদাম ঘরে হযরতের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। রাত হয়ে এল। স্টেশন মাষ্টার এক কর্মচারীকে সেই গুদাম ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেয়ার হুকুম দিল। হযরতের সন্দেহ হল এটা আবার রেলওয়ে কোম্পানীর লণ্ঠন নয়তো? (তাহলেতো এটা আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা ঠিক হবে না।) কিন্তু তিনি উক্ত কর্মচারীকে নিষেধ করলেন না এই চিন্তায় যে, লোকটি হিন্দু, সে ভাববে ইসলাম ধর্মে এতটা সংকীর্ণতা এবং এত কড়াকড়ি! তাই হযরত মনে মনে দুআ করতে থাকলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এ থেকে রক্ষা করুন। ইতিমধ্যে স্টেশন মাষ্টার উক্ত কর্মচারীকে ডেকে বলল, স্টেশনের লণ্ঠন নয়, আমাদের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ব্যক্তিগত লণ্ঠন জ্বালাবে। এ কথা শুনে হযরত থানবী (রহ.) আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। এ ঘটনা থেকেও বোঝা গেল যে, সত্যিই বান্দা দিল থেকে পরহেযগারির উপর চাইলে আল্লাহ পাক তাকে পরহেযগারীর উপর চলার তাওফীক দান করেন। একথা হাদীছেও বর্ণিত হয়েছে যে, পরহেযগারির উপর চলতে চাইলে আল্লাহ পাক তাকে পরহেযগারীর উপর চলার তাওফীক দান করেন। বোখারী শরীফের একটা দীর্ঘ হাদীছের একাংশে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ. (صحيح البخاري برقم ٦٤٧٠)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন।

দুই নম্বর– হাদীছে দ্বিতীয় যে বিষয়টা বলা হয়েছে, তা হল– وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا অর্থাৎ, কোন মন্দ কাজ হয়ে গেলে তারপর নেক কাজ করে নিবে তাহলে ঐ মন্দ কাজ মিটে যাবে। এখানে নেক কাজ দ্বারা পাপের কাজ মিটে যায় বলা হয়েছে। কুরআনে কারীমেও এ ব্যাপারে বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ. (সূরা হূদ: ১১৪)

অর্থাৎ, অবশ্যই নেক কাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটা বড় উপদেশ।

নেক কাজ দ্বারা মন্দ কাজ তথা পাপের কাজ তিনভাবে মিটে যায়।

এক: নামায, রোযা, হজ্জ, ইত্যাদি নেক আমল দ্বারা গোনাহে সগীরা মোচন হয়ে থাকে।

দুই: কারও মধ্যে নেক কাজের অভ্যাস গড়ে উঠলে তার মনের মধ্যে যে যোগ্যতা পয়দা হয় তাতে সে গোনাহ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি পায়। এভাবে সে গোনাহ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

তিন: নেক কাজের দ্বারা মনের মধ্যে যে নূর পয়দা হয় তাতে সে পাপের অন্ধকার থেকে রক্ষা পায়। ইবাদতের দ্বারা কলবের মধ্যে যে নূর সৃষ্টি হয় সেই নূরের কারণে পাপের অন্ধকার উপলব্ধি করতে পারে। ফলে পাপের কাজ তার কাছে খারাপ এবং কষ্টকর লাগে, আর পাপ খারাপ ও কষ্টকর লাগার ফলে সে পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে। এভাবে নেক কাজই তার থেকে মন্দ কাজকে হটিয়ে দেয়, নেক কাজই পাপ কাজকে দূর করে দেয়। এভাবে নেক কাজ দ্বারাই মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পায়।

নেক কাজ দ্বারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা যায়– এ বিষয়টা একটা মৌলিক বিষয়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আল্লাহ পাক আয়াতের শেষে বলেছেন, "এটা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটা বড় উপদেশ"। আমরা নেক কাজে অভ্যস্ত নই বলে পাপ কাজ আমাদের কাছে ভাল লাগে, ফলে আমরা পাপে জড়িত হয়ে পড়ি। আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ নেক কাজ করি না বলে আমাদের অন্তরে পর্যাপ্ত নূর পয়দা হয় না, যার ফলে পাপের অন্ধকার আমরা উপলব্ধি করতে পারি না এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে পারি না। পর্যাপ্ত নেক আমল করলে অন্তরে পর্যাপ্ত নূর পয়দা হত। তাহলে আমরা অন্তরের অন্ধকার উপলব্ধি করতে পারতাম এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে পারতাম।

পাপ কাজ দ্বারা কলবে কাল দাগ পড়ে যায়, কলব কাল হয়ে যায়, সেই কলবে ইলমের নূর প্রবেশ করে না। হাদীছে শরীফে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ. (رواه الترمذي برقم ٣٣٣٤ وقال حسن صحيح)

অর্থাৎ, বান্দা যখন কোন একটা গোনাহ করে তখন তার কলবে একটা কাল দাগ পড়ে যায়। এভাবে যত গোনাহ করতে থাকে কাল দাগও বাড়তে থাকে। এভাবে বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে তার কলব সম্পূর্ণ কাল হয়ে যায়। ঐ কালির উপর ইল্‌মের নূর প্রতিফলিত হয় না, ইল্‌মের আলো ফোটে না। যেমন কালো হাড়ির উপর সূর্যের আলো ফোটে না। কিন্তু কাঁচ -যা অত্যন্ত স্বচ্ছ- তার উপর যখন সূর্যের আলো পড়ে ,তখন সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাঁচ তখন এত উজ্জল হয়ে যায় যে, তার থেকে আলো ছুটতে থাকে। কলবের অবস্থাও এরকম, বান্দা যখন গোনাহ করতে থাকে, ধীরে ধীরে তার কলব কাল হয়ে যায়, ইল্‌মের নূর সেখানে ফোটে না। আর যে কলব পাপ মুক্ত থাকে, যে কলব উজ্জল স্বচ্ছ থাকে, সেখানে ইল্‌মের নূর ফুটে ওঠে, সেখান থেকে হেদায়েতের আলো ছুটতে থাকে। ইল্‌ম যে নূর এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ. (সূরা মায়িদা: ১৫)

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে এসেছে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব। এখানে নূর দ্বারা জ্ঞানের উৎস কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতে ইল্‌মে ওহী সম্পর্কে বলা হয়েছে– جعلناه نور অর্থাৎ, সেটাকে আমি বানিয়েছি নূর। পাপের কারণে যে সহীহ্ ইল্‌ম আসে না এ সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করা যায়, সে আয়াতে কাফেরদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ. (সূরা আনআম : ২৫)

অর্থাৎ, তাদের কলবে আমি পর্দা রেখে দিয়েছি। দ্বীনী কথা বোঝার ক্ষেত্রে সেটা আঁড় হয়ে আছে। যদিও এ আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু এর থেকে বোঝা যায় -যারাই পাপ করবে তাদের কলবে এই পর্দা পড়তে থাকবে। কাফেররা সবচেয়ে বড় পাপী, এজন্য তাদের পর্দাও বেশী মোটা ও বেশী পুরু। এমনিভাবে যারা যতটুকু পাপ করতে থাকবে তাদের কলবেও এরকম পর্দা পড়তে থাকবে। দ্বীনী কথা তারা সঠিক ভাবে বুঝতে পারবে না। দ্বীনের সহীহ্ জ্ঞান, দ্বীনের সহীহ্ সমঝ তাদের মধ্যে আসবে না। এজন্যই দেখা যায়, যারা পাপী তাদের সামনে কুরআন হাদীছের বরাত দিয়ে সহীহ কথা সহীহ মাসআলা স্পষ্ট ভাবে বয়ান করা হলেও তাদের দিলে ধরেনা, তাদের কাছে সেটা পরিষ্কার হয় না, তাদের সন্দেহ কাটেনা, তাদের মনে সেটা কবুল করতে চায় না। হতে পারে গোনাহের কারণে তাদের অন্তরে কাল দাগ পড়ে থাকার কারণে এটা হচ্ছে।

তিন নম্বর– হাদীছে তৃতীয় বিষয় যেটা বলা হয়েছে, তাহল– وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ অর্থাৎ, মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রের ব্যবহার করবে। এখানে উত্তম চরিত্রের কথা বলা হয়েছে।

ইসলামে উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব অনেক। কারণ, উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন। আর যে বিষয়ের পূর্ণতা বিধানের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন, সে বিষয়টা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٤٢٢١ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وتعليق الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই তো আমি প্রেরিত হয়েছি।

উত্তম চরিত্রের অনেক ফযীলত। তন্মধ্যে একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম ব্যক্তি। বোখারী শরীফের হাদীছে এসেছে– হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আম্‌র (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ اَحْسَنَكُمْ خُلُقًا. (رواه البخارى فى كتاب الادب برقم ٦٠٢٩)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কামেল মু'মিন ব্যক্তি। আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (رواه الترمذي برقم ١١٦٢ وقال : حسن صحيح، وابو داود برقم ٤٦٨٤)

অর্থাৎ, মু'মিনদের মধ্যে কামেল মু'মিন হল যার চরিত্র উত্তম। তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েতে আছে আর মু'মিনদের মধ্যে আরও উত্তম যে পরিবারের সাথে কোমল ব্যবহার করে।

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় ব্যক্তি। তিরমিযী শরীফের হাদীছে এসেছে– হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا. (رواه الترمذي برقم ٢٠١٨ وقال : حسن غريب)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সব থেকে নিকটতর, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ভাল।

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদা নফল নামায ও নফল রোযার ছওয়াব পেতে থাকে। আবূ দাউদ শরীফের হাদীছে এসেছে– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. (رواه ابو داود في سننه برقم ٤٨٠٠ وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, মু'মিন তার উত্তম চরিত্র দ্বারা (নফল ইবাদতকারী) রাত্রি জাগরণকারী ও (দিনের বেলায় নফল) রোযা পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে।

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– কেয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের ওজন সবচেয়ে বেশী হবে। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

مَا شَيْئٌ اَثْقَلَ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ. (رواه الترمذي في ابواب البر والصلة. باب ما جاء في حسن الخلق برقم ٢٠٠٢ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন মু'মিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে তা হল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন।

উত্তম চরিত্রের আর একটি ফযীলত হল– উত্তম চরিত্র উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষকে জান্নাতে পৌছাবে। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ জিনিস মানুষকে বেশী হারে জান্নাতে পৌছাবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন,

تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. (رواه الترمذي في ابواب البر والصلة. باب ما جاء في حسن الخلق برقم ٢٠٠٤ وقال: صحيح غريب)

অর্থাৎ, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র।

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি শুধু কোন রকমে জান্নাতে পৌঁছবে না বরং জান্নাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করবে। তিরমিযী শরীফেরই আর এক হাদীছে এসেছে– হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِيْ وَسْطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ الْخُلُقَ بُنِيَ لَهُ فِيْ اَعْلَاهَا. (رواه الترمذي في ابواب البر والصلة. باب ما جاء في المراء برقم ١٩٩٣ وقال: حسن)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি না-হক মিথ্যা পরিত্যাগ করে, তার জন্য জান্নাতে এক প্রান্তে প্রাসাদ তৈরি করা হবে এবং যে ব্যক্তি ন্যায়ের উপর থেকে ঝগড়াঝাটি পরিহার করে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে প্রাসাদ তৈরি করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে উত্তমভাবে গড়ে তোলে তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রাসাদ তৈরি করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে চরিত্র উত্তম বানানোর তাওফীক দান করুন। এই হাদীছের তিনটি নসীহতের উপর আমল করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং – ১০

৪ টি বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا. حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত চার জুমুআ যাবত কুরআন-হাদীছে উল্লেখিত বিভিন্ন নছীহতের কথা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে নছীহতের কথা শুনতেন, উপদেশের কথা শুনতেন। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নছীহত চেয়ে নিতেন। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মানুষকে নছীহতের কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নির্দেশও ছিল তিনি যেন মানুষকে নছীহত করেন। সেমতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সময় সুযোগে বিভিন্ন নছীহত করেছেন। একটা হাদীছে এরকম চারটি বিষয়ে নছীহত এসেছে। মুসনাদে আহমদ কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নছীহত প্রসঙ্গে বললেন,

اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا. حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ. (قال شعيب الأرنؤوط: رواه ابن المبارك في الزهد ١٢٠٤ عن ابن عمرو موقوفا وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, তোমার মধ্যে যদি চারটি গুণ থাকে, তাহলে দুনিয়ার আর কিছু না পেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই। সে চারটি গুণ হল– আমানতদারী রক্ষা করা, সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র আর খাদ্য-খাবারে পবিত্রতা।

এ হাদীছ থেকে বোঝা যায়– আমানতদারী, সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র আর খাদ্য-খাবার পবিত্র হওয়া এই চারটি বিষয় এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ এই চারটি পেলে তার আর কিছু না পেলেও চলে। এই চারটি বিষয়ের মধ্যে–

এক নম্বর বিষয় হল আমানতদারী। মানুষের মধ্যে যখন আমানতদারী এসে যায়, তখন মানুষের দ্বীনী ও দুনিয়াবী সব দায়িত্ব ঠিকমত পালন করা এসে যায়। তার সবকিছু দোরস্ত হয়ে যায়। আমানতদারী আসলে কীভাবে সব দায়িত্ব পালন করা এসে যায় এবং কীভাবে সবকিছু দেরাস্ত হয়ে যায়–কথাটি পরিস্কার করার জন্য কিছু ব্যাখ্যা দরকার।

প্রথমে আমানতদারী কথাটির অর্থ পরিষ্কার করে বোঝা দারকার। আমরা শুধু বুঝি মানুষ অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করাই হল আমানতদারী। কিন্তু বাস্তবে আমানতদারী কথাটি আরও ব্যাপক। মানুষ অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যেমন আমানতদারী, তেমনিভাবে কেউ কোন গোপনীয় কথা জানালে বা কোনভাবে কারও কোন গোপনীয় বিষয় জানতে পারলে তা গোপন রাখাও আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শরীয়তের যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তা সমুদয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত। তার হক আদায় করাও আমাদের উপর ওয়াজিব। টাকা-পয়সার আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত সবকিছু রক্ষা করাই আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত।

আমানত কথাটা যে অনেক ব্যাপক, তার মধ্যে কথার আমানত পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত, এ বিষয়টাও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তিরমিযী শরীফে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে একটা হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اِلْتَفَتَ فَهِيَ اَمَانَةٌ. (رواه الترمذى برقم ١٩٥٩ وحسنه)

অর্থাৎ, যখন কোন ব্যক্তি কোন কথা বলে এদিক সেদিক তাকায় (যে, কেউ শুনলনাতো) তাহলে তা আমানত।

দুইজন লোক বা কয়েকজন লোক কোন মজলিসে একটা কথা বললে সে কথা যারা শুনবে, তাদের কাছে সে কথাগুলো আমানত। কারণ তারা সে কথাগুলো প্রকাশ্য মজলিসে বসে আলোচনা করছে না, বরং গোপন পরিবেশে একান্তে আলোচনা করছে। এর অর্থই হল সে কথাগুলো বাইরে বলার কথা নয়। তাই যে সেটা শুনবে, সে অন্যের সামনে তা প্রকাশ করতে পারবে না। করলে আমানতের খেয়ানত হবে। খেয়ানতের গোনাহ হবে। এমনিভাবে দুজনে গোপনে যদি কোন কথা বলে, আর মাঝখানে কোন ভাবে কেউ সেটা শুনে ফেলে, সেটাও আমানত। সে কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করলে আমানতের খেয়ানত হবে। এমনিভাবে টেলিফোনে কেউ কথা বলছে, আমি আড়ালে থেকে সে কথা শুনলাম, সেটা অন্যের কাছে বললেও আমানতের খেয়ানত হবে। আমরা অনেক সময় টেলিফোন করতে যাই, মাঝখান থেকে ক্রস কানেকশন হয়ে অন্যের কথা কানে আসে। এটা না শোনা উচিৎ। কারণ হতে পারে কোন গোপনীয় কথা হচ্ছে, আমি হয়তো তাদেরকে চিনে ফেলব, আর তারা আমার কাছে সেটা প্রকাশ করতে চায় না। তাই তাদের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সে কথা শোনা আমার জন্য উচিৎ নয়। এ জন্যেই টেলিফোনে আড়ি পেতে কথা শোনা জায়েয নয়। আড়াল থেকে কান পেতে কারও কথা শোনা জায়েয নয়। এগুলি আমানতের খেয়ানত।

আমানত যে কোন ধরনের হোক, সেই আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গোনাহ।

এই আমানতে খেয়ানত করা কথাটার অর্থও আমরা পরিষ্কার করে বুঝি না। আমরা অনেকে মনে করি কেউ আমার কাছে টাকা-পয়সা জমা রাখল, বা সোনা-দানা গচ্ছিত রাখল আর আমি তাকে তা ফেরত দিলাম না, বরং নিজেই আত্মসাত করে ফেললাম; আমরা বুঝি এটাই শুধু আমানতে খেয়ানত। কিন্তু তা নয়, শুধু টাকা-পয়সা, সোনা-দানা এবং মাল-সামানই আমানত নয়। আমানত আরও অনেক ব্যাপক। সব ধরনের আমানতে খেয়ানতই এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহর সমস্ত হুকুম-আহকামও আমাদের কাছে আমানত। এই সব হুকুম-আহকাম অমান্য করাও আমানতের খেয়ানত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ. (সূরা আহযাব: ৭২)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, আমি আসমান জমিন ও পর্বতমালার কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম যে, তোমরা কি পারবে এই আমানত রক্ষা করতে? তারা এই আমানতের বোঝা বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করল এবং ভীত হয়ে পড়ল, আর মানুষ তা বহন করল।

এ আয়াতে "আমানত" দ্বারা সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ পাকের সমস্ত হুকুম-আহকাম আমাদের কাছে আমানত। এ সব হুকুম-আহকাম লঙ্ঘন করাও আমানতে খেয়ানত। এমনকি উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আমাদের যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, যেমন কান আছে, চোখ আছে, নাক আছে, হাত-পা আছে, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, এগুলোও আমাদের কাছে আল্লাহ্ পাকের আমানত। আল্লাহ পাক আস্থা করে আমাদের কাছে এগুলোকে আমানত রেখেছেন। এই আস্থার বিরুদ্ধে করাটাই হল খেয়ানত। আমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানব বলে ওয়াদা করেছি, আল্লাহ পাক তাই আমাদের উপরে আস্থা করে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকম ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক এগুলোকে ব্যবহার করি। তাই আল্লাহর মর্জির বাইরে এ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করলেও আমানতে খেয়ানত হবে। যেমন আল্লাহ্র দেয়া চোখকে যদি আমরা গোনাহের কাজে ব্যবহার করি, এর দ্বারা গায়রে মাহরাম মহিলাদের দিকে নজর দেই, তাহলে এটা চোখের খেয়ানত হয়ে গেল। কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ. (সূরা মুমিন: ১৯)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চোখের খেয়ানত সম্বন্ধে অবগত আছেন।

এ আয়াতে চোখের পাপ না বলে চোখের খেয়ানত বলা হয়েছে। এভাবে বলে বোঝানো হয়েছে যে, চোখ আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া এক আমানত, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া এই আমানতকে তাঁর হুকুমের বাইরে ব্যবহার করাই হল খেয়ানত।

মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র দেয়া আমানত। মানুষ তার মালিক নয়। মানুষ শুধু এই আমানতকে বহন করে চলবে। আল্লাহ্র আমানতকে আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী রাখবে। আমি যার মালিক নই, তা আমি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারি না। তাই ইচ্ছা হলেই কান দিয়ে গান শুনতে পারব না, মানুষের গীবত সমালোচনা শুনতে পারব না, চোখ দিয়ে যা ইচ্ছা তাই দেখতে পারব না, জবান দিয়ে যা ইচ্ছা তা বলতে পারব না। বরং আল্লাহর হুকুমের মধ্যে থাকলে পারব নতুবা পারব না। কেননা, আল্লাহ্র দেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে সেটাও খেয়ানত বলে গণ্য হবে।

আমার জীবনের মলিকও আমি নই। আমি শুধু এর আমানতদার। আমি এই আমানত রক্ষা করে চলতে পারব, কিন্তু এটা নষ্ট করতে পারব না। তাই ইচ্ছা হলেই আত্মহত্যা করা যায় না। একথা বলা চলবে না যে, আমার জীবন আমি নষ্ট করব তাতে কার কী বলার আছে? । এ কথা চলবে না। কারণ, আমার জীবনের মালিক আমি নই, আমি এটার আমানত রক্ষাকারী মাত্র। এই আমানতে খেয়ানত করা যাবে না।

আমানতে খেয়ানত বিষয়টা এত ব্যাপক যে, আমি অফিস-আদালতে চাকুরী করি। অফিস আমার প্রতি আস্থা করেছে যে, আমি ঠিকমত অফিসের ডিউটি পালন করব। অতএব আমি যদি ঠিকমত ডিউটি পালন না করি, তাহলে অফিসের সাথে খেয়ানত করা হবে। যতটুকু সময় অফিসের ডিউটি পালন করার কথা, সেই সময়ের মধ্যে যদি আমি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প-গুজব করি, আড্ডা দেই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বা অফিসের কাজ থাকা সত্ত্বেও বসে বসে সময় নষ্ট করি, তাহলে এতটুকু সময় খেয়ানত বলে গণ্য হবে। এতটুক সময়ের বেতন ভাতা গ্রহণ করা আমার জন্য জায়েয হবে না।

ভারতের এক বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা মাজহার নানুতবী (রহ.)। তার সম্বন্ধে "আকাবির কা তাকওয়া" গ্রন্থে লেখা আছে– তার অভ্যাস ছিল, মাদ্রাসার ক্লাস টাইমে তাঁর কোন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আসলে এবং ক্লাস টাইমে তাদের জন্য সময় দিতে হলে তিনি সেই সময়টুকু লিখে রাখতেন। মাস শেষে হিসেব করতেন এরকম কত ঘন্টা কত মিনিট মাদ্রাসার টাইমে মাদ্রাসার কাজে ব্যবহৃত হয়নি, বরং ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। হিসেব করে মাসের শেষে মাদ্রাসার অফিসে দরখাস্ত দিতেন যে, এ মাসে আমার এত ঘন্টা, এত মিনিট ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই হিসেব করে আমার বেতন থেকে এত টাকা এত পয়সা কেটে দেয়া হোক।

দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর একটা ঘটনা শুনুন। তার বেতন ছিল ১০ রূপী। স্বাভাবিকভাবে মানুষের বয়স যত বাড়ে, আত্মীয়-স্বজন, সন্তানাদিও বাড়ে। তখন অর্থকড়ির প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। তাই শেষ দিকে মাদ্রাসার মজলিসে শুরা সিদ্ধান্ত নিল যে, হযরত শায়খুল হিন্দের বেতন বাড়াতে হবে। কারণ আগের চেয়ে তাঁর খরচ বেড়ে গেছে। সিদ্ধান্ত হল পরবর্তী মাস থেকে ১৫ টাকা বেতন দেয়া হবে। পরবর্তী মাসে যখন তিনি বেতন আনতে গেলেন, তখন ১৫ টাকা পেয়ে বললেন ১৫ টাকা কেন? তাকে জানানো হল, মজলিসে শুরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বললেন, মজলিসে শুরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ, আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমি যখন জওয়ান ছিলাম, তখন আমার বেতন ছিল ১০ রূপী। তখন বেশী পড়াতে পারতাম, বেশী মাদ্রাসার খেদমত করতে পারতাম। এখন আমার বয়স হয়ে গেছে, আগের মত পড়াতে পারি না। মাদ্রাসার জন্য আগে যে পরিমাণ সময় ব্যয় করতাম, এখন তা পারি না। এখনতো আমার বেতন ৫ রূপী কমানো উচিৎ। সেখানে ৫ রূপী বাড়ানো হল কেন? আমি এই বেতন বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারি না। সুবহানাল্লাহ! বুযুর্গানে দ্বীনের আমল দেখেই দ্বীনের উপর চলা শিখতে হয়।

যাহোক বলা হচ্ছিল অফিস-আদালতের সময়ও আমানত, এই আমানতেও খেয়ানত করা যাবে না। অফিস আদালতের আসবাব-পত্রও আমানত। সেগুলো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হতে পারবে না। দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের এরকম ইতিহাস জানা যায় যে, তারা মাদ্রাসার কাজ ছাড়া মাদ্রাসার একটা কাগজে নিজের ব্যক্তিগত একটা চিঠিও লিখতেন না। মাদ্রাসার কলম পর্যন্ত ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন না। ব্যক্তিগত কাজে কাউকে একটা ঠিকানা লিখে দিতে হলেও অফিস আদালতের কাগজ কলম ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ, সেগুলো আমানত।

অনেক সময় কোন্‌টা প্রতিষ্ঠানের কাজ, আর কোন্‌টা ব্যক্তিগত কাজ, তা পার্থক্য করা খুব জটিল হয়ে যায়। যেমন আমি আমার পরিচিত কোন লোকের কাছে টেলিফোন করছি, তিনি আবার আমার চাকুরী প্রতিষ্ঠানের সাথেও সম্পৃক্ত। এখন এই টেলিফোনটা কোন্ খাতিরে করছি, আমার পরিচিত সেই খাতিরে করছি, না প্রতিষ্ঠানের খাতিরে করছি, তা পার্থক্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরকম ক্ষেত্রে তাক্‌ওয়া হল নিজের উপরে খরচটা নিয়ে নেয়া। অর্থাৎ, এই মনে করা যে, এটা প্রতিষ্ঠানের কল নয়; বরং ব্যক্তিগত কল, তাই এর খরচটা নিজে বহন করা। নিজের ফোন থাকলে সেটা ব্যবহার করা, নতুবা অফিসের ফোন ব্যবহার করলে তার বিল যে কোনভাবে হোক প্রতিষ্ঠানের ফাণ্ডে পৌঁছে দেয়া। এটাই হল তাক্‌ওয়া।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এমনিভাবে যদি কোন আত্মীয়-স্বজন আমার বাড়ীতে কোন কিছু হাদিয়া নিয়ে আসে, আর তিনি এমন আত্মীয়, আমার চাকুরী প্রতিষ্ঠানে যার কাজও রয়ে গেছে, এরকম মুহূর্তে সন্দেহ জাগে যে, তিনি কি আত্মীয় হিসেবে ঐ হাদিয়া এনেছেন, না কি অফিসের কাজ উদ্ধার করার জন্য ঘুষ হিসেবে এনেছেন। এরকম সন্দেহের ক্ষেত্রে ঐ হাদিয়া গ্রহণ না করাই হল তাক্‌ওয়া বা পরহেযগারী। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে এসেছে- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلَى مَا لَايُرِيْبُكَ. (رواه الترمذي في اخر أبواب الزهد برقم ٢٥١٨ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, সন্দেহ যুক্ত জিনিস বর্জন কর। যেটা সন্দেহ মুক্ত (জায়েয), সেটা গ্রহণ কর।

শরীয়তে আমানতের গুরুত্ব অনেক বেশী। আমানতের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে,

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. (رواه ابن حبان في صحيحه برقم ١٩٤ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن في الشواهد)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গিকারের মূল্য নেই তার দ্বীনও নেই।

যাহোক এতক্ষণ পর্যন্ত হাদীছের প্রথম বিষয় আমানতদারী সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

দুই নম্বর বিষয় হল সত্যবাদিতা। মানুষের মধ্যে যখন সত্যবাদিতা এসে যায়, তখন তার পক্ষে বহু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। কেননা, মিথ্যাকে বলা হয়েছে "গোনাহের মা"। এক মা থেকে যেমন বহু সন্তানের জন্ম হয়, তদ্রূপ এক মিথ্যা থেকে বহু মিথ্যা এবং বহু পাপের জন্ম হয়। অতএব যে ব্যক্তি মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকতে পারে, সে বহু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

সত্যবাদিতার ফযীলত ও মিথ্যার খারাবী সম্বন্ধে মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা.) থেকে একটা হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ، وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ، وَاَنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ، وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ، وَاَنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا. (رواه مسلم في كتاب البر والصلة والادب– باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. حديث رقم ٦٨٠٣)

অর্থাৎ, অবশ্যই সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে, আর নেকী জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। মানুষ সত্য বলতে থাকে, এভাবে এক পর্যায়ে আল্লাহর নিকট তাকে সত্যবাদী বলে তালিকাভুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা অবশ্যই গোনাহের দিকে পরিচালিত করে, আর গোনাহ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, এভাবে এক পর্যায়ে আল্লাহর নিকট তাকে মিথ্যাবাদী বলে তালিকাভুক্ত করা হয়।

সত্যবাদিতা দ্বারা মানুষ অনেক উঁচু দরজার মর্যাদা লাভ করতে পারে। ইমাম মালেক (রহ.) মুয়াত্তা কিতাবে বয়ান করেছেন যে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

قِيْلَ لِلُقْمَانَ مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرٰى يُرِيْدُوْنَ الْفَضْلَ؟ فَقَالَ لُقْمَانُ: صِدْقُ الْحَدِيْثِ وَاَدَاءُ الْاَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِيْنِيْ. (رواه مالك في المؤطا برقم ١٧٩٣)

অর্থাৎ, হযরত লুকমান হাকীমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কিভাবে মর্যাদার এত উঁচু স্তরে উপনীত হতে সক্ষম হলেন? তিনি উত্তরে বললেন, সত্যবাদিতা, আমানতদারী এবং অহেতুক কথা ও অহেতুক কাজকর্ম পরিত্যাগ করা দ্বারা।

এ রেওয়ায়েতে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে সত্যবাদিতা ও আমানতদারী সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় হল অহেতুক কথা ও অহেতুক কাজকর্ম পরিত্যাগ করা। এর দ্বারাও মানুষ জীবনে অনেক উন্নতি লাভ করতে পারে। যারা জীবনে অহেতুক কথা ও অহেতুক কাজকর্ম পরিত্যাগ করতে পারে তাদের জীবনের সময় কাজের কাজে লাগে, ফায়দার কাজে লাগে। যার ফলে তারা জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে। চিন্তা করলে আমরাও বুঝতে পারব, আমাদের জীবনের কত মূল্যবান সময় অহেতুক কথা-বার্তা ও অহেতুক কাজের পিছনে নষ্ট হয়। এই সময়গুলোকে কাজের কাজে লাগাতে পারলে, ফায়দার কাজে লাগাতে পারলে আমাদের জীবনের বহু উপকারে আসত। হযরত লোকমান হাকীম আগের যুগের এক বড় জ্ঞানী ও সাধক মানুষ ছিলেন। তিনি বলছেন তার জীবনে এত উঁচু মর্যাদা লাভের পশ্চাতে অহেতুক কথা ও অহেতুক কাজকর্ম পরিত্যাগ করারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

যাহোক এতক্ষণ পর্যন্ত হাদীছের দুই নম্বর বিষয় সত্যবাদিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

তিন নম্বর বিষয় হল উত্তম চরিত্র। গত জুমুআয় উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। উত্তম চরিত্র এসে গেলে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হওয়া যায়। উত্তম চরিত্র এসে গেলে কামেল মু'মিন হওয়া যায়। উত্তম চরিত্র এসে গেলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ব্যক্তি হওয়া যায়। উত্তম চরিত্র এসে গেলে জান্নাত লাভ করা যায়। শুধু কোন রকমে জান্নাত লাভ করা নয় বরং জান্নাতের উঁচু মর্যাদা লাভ করা যায়। যেহেতু উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদা নফল নামায ও নফল রোযার ছওয়াব পেতে থাকে এবং দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্রের ওজন সবচেয়ে বেশী হবে, তাই জান্নাতে সে উঁচু মর্যাদা লাভ করতে পারবে।

এ গেল হাদীছের তিন নম্বর বিষয় উত্তম চরিত্রের কথা।

চার নম্বর বিষয় হল খাদ্য-খাবার পবিত্র তথা হালাল হওয়া। শরীয়তে এ বিষয়টির গুরুত্ব অনেক। খাদ্য-খাবার হালাল হওয়া ইবাদত কবূল হওয়ার জন্য একটা শর্ত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا. (সূরা মুমিনূন : ৫১)

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! হালাল রিযিক গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।

এ আয়াতের মধ্যে দু'টো কথা বলা হয়েছে। একটা হল হালাল রিযিক গ্রহণ করা। দ্বিতীয় হল নেক আমল করা তথা ইবাদত করা। এখানে প্রথমে হালাল রিযিক গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, তারপর ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম -যারা কুরআনের ব্যাখ্যা জানেন- তারা বলেছেন, এই আয়াতে প্রথমে হালাল রিযিকের কথা তারপর নেক আমল বা ইবাদতের কথা বলে বোঝানো হয়েছে যে, ইবাদত বা নেক আমল কবূল হওয়ার জন্য হালাল রিযিক শর্ত। শর্ত আগে থাকে, তাই হলাল রিযিকের কথা আগে বলে বোঝানো হয়েছে যে, এটা হল শর্ত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হালাল রিযিক এত মৌলিক বিষয় যে, এক হাদীছে রিযিক হালাল না হলে জান্নাতেই যাওয়া যাবে না - এমন কঠোর কথাও বলা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِحَرَامٍ. (رواه أبو يعلى ورجال أبي يعلى ثقات. كذا في مجمع الزوائد برقم ١٨١٠٩)

অর্থাৎ, হারাম রিযিক দ্বারা লালিত-পালিত দেহ জান্নাতে যেতে পারবে না। হালাল রিযিক যেহেতু ইবাদত কবূল হওয়ার একটা শর্ত, অতএব হারাম রিযিক গ্রহণ করলে ইবাদত কবূল হবে না। আর ইবাদত কবূল না হলে কীভাবে জান্নাতে যাওয়া যাবে?

হারাম রিযিকের অনেক রকম ক্ষতি আছে। হারাম রিযিক গ্রহণ করলে ইবাদত কবূল হয় না। হারাম রিযিক গ্রহণ করলে ইবাদত করার জযবা বা আগ্রহও সৃষ্টি হয় না। হারাম রিযিক দ্বারা দিল শক্ত হয়ে যায়, কলব গাফেল হয়ে যায়, ইবাদতে মজা লাগে না, কল্‌বে নূর পয়দা হয় না, আখেরাতের দিকে মন রুজূ হয় না। হরাম রিযিক দ্বারা কল্‌ব অন্ধকার হয়ে যায়। আর কল্‌ব অন্ধকার হয়ে গেলে দ্বীনের কথা ভাল বুঝে আসে না, সহীহ্ ইল্‌ম আসে না। আমরা অনেক সময় দ্বীনের কথা শুনি, কিন্তু মনে ধরে না, যুক্তিতে ধরে না, বিবেচনায় ধরে না, মনের অস্পষ্টতা কাটে না, এটাই যে সঠিক কথা এবং ভাল কথা- মনের ভিতরে এরকম পরিষ্কার ধারণা আসে না। এটা হারাম রিযিকের কারণে হয়। হালাল রিযিক গ্রহণ করা হলে, দ্বীনের কথা শুনলে ভাল বুঝে আসবে, কল্‌বে নূর পয়দা হবে, যার ফলে যা শুনব মনের ভিতরে তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। দিলের মধ্যে এত্‌মিনান এসে যাবে যে, এটাই সঠিক, এটাই যথার্থ। এরকম দিলের এত্‌মিনান নিয়ে ইবাদত করলে ইবাদতে মজা লাগবে। কল্‌বে আল্লাহর এশ্‌ক মা'রেফাত পয়দা হবে। এভাবে হালাল রিযিকের অনেক ভাল প্রভাব আর হারাম রিযিকের অনেক খারাপ প্রভাব রয়েছে।

যাহোক যা বলা হচ্ছিল যে, হারাম রিযিক গ্রহণ করলে ইবাদত কবূল হয় না। হালাল রিযিক গ্রহণ করা ইবাদত কবূল হওয়ার জন্য শর্ত।

আজকের আলোচনার সারকথা হল– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানতদারী, সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র আর খাদ্য-খাবার হালাল হওয়া– এই চারটি বিষয় সম্পর্কে নসীহত করেছেন। এই চারটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমানতদারী এসে গেলে মানুষের দ্বীনী ও দুনিয়াবী সব দায়িত্ব ঠিকমত পালন করা এসে যাবে। আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব ও মানুষের দেয়া দায়িত্ব সব ঠিকমত পালন করা এসে যাবে। সত্যবাদিতা এসে গেলে বহু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। খাদ্য–খাবার হালাল হলে ইবাদত কবূল হবে, ইবাদত করতে মজা লাগবে, কলবে নূর পয়দা হবে। আর উত্তম চরিত্র এসে গেলে কামেল মু'মিন হওয়া যাবে, আল্লাহর রসূলের প্রিয়পাত্র হওয়া যাবে, জান্নাত লাভ করা যাবে। শুধু জান্নাত লাভ করা নয় বরং জান্নাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করা যাবে। দেখা গেল এই চারটি বিষয় এমন যে, এর দ্বারা দুনিয়া আখেরাত সবটার কল্যাণ অর্জিত হয়ে যায়। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রা.)কে নসীহত করে বলেছেন, তুমি এই চারটি গুণ অর্জন কর। তুমি যদি এই চারটি গুণ অর্জন করতে পার, তাহলে দুনিয়ার আর কিছু না পেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই হাদীছের নসীহত অনুযায়ী এই চারটি গুণ অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং- ১১

৫ টি বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قال قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَّاْخُذُ عَنِّيْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِهِنَّ؟ قُلْتُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ: اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ. وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ. (رواه أحمد برقم ٨٠٨١ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث جيد.)

মুসল্লিয়ানে কোরাম!

গত কয়েক জুমুআ যাবত আলোচনা করা হচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে নছীহতের কথা শুনতেন, উপদেশের কথা শুনতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তারা নছীহত চেয়ে নিতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ডেকে ডেকে উপদেশ দিতেন। বহু হাদীছের ভিতর এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ নছীহত করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সারা জীবনের সব কথাই তো নছীহত তথা উপদেশ। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে এসেছে, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ يَّاْخُذُ عَنِّيْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِهِنَّ؟ قُلْتُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, আমি পঁচটা নছীহতের কথা বলব। তোমাদের মধ্যে কে আমার থেকে পাঁচটা নছীহত গ্রহণ করতে আগ্রহী, শুনে নিজের তার উপর আমল করবে অথবা অন্তত অন্যকে আমল করতে শিখাবে? সাহাবায়ে কেরামের সকলেরই তো নছীহত শোনার আগ্রহ ছিল। তার মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আগে বেড়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এই পাঁচটা নছীহতের কথা গ্রহণ করতে আগ্রহী আছি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শোনার ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। আর নিয়ম হল যার আগ্রহ বেশী, সে মুখস্তও রাখতে পারে বেশী। যারা নছীহতের কথা আগ্রহ সহকারে শোনেন নছীহতের কথা তাদের মনে থাকে। আর যারা আগ্রহ সহকারে শোনেনা তাদের মনেও থাকে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন, কি করেন, সেটার প্রতি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর আগ্রহ খুব বেশী ছিল তিনি খুব আগ্রহ সহকারে শুনতেন এবং লক্ষ্য করতেন। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)। এবং তিনি নিজেও বলেছেন যে, অনেকে বলে আবূ হুরায়রা বেশী হাদীছ বয়ান করে, আমিতো বেশী হাদীছ বয়ান করবই, কারণ আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন, কি করেন তা মুখস্ত করা। মানুষের বিভিন্ন রকম কাজ ছিল, মুহাজিরদের ব্যবসা ছিল, আনসারী সাহাবীদের খেত-খামার ছিল, তাদের মাথায় এসবের ফিকির থাকত, আমার মাথায় তো কোন ফিকির ছিল না। ছিল মাত্র এক ফিকির। তাহল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন তিনি কি করেন। তাই আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা সবার চেয়ে বেশী মুখস্ত করেছি। তাই আমি হাদীছ বেশী বয়ান করতে পারি। দেখা গেল যার আগ্রহ বেশী তিনি মুখস্তও করতে পারেন বেশী, তার মনেও থাকে বেশী। যিনি নছীহতের কথা আগ্রহের সাথে শুনবেন, তার মনেও থাকবে বেশী, মুখস্তও হবে বেশী। শুধু মনে থাকবে আর মুখস্ত থাকবে তা নয় বরং তার কলবে আছরও পড়বে বেশী। যিনি আগ্রহের সাথে দ্বীনের কথা শোনেন, মনের জযবা-আবেগ নিয়ে শোনেন তার মধ্যে দ্বীনের কথায় যে রকম আছর হয়, গাফলতের সাথে, অমনোযোগিতার সাথে শুনলে সে রকম আছর হয়না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে এই পাঁচটি নছীহত শুনবে, শুনে তার উপর নিজে আমল করবে বা অন্তত অন্যকে আমল করতে শিক্ষা দিবে? অর্থাৎ, নিজে আমল করতে না পারলেও অন্তত অন্যকে শিক্ষা দিবে, তাতে অন্যরা আমল করলে সেই আমলের দাওয়াত বা শিক্ষা প্রদান করার জন্য দাওয়াত প্রদানকারী বা শিক্ষা দানকারীও সেই সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে।.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায় আমরা যা কিছু শিখব আমলের জন্যই শিখব। শুধু শেখার জন্য শিখব তা নয়, শুধু জানার জন্য জানব তা নয়, ইল্ম শিখার আসল উদ্দেশ্য হতে হবে আমল করা। ইলম শেখার পিছনে নিয়ত এই থাকবে যে, জানতে থাকব আর আমল করতে থাকব। জানা বাড়তে থাকবে আর আমল বাড়তে থাকবে। সাথে সাথে এই নিয়তও থাকবে যে, আমি নিজেও আমল করব অন্যকেও আমলের জন্য বলব।

এ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজে আমল না করলেও অন্তত অন্যদেররকে শিক্ষা দিবে। বোঝা গেল নিজের মধ্যে আমল না থাকলেও অন্যকে দাওয়াত দেয়া যায় বা অন্যকে বলা যায়। আমরা অনেক সময় কেউ আমাদেরকে নছীহত করলে আমরা উল্টো তাকে ধরে বসি যে, মিয়া তোমার নিজের মধ্যেই আমল নেই অন্যজনকে উপদেশ দিতে যাও কেন! এ রকম বলা ঠিক নয়। নিজের মধ্যে আমল না থাকলেও অন্যকে বলা যায়। নিজের মধ্যে আমল না থাকলেও অন্যকে উপদেশ দেয়া যায়। মুফতী শফী সাহেব (রহ.) তফসীরে মাআারিফুল কুরআনে লিখেছেন যে, নিজে আমল করা এটাও একটা ছওয়াবের কাজ, অন্যকে উপদেশ দেয়া বা অন্যকে আমলের জন্য বলা এটাও একটা ছওয়াবের কাজ। এখন আমি নিজে আমল করতে পারছি না আমার ভিতরে আসলের ত্রুটি আছে, এর অর্থ হল একটা ছওয়াবের কাজ আমি করতে পারলাম না। এজন্য আরেকটা ছওয়াবের কাজ অর্থাৎ, অন্যকে বলা এটাও আমি করতে পারব না তা তো ঠিক কথা নয়। আমি একটা ছওয়াবের কাজ করতে পারলাম না এজন্য আরেকটা ছওয়াবের কাজও করতে পারব না– এটা ঠিক কথা নয়। আমি আমল না করে একটা গোনাহ করলাম। একারণে আরেকজনকে বলা যে আমার ফরয ছিল সেই ফরয তরক করার গোনাহও আমাকে করতে হবে, এটা কী করে ঠিক নীতি হতে পারে? একটা গোনাহ করছি বলে আরেকটা গোনাহও করতে হবে এটাতো কোন কথা নয়। হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র হযরত হাসান (রা.) বলতেন যে, শয়তানতো মানুষকে ভাল কথা বলা থেকে এভাবেই বিরত রাখতে চায়। শয়তান মানুষের ভিতরে এই চেতনা এনে দেয় যে, আমি মানুষকে কী বলব নিজের মধ্যেই তো

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমল নেই? এভাবে সে অন্যকে বলা থেকে বিরত থাকে। এভাবে নছীহতের কথা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ যদি এই নীতির উপরে চলে আসে যে, আমার ভিতরে আমল না থাকলে আমি বলবই না। তাহলে দুনিয়াতে অনেক নছীহতই বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ কে এমন আছে, যে বলতে পারে আমার ভিতরে সবকিছুর আমল আছে। কিছুনা কিছু ত্রুটি সকলের মধ্যেই আছে। কাজেই আমার ভিতরে ত্রুটি থাকলে আমি অন্যকে উপদেশ দিতে পারব না একথা ঠিক নয়। এক হাদীছে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَاِنْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهٖ كُلِّهٖ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوْا عَنْهُ كُلِّهٖ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٧٥٧٠)

অর্থাৎ, তোমরা অন্যকে ভাল কাজের কথা বল যদিও তোমার নিজের মধ্যে সে আমলের ত্রুটি থাকে। আর অন্যকে খারাপ কাজ থেকে বারণ কর, যদিও তুমিও নিজে একাজ থেকে বিরত থাকতে পারছ না।

তবে একথা উদ্দেশ্য নয় যে, আমার আমল করার দরকার নেই আমি শুধু অন্যকে উপদেশ দিয়েই যাব। এরকম করলে উপদেশের আছর হবে না। আমার মধ্যে যে বিষয়ে আমল আছে ঐ বিষয়ে আমি অন্যকে নছীহত করলে মানুষে সে নছীহত মানবে। আর যখন আমার নিজের মধ্যে আমল থাকবে না, তখন অন্যকে বললে তারা খুব একটা মানবে না।

যাহোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, কে আছে আমার থেকে পাঁচটি নছীহত গ্রহণ করবে, তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ আপনার এই পাঁচটা কথা গ্রহণ করার জন্য আমি অবূ হুরায়রা প্রস্তুত। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা শুরু করলেন যে, সেই পাঁচটি নছীহত এই–

১নং নছীহত হল–

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ.

অর্থাৎ, গোনাহের কাজ থেকে তথা খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। তাহলে তুমি হবে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুই ধরনের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিছু হল করার দায়িত্ব আর কিছু হল না করার দায়িত্ব। যেগুলি ছওয়াবের কাজ সেগুলি করা দায়িত্ব, আর যেগুলি গোনাহের কাজ সেগুলি না করা অর্থাৎ, সেগুলি থেকে বিরত থাকা দায়িত্ব। এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার দায়িত্বের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে বেশী। অর্থাৎ, গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার উপরে জোর বেশী দেয়া হয়েছে। মুহাদ্দিছীনে কেরাম অর্থাৎ, হাদীছ বিশারদগণ, যারা হাদীছের ব্যাখ্যা দেন, তারা এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করার কাজের উপরে গুরুত্ব না দিয়ে, না করার কাজ থেকে বিরত থাকার উপরে অর্থাৎ, গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার উপর জোর দিয়েছেন। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটা কারণ হল আমরা সাধারণত মনে করি করার কাজটাই হল ইবাদত। গোনাহ থেকে বিরত থাকাও যে ইবাদত তা আমরা মনে করি না। যেমন নামায পড়া, রোযা রাখা, হজ্জ করা, যাকাত দেয়া, নফল ইবাদত বন্দেগী করা, যিকির-আযকার করা, এগুলোকে আমরা ইবাদত মনে করি। কিন্তু আমার জীবনে প্রতিটা পদে পদে অহরহ অসংখ্য গোনাহ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হয়ে যাচ্ছে, আমি একজন ইবাদতকারী হিসেবে সেই সব গোনাহ থেকে বিরত থাকাও যে, আমার দায়িত্ব তা আমরা মনে করছি না। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিকটার প্রতি জোর দিয়ে বলেছেন, গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাক, তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হতে পারবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা দ্বারা দুটো বিষয় বুঝিয়েছেন। এক হল গোনাহ থেকে বিরত থাকাও ইবাদত। দুই হল গোনাহ থেকে বিরত থাকা বড় ইবাদতকারী হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। বোঝা গেল গোনাহ থেকে বিরত থাকার প্রতি জোর দেয়া চাই।

চিন্তা করলে বোঝা যায় এক ব্যক্তি ফরয ইবাদত করে, সাথে সাথে নফল নামায, নফল যিকির-আযকার, তিলাওয়াত ইত্যাদি অনেক নফল কাজ করে, কিন্তু গোনাহ থেকে বিরত থাকে না, বিভিন্ন রকম গোনাহে লিপ্ত হয়। আরেক ব্যক্তি শুধু ফরয দায়িত্বটুকু পালন করে, আর গোনাহ থেকে বিরত থাকে, নফল ইবাদত তার তেমন একটা নেই। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই উত্তম। কেননা, যদিও তার নফল ইবাদত খুব বেশী নয়, কিন্তু যেহেতু সে গোনাহ থেকে বিরত থাকে, তাই যখন তার হিসাব হবে তখন তার নফল তেমন একটা না থাকলেও ফরয দায়িত্বগুলো ঠিক থাকার কারণে সে আঁটকাবে না। আর প্রথমজনের নফল ইবাদত খুব থাকলেও গোনাহের পাল্লা ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই আমাদের জীবনে ইবাদত করার সাথে সাথে গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা খুব বেশী জরুরী। ইবাদতের উপর যেমন জোর দেয়া চাই, তার চেয়ে বেশী জোর দেয়া চাই গোনাহ থেকে বিরত থাকার উপর।

এই হল প্রথম নছীহত। এটা হল ইবাদত সম্পর্কিত একটা নছীহত। জীবনকে গোনাহ মুক্ত রাখার নছীহত।

২ নং নছীহত হল–

وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে ধন-সম্পদ ইত্যাদি যা দিয়েছেন তার উপরে সন্তুষ্ট থাকবে। তাহলে মনের দিক থেকে তুমি ধনী হতে পারবে, তোমার মন থেকে অভাব বোধ দূর হয়ে যাবে।

আমাদের স্বভাব হল আমরা নিজেদের যা কিছু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট নই। বরং আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে অভাবী মনে করি। আমাদের শুধু মনে হয় এই নেই, সেই নেই, অমুকের এত আছে আমার নেই। আবার অমুক যার নিকট অনেক আছে বলে আমি মনে করছি, সেও আরও উপরের দিকে তাকিয়ে মনে করছে যে, অমুকের কত কিছু আছে আমারতো তা নেই। এভাবে যার যতই থাকুক না কেন প্রত্যেকের মধ্যেই এই অনুভূতি কাজ করছে যে, আমি অভাবী, আমার নেই। নেই নেই বোধটা সকলের মধ্যে রয়েছে, কেউই যা আছে তা নিয়ে পুরো সন্তুষ্ট নই। ইল্লা মা শাআল্লাহ দুই একজন ব্যতিক্রম রয়েছে বৈকি?

এ হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহ রিযিক বন্টন করে দিয়েছেন যার নসীবে যতটুকু আছে আল্লাহ তা দিয়ে দিয়েছেন, অতএব যা পাওয়া গেছে তা নিয়েই রাজি থাকতে হবে। মনের মধ্যে এই উপলব্ধি থাকতে হবে যে, আলহামদুলিল্লাহ্ যতটুকু পেয়েছি তাতেই আমি রাজি। তবে রাজি থাকার অর্থ এই নয় যে, যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশীর জন্য চেষ্টা করা যাবেনা, বরং রিযিক আল্লাহর অনুগ্রহ সেই অনুগ্রহ সন্ধান করার হুকুম আছে। ধন-সম্পদ আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করা নিষেধ নয়। তবে সন্ধানের পর, চেষ্টা মেহনত করার পর যতটুকু আল্লাহ দেন তাতে রাজী থাকতে হবে। মনে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করতে হবে যে, এতটুকুই আল্লাহ আমাকে দিতে চান এর মধ্যেই আল্লাহ আমার জন্য কল্যাণ রেখেছেন, এর চেয়ে বেশী হওয়ার মধ্যে আমার কল্যাণ নেই। যদি আরও বেশী পাওয়ার মধ্যে কল্যাণ থাকত, তাহলে আল্লাহ পাক তা-ই করতেন। কারণ, আল্লাহ পাক কোন বান্দার অকল্যাণ চান না। যতটুকু পেয়েছি ততটুকুতে রাজী খুশী থাকলেই মনের অভাব কেটে যাবে। আসল অভাব হল মনের অভাব। তাই এক হাদীছে বলা হয়েছে,

اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, মনের ধনাঢ্যতাই হল আসল ধনাঢ্যতা।

এ হাদীছ থেকে বোঝা যায় যার মন ধনী সে ধনী, আর যার মন গরীব সে গরীব। সম্পদ থেকেও সে গরীব। যাহোক যা কিছু আল্লাহ পাক আমাকে দিয়েছেন তার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটা করলেই মনের অভাব দূর হয়ে যাবে। এরূপ করতে পারলে অর্থনৈতিক সমস্যার বিরাট সমাধান বের হয়ে আসবে। অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অভাব দূর করা। এই অভাব দূর করার একটা বিশেষ পন্থা এ হাদীছে বলে দেয়া হয়েছে। প্রথম নম্বর নছীহত ছিল ইবাদতের সাইডে, আর এই দ্বিতীয় নম্বর নছীহত হল অর্থনৈতিক সাইডে।

৩ নং নছীহত হল–

وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا.

অর্থাৎ, তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তুমি হবে খাঁটি মু'মিন।

হাদীছের এই অংশে বোঝানো হয়েছে শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী করেই খাঁটি মু'মিন হওয়া যায় না। কারও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী ঠিক, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভাল নয়, প্রতিবেশীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নয়, মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহার ভাল নয় তাহলে সে খাঁটি মু'মিন নয়। খাঁটি মু'মিন হতে গেলে ঈমান-আমলের সাথে সাথে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার ভাল হতে হবে, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ভাল থাকতে হবে। আর এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. (صحيح البخاري رقم ٦٠١٩)

অর্থাৎ যে আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি খাঁটি মু'মিন হতে চায় সে যেন তার আশে পাশের লোকজনের সাথে অর্থাৎ, প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে।

যাহোক এসব হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, খাঁটি মু'মিন হওয়ার জন্য ইবাদত-বন্দেগীর সাথে সাথে সমাজ-সামাজিকতাও দোরস্ত করতে হবে। এই তৃতীয় নম্বর নছীহত হল সমাজ-সামাজিকতার সাইড নিয়ে নছীহত।

৪ নং নছীহত হল–

وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ.

অর্থাৎ, যা তুমি নিজের জন্য ভালবাসবে, অন্যের জন্যও তার অনুরূপ ভালবাসবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

তুমি যেমন চাও আমার সচ্ছলতা হোক, আমি নিরাপদে থাকি, আমার ছেলে মেয়েরা ভাল লেখা-পড়া করুক, ভাল চাকুরী পাক, প্রতিষ্ঠিত হোক। আমার ছেলে মেয়েদের ভাল বিবাহ হোক। আমার ও আমার ছেলে মেয়েদের সুনাম-সুখ্যাতি হোক ইত্যাদি। তুমি নিজের জন্য যেমন এগুলি চাও আরেক মুসলমানের জন্যও তোমাকে এরকম চাইতে হবে। যদি এরকম না হয়ে উল্টো হয় যে, আমি আরেক জনের ক্ষতির চিন্তা করি, আরেকজনের ভাল হতে দেখলে আমার ভিতর হিংসা লাগে, প্রতিবেশীর মেয়ের ভাল জায়গায় বিবাহ হচ্ছে দেখে হিংসা লাগল এবং কামনা করলাম যে, যদি কোন রকমে একটা প্যাঁচ লেগে বিবাহটা ভেঙ্গে যেত। এরকম হলে আমি খাটি মু'মিন নই। খাঁটি মু'মিনের চিন্তা-চেতনা এরকম হবে না। তার চিন্তা থাকবে সকলের কল্যাণের চিন্তা।

এই নছীহতের মধ্যে মানুষের মনকে উদার করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মন থেকে হিংসা ও সংকীর্ণতা দূর করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। পরস্পরে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা বোধ সৃষ্টি করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানুষকে পর নয় বরং সমস্ত মানুষকে আপন করে ভাববার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতএব এই চতুর্থ নছীহত হল মনের চিন্তা-চেতনা ও মনস্তত্ব বিষয়ক একটি নছীহত। এটা হল মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও সুবন্ধন গড়ে তোলার নছীহত।

৫ নং নছীহত হল–

وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

অর্থাৎ বেশী হাসবে না, কারণ বেশী হাসলে কলব মরে যাবে।

এখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলবকে জিন্দা রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কলব কি জিনিস, তা আমরা স্পষ্ট করে বুঝি না। তবে এতটুকু অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারি যে, কলব বা অন্তর বলে একটা জিনিস ভেতরে আছে। কলব বস্তু জগতের কোন জিনিস নয়। কলব হল উর্ধ্ব জগতের জিনিস। যখন কলব ভাল থাকবে তখন উর্ধ্ব জগতের কথা অর্থাৎ, কুরআন হাদীছের কথা ভাল লাগবে। যখন কলব ভাল থাকবে তখন উর্ধ্ব জগতের আমল তথা ইবাদত-বন্দেগী ভাল লাগবে। যখন কলব ভাল থাকবে তখন উর্ধ্ব জগতের আমল তথা ইবাদত-বন্দেগীর স্প্রীহা আসবে। যার কলব যিন্দা থাকবে, তার কলবের মধ্যে ঈমান-আমলের চেতনাও জাগ্রত থাকবে। যার কলব মরে যাবে তার কলবে ঈমান-আমলের চেতনা জাগ্রত থাকবেনা, সেই কলবে ঈমান-আমলের স্প্রীহা আসবে না। এই কলব মরে যাওয়ার অনেক গুলি কারণ রয়েছে, তার মধ্যে একটা কারণ হল বেশী হাসা। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নছীহত করে বললেন যে, বেশী হাসবে না, বেশী হাসলে কলব মরে যাবে।

মু'মিন ব্যক্তি কলবকে জিন্দা রাখার ব্যাপারে যত্নবান থাকবে, তাই সে বেশী হাসতে পারে না। বেশী হাসা মু'মিনের কাজ নয় এটা হল কাফের মুনাফেকদের কাজ। কাফের মুনাফেকরা বেশী হাসত, তাই কুরআনে কারীমে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا . (সূরা তওবা: ৮২)

অর্থাৎ, তারা এখন বেশী হাসছে, কাঁদছে কম। কিন্তু তারা ভবিষ্যতে অর্থাৎ, পরকালে হাসবে কম কাঁদবে বেশী। এ আয়াতের অর্থ এরূপও করা যায় যে, মানুষ যেন হাসে কম, কাঁদে বেশী।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যার মধ্যে পরকালের চিন্তা আছে সে বেশী হাসে কী করে? আখেরাতের ফিকির এবং আযাবের ভয়ে তার তো হাসি আসার কথা নয়। মু'মিন বান্দার অন্তরে থাকবে আখেরাতের ফিকির, জাহান্নামের ভয়, জান্নাত পাওয়ার আশা। এসব চিন্তায় তার অন্তর থাকবে ভরা। এগুলো থাকলে হাসি আসবে কী করে? এসব চিন্তায় সর্বক্ষণ তার চিন্তামগ্ন থাকার কথা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকতেন। কখনও হাসলেও সে হাসি হত মুচকি হাসি, অট্ট হাসি নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হাদীছে এসেছে–

كَانَ لَا يَضْحَكُ اِلَّا تَبَسُّمًا. (شمائل الترمذي)

অর্থাৎ, তিনি মুচকি হাসি ছাড়া কখনও অট্টহাসি দিতেন না।

মানুষের সঙ্গে সদাচার, সৎ ব্যবহার, সৌজন্য এই সমস্ত নীতি আছে ইসলামে। এ জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার সাথেই দেখা হত, তাকে প্রফুল্লতার সাথে গ্রহণ করতেন, দেখা হলে মুচকি হাসি দিতেন। কিন্তু হো হো শব্দ হয় এরকম অট্টহাসি কখনও হাসেননি।

যাহোক বলা হচ্ছে বেশী হাসলে কলব মরে যায়। কলবকে যিন্দা রাখতে হলে বেশী হাসা পরিত্যাগ করতে হবে। বেশী বেশী যিকির করলে কালব যিন্দা থাকে, যিকির পরিত্যাগ করলেও কলব মরে যায়। যিকির অনেক বাক্যে হতে পারে। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাও যিকির, আল্লাহ আল্লাহ বলাও যিকির, সুবহানাল্লাহ, আল হামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এগুলি বলাও যিকির। এগুলি হল মুখের যিকির। আর দ্বীনের কথা চিন্তা করা, আখেরাতের কথা চিন্তা করা, আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের কথা চিন্তা করা, আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা– এগুলি হল কলবের যিকির। এই সব যিকির দ্বারা কলব জিন্দা থাকে। এসব যিকির পরিত্যাগ করলে কলব মরে যায়। যে যত বেশী যিকির করবে, তার কলব তত জিন্দা হবে, আর যে যত বেশী যিকির পরিত্যাগ করবে, তার কলব তত মুর্দা হতে থাকবে। এই পঞ্চম নছীহতটাও আত্মা সম্পর্কিত একটা নছীহত।

সারকথা– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটা নছীহত করেছেন। যিন্দেগীর গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটা সাইড নিয়ে পাঁচটা নছীহত করেছেন। ইবাদতের সাইডে বলেছেন, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে। অর্থনৈতিক সাইডে বলেছেন, যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে। সামাজিক সাইড নিয়ে বলেছেন, মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে। আর আত্মার সাইড নিয়ে বলেছেন, মনকে উদার করতে, হিংসা পরশ্রীকাতরতা পরিত্যাগ করতে এবং আত্মাকে জিন্দা রাখতে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই পাঁচটা নছীহতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং -১২

৬ টা বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا. وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلٰثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلٰثٌ مُهْلِكَاتٌ. فَاَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَوْلُ الْحَقُّ فِى الرِّضَا وَالسَّخَطِ. وَالْقَصْدُ فِى الْغِنٰى وَ الْفَقْرِ، وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهُوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِيَ اَشَدُّهُنَّ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٧٢٥٢ والحديث حسن بشواهده.)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত কয়েক জুমুআ যাবত আলোচনা করা হচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে নছীহতের কথা শুনতেন, উপদেশের কথা শুনতেন। তাঁরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নছীহত চেয়ে নিতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ডেকে ডেকে উপদেশ দিতেন। বহু হাদীছের ভিতর এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় মানুষকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নছীহত করেছেন। তার মধ্যে বায়হাকী শরীফের এক হাদীছে এসেছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

ثَلٰثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلٰثٌ مُهْلِكَاتٌ.

অর্থাৎ, তিনটা বিষয় এমন আছে যা মানুষকে মুক্তি দেয়, আর তিনটা বিষয় এমন আছে যা মানুষকে ধ্বংস করে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিনটা তিনটা মোট ছয়টা বিষয়ের কথা বললেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টা বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন,

فَاَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَوْلُ الْحَقُّ فِى الرِّضَا وَالسَّخَطِ. وَالْقَصْدُ فِى الْغِنٰى وَالْفَقْرِ.

অর্থাৎ, যে তিনটা বিষয় মানুষকে মুক্তি দেয় তা হল– গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা, পছন্দ অপছন্দ সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করে দেয়া এবং স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা সর্বাবস্থায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণ করা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে মুক্তির তিনটা বিষয় বলেছেন। তার মধ্যে

১ নং বিষয় হল– গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা। আল্লাহর ভয়কে আরবীতে বলা হয় "তাকওয়া"। সর্বাবস্থায় মনের মধ্যে এই তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখতে বলা হয়েছে, তাহলে মুক্তি পাওয়া যাবে। কিসের থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? পাপ থেকে মুক্তি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পাওয়া যাবে, তার ফলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এমনকি তাকওয়া থাকলে অভাব অনটন ও বিপদাপদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে।

তাকওয়া বা খোদাভীতি থাকলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়– এ বিষয়টা একটু চিন্তা করলেই সহজে বুঝে আসে। মানুষের মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে সে কোন পাপ করতে পারে না। কেননা পাপ করতে গেলেই তার মনে আল্লাহর ভয় তথা আল্লাহর আযাবের ভয় জাগ্রত হয়ে ওঠে। তখন আযাবের ভয় তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে। আযাবের ভয় তাকে সঠিক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে তাকওয়া বা খোদাভীতি দ্বারা আমল দোরস্ত হয় এবং পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীতি না থাকলে তাকে গোনাহ ও অপরাধ থেকে বিরত রাখা প্রায় অসম্ভব। আইন করে, শাস্তি দিয়ে মানুষকে কিছুটা ভাল রাখা সম্ভব হলেও পুরোপুরি ভাল রাখা সম্ভব নয়। কারণ, একান্ত কেউ অপরাধ করতেই চাইলে আইনের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে, শাসনের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়েও অন্যায় করতে পারে। কিন্তু যার মধ্যে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর ভয় এসে যায়, সে কোনভাবেই কোন স্থানেই অন্যায় করতে পারবে না, কেননা, আল্লাহর চক্ষুকে ফাঁকি দেয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই অন্যায় অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে চাইলে তার জন্য খোদাভীতির চেয়ে বেশী কার্যকরী আর কিছু নেই।

তাকওয়া থাকলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং আমল দোরস্ত হয়– এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল, তাহলে তোমাদের আমল দোরস্ত হবে এবং আল্লাহ তোমাদের গেনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা আহযাবঃ ৭০-৭১)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় তাকওয়া অবলম্বন করলে এবং সঠিক কথা বললে মানুষের আমল দোরস্ত হয়। সঠিক কথা বলা অর্থ মিথ্যা কথা না বলা, সত্যের বিরুদ্ধে কথা না বলা, বাস্তবতার বিরুদ্ধে কথা না বলা, বরং যা বাস্তব তাই বলা। যদি মানুষের মধ্যে এই গুণ এসে যায়, তাহলে মানুষ খাঁটি হতে পরবে। পক্ষান্তরে মিথ্যা কথা বললে, অবাস্তব কথা বললে তার আমল খারাপ হয়ে যাবে। কারণ একটা মিথ্যা কথা বললে সেটাকে ঢাকা দেয়ার জন্য তাকে আরও অনেক মিথ্যা কথা বলতে হবে, আরও অনেক অন্যায় তাকে করতে হবে। এভাবেই একটা গোনাহ্ মানুষকে আর বহু গোনাহের দিকে টানতে থাকে। পক্ষান্তরে একটা নেক কাজ মানুষকে আরও বহু নেক কাজের দিকে টানে। যেমনঃ কেউ যদি ইসলামী লেবাস-পোশাক পরিধান করে, দাঁড়ী টুপি রাখে, তাহলে অনেক অন্যায় সে করতে পারবে না। কারণ ঐ পোশাক, দাড়ি, টুপি তাকে বাঁধা দিবে যে, এই লেবাস-পোষাক নিয়ে, এই দাড়ি টুপি নিয়ে তুমি কীভাবে এসব কাজ করতে পার ? এই লেবাস-পোশাক এবং দাড়ি টুপি তাকে অনেক নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। যেমন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে মনে হবে আমি এরকম ইসলামী লেবাস-পোশাকধারী মানুষ, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, আমি নামায না পড়ে কিভাবে থাকব, মানুষে বলবে কি ? যদিও মানুষের চিন্তায় নামায পড়া ইখ্লাছের পরিপন্থী। এটা রিয়া, তবুও রিয়া সহকারে নেক কাজ করতে করতে এক সময় সে ঐ নেক কাজের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং এক সময় ইখ্লাছ এসে যাবে। তাই রিয়ার সাথে নেক কাজ করাও একেবারে ফায়দা থেকে খালি নয়। রিয়াও আস্তে আস্তে ইখ্লাসে পরিণত হয়। যাহোক বলা হচ্ছিল তাকওয়া থাকলে আমল দোরস্ত হয়,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

তাকওয়া থাকলে গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া গেলে জান্নাত লাভ করা যায়।

তাকওয়া থাকলে অভাব-অনটন থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়, ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়– এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

অর্থাৎ, যে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা হতে রিযিক প্রদান করেন যার সে ধারণাও করতে পারে না। (সূরা তালাকঃ ২-৩)

মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইবনে হিব্বান কিতাবে একটি হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اٰيَةً لَوْ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ. وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا، وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (رواه أحمد حديث رقم ١٧٨/٥، وابن حبان برقم ٦٦٦٩)

অর্থাৎ, আমি এমন একটি আয়াত জানি, যদি লোকেরা তার উপর আমল করত, তাহলে তাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট হত। তারপর তিনি বললেন, আয়াতটি হল–

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

দেখা গেল তাকওয়া বা খোদাভীতি দ্বারা অনেক পাপ ও ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে তিনটি জিনিস মানুষকে মুক্তি দেয় তার মধ্যে একটা হল তাকওয়া বা খোদাভীতি।

২ নং বিষয় হল– পছন্দ অপছন্দ সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করে দেয়া। সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করা দ্বারাও মুক্তি পাও। কিসের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? **ন্যায়কে গোপন করা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়,** যারা সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত, তারা ন্যায্য কথা বলতে দ্বিধা করে না, ফলে ন্যায়কে গোপন করার পাপ থেকে তারা মুক্তি পায়। সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করা দ্বারা **স্বজন প্রীতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়,** যারা সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত, আপনজনের বিরুদ্ধে গেলেও সত্য কথা বলতে এবং সত্য সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে তাদের কোন দ্বিধা হয় না, ফলে তারা স্বজনপ্রীতির অপরাধ থেকে মুক্তি পায়। সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত হলে **মানুষের চেহারা দেখে সত্য কথাকে চাপা দেয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।** যারা সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত, তারা কারও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না, সত্য কথা বললে অমুকে অসন্তুষ্ট হবে, এর কোন পরওয়া তারা করে না। ফলে কারও চেহারা দেখে সত্য কথা না বলে চেপে যাওয়ার অন্যায় থেকে তারা মুক্তি পায়। সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত হলে **লোভের বশবর্তী হয়ে বা কারও ভয়ে ভীত হয়ে ন্যায়কে বর্জন করা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।** যারা সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত, তারা সত্য কথা ব্যক্ত করতে বা সত্য পথে চলতে কোন স্বার্থের চিন্তা করে না কিংবা কারও ভয়েরও চিন্তা করে না। ফলে তারা লোভের বশবর্তী হয়ে বা কারও ভয়ে ভীত হয়ে ন্যায়কে বর্জন করা থেকে মুক্তি পায়। দেখা গেল সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত হলে অনেক পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে তিনটি জিনিস মানুষকে মুক্তি দেয় তার মধ্যে আর একটা হল পছন্দ অপছন্দ সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করে দেয়া। সত্য কথা বলতে যেয়ে কে পছন্দ করল আর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কে অপছন্দ করল তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা চাই। বরং অকপটে কারও চেহারার দিকে না তাকিয়ে যেটা সত্য সেটা ব্যক্ত করে দেয়া চাই।

তবে এখানে একটা কথা মনে রাখা চাই। তাহল– কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে, কারও পছন্দ অপছন্দের দিকে না তাকিয়ে সত্য কথা বলতে হবে, এর অর্থ এই নয় যে, কথার মধ্যে কোন আদব লেহাজও থাকবেনা, কথার মধ্যে কোন রস-কষও থাকবেনা, বরং রুক্ষ এবং কর্কষ ভাষায় বলতে হবে। অবশ্যই মুরব্বী ও গুরুজনের সামনে কোন সত্য কথা বলতে গেলে যদি তাদের মর্যাদায় আঘাত লাগার মত হয় তাহলে এমনভাবে তা ব্যক্ত করতে হবে যাতে সত্য কথাটিও বলা হয়ে যায় আবার তাদের মর্যাদায় আঘাত দেয়াও যথাসম্ভব এড়ানো যায়। অনেকে বিষয়টা বুঝতে ভুল করে, তারা বলে থাকে যে, সত্য কথা বলে দিব, কে কি মনে করল তার কোন পরওয়া নেই। কথাটি সত্য। সত্য কথা ব্যক্ত করতে কারও পরওয়া না থাকাই উচিত। কিন্তু তাই বলে এমনভাবে বলতে হবে কেন যে, মুরব্বী ও গুরুজনদের আদব লেহাজ রক্ষা পাবে না, রুক্ষভাবে কেন বলতে হবে? মুরব্বী ও গুরুজনদের আদব রক্ষা করাও শরীয়তের একটা বিধান। রুক্ষভাবে নয় কোমলভাবে দাওয়াত পেশ করাও শরীয়তের একটা বিধান। এই বিধানগুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখা চাই। সব বিধানগুলির মাঝে সমন্বয় করে চলতে হবে।

৩ নং বিষয় হল– স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা সর্বাবস্থায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণ করা। মধ্যপন্থা গ্রহণ করার অর্থ হল ব্যয়ের ক্ষেত্রে কমীও না করা বেশীও না করা। ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হলেও মুক্তি পাওয়া যায়। কিসের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? অপব্যয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, অমিতব্যয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যয় না করার কার্পণ্য থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অপব্যয় করার অর্থ হল যেখানে ব্যয় করার অনুমতি নেই সেখানে ব্যয় করা। যেমন নাজায়েয কাজে ব্যয় করা, গোনাহের কাজে ব্যয় করা। আর অমিতব্যয়ের অর্থ হল জায়েয স্থানে ব্যয় করা তবে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা। আর কার্পণ্য বা বখীলী হল প্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োজনের চেয়ে কম ব্যয় করা। শরীয়তে অপব্যয়, অমিতব্যয় এবং কার্পণ্য সবই নিষিদ্ধ। কুরআনে কারীমে সূরা বানী ইসরাঈলের ২৭ নং আয়াতে অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ. (সূরা বানী ইসরাঈল: ২৭)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।

সূরা বানী ইসরাঈলের ২৯ নং আয়াতে অমিতব্যয় এবং কার্পণ্য উভয়টি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

যারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থায় অভ্যস্ত তারা অপব্যয়, অমিতব্যয় এবং কার্পণ্য সবটা থেকে রক্ষা পায় এবং এগুলির গোনাহ থেকে মুক্তি পায়।

এই হল মোট তিনটা বিষয় যা মানুষকে মুক্তি দেয়। সর্বাবস্থায় তাকওয়া, সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করে দেয়া এবং সর্বাবস্থায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণ করা– এই তিনটি জিনিস মানুষকে মুক্তি দেয়। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِيَ اَشَدُّهُنَّ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, আর যে তিনটা বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে তাহল– খাহেশাতে নফছানীর অনুসরণ, মনের কার্পণ্য অনুযায়ী কাজ করা এবং নিজের মনে গর্ব বোধ করা। এই শোষোক্তটা হল সবচেয়ে মারাত্মক।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ধ্বংসের তিনটি বিষয় বলেছেন। তার মধ্যে–

১ নং বিষয় হল– খাহেশাতে নফছানীর অনুসরণ। খাহেশাতে নফছানী কথাটার অর্থ হল প্রবৃত্তির চাহিদা, মনের খারাপ চাহিদা। অর্থাৎ, শরীয়ত পরিপন্থী যা কিছু মনে চায় তাই হল খাহেশাতে নফছানী। এই খাহেশাতে নফছানীর অনুসরণ মানুষকে ধ্বংস করে। কারণ খাহেশাতে নফছানীর কারণেই মানুষ সব পাপ করে। খাহেশাতে নফছানী হল সমস্ত পাপের মূল। মানুষ যত পাপ করে, তা হয়তো পেটের খাহেশাতের কারণে করে বা যৌন খাহেশাতের কারণে করে। তাই খাহেশাতে নফছানী হল সমস্ত পাপের জড়। অতএব কেউ যদি খাহেশাতে নফছানীর অনুসরণ করে তাহলে সে সত্য পথ থেকে সরে যাবে, তাহলে সে পাপের মধ্যে পড়ে যাবে, তাহলে সে ধ্বংস হবে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে তার মধ্যে একটা হল খাহেশাতে নফছানীর অনুসরণ।

২ নং বিষয় হল– মনের কার্পণ্য অনুযায়ী কাজ করা। স্বভাবগত ভাবে সকলের মধ্যেই কম বেশী বখীলী বা কার্পণ্য থাকে। এই কার্পণ্যের কারণেই মানুষ আত্মীয়-স্বজন গরীব হলেও নিজের থাকা স্বত্ত্বেও তাদেরকে দেয় না, এই কার্পণ্যের কারণেই মানুষ যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকে, এই কার্পণ্যের কারণেই মানুষ হজ্জ করা থেকে বিরত থাকে, এই কার্পণ্যের কারণেই মানুষ দান-সদকা করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে কার্পণ্যের কারণে মানুষ অনেক পাপে জড়িত হয়ে পড়ে। এভাবে কার্পণ্য মানুষকে ধ্বংস করে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে তার মধ্যে আর একটা হল মনের কার্পণ্য অনুযায়ী কাজ করা তথা বখীলী করা।

৩ নং বিষয় হল– গর্ব বোধ করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা হল সবচেয়ে মারাত্মক। অর্থাৎ, যে তিনটা বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে তার মধ্যে গর্ব বা অহংকারটা হল সবচেয়ে মারাত্মক। এটা মানুষকে সবচেয়ে বেশী ধ্বংস করে। সবচেয়ে বড় ধ্বংস হয়েছে ইবলীছ শয়তান। তার ধ্বংসের কারণ ছিল অহংকার। অহংকারই তাকে গোমরাহ করেছিল, অহংকারই তাকে কাফের বানিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.)কে তৈরী করে হুকুম দিয়েছিলেন, আদমকে সাজদা কর, তখন ইবলীস সাজদা করেনি। তার ভিতরে অহংকার এসে গিয়েছিল যে, আমি আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী। আমি আদমের সামনে নত হতে পারি না। এই অহংকারে সে আল্লাহ্‌র হুকুমকে অমান্য করল এবং কাফের হয়ে গেল। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ. (সূরা বাকারা: ৩৪)

অর্থাৎ, সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে অহংকারই ছিল তার অস্বীকার করা এবং কাফের হওয়ার কারণ। এই অহংকারই তাকে কাফের বানাল, এই অহংকারই তাকে উঁচু মর্যাদা থেকে নীচে নামিয়ে দিল। তাকে লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত বানালো। শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

تکبر عزازیل را خوار کرد + بزندان لعنت گرفتار کرد

অর্থাৎ, অহংকারই আযাযীলকে অর্থাৎ, ইবলীসকে লাঞ্ছিত করল, অহংকারই তাকে অভিশাপের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করল।

দেখা গেল অহংকার এতই খারাপ যে, অহংকারের ফলে মানুষ কুফরী পর্যন্ত করে বসে। অহংকারের কারণে মানুষ সত্যকে অস্বীকার করে বসে। কেউ অহংকার রোগে আক্রান্ত হলে সে কারও উপদেশ গ্রহণ করে না, কারও সৎপরামর্শও গ্রহণ করে না। আত্মগরিমার কারণে সে অন্যের ভাল উপদেশ ও সৎপরামর্শকে অগ্রাহ্য করে বসে। অহংকার রোগ হক ও সত্য গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা। যখন মানুষের মধ্যে অহংকার আসে, তখন সে অনেক সময় সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। আত্মগরিমার কারণে সে সত্যকে অস্বীকার করে বসে। এমনকি মহান আল্লাহকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে, এমনকি নিজে খোদায়ী দাবী করে বসে। ফিরআউন আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে বসেছিল, সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করে বসেছিল। ক্ষমতা এবং দাপটের অহংকারেই সে নিজেকে খোদা বলে বসেছিল। কারূন ধন-সম্পদের অহংকারে খোদার অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, সে ধন-সম্পদকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মনে করেনি বরং এর কারণে নিজেকে বড় মনে করে বসেছে এবং এর অহংকারে খোদাকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ. (সূরা কাসাস: ৭৬)

অর্থাৎ, কারূন ছিল মূসা-এর বংশধর। সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাকে এত সম্পদ দিয়েছিলাম যে, সম্পদের ভান্ডারগুলোর চাবি তুলতে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন হত।

যাহোক অহংকার এতই ক্ষতিসাধন করে যে, খোদার অবাধ্য করে তোলে, কাফের পর্যন্ত বানিয়ে দেয়, তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে তিনটা জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে, তাহল খাহেশাতে নফছানীর অনুসরণ, বখীলী এবং অহংকার, তবে এই তিনটার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল অহংকার।

সারকথা– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট ছয়টা বিষয়ে নছীহত করেছেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা, সর্বাবস্থায় সত্য কথা ব্যক্ত করে দেয়া, সর্বাবস্থায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণ করা, খাহেশাতে নফছানীর অনুসরণ না করা, বখীলী না করা এবং অহংকার না করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ছয়টা নছীহতের উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং - ১৩

৭ টি বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِيْ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهٗ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٤٩٤٢.)

মুসল্লিয়ানে কোরাম!

গত কয়েক জুমুআ যাবত আলোচনা করা হচ্ছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ নছীহত করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে নছীহতের কথা শুনতেন, তাঁরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তারা নছীহত চেয়ে নিতেন, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নছীহত করতেন। বায়হাকী শরীফের এক হাদীছে এসেছে, একদিন হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নছীহত চেয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু নছীহত করুন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নছীহত করে বললেন,

اَوْصِنِيْ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ.

অর্থাৎ, আমি তোমাকে তাকওয়া বা খোদাভীতি অবলম্বনের নছীহত করছি। কেননা, তাকওয়া তোমার সব বিষয়কে সুন্দর করে দিবে।

এটুকু শুনে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বললেন,

زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ.

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও কিছু নছীহত করুন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যত্নের সাথে কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য যিকির করতে থাক। কেননা, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির দ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হবে আর পৃথিবীতে তোমার জন্য নূর হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এটুকু শুনে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বললেন,

زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَّكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ.

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও কিছু নছীহত করুন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খুব বেশী চুপ থাকবে। কেননা, চুপ থাকলে শয়তান ভেগে যাবে আর চুপ থাকা দ্বারা তোমার দ্বীনী বিষয়ে সহযোগিতা লাভ হবে।

এটুকু শুনে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বললেন,

زِدْنِيْ قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةِ الضِّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ.

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও কিছু নছীহত করুন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশী হাসা থেকে বিরত থাক। কেননা, বেশী হাসলে কলব মরে যায় আর চেহারার নূর মিটে যায়।

এটুকু শুনে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বললেন,

زِدْنِيْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا.

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও কিছু নছীহত করুন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্য কথা ব্যক্ত করে দিবে যদিও তা তীক্ত হয়।

এটুকু শুনে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বললেন,

زِدْنِيْ قَالَ لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও কিছু নছীহত করুন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্য কথা বলতে যেয়ে এবং সত্যের উপর চলতে গিয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবে না।

এটুকু শুনে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বললেন,

زِدْنِيْ قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَاتَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ.

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ! আরও কিছু নছীহত করুন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি নিজের ব্যাপারে যে দোষ-ত্রুটি অবগত আছ তা যেন অন্যের দোষ খোঁজা থেকে তোমাকে বিরত রাখে। অর্থাৎ, নিজের দোষের দিকে তাকাবে, অন্যের দোষ দেখবে না।

এভাবে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) ৭ বার নছীহত চাইলেন আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাতটি বিষয়ে নছীহত করলেন। দেখা গেল সাহাবায়ে কেরাম নছীহত শুনতে আগ্রহী ছিলেন এজন্য বারবার নছীহত শুনতে চাইতেন, নছীহত শুনতে তারা বিরক্ত হতেন না। আবার কেউ নছীহত শুনতে চাইলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ত্যাক্ত হতেন না বরং দিল খুলে তাকে নছীহতের কথা শুনাতেন।

এ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোট সাতটা নছীহতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

১ নং নছীহত হল– তাকওয়া বা খোদাভীতি অবলম্বনের নছীহত। এ সম্পর্কে গত জুমুআয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এক কথায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

তাকওয়া দ্বারা দ্বীন দুনিয়ার সবকিছু সুন্দর হয়ে যায়। কেননা, তাকওয়া পরহেযগারীর সারকথা হল সব রকম গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং সব রকম নেক আমল করা। অতএব তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করলে অবশ্যই দ্বীন দুনিয়ার সবকিছু সুন্দর হবে।

এই হল ১ নং নছীহত।

২ নং নছীহত হল– কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য যিকির করার নছীহত। কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির দ্বারা কি ফায়দা তা-ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, এর দ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হবে আর পৃথিবীতে তোমার জন্য নূর হবে। যখন কেউ যিকির করে, তখন আল্লাহ তাআলা আসমানে ফেরেশতাদের সামনে তার প্রশংসামূলক আলোচনা করতে থাকেন। তাই বলা হয়েছে, যিকির করলে আসমানে তোমার আলোচনা হবে। কুরআন তেলাওয়াতও একটি যিকির। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন তেলাওয়াত হল একটি শ্রেষ্ঠ যিকির। অতএব কুরআন তেলাওয়াত করলেও আল্লাহ তাআলা আসমানে ফেরেশতাদের সামনে তার প্রশংসামূলক আলোচনা করবেন।

কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের বহু ফায়দা ও ফযীলত রয়েছে, এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটা ফায়দা-ফযীলতের কথা উল্লেখ করেছেন। একটা হল আল্লাহ তাআলা আসমানে ফেরেশতাদের সামনে তার প্রশংসামূলক আলোচনা করেন, এর দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা খুশী হন। খুশী হন বলেই ফেরেশতাদের সামনে তার সম্পর্কে প্রশংসামূলক কথা বলেন। এই হল একটা ফায়দা ফযীলত। আর একটা হল কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির দ্বারা নূর হাসেল হয়।

নূর বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা সহকারে বোঝা দরকার। নূর অর্থ হল আলো। এখানে কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির দ্বারা কলবের মধ্যে যে নূর বা আলো সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল কলবের মধ্যে বিকশিত অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। কলব বা দিলের মধ্যে এই অবস্থা সৃষ্টি হলে কুরআন হাদীছের কথা শুনে দিল বিকশিত হয়ে ওঠে। ইলমের নূর সেই কলবে ভালভাবে প্রতিফলিত হয় ফলে কুরআন হাদীছের কথা আলোর মত পরিষ্কার ভাবে বুঝে আসে, কলবে কোন অন্ধকার ভাব থাকেনা অর্থাৎ, কোন অস্পষ্টতা থাকে না। কুরআন হাদীছের কথা মানতে ভাল লাগে, ইবাদত-বন্দেগী করতে দিলের মধ্যে জড়তা বা অনীহা ভাব আসে না, বরং ইবাদত-বন্দেগী করতে আনন্দ লাগে। যার অন্তরে এই নূর না থাকে, তার কুরআন হাদীছের কথা শুনে দিল বিকশিত হয় না, কুরআন হাদীছের কথা তার ভাল বুঝে আসে না, কুরআন হাদীছের কথায় দিল লাগে না, ইবাদত-বন্দেগী করতে মজা লাগে না। দ্বীনের কথা শুনলে, ইবাদত-বন্দেগীর কথা শুনলে দিলের মধ্যে জড়তাভাব এবং অনীহাভাব বিরাজ করতে থাকে। এগুলি হয়ে থাকে দিলের মধ্যে এই নূর না থাকার কারণে।

অতএব বোঝা গেল কলবের মধ্যে এই নূর সৃষ্টি করতে পারা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির দ্বারা কলবের মধ্যে এই নূর হাসেল হয়। পক্ষান্তরে গোনাহ করলে কলবের এই নূর মিটে যায়। একটা একটা গোনাহ দ্বারা কলবে এক একটা কাল দাগ পড়তে থাকে। এভাবে গোনাহ করতে থাকলে কলবে এক একটা কাল দাগ পড়তে পড়তে এক সময় গোটা কলব কাল অন্ধকারে ছেয়ে যায়। এরকম অবস্থা হওয়ার অর্থ হল তার কলব থেকে নূর সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল। কলবের এই অবস্থা হলে সেই কলব থেকে ভাল মন্দ বিবেচনা বোধ পর্যন্ত মিটে যায়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হাদীছে এসেছে,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ. (رواه الترمذي برقم ٣٣٣٤ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, বান্দা যখন গোনাহ করে তখন তার অন্তরে একটা কাল দাগ পড়ে যায়।

এভাবে যত গোনাহ করতে থাকে কাল দাগও বাড়তে থাকে। এভাবে বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে তার অন্তর সম্পূর্ণ কাল হয়ে যায়। ঐ কালির উপর ইল্‌মের নূর প্রতিফলিত হয় না, ইল্‌মের আলো ফোটে না। যেমন কালো হাড়ির উপর সূর্যের আলো ফোটে না। কিন্তু কাঁচ –যা অত্যন্ত স্বচ্ছ– তার উপর যখন সূর্যের আলো পড়ে, তখন সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাঁচ তখন এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে, তার থেকে আলো ছুটতে থাকে। অন্তরের অবস্থাও এরকম, বান্দা যখন গোনাহ করতে থাকে, আস্তে আস্তে তার অন্তর কাল হয়ে যায়, ইল্‌মের নূর সেখানে ফোটে না। আর যে অন্তর পাপ মুক্ত থাকে, যে অন্তর উজ্জ্বল স্বচ্ছ থাকে, সেখানে ইল্‌মের নূর ফুটে ওঠে, সেখান থেকে হেদায়েতের আলো ছুটতে থাকে।

এ হাদীছের বিস্তারিত বিবরণে এসেছে–

وَالْآخَرُ اَسْوَدُ مِرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

এর ভাবার্থ হল– এভাবে গোনাহ করতে করতে কলব কাল হতে হতে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় যে, সেই কলব থেকে খাহেশাতে নফছানী ছাড়া ভাল-মন্দ বিবেচনা বোধ সব বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেই কলব হয়ে উল্টানো মশকের মত যা উপুড় করা থাকে, ফলে তার মধ্যে কিছুই প্রবেশ করতে পারে না অর্থাৎ, ভাল কিছু প্রবেশ করতে পারে না। পাপের দ্বারা অন্তর সম্পূর্ণ কালিমা লিপ্ত হয়ে পড়লে সেই অন্তরেও ভাল কিছু প্রবেশ করে না।

যাহোক কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য যিকির দ্বারা কলবের নূর বাড়াতে হবে–এই হল ২ নং নছীহত।

৩ নং নছীহত হল– খুব বেশী চুপ থাকার নছীহত। চুপ থাকলে কি ফায়দা তা-ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, চুপ থাকলে শয়তান ভেগে যায় আর চুপ থাকা দ্বারা দ্বীনী বিষয়ে সহযোগিতা লাভ হয়। কারণ, বেশী কথা বলার অভ্যাস হলে তার মিথ্যা বেশী হয়, গীবত শেকায়েত বেশী হয়, ঝগড়া-বিবাদ বেশী হয়, অনর্থক কথা বলে সময় নষ্ট হয় ইত্যাদি। অতএব চুপ থাকলে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়, চুপ থাকলে গীবত-শেকায়েত থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়, চুপ থাকলে অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়, চুপ থাকলে অর্থাৎ, বেশী কথা বলা থেকে বিরত রাখলে সেই সময়টুকু যিকির-আযকার করা সম্ভব হয়, দুরূদ শরীফ পড়া সম্ভব হয়, সেই সময়টুকুতে আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব হয়, সেই সময়টুকুতে কাজের কথা চিন্তা করা সম্ভব হয়, ফায়দার বিষয় চিন্তা করা সম্ভব হয়। সুতরাং দেখা গেল চুপ থাকলে অনেক গোনাহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয় এবং অনেক নেকীর কাজ করা সম্ভব হয়। তাই চুপ থাকলে গোনাহ থেকে বিরত হয়ে যাচ্ছে এবং নেকীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে শয়তানের গায়ে জ্বালা ধরে। একারণে কেউ চুপ থাকলে তার কাছ থেকে শয়তান ভেগে যায়। কারণ, তার কাছে থাকতে শয়তানের ভাল লাগে না। আর এই চুপ থাকার কারণে তার পক্ষে অনেক গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং অনেক নেকীর কাজ করতে পারার দ্বারা তার দ্বীনের পক্ষে সহযোগিতা লাভ হয়। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খুব বেশী চুপ থাক, তাহলে শয়তান ভেগে যাবে এবং তোমার দ্বীনী বিষয়ে সহযোগিতা লাভ হবে।

চুপ থাকলে যে বহু গোনাহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয় তা একটা হাদীছে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ صَمَتَ نَجَا. (رواه الترمذي برقم ٢٥٠١)

অর্থাৎ, যে চুপ থাকে, সে মুক্তি লাভ করে। অর্থাৎ, সে মিথ্যা, গীবত-শেকায়েত ইত্যাদি থেকে মুক্তি পায়, শাস্তি ও আযাব থেকে মুক্তি পায়।

তবে এখানে আরও একটা উল্লেখ করার প্রয়োজন। তা হল– এ হাদীছে যে চুপ থাকার কথা বলা হয়েছে, তা সব স্থানে নয়। সবস্থানেই চুপ থাকা ভাল নয়। যেখানে কথা বলা জরুরী, সেখানে চুপ থাকা অন্যায়। যেখানে কথা না বললে গোনাহ হবে, সেখানেও কথা বলা জরুরী, সেখানে চুপ থাকাও অন্যায়। চুপ থাকা যে উত্তম তা হল ঐ সব ক্ষেত্রে, যেখানে কথা বলা দ্বারা কোন ফায়দা নেই। যেখানে বললে ফায়দা রয়েছে সেখানে চুপ থাকা নয় বরং সেখানে বলার নিয়ম।

যাহোক বহু রকম পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য বেশী কথা এবং অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকতে হবে–এই হল ৩ নং নছীহত।

৪ নং নছীহত হল– বেশী হাসা থেকে বিরত থাকার নছীহত। বেশী হাসলে কি ক্ষতি তাও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, বেশী হাসলে কলব মরে যায় এবং চেহারার নূর নষ্ট হয়ে যায়।

কলব যিন্দা থাকলে কুরআন হাদীছের কথা ভাল লাগে। কলব যিন্দা থাকলে আমল তথা ইবাদত-বন্দেগী ভাল লাগে। কলব যিন্দা থাকলে ইবাদত-বন্দেগীর স্প্রীহা আসে। কলব যিন্দা থাকলে কলবের মধ্যে ঈমান-আমলের চেতনা জাগ্রত থাকে। পক্ষান্তরে যার কলব মরে যায় তার কলবে ঈমান-আমলের চেতনা জাগ্রত থাকে না, সেই কলবে ঈমান-আমলের স্প্রীহা আসে না।

কলব মরে যাওয়ার অনেকগুলি কারণ রয়েছে, তার মধ্যে একটা কারণ হল বেশী হাসা। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নছীহত করে বললেন যে, বেশী হেস না, তাহলে কলব মরে যাবে।

যাহোক কলবকে যিন্দা রাখার স্বার্থে বেশী হাসা থেকে বিরত থাকতে হবে– এই হল ৪ নং নছীহত।

৫ নং নছীহত হল– সত্য কথা ব্যক্ত করে দিতে হবে যদিও তা তীক্ত হয়। কারও কাছে তীক্ত লাগবে, কেউ অপছন্দ করবে এই ভয়ে হক কথা বলা থেকে বিরত থাকবে না। যেখানে হক কথা অর্থাৎ, সত্য কথা প্রকাশের স্বার্থে মুখ খোলা প্রয়োজন সেখানে মুখ না খুলে চুপ থাকা পাপ। এজন্যই বলা হয়েছে,

اَلسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ اَخْرَسُ.

অর্থাৎ, হক কথা প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে– এমন মুহূর্তে যে চুপ থাকে, সে হল বোবা শয়তান।

তবে এখানে একটা কথা মনে রাখা চাই। তাহল– সত্য কথা তীক্ত হলেও বলতে হবে, এর অর্থ এই নয় যে, কথার মধ্যে কোন রস-কষও থাকবে না, বরং রুক্ষ এবং কর্কষ ভাষায় বলে দিতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অবশ্যই কোন কথা রুক্ষভাবে এবং কর্কষভাবে বলা শরীয়তের নিয়ম নয়, বরং শরীয়তের কথা কোমলভাবেই বলা নিয়ম। হাঁ কোমলভাবে কথায় কাজ না হলে তখন কঠিনভাবে বলা যেতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় রুক্ষভাবে নয় বরং কোমলভাবে কথা বলা নিয়ম। রুক্ষভাবে নয় বরং কোমলভাবে দাওয়াত পেশ করা শরীয়তের একটা বিধান। নরমে এবং কোমলভাবে কথা পেশ করলে শ্রোতার মধ্যে তা মানার মনোভাব সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে রুক্ষভাবে কথা পেশ করলে শ্রোতার মনে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে, অনেক সময় তার মধ্যে জেদ সৃষ্টি হয়ে হীতে বিপরীত হয়। এই বিষয়গুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখা চাই। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)কে ফেরআউনের মত উদ্ধত লোকের কাছেও দাওয়াত পেশ করার সময় কোমলভাবে এবং নরমে বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى. (সূরা তাহা: ৪৪)

অর্থাৎ, তোমরা উভয়ে তার কাছে কোমলভাবে কথা পেশ করবে, তাহলে আশা করা যায় সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা অন্তত তার মনে (দাগ কাটবে, ফলে তার মধ্যে) আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে।

অতএব সত্য কথা তীক্ত হলেও বলতে হবে, এর অর্থ হল সত্য কথায় যদি কারও স্বার্থে আঘাত লাগে একারণে বা অন্য কোন কারণে সে অপছন্দ করে, তাহলে তার অপছন্দ করার পরওয়া করা না চাই। বরং বিনা দ্বিধা সংকোচে আল্লাহকে রাজি খুশী করার নিয়তে সত্য কথা ব্যক্ত করে দেয়া চাই।

সারকথা সত্য কথা ব্যক্ত করে দিতে হবে যদিও তা তীক্ত হয়–এই হল এই হল ৫ নং নছীহত।

৬ নং নছীহত হল– সত্য কথা বলতে যেয়ে এবং সত্যের উপর চলতে গিয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করা যাবে না। সত্য কথা বলতে গেলে, সত্য পথে চলতে গেলে অনেক সময়ই অনেকের স্বার্থে আঘাত লাগে বা অনেকের অপছন্দ লাগে, ফলে তারা নিন্দা বদনামের পথ গ্রহণ করে। যদি এসব নিন্দুকের নিন্দা-বদনামের পরওয়া করতে যাওয়া হয়, তাহলে সত্য কথা বলা যাবে না, সত্য পথে চলা যাবে না। দুনিয়ায় এমন কোন লোক যায়নি তাদের কোন নিন্দা-বদনাম হয়নি। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল মানুষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও নিন্দা-বদনাম হয়েছে। তাই সত্য কথা বলতে যেয়ে এবং সত্যের উপর চলতে গিয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করা যাবে না। এই গুণকে আল্লাহ তা'আলা খুব পছন্দ করেন। কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে সব লোকদেরকে ভালবাসেন, তাদের কিছু গুণাবলী তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে এই গুণটার কথাও উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ.
(সূরা মায়িদা: ৫৪)

অর্থাৎ, তারা মু'মিনদের ব্যাপারে কোমল, কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর, তারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে এবং তারা কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে চলে না।

এই হল ৬ নং নছীহত।

৭ নং নছীহত হল– অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষের দিকে তাকাতে হবে। সাধারণত আমাদের অভ্যাস হল আমরা অন্যের দোষ খুব দেখি, নিজের দোষ দেখি না। অথচ নিজের দোষ দেখা চাই, অন্যের দোষ না দেখা চাই। নিজের দোষ দেখলে নিজের সংশোধনের চিন্তা আসে, তাতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

নিজের জীবনের সংশোধন হয়, নিজের ফায়দা হয়। আর অন্যের দোষ দেখলে নিজের কোন ফায়দা হয় না, বরং নিজেকে শুধু ভালই মনে হতে থাকে, আর অন্যকে খারাপ মনে হতে থাকে, অন্যের প্রতি কু-ধারণা বাড়তে থাকে। এই কু-ধারণা মানুষের সাথে সম্পর্ককে নষ্ট করে, মানুষ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এতে সমাজ-সামাজিকতা খারাপ হয়ে পড়ে। এজন্যই মানুষের প্রতি কু-ধারণা করা নিষেধ। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. (সূরা হুজুরাত: ১২)

অর্থাৎ, অবশ্যই কতক ধারণা পাক।

এখানে বোঝানো হয়েছে বিনা দলীল প্রমাণে মানুষের প্রতি যে কু-ধারণা হয়, তা নিষেধ। বিনা দলীল প্রমাণে কারও প্রতি কু-ধারণা করা পাপ।

যাহোক অন্যের দোষের প্রতি নজর দিলে অন্যের প্রতি কু-ধারণা সৃষ্টি হয়, তাতে নিজের কোন লাভ হয় না বরং নিজে পাপ হয় এবং নিজের ক্ষতি হয়, তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নছীহত করে বললেন, অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষের দিকে তাকাতে হবে।

এই হল ৭ নং নছীহত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সাতটা নছীহতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং - ১৪

আরও ৭ টি বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض قَالَ اَمَرَنِيْ خَلِيْلِيْ بِسَبْعٍ اَمَرَنِيْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنِيْ وَلَا اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَصِلَ الرَّحِمَ وَاِنْ اَدْبَرَتْ وَاَمَرَنِيْ اَنْ لَا اَسْاَلَ اَحَدًا شَيْئًا وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا وَاَمَرَنِيْ اَنْ لَا اَخَافَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَاِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٢١٤٥٣ وإسناده حسن والحديث صحيح.)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা বিগত বেশ কয়েক জুমুআ ধরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বিভিন্ন সময় যে সব উপদেশ দিয়েছেন নছীহত করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নছীহত করতে আগ্রহী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও নছীহত শুনতে আগ্রহী ছিল। দুই পক্ষের-ই আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। যিনি নছীহত করবেন তার যদি আগ্রহ না থাকে, তাহলে তার মুখে ভাল কথা আসবে না। আর যিনি নছীহত শুনবেন তার যদি আগ্রহ না থাকে, তাহলে আগ্রহ না থাকার ফলে তিনি কথা ভাল করে বুঝবেন না। কিংবা বুঝলেও সেই কথা তার দিলের মধ্যে আছর করবে না। বুঝার জন্য এবং কলবে আছর পড়ার জন্য কথা আগ্রহ সহকারে শোনা প্রয়োজন। দুনিয়াতে আমরা বিভিন্ন খাদ্য-খাবার খাই, যদি তা খাওয়ার রুচি না থাকে তাহলে বদ হজমী হয় অর্থাৎ, খাদ্য-খাবারের আছর ভাল হয় না। যার যত রুচি ভাল খাদ্য তার দেহে তত বেশী কাজে লাগে। তদ্রূপ দ্বীনের কথা শোনার বেলায়ও আগ্রহ থাকতে হবে, রুচী থাকতে হবে। তাহলে দ্বীনের কথা ভিতরে ভাল আছর করবে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দ্বীনের কথা শোনার আগ্রহ ছিল। তারা সময় সুযোগ পেলেই, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবসর মুহূর্তে পেলেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নছীহত চেয়ে নিতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সময় সুযোগ পেলে সাহাবায়ে কেরামকে নছীহত করতেন। বহু হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরূপ উপদেশের বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে মুসনাদে আহমদের এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাতটা বিষয়ে নছীহত করলেন। রেওয়ায়েতটি এভাবে এসেছে– হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন,

قَالَ اَمَرَنِيْ خَلِيْلِيْ بِسَبْعٍ. إلخ.

অর্থাৎ, আমার বন্ধু আমাকে সাতটা নছীহত করলেন। "বন্ধু" বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝিয়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের

www.maktabatulabrar.com

প্রেমের সম্পর্ক ছিল, মহব্বতের সম্পর্ক ছিল। তাই হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "আমার বন্ধু" বলে আখ্যায়িত করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের এরকম প্রেমের সম্পর্ক ছিল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় কোন কারণে কোন সাহাবীকে রহস্য করেও যদি কিছু বলেছেন তা শুনতে খারাপ লাগলেও তিনি সেটাকে মজার সাথে গ্রহণ করেছেন। এরকম একটা ঘটনা শুনুন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সম্পর্কে আমরা অনেকে জানি। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ভিতরে সবচেয়ে বেশী হাদীছ বয়ান করেছেন। সারাক্ষণ তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে লেগে থাকতেন। একদিন তিনি একটা বিড়ালের বাচ্চা কোলে নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে আসলেন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রহস্য করে "আবূ হুরায়রা" বলে সম্বোধন করলেন।"আবূ হুরায়রা"-এর অর্থ বিড়ালের বাপ। বাপ যেরকম বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে আসে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)ও সেরকম বিড়ালটিকে আদর করে কোলে নিয়ে এসেছিলেন। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রহস্য করে "আবূ হুরায়রা" বলে সম্বোধন করলেন। আবূ হুরায়রা বা বিড়ালের বাপ কথাটি শুনতে খারাপ শোনা গেলেও এরপর থেকে তিনি নিজেকে সব সময় আবূ হুরায়রা বলেই পরিচয় দিতেন। তিনি আবূ হুরায়রা নামে নিজেকে পরিচয় দিতে খুব মজা বোধ করতেন। নিজের আসল নাম আর কখনও বলতেননা। তাই আবূ হুরায়রা (রা.)-এর আসল নাম কি ছিল তা কেউ জানে না। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সূত্র ধরে খোজা-খুজি করে জানার চেষ্টা করেছেন তার আসল নাম কি ছিল। এক এক জন এক একটা নাম খুঁজে বের করেছেন। এমনকি ঐতিহাসিকদের মধ্যে তার আসল নাম কি ছিল তা নিয়ে ৪০টা মত পাওয়া যায়। তিনি শুনতে খারাপ শোনা গেলেও নিজেকে আবূ হুরায়রা বলেই পরিচয় দিতেন এবং এরকম পরিচয় দিতে তিনি মজা বোধ করতেন। এটা হল এরকম ব্যাপার যে, যাকে ভালবাসি তার গালিটাও ভাল লাগে, যাকে ভালবাসি তার টিকা-টিপ্পনীটাও ভাল লাগে। এর কারণ হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক ছিল প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)ও এরকম প্রেমের মনোভাব থেকে বললেন যে, আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে সতটা বিষয়ে নছীহত করেছেন। তার মধ্যে–

এক নম্বর নছীহত হল–

اَمَرَنِيْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ.

অর্থাৎ, তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন আমি যেন গরীবদেরকে ভালবাসি এবং গরীবদের কাছে থাকি। অর্থাৎ, গরীবদের সাথে বেশী উঠা বসা করি।

এই নছীহতটা আমাদের অনেকের কাছেই হয়তো খারাপ লাগে। আমরা তো গরীবদের সাথে ভালবাসা রাখি না, গরীবদের সাথে ওঠা বসা করতে ভালবাসি না, গরীবদেরকে ভাল জানি না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু গরীবকে ভালবাসতেন তা নয়, তিনি তো গরীব হয়েই থাকতে চাইতেন। আমাদেরকে এ হুকুম দেয়া হয়নি যে, তোমরা গরীব হয়ে থাক। বরং বলা হয়েছে অন্তত গরীবদেরকে ভালবাস। তাই আমাদেরকে একটু কম করে বলা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু যে গরীবদেরকে ভালবাসতেন তা নয় নিজেও গরীব হয়েই থাকতে ভালবাসতেন। হাদীছে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَّ احْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ. (رواه الترمذي برقم ٢٣٥٢ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ ! আমাকে গরীব অবস্থায় দুনিয়াতে রাখ, গরীব অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়। আর গরীবদের সাথে যেন আমার হাশর হয়।

আমরা নিজেদের বুকের উপর হাত রেখে নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখি আমাদের কারও এই দুআ করার সাহস আছে কি না। আমাদের ভয় লাগবে যে, আল্লাহর কাছে এ রকম দুআ করলে সাথে সাথে যদি গরীব হয়ে যাই! গরীব হতে আমাদের ভয় লাগে, তাই আমাদের দুর্বলতার কারণে হয়তো আমাদেরকে সরাসরি হুকুম দেয়া হয়নি যে, তোমরা গরীব হয়ে থাক! তবে হ্যাঁ, এতটুকু হুকুম অবশ্যই রয়েছে যে, আল্লাহ পাক যাকে যে হালে রাখেন সে আবস্থায়-ই সে খুশী থাকবে। তবে গরীবদের সাথে উঠা-বসা করতে বলা হয়েছে, গরীবদেরকে ভালবাসতে বলা হয়েছে। এর অর্থ হল গরীবদেরকে ঘৃণা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একান্তভাবে নছীহত করেছেন যে,

يَاعَائِشَةُ اَحِبِّى الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ فَاِنَّ اللّٰهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه الترمذي برقم ٢٣٥٢ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, হে আয়েশা! তুমি গরীব-মিসকীনদেরকে ভালবাস, গরীব-মিসকীনদের সাথে নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে তোল। তাহলে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তোমাকে নৈকট্য দান করবেন।

এই নছীহত সামাজিক নছীহত নয়, লোক দেখানো নছীহত নয়, বরং এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনের নছীহত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মনের মানুষকে এই নছীহত করেছেন যে, গরীবদেরকে ভালবাসবে।

গরীবদের সাথে উঠা-বসা করলে অনেক ফায়দা। গরীবদের সাথে উঠা-বসা করলে নজর বড় হবে কম, নিজেকে অভাবী বোধ হবে কম, যা আছে তা নিয়ে তৃপ্তি আসবে, যা আছে তা নিয়ে শোকর আসবে। এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই নম্বর নছীহতে বলেছেন,

দুই নম্বর নছীহত হল–

وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنِيْ وَلَا اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ.

অর্থাৎ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন দুনিয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে নীচে কে আছে এটা দেখি। আমার চেয়ে উপরে কে আছে সেটা যেন না দেখি।

এটা এ জন্য যে, নিয়ম হল দুনিয়ার ব্যাপারে আমি যখন উপরের দিকে তাকাই অর্থাৎ, যাদের ধন-সম্পদ বেশী আছে তাদের দিকে তাকাই, তখন আমার মনে হয় যে, আমার অনেক কিছু নেই। অমুকের মত আমার এই কয়টা গাড়ি-বাড়ি নেই, এত ব্যাংক-ব্যালেন্স নেই, অমুকের মত আমার এই নেই, তা নেই ইত্যাদি। এভাবে নিজের ভিতরে অভাব বোধ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন সেদিকে নজর যায় না, আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন সেটার শোকর আদায়ের মনোভাব জাগ্রত হয় না;

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বরং না শোকরীর মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) কে বললেন যে, দুনিয়ার ব্যাপারে উপরের দিকে তাকাবে না বরং নিচের দিকে তাকাবে।

সাহাবায়ে কেরাম এই নছীহতের উপর আমল করেছেন। এই হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর নিজের অবস্থা এরকম ছিল যে, তিনি প্রথম নছীহত অনুযায়ী গরীবদেরকে খুব ভালবাসতেন এবং সম্পদের দিকে কোনই নজর দিতেন না বরং কারও সম্পদ দেখলে তিনি রেগে যেতেন। বলতেন ধন-সম্পদ এটাতো জাহান্নাম, জাহান্নামের আগুন। এই আগুন তোমরা কী করে বরদাশত কর! কীভাবে এই আগুন নিয়ে তোমরা নাড়াচড়া কর! তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর এতটুকু সম্পদ ছিল না যে সম্পদ দিয়ে তার কাফনের কাপড় হয়। শুধু হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)ই নন, সব সাহাবীদেরই এ অবস্থা ছিল। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবান মুবারক থেকে গরীবদেরকে ভালবাসার নছীহত বের হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম তা শুনেছেন, যখন সাহাবায়ে কেরাম শুনেছেন এবং বুঝেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরীব হয়ে থাকতে চান, তারপর তাঁদের আবস্থা এরকম হয়েছিল যে, তাঁরা অনেকেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন যে, আমার যত মাল আছে সব দান করে দিতে চাই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের সবটা নেননি, কাউকে বলেছেন তিন ভাগের এক ভাগ দাও আর বাকিটা তোমার কাছে রেখে দাও। কাউকে এর কাছাকাছি অন্য রকম বলেছেন। কারণ অনেকের অবস্থা হল এক সময় ওয়াজ শুনে জযবার চোটে সবটা দান করে দিতে পারে। কিন্তু পরে যদি অভাব দেখা দেয়, তাহলে কুফরীর দিকে চলে যায় এই চিন্তা করে যে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলাম এখন দেখি আল্লাহ আমাকে না খাইয়ে মারছেন! শুনেছি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে বরকত হয় কিন্তু কৈ বরকত কোথায় গেল! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক! এভাবে আল্লাহর উপরে তার বদ গুমানী এসে যায়, তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমাদেরকে এরকম হুকুম দেয়া হয়নি যে, সব মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দাও। তবে হ্যাঁ এ কথা সত্য– যদি কেউ অভাবের অবস্থায়ও মজবূত থাকে, কারও কাছে হাত না পাতে, মজবূতির সাথে থাকে, তাহলে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে না খাইয়ে রাখবেন না।

যাহোক দুই নম্বর নছীহত হল দুনিয়ার ব্যাপারে উপরের দিকে না তাকানো বরং নিচের দিকে তাকানো।

তিন নম্বর নছীহত হল–

وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَصِلَ الرَّحِمَ وَاِنْ اَدْبَرَتْ.

অর্থাৎ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন আত্মীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখি, যদিও তারা আমার থেকে দূরে সরে যায়।

এখানে আত্মীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে বলা হয়েছে, যদিও আত্মীয়-স্বজনরা দূরে থাকে। এই নীতি গ্রহণ করা যাবেনা যে, আমার সাথে যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখব, আমার সাথে যে সু-সম্পর্ক বজায় না রাখলে আমিও সু-সম্পর্ক বজায় রাখব না। অর্থাৎ, তারা যেমন করবে আমিও তেমন করব– এরকম নীতি নয়। তেমন হলেতো সমান সমান হল, ভালোর জবাবে ভাল মন্দের জবাবে মন্দ। বরং ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, ভালোর জবাবে তো ভাল হবেই, মন্দের জবাবেও ভাল হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, মানুষে পছন্দ না করুক তবুও যেন সবসময় হক কথা বলে যাই। দ্বীনের উপরে চলতে গেলে, সত্যে উপরে চলতে গেলে মানুষের পছন্দ-অপছন্দটা বেশী লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না। মানুষের পছন্দ-অপছন্দ লক্ষ্য রেখে চলতে গেলে অনেক সময়ই হক পথে চলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এভাবে দ্বীনের উপর উঠে আসা সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে গত জুমুআয় আপনাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এই হল পাঁচ নম্বর নছীহত।

ছয় নম্বর নছীহত হল–

وَاَمَرَنِيْ اَنْ لَّا اَخَافَ فِى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

অর্থাৎ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন দ্বীনের উপর চলতে যেয়ে, আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় না করি।

আমি দ্বীনের উপর চলব, আল্লাহর পথে চলব, কে আমার নিন্দা-সমালোচনা করল, কে নাক সিটকাল, কে ভ্রুকুঞ্চিত করল, এগুলির দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করার অবকাশ আমার কোথায়? আমি দ্বীনের কাজ করেই যাব, দ্বীনের আমল করেই যাব, দ্বীনের উপরে অটল থাকবই, তাই যে আমার সমালোচনা করে করুক, যে নিন্দা করে করুক, যে তিরস্কার করে করুক এর কোন পরওয়া আমি করব না।

এটা এমন এক নছীহত, দ্বীনের উপরে চলতে গেলে সকলের জন্য এটা স্মরণ রাখা জরুরী। দাড়ি রাখলে কে কি বলবে, বিবিকে পর্দায় রাখলে কে কি বলবে, এসব পরওয়া করলে এগুলি করা যাবে না। টুপি মাথায় দিয়ে চললে, তাসবীহ হাতে নিয়ে চললে, লম্বা পাঞ্জাবী পরলে, পাগড়ী মাথায় দিলে কে আমাকে হুজুর বলবে, কে টিকা-টিপ্পনি কাটবে, কে টিটকারী দিবে– এগুলির পরওয়া করতে গেলে মউত পর্যন্ত কোন দিন এগুলি করা যাবে না। কেননা, এসব বিষয়ে টিকা–টিপ্পনী কাটার লোক, টিটকারী দেয়ার লোক সবসময় ছিল, সবসময় আছে এবং সবসময় থাকবে। কাজেই এগুলি করতে চাইলে তাদের পরওয়া বাদ দিয়েই করতে হবে। এ সম্পর্কে গত জুমুআয়ও কিছু আলোচনা পেশ করা হয়েছিল। যাহোক এটা হল ছয় নম্বর নছীহত।

সাত নম্বর নছীহত হল–

وَاَمَرَنِيْ اَنْ اُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ فَاِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ.

অর্থাৎ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন বেশী বেশী লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করি। কেননা, এ কালেমাটি আরশের নীচে সংরক্ষিত গোপন ভান্ডারের একটা কথা।

সাধারণভাবে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ যিকিরের বাক্য নয়। সাধারণভাবে যিকিরের বাক্য হল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি। ইস্তেগফার দুরুদ শরীফ এগুলোও সর্বক্ষণের আমল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ– এটা হল এমন একটা আমল, যার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র আছে। ক্ষেত্রগুলো বুঝতে হলে এই বাক্যটার অর্থ আগে বুঝতে হবে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-এর অর্থ হল "এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন কিছু করার শক্তি নেই। সব শক্তি আল্লাহর হাতে, তিনি ছাড়া কারও কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই।" এই অর্থটা বুঝলে আমরা ঠিক করতে পারব কোথায় কোথায় লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়তে হয়। যেমন কেউ আমার ক্ষতি করতে পারে চিন্তা করে দুঃশ্চিন্তা টেনশনে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে–

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ اِذَا انْقَطَعَتْ رِحْمُهُ وَصَلَهَا.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সু-সম্পর্ক বজায় রাখলেই কেবল সু-সম্পর্ক বজায় রাখে, সে মূলত আত্মীয়তার সু-বন্ধন রক্ষাকারী নয়, এটার নাম সু-সম্পর্ক বজায় রাখা নয়। বরং আত্মীয়তার সু-বন্ধন রক্ষাকারী হল সেই ব্যক্তি যার সাথে বন্ধন ছিন্ন করা হলেও সে বন্ধন রক্ষা করে চলে।

এ হাদীছে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজনরা তোমার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখুক বা না রাখুক সর্বাবস্থায় তুমি তাদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখবে। এখানে যদিও আত্মীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে বলা হয়েছে, কিন্তু সু-সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টা শুধু আত্মীয়দের সাথেই নয় বরং সমস্ত মুসলমানের সাথেই সু-সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের শিক্ষা।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ কি ? আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হল তাদের কাছে যাওয়া-আসা করা, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া, তাদের আদর-আপ্যায়ন করা, তাদের অভাব-অনটন হলে নিজের সাধ্যমত তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি। ব্যস্ততা, ঝামেলা বেশী থাকলেও টেলিফোন মোবাইলের যুগে অন্তত টেলিফোন মোবাইলের মাধ্যমে একটু সালাম-কালাম করেও খোঁজ-খবর নেয়া যেতে পারে। অন্তত এতটুকু করলেও কিছুটা সু-সম্পর্ক বজায় রাখা হল। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম বেশ জোরালো হুকুম। যাহোক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার নছীহত হল তিন নম্বর নছীহত।

চার নম্বর নছীহত হল–

وَاَمَرَنِيْ اَنْ لَا اَسْاَلَ اَحَدًا شَيْئًا.

অর্থাৎ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন কারও কাছে কিছু না চাই অর্থাৎ, কারোর কাছে যেন হাত না পাতি।

আমাদের যা কিছু প্রয়োজন আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। মানুষের কাছে হাত পাতা বড়ই জঘন্ন বিষয়। এক হাদীছে এসেছে–

وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. (رواه الترمذي برقم ٢٣٢٥ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, যে মানুষের কাছে হাত পাতার দুয়ার খোলে, আল্লাহ তার উপর অভাবের দুয়ার খুলে দেন।

এর বিপরীত যে মানুষের কাছে হাত পাতবে না, অভাব চলছে, না খেয়ে আছে, কিন্তু সে তার অভাবকে মানুষের কাছে প্রকাশ করছে না, একদিনের ঘটনা যদি এরকম ঘটে আর সে নিরবে সয়ে যায়, কারও কাছে নিজের অভাব প্রকাশ না করে, তাহলে এই একদিনের ছবরের ওছীলায় আগামী এক বছরের জন্য আল্লাহ পাক তার জন্য হালাল রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন।

পাঁচ নম্বর নছীহত হল–

وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا.

অর্থাৎ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন হক কথা এবং সত্য কথা বলে যাই, যদিও সেটা তিক্ত হয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পড়ে গেলাম, বা কোন দুর্ঘটনা হতে পারে চিন্তা করে দুঃশ্চিন্তা টেনশনে পড়লাম, কিংবা অন্য যে কোন কারণে টেনশন, পেরেশানী আসল। এসব মুহূর্তে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়তে হয়। এসব মুহূর্তে এই দুআটি পড়ার অর্থ হল সব কিছু আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করে দিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। অথবা কারও প্রাতি আমার জুলুম করার চিন্তা আসল বা কারও ক্ষতি করার মত খারাপ চিন্তা মনে জাগল, কিংবা কারও থেকে প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা আসল, এসব মুহূর্তে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়ে নিতে হয়। এসব মুহূর্তে এই দুআটি পড়ার অর্থ হল আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত করা যে, সমস্ত শক্তি তাঁর হাতে। তাঁর যে শক্তি রয়েছে, সেই শক্তির কিঞ্চিত পরিমাণও আমাকে দেয়া হয়নি। অতএব আমার এই নগণ্য শক্তি নিয়ে যদি আমি এত বড়াই দেখাই, প্রতিশোধ নিতে চাই, জুলুম করতে চাই, প্রতিপক্ষকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করি, তাহলে যার হাতে মহা ক্ষমতা তিনি আমাকে ধরলে আমার কী উপায় হবে? এরকম মনোভাব নিয়ে এই দুআটি পড়লে কারও প্রতি জুলুম বাড়িবাড়ি করার করার মনোবৃত্তি জাগবে না, কারও থেকে প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা মাথা চাড়া দিতে পারবে না। যদি কেউ অর্থ চিন্তা করে এই দুআটি পড়ে, তাহলে তার রাগ পানি হয়ে যাবে, তখন মনে হবে একজন লোক এতটুকু অন্যায় করেছে, তবুও আমি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি, আর যার হাতে সব ক্ষমতা, আমি অহরহ তাঁর ব্যাপারে কত অন্যায় করে চলেছি, তিনি যদি আমাকে ধরেন তাহলে আমরা কী অবস্থা হবে! এভাবে রাগ দমন হয়ে যাবে, বিনয় এসে যাবে।

এই দুআটি পড়ার বিশেষ আর একটা ক্ষেত্র রয়েছে। যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোন পাপ কাজের ওয়াছওয়াছা আসে, তখন এই দুআ পড়তে হয়। তখন এই দুআটি পড়ার অর্থ হল আরে শয়তান! তুই ওয়াছওয়াছা দিয়ে আমার কী করতে পারবি? তোর চেয়ে মহা ক্ষমতাধর আল্লাহ, তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন, তিনি ব্যতীত কারও কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। কিংবা এর অর্থ হল হে শয়তান! আমি তোর ওয়াছওয়াছার পরওয়া করি না, আমি ঐ শক্তিধর আল্লাহকে ভয় করি, তিনি আমাকে এই পাপ কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাঁর কথাকে আমি লংঘন করতে পারি না। যখন আল্লাহ কে এরকম বড় মনে করা হয়, তখন শয়তান হটে যায়। অথবা এই দুআ পড়লে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের মোকাবেলায় সাহায্য করেন, ফলে শয়তান ভেগে যায়। অতএব এই দুআ হল শয়তানকে ভাগানোর উপায়, এই দুআ হল শয়তানী চিন্তা দূর করার উপায়, এই দুআ হল মন থেকে রাগ উত্তেজনা দমন করার এবং মনের মধ্যে বিনয় নম্রতা আনয়ন করার উপায়।

এই হল সর্বমোট সাতটি নছীহত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই সাতটি নছীহতের উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং - ১৫

৭ শ্রেণীর মানুষ, যারা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়া পাবে

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ، اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَاَ فِيْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ، وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. (رواه البخارى ومسلم.)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

বিগত বেশ কয়েক জুমুআ ধরে আমরা আলোচনা করে আসছি যে, রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামকে নছীহত করতেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে– একদিন নছীহত করতে যেয়ে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন যে, কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে আল্লাহ পাক সাত ধরনের মানুষকে আরশের নীচে ছায়া দিবেন। যেদিন আর কোন ছায়া থাকবে না, সূর্য মাথার কাছে চলে আসবে। প্রচন্ড গরম হবে। সূর্য মাথার কাছে চলে আসলে কেমন গরম হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে এখন সূর্য আমাদের থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করছে। সেই গরমে আমরা অতিষ্ট হয়ে যাই। আর কেয়ামতের দিন এই সূর্য মাথার কাছে এসে যাবে। মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না যে, তখন কী অবস্থা হবে। এছাড়াও কেয়ামতের দিনের যে ভয়াবহতা হবে তাও কল্পনা করা যায় না। সূরা হজ্জের শুরুতে আল্লাহ পাক কেয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ.

অর্থাৎ, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই কেয়ামতের ভয়াবহতা এক প্রচণ্ড বিষয়। সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, কোন দুধ দেয়া মা, যার কাছে দুধের সন্তান আছে সে তার দুধের সন্তানের কথা ভুলে যাবে। গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। মানুষকে মনে হবে হুশ হারা, অথচ তারা বেহুশ নয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এখানে কেয়ামতের ময়দানের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ ভয়াবহ দিনে সাত ধরনের মানুষ এমন থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। কেয়ামতের দিন এটা হবে আল্লাহর বিশেষ রহমত। আল্লাহ পাক তাদের প্রতি খাস রহমত দান করবেন। যারা সেদিন আরশের নীচে ছায়া পেল তারা আল্লাহ পাকের খাস রহমত প্রাপ্ত হল। এই সাত প্রকারের লোকের মধ্যে

প্রথম প্রকারের লোক হল–

اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ.

অর্থাৎ, ইনসাফগার শাসক।

যাদের হাতে যতটুকু শাসন ক্ষমতা আছে, সে যদি সেই ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, বরং ইনসাফের সাথে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। আল্লাহ পাক হলেন ইনসাফগার, তাঁর আরশ বা সিংহাসন হল ইনসাফের প্রতীক, তাই ইনসাফগারদেরকে তিনি সেই ইনসাফের প্রতীক আরশের নীচে স্থান দান করবেন।

ক্ষমতা হাতে আসলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। ক্ষমতা হাতে আসলে মানুষ বেসামাল হয়ে যায়। তখন দুই দিক থেকে জুলুম হয়, (১) নিজের পক্ষে যতটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে বেশী নেয়, এটাও বেইনসাফী এটাও জুলুম। (২) প্রতিপক্ষের যতটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে তাদেরকে কম দেয় বরং তাদেরকে কতভাবে দমন করা যায়, কতভাবে নিষ্পেষিত করা যায় সেই চেষ্টা করে। এখানে প্রতিপক্ষের যতটুকু প্রাপ্য তাও দেয়া হল না বরং উল্টো জুলুম করা হল। এভাবে মানুষ ক্ষমতা পেলে ব্যালেন্স হারা হয়ে পড়ে, জুলুম করতে থাকে। একমাত্র যে আল্লাহর কথা স্মরণ রাখে যে, আমার চেয়ে আমার আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ক্ষমতা বেশী, আমি ক্ষমতার অপব্যবহার করলে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে পাকড়াও করবেন, একথা যে স্মরণ রাখে সে-ই ক্ষমতা পাওয়া সত্ত্বেও জুলুম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। আল্লাহর ক্ষমতার সামনে দুনিয়ার ক্ষমতা মশা-মাছির সমতুল্যও না। আল্লাহ পাক তো একটা মশা দিয়ে নমরূদের মত প্রতাপশালী সম্রাটকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আমি সামান্য ক্ষমতা পেয়ে যদি এতটা বে-সামাল হয়ে যাই, নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পারি, মানুষের উপরে জুলুম করতে থাকি তাহলে আল্লাহ পাকের কাছে আমি অপরাধী সাব্যস্ত হব, তাহলে আল্লাহ পাকের যে ক্ষমতা তিনি আমাকে অনেক কিছু করতে পারেন। এসব কথা স্মরণ রাখলে ক্ষমতার অপব্যবহার করার মত মনোভাব জাগ্রত হয় না। ক্ষমতা পেয়েও যারা ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, তার অর্থ হল সে সদা সর্বদা এসব চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত রাখে, সে সদা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কম্পিত থাকে, অতএব সদা-সর্বদা যে আল্লাহর কথা স্মরণ রাখে, সদা-সর্বদা যে আল্লাহর ভয়ে কম্পিত থাকে, সে তো আল্লাহর আপন মানুষ। তাই আল্লাহ পাক আপন হিসেবে তাকে চিহ্নিত করবেন এবং তাঁর আরশের নীচে তাকে ছায়া দান করবেন। আর যার ক্ষমতা নেই, শক্তি নেই, সে জুলুম থেকে বিরত থাকলে তার মধ্যে এমন কোন আল্লাহর আপন হওয়ার মত কৃতিত্ব ফুটে ওঠে না। ফারসিতে প্রবাদ আছে–

گدا گر تو ضع کند خوئے اوست۔

এই প্রবাদের ভাবার্থ হল– যার টাকা পয়সা আছে, ধন-সম্পদ আছে সে যদি তাওয়াজু বা বিনয়ের অধিকারী হয়, তাহলে তার বিনয়ের মূল্য আছে। আর যে ফকীর, সে যদি বিনয় দেখায় তাহলে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

তার সেই বিনয়ের কোন মূল্য নেই। কারণ তার মধ্যে বিনয় ছাড়া অহংকার দেখানোর মত আছেই বা কি? তাই যার ক্ষমতা আছে সে যদি আল্লাহকে স্মরণ রেখে জুলুম থেকে বিরত থাকে, তাহলে সেটার মূল্য অনেক। তাই ক্ষমতার অপব্যবহার না করলে আল্লাহ পাক এর ওছীলায় তাকে আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। এই হল প্রথম প্রকারের লোক যারা কেয়ামতের দিন আরশের নীচেয় ছায়া পাবে।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল–

وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ.

অর্থাৎ, যারা যৌবনে আল্লাহর ইবাদতের জন্য তৎপর হয়।

আমরা তো বয়স হলে খুব আল্লাহকে স্মরণ করি, যৌবন বয়সে আল্লাহকে তেমন স্মরণ করি না। যৌবনের সময় মনে করি, এই বয়সটা তো ফূর্তিফার্তির বয়স, এখন কি ইবাদতের বয়স হয়েছে? অনেক গার্জিয়ানও এমন আছে, যারা তাদের ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সে ইবাদত-বন্দেগী শুরু করলে মনে করেন বা মুখে বলেও থাকেন যে, এখন কি এসবের বয়স হয়েছে? এখন তো লেখাপড়া করার বয়স। তাদের ভাবখানা এমন যে, ইবাদত-বন্দেগী করার বয়স হল যখন বৃদ্ধ হবে, যখন কোমর বাঁকা হয়ে আসবে, যখন দুনিয়ার কোন কিছু করার দৈহিক ক্ষমতা আর থাকবে না তখন। তারা উল্টো বুঝে বসে আছে, তারা যৌবনে ইবাদতকে পছন্দ করে না, অথচ আল্লাহ, আল্লাহর রসূল যৌবন বয়সে ইবাদতকেই বেশী পছন্দ করেন। বুড়া হয়ে গেলে কমর যখন বাকা হয়ে যায়, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর, সোজা হয়ে বসার, সঠিক ভাবে রুকু করার যখন কোন ক্ষমতা থাকেনা, তখন ইবাদত করার কী মূল্য? যারা যৌবনের উচ্ছলতাকে উপেক্ষা করে ইবাদত করছে, যৌবনের পাপের চাহিদাকে উপেক্ষা করে ইবাদত করছে, তাদের ইবাদত আর যাদের এক পা কবরে চলে গেছে তাদের ইবাদত কখনই সমান হতে পারে না। যৌবনে ইবাদতের মূল্য অনেক বেশী। কারণ তাদের ইবাদত করতে নফসের সাথে মুজাহাদা বেশী করতে হয়। তাই যারা যৌবনে ইবাদতের জন্য তৎপর হয়, তারা আল্লাহ পাকের বিশেষ পছন্দের মানুষ হয়ে যায়। তাই বিশেষ পছন্দের মানুষ হিসেবে আল্লাহ পাক তাদেরকে আরশের নীচে ছাঁয়া দান করবেন। এই হল দ্বিতীয় প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন।

তৃতীয় প্রকারের লোক হল–

وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ.

অর্থাৎ, যার অন্তর মসজিদের সাথে লাগানো থাকে।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নামায পড়ার পর মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু আবার নামাযের জন্য মসজিদের আসার কথা তার মনের মধ্যে জাগ্রত থাকে। এ লোকের অবস্থা এমন যে, মসজিদ থেকে যেন বের হতে তার মনে চায় না কিন্তু প্রয়োজনের তাগীদে তাকে বের হতে হয়েছে। সংসার ধর্ম করা, সমাজ- সমাজিকতার কাজ করা, আয়-উপার্জনের কাজ করা এগুলো তার করতে হয়, এই প্রয়োজনে সে বের হয়েছে, কিন্তু আসলে তার মন লাগানো রয়েছে মসজিদের সাথে। আবার যখন সে মসজিদে ফিরে আসে, তখন সে এতমিনান বা প্রশান্তি বোধ করে। আবার প্রয়োজনে বের হয় কিন্তু বের হতে তার মনে চায় না। আবার ফিরে আসলে তার এতমিনান হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর দরবারের সাথে তার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাহলে এরূপ লোকও আল্লাহর খাস লোক, তারা খাঁটি মু'মিন। তাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর আরশের নীচে তাদেরকে ছায়া দান করবেন। আর যদি এর উল্টো হয় যে, মসজিদে এসেছি কোন রকম নামায শেষ হতে পারলেই মনের শান্তি, কখন বের হতে পারব এই চিন্তা, তাহলে তারা খাঁটি মু'মিনের গুণে গুণান্বিত নয়। এর একটা সুন্দর উপমা দিয়ে বলা হয়েছে,

اَلْمُؤْمِنُ فِى الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكِ فِى الْمَاءِ وَالْمُنَافِقُ فِى الْمَسْجِدِ كَالطَّيْرِ فِى الْقَفَصِ. (قال العجلونى لم اعرفه حديثا وان اشتهر بذالك. ويشبه ان يكون من كلام مالك بن دينار كذا فى كشف الخفاء ومزيل الالباس)

অর্থাৎ, মসজিদে আসলে মু'মিনের অবস্থা এমন হয় যেমন পানিতে মাছের অবস্থা। আর মুনাফেকের অবস্থা মসজিদে আসলে এমন হয় যেমন খাচার মধ্যে পাখির অবস্থা।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– মাছকে যদি পানি থেকে উপরে তুলে ফেলা হয়, ডাঙ্গায় তোলা হয়, তাহলে মাছের ভিতর অস্বস্তি এসে যায়, তার মরণ আবস্থা হয়ে যায়, পানিতে ফিরে যাওয়ার জন্য সে ছটফট শুরু করে দেয়, এর বিপরীত পনিতে ছেড়ে দেয়া হলে তার খুব এতমিনান এসে যায়, স্বস্তি বোধ করতে থাকে। মু'মিনের অবস্থাও এরকম। মসজিদে আসলে তার খুব ভাল লাগে, আর যতক্ষণ বাইরে থাকে, ততক্ষণ তার ভাল লাগে না, আবার মসজিদে আসার জন্য সে ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীত মসজিদে মুনাফেকদের অবস্থা হল পাখিকে যদি খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয় সেই পাখির অবস্থা যেমন। খাঁচায় বন্দী পাখি কোন রকমে একটু ছাড় পেলেই উড়াল দেয়। খাঁচার বাইরে যেতে পারলেই সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তদ্রূপ মুনাফেকদের অবস্থা হল মসজিদ থেকে বের হতে পারলেই যেন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আমরা প্রত্যেকেই বুঝি আমাদের কার কলবের হালাত কি! আল্লাহ পাক আমাদের কলবের হালাতকে দোরস্ত করে দেন। সর্বদা মসজিদের সাথে যেন আমাদের দিল লাগা থাকে। আমরা যে আল্লাহর খাস লোক হতে পারি।

যাহোক মসজিদের সাথে যাদের দিল লাগা থাকে, তার হল তৃতীয় প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন।

চতুর্থ প্রকারের লোক হল–

وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, ঐ দুই জন লোক, যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে। তাদের ভালবাসা থাকা কিংবা ভালবাসা না থাকা উভয়টা হয় আল্লাহকে কেন্দ্র করে।

এখানে বোঝানো হয়েছে– তাদের ভালবাসা দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে, দুনিয়ার কোন স্বার্থে নয় বরং আল্লাহকে কেন্দ্র করে। আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসা কিংবা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসা বর্জন– এর একটা দৃষ্টান্ত হল হযরত আলী (রা.)-এর একটা ঘটনা। একদিন এক ইয়াহুদী হযরত আলী (রা.)-এর সামনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালি দিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া জঘন্য ধরনের বে-আদবী এবং জঘন্ন ধরনের কুফ্‌রী। হযরত আলী (রা.) বাহাদূর মানুষ। তার সামনে এরকম অবস্থা ঘটছে। তিনি সাথে সাথে লোকটাকে ধরে আছাড় দিয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ফেলে দিলেন। তার বুকের উপরে চড়ে বসলেন এবং তলোয়ার নিয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কারণ কাফের মুরতাদকে হত্যাই করে দিতে হয়। লোকটা নীচেয় থেকে হযরত আলী (রা.)-এর মুখে থুথু মেরে দিল। থুথু মারার সাথে সাথে হযরত আলী (রা.) লোকটাকে ছেড়ে দিলেন, আর তাকে হত্যা করলেন না। তখন সাথী সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি তার বুকের উপরে চড়ে বসেছেন, হাতে তলোয়ার, তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন আর এই অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিলেন! থুথু মেরেছে বলে তো আরও বেশী রাগ হয়ে তাড়াতাড়ী তাকে হত্যা করে দেয়ার কথা। হযরত আলী (রা.) বললেন যে, আগে তার প্রতি আমার যে রাগ হয়েছিল সেটা ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে রাগ যে, সে আল্লাহর রসূলকে গালি দিয়েছে, আমি মুসলমান হয়ে কী করে বরদাশত করতে পারি! এই রাগটা ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে রাগ। কিন্তু যখনই সে আমার মুখে থুথু দিয়েছে, তখন আমার যে রাগ এসেছে সেটা হল আমার ব্যক্তিগত রাগ। অতএব এ অবস্থায় যদি তাকে হত্যা করি তাহলে সেটা হবে আমার ব্যক্তিগত রাগে হত্যা করা। এটা হবে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা। বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সব আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হওয়া চাই। আগে ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে, আর এবার হল ব্যক্তিগত শত্রুতা, একারণে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। দেখা গেল মনের উপরে সাহাবায়ে কেরামের কতটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। এটাই হল আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা।

আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসার আর একটা নমূনা শুনুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রা.)কে ভালবাসতেন। কি জন্য ভালবাসতেন? বেলালের কোন ধন-সম্পদ ছিল! বেলাল তো ছিল গোলাম, মুসলমান হওয়ার পরেও তিনি অনেক দিন গোলাম ছিলেন। তার ধন-সম্পদ কিছু ছিল না, আর চেহারাতো হাবশী চেহারা– মোটা ঠোঁট, কাল বর্ণ। এই হাবশী বেলালকে রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসতেন। কি জন্য তাকে ভালবাসতেন? আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসতেন। বেলাল হাবশীও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসতেন। কত ভালবাসা ছিল তার একটা ঘটনা শুনুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর বেলাল হাবশী (রা.) আর মদীদনায় থাকতে পারেননি। যেখানে থেকে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, সেখানে আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখা যাবে না– এটা তিনি সহ্য করতে পারেননি। তিনি মদীনা ছেড়ে কুফায় চয়ে গেছেন। অনেক দিন আর মদীনায় আসেননি। একদিন স্বপ্নে দেখলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেন, বেলাল! এ কী জুলুম চলছে? তুমি আমার কাছে আস না কেন? তিনি ঘুম থেকে উঠে পাগলের মত দৌড় দিয়েছেন। সোজা মদীনায় চলে এসেছেন। এই যে বেলাল হাবশীকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালবাসতেন, এই ভালবাসার পেছনে দুনিয়ার কোন স্বার্থ ছিল না। এটা ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা।

যে ব্যক্তির ভালবাসা, শত্রুতা, রাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি মনের সব চেতনা আল্লাহকে কেন্দ্র করে হবে, তার অর্থ হল তার মন সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আর যে ব্যক্তির মন এভাবে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হবে অবশ্যই সে আল্লাহর খাস মানুষে পরিণত হবে। তাই কেয়ামতের দিন আল্লাহর খাস বান্দা হিসেবে তাকে আরশের নীচে ছায়া দান করা হবে। এই হল চতুর্থ প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কেয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পঞ্চম প্রকারের লোক হল–

وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয়া এবং রূপ সৌন্দর্যের অধিকারীণী নারী যেনার দিকে আহবান করে আর সে এই বলে যেনা থেকে বিরত থাকে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

এখানে বোঝানো হয়েছে– ঐ ব্যক্তিও আরশের ছায়া পাবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে তার প্রেমের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। দুনিয়ার কোন সুন্দরী এবং বংশীয়া নারীও যদি তাকে অপকর্মের দিকে আহবান করে, তাহলে সে আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থাকে। এর অর্থ হল সে তার প্রেমের চেতনাকে, তার যৌন উচ্ছলতাকে আল্লাহর ভয়ে বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের অনেকের জীবনে এরকম মুহূর্ত আসতে পারে, তখন যদি আমরা আল্লাহর ভয়ে এই পর্যায়টা উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে আমরাও ইনশাআল্লাহ কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া লাভ করতে পারব, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। যাহোক এই হল পঞ্চম প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কেয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন।

ষষ্ঠ প্রকারের লোক হল–

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করে এমন গোনপভাবে যে, তার ডান হাত যা ব্যয় করে তার বাম হাত তা জানতে পারে না।

হাতের তো জানার ক্ষমতা নেই। এখানে ডান হাত ব্যয় করে বাম হাত জানতে পারে না– এ বলে বোঝানো হয়েছে যে, কাছের মানুষও জানতে না পারে এভাবে গোপনে ব্যয় করে। এখানে একথা বোঝানো হয়নি যে, প্রকাশ্যে দান করা নিষেধ এবং প্রকাশ্যে দান করলে ছওয়াব পাওয়া যায় না। অবশ্যই নিয়ত যদি ভাল থাকে তাহলে প্রকাশ্যে দান করাতেও ছওয়াব পাওয়া যায়। আমি যদি প্রকাশ্যে দান-সদকা করি এই নিয়তে যে, আমার দান-সদকা করা দেখে অন্যরাও দান-সদকা করতে উদ্বুদ্ধ হবে, তাহলে এরকম প্রকাশ্যে দান-সদকা করাও উত্তম। তবে সাধারণত দান-সদকা করার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে এই রিয়া থাকতে পারে যে, মানুষে আমাকে দান করতে দেখলে আমাকে দানশীল বলবে বা আত্মীয়-স্বজনকে দিলে বলবে আত্মীয়-স্বজনের খুব খোঁজ খবর নেয়, এই ধরনের রিয়ার চিন্তা বা গলত চিন্তা মনের ভিতরে এসে যায়। তাই এখানে গোপনে দান করার কথা বলা হয়েছে, যাতে রিয়ার চিন্তা আসতে না পারে এবং দান সম্পূর্ণ ইখলাছের সাথে হয়, একান্তই আল্লাহকে রজি-খুশী করার জন্য হয়। যারা এরকম একান্তই আল্লাহকে রজি-খুশী করার জন্য ব্যয় করবে তারাও আল্লাহর খাস মানুষ কারণ, তারা যেন দুনিয়ার কোন কিছু বোঝে না, দুনিয়ার কোন স্বার্থ বোঝে না, একটু সুনাম হবে, মানুষে একটু ভাল বলবে দুনিয়ার এই সামান্যতম স্বার্থও তারা উদ্ধার করতে চায় না। কোন স্বার্থ উদ্ধার করা ছাড়াই নিজের কষ্টে উপার্জন করা সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করল। এমন করলে সে আল্লাহর খাস মানুষে পরিণত হয়, আল্লাহর একান্ত মানুষে পরিণত হয়। তাই খাস বান্দা হিসেবে আল্লাহ পাক আরশের নীচে ছায়া দান করবেন।

এই হল ষষ্ট প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কেয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

সপ্তম প্রকারের লোক হল–

وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার চোখ অশ্রু ঝরাতে থাকে।

যে ব্যক্তি মনের আবেগ মিশিয়ে, মনের মাধুরী মিশিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে আর মনে থাকে আল্লাহর চিন্তা-চেতনা, মনে থাকে পরকালের চিন্তা-চেতনা, মনে থাকে জাহান্নামের ভয়, আযাবের ভয়, এই ভয়ে সে কাঁদতে থাকে, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে, এ অবস্থা যার হয়, সে তো আল্লাহর খাস মানুষে পরিণত হয়। তাই কেয়ামতের দিন আল্লাহর খাস বান্দা হিসেবে তাকে আরশের নীচে ছায়া দান করা হবে।

এই হল সাত শ্রেণীর মানুষ। ইনসাফদার শাসক, যৌবন বয়সে যারা ইবাদত করে, যাদের অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লাগানো থাকে, যারা একে অপরকে ভালবাসে কিংবা ভাল না বাসে এটা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, যারা আল্লাহর জন্য দুনিয়ার প্রেমকে বিসর্জন দেয় এবং যৌবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, যারা রিয়া মুক্ত হয়ে একান্তই আল্লাহকে রাজি-খুশী করার জন্য সম্পূর্ণ এখলাছের সাথে সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা মনের আবেগ মিশিয়ে গোপনে আল্লাহর যিকির করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে থাকে।

আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন এই সাত প্রকারের লোককে আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। আরশের নীচে ছায়া দান করবেন তার কি অর্থ? তার এই অর্থ হতে পারে না যে, কেয়ামতের ময়দানে আরশের নীচে ছায়া দান করবেন পরে আবার জাহান্নামে পাঠাবেন। এ অর্থ হতে পারে না। বরং তারা আল্লাহর খাস মানুষ, তাই প্রথম থেকেই তাদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়া শুরু হবে। ময়দানে গরমের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আরশের নীচে ছায়া দেয়া হবে, তারপর জাহান্নামের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য জান্নাতে পাঠানো হবে। তবে হাঁ ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি জরুরী ইবাদতগুলো অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে। ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি জরুরী কাজগুলো করার পর এই আমলগুলো থাকলে এর ওছীলায় আল্লাহ পাক তাকে ময়দানে হাশরে আরশের নিচেয় ছায়া দান করবেন তারপর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই সাত শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমাদের জন্য যেন আরশের নীচেয় ছায়া বরাদ্দ হয়। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং - ১৬

৮ টি বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَخْلَصَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ لِلْاِيْمَانِ وَجَعَلَهٗ سَلِيْمًا وَلِسَانَهٗ صَادِقًا وَنَفْسَهٗ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيْقَتَهٗ مُسْتَقِيْمَةً وَجَعَلَ اُذُنَهٗ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهٗ نَاظِرَةً فَاَمَّا الْاُذُنُ فَقَمِعٌ وَاَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِّمَا يُوْعٰى الْقَلْبُ وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهٗ وَاعِيًا. (رواه أحمد في مسنده برقم ٢١٣٤٨ وإسناده ضعيف.)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা বেশ কয়েক জুমুআ ধরে এই আলোচনা করে আসছি যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের ফায়দা ও উপকারিতার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে নছীহত করতেন। নছীহতের মধ্যে মানুষের ফায়দা। কুরআনে কারীমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নছীহত করার জন্য হুকুমও দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. (সূরা যারিয়াত: ৫৫)

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি নছীহত কর। অবশ্যই নছীহত তথা উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে।

আল্লাহর এই হুকুম পালন করার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময় সুযোগ পেলেই এবং নছীহত শোনার জন্য মানুষকে প্রস্তুত পেলেই নছীহত করতেন। একদা একটা দীর্ঘ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নছীহত করে আটটা কথা বললেন। হাদীছটি মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আটটা নছীহত সম্বন্ধে এও বললেন যে, এই আটটা বিষয় যার মধ্যে থাকবে, সে নিশ্চিত কামিয়াব হবে, সে নিশ্চিত সফলকাম হবে। এই আটটা বিষয়ের মধ্যে

প্রথম বিষয় বলা হয়েছে–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَخْلَصَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ لِلْاِيْمَانِ.

অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি নিশ্চিত কামিয়াব হবে, যে তার কলবকে ঈমানের জন্য একান্ত করে নিবে।

কলব বা অন্তর হচ্ছে একটা পাত্রের মত। এই পাত্রকে ঈমানের জন্য একান্ত করে নিতে হবে। অর্থাৎ, এই পাত্রে একমাত্র ঈমানী চেতনা ব্যতীত অন্য কোন চেতনা থাকতে পারবে না। ঈমানী চিন্তা-চেতনা ব্যতীত আর যত বাজে চিন্তা-চেতনা আছে তা এই পাত্র থেকে বের করে দিতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

যত ঈমানী চিন্তা-চেতনা তথা ভাল চিন্তা-চেতনা ও ভাল ধ্যান-ধারনা আছে তা দিয়ে অন্তরকে ভরে দিতে হবে।

কলব তথা মনের ভিতরে কোন ধ্যান-ধারণা ঢোকার রাস্তা হল দুইটা। একটা হল কান, আরেকটা হল চোখ। কান দিয়ে যা শোনে তা অন্তরে প্রবেশ করে, আর চোখ দিয়ে দেখে যা দেখে তা অন্তরে প্রবেশ করে। এই দুই পথ দিয়েই সব চিন্তা-চেতনা, সব ধ্যান-ধারণা, সব আকীদা-বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীছের শেষভাগে বলেছেন,

فَاَمَّا الْاُذُنُ فَقَمِعٌ وَاَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِّمَا يُوْعٰى الْقَلْبُ.

অর্থাৎ, অন্তরে যা সংরক্ষিত হয় কান হল তার জন্য কাপ আর চোখ হল পাত্র।

এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিলকে শিশি বোতলের সাথে আর কানকে কাপের সাথে উপমা দিয়েছেন। শিশি বোতলের মধ্যে তেল ইত্যাদি ঢোকানোর জন্য একটা কাপ থাকে, ঐ কাপের ভিতর দিয়ে তেল ইত্যাদি শিশি বোতলের মধ্যে ঢোকানো হয়। তদ্রূপ কলব হল শিশি বোতলের ন্যায় আর কান হল কাপের ন্যায়। কানের মধ্য দিয়ে কলবের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। যে জিনিস আমরা শিশি বোতলের মধ্যে ঢোকাতে চাই না, সে জিনিস কাপের মধ্যে দেই না। তদ্রূপ যে চিন্তা-চেতনা দিলের মধ্যে ঢোকানোর নয়, সেরকম কোন কথা কানের মধ্যে ঢোকানো চাইনা। খাহেশাতে নফছানী দিলের মধ্যে ঢোকানো চা ইনা, তাই গান-বাদ্য যা খাহেশাতে নফছানীকে উস্কানী দেয়, তা কানের মধ্যে ঢোকাবো না। মানুষের প্রতি কু-ধারণা দিলের মধ্যে ঢোকাতে চাই না তাই মানুষের গীবত-শেকায়েত কানের মধ্যে ফেলানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ গীবত-শেকায়েত শুনেই দিলের মধ্যে অন্যের ব্যাপারে কু-ধারণা জন্মে। এমনিভাবে যে চিন্তা-চেতনা দিলের মধ্যে ঢোকানো উচিত নয় সেরকম কথা কানের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। কারণ কান হল দিলের কাপ। এই কাপের মধ্যে কোন জিনিস ঢোকানোর পূর্বেই বিবেচনা করে নিতে হবে যে, এখানে ঢোকালেই দিলের মধ্যে ঢুকে যাবে, এটা ঢোকানো ঠিক হবে কি না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আরও একটা উপমা পেশ করেছেন। তিনি চোখকে অন্তরের বিষয়ের জন্য আধার বা পাত্র। এই পাত্রে যা কিছু রাখা হবে তা এই পাত্র হয়ে কলবের মধ্যে প্রবেশ করবে।চোখ খুললেই সেই চোখ দিয়ে নানা কিছু দেখা হয় আর তার মাধ্যমে দিলের মধ্যে নানা রকম চিন্তা-চেতনা প্রবেশ করে। অতএব চোখ খোলার পূর্বে অর্থাৎ, চোখ দিয়ে কোন কিছু দেখার পূর্বেই চিন্তা ভাবনা করে নিতে হবে এ জিনিস দেখা ঠিক হবে কি না। যে রকম চিন্তা-চেতনা মনের মধ্যে ঢুকতে দেয়া ঠিক নয় সেরকম জিনিস দেখা যাবে না। কারণ, কোন চোখ দিয়ে কোন জিনিস দেখা অর্থ হল সেটা দিলের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

যাহোক প্রথম নছীহতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কলবকে ঈমানের জন্য একান্ত করে নিতে হবে অর্থাৎ, কলবের মধ্যে ঈমান ও ঈমানী চেতনা বিরুদ্ধ কোন চিন্তা-চেতনা ঢুকতে দেয়া যাবে না। এই হল আটটা বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দ্বিতীয় বিষয় বলা হয়েছে–

وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا.

অর্থাৎ, যে তার অন্তরকে মুক্ত করে নিবে। অর্থাৎ, অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে নিবে।

নছীহতের এ অংশে আধ্যাত্মিক পরিশোধনের কথা বলা হয়েছে, আত্মার রোগ দূর করতে বলা হয়েছে। কামিয়াব হওয়ার জন্য, সফলতা লাভ করার জন্য শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী বিধি-বিধান পালনই যথেষ্ট নয়। বরং বাতিনী বিধি-বিধান তথা আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পালন করাও জরুরী। সেমতে কামিয়াব হওয়ার জন্য, সফলতা লাভ করার আত্মার রোগ-ব্যধি থেকে আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই ব্যক্তি কামিয়াব হবে যে তার কলব তথা আত্মাকে মুক্ত করবে অর্থাৎ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি আত্মার রোগ থেকে মুক্ত করবে। এ হল দ্বিতীয় বিষয়।

তৃতীয় বিষয় বলা হয়েছে–

وَلِسَانَهُ صَادِقًا.

অর্থাৎ, যে তার জবানকে সত্য বানাবে।

এখানে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, কামিয়াব তথা সফল হতে চাইলে জবানকে সত্যের বাইরে ব্যবহার করতে পারবে না। এই জবান শুধু সত্য কথার জন্যই ব্যবহৃত হতে পারবে, কোন মিথ্যা কথার জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে না। জবান আল্লাহ তাআলার দেয়া বড় এক নেয়ামত। যার জবান নেই, যে কথা বলতে পারে না সে বোঝে এটা কত বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলার দেয়া এই নেয়ামতের অপব্যবহার না করা চাই। জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা চাই। নিয়ন্ত্রণ না করলে এই জবান দ্বারা অনেক বড় পাপ হতে পারে। জবান সম্পর্কে বলা হয়–

فَإِنَّ اللِّسَانَ جِرْمُهُ صَغِيْرٌ وَجُرْمُهُ كَبِيْرٌ.

অর্থাৎ, জবানের আকার খুব ছোট, কিন্তু এর অপরাধ অনেক বড়।

মানুষের জবান আর যৌনাঙ্গ দ্বারাই সবচেয়ে পাপ বেশী হয়। এ দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অনেক পাপ থেকে মুক্ত থাকা যায়। এ জন্য এক হাদীছে এসেছে–

مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٦٤٧٤)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহবা আর যৌনাঙ্গকে হেফাজত করার দায়িত্ব নিয়ে নিবে, তাহলে আমি তোমাদেরকে জান্নাতে পৌছানোর দায়িত্ব নিয়ে নেব।

অর্থাৎ, জিহবা আর যৌনাঙ্গ এ দুটোর অপব্যবহার করবে না– এ দায়িত্ব নিয়ে নাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে জান্নাতে পৌছানোর দায়িত্ব নিয়ে নেব। অনেক বড় কথা। জান্নাত হাছিল করার কত সহজ পন্থা এটা।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

আমরা যদি আজ থেকে এই হাদীছের উপরে আমল শুরু করি এবং আজ থেকে এদুটো অঙ্গকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমি নিয়ে নেই যে, আজ থেকে আর এ দুটো অঙ্গের অপব্যবহার করবনা, তাহলে আল্লাহর রসূর কেয়ামতের দিন আমাদেরকে জান্নাতে পৌছানোর যিম্মাদার হয়ে দাঁড়াবেন।

যাহোক এই হল তৃতীয় বিষয়। এই তৃতীয় বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবানকে সত্য বানানোর কথা বললেন।

চতুর্থ বিষয় বলা হয়েছে–

وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً.

অর্থাৎ, যে তার মনকে এতমীনান সম্পন্ন বানায়।

মনকে আল্লাহর যিকির দ্বারা এতমীনানপূর্ণ তথা প্রশান্তিপূর্ণ বানাতে হবে। যারা আল্লাহ অভিমুখী লোক তাদের মন যিকির দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ অভিমুখী লোকদের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ. (সূরা রা'দ: ২৮)

অর্থাৎ, তারা ঐসব লোক, যারা ঈমান রাখে এবং আল্লাহর যিকির দ্বারা তাদের কলব প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখ আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে থাকে।

আল্লাহর যিকির অর্থাৎ, আল্লাহর স্মরণ। এখানে আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্মরণ কথাটা অনেক ব্যাপক। আমরা যে দ্বীনের কথা বার্তা শুনি, এটাও যিকির, এর মাধ্যমেও আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। ইবাদত-বন্দেগী করাও যিকির, এর মাধ্যমেও আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। মুখে আল্লাহ আল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি রটানোও যিকির, এগুলির মাধ্যমেও আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। সারকথা– যে কোনভাবে আল্লাহকে স্মরণ করাই যিকির। এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ অভিমুখী মানুষ তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করলে প্রশান্তি আসে।

অতএব এই চতুর্থ বিষয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝাচ্ছেন যে, কামিয়াব বা সফল ঐসব ব্যক্তি, যারা এই পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যে, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাদের অন্তরে প্রশান্তি বোধ হয়। আমাদের অনেকের অবস্থা হল দ্বীনের কথাবার্তা, যিকির-আযকার, তালীম তেলাওয়াত, ইবাদত-বন্দেগীতে অন্তরে প্রশান্তি বোধ হয় না বরং নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা, খেলাধূলা, মদ-নেশা ইত্যাদিতে মনে প্রশান্তি বোধ হয়। এমন হলে বুঝতে হবে আমরা এখনও কামিয়াবীর লাইনে উঠে আসতে পারিনি। এ অবস্থা থেকে উঠে আসতে হলে নফছের সাথে মুজাহাদা করে ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, তালীম তেলাওয়াত ইত্যাদি বাড়াতে হবে, বাড়াতে বাড়াতে এক পর্যায়ে মনের এমন অবস্থা হবে যে, মন এগুলিতে প্রশান্তি বোধ করতে শুরু করবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কামিয়াব ঐ ব্যক্তি যে তার মনকে এমন বানায় যে, আল্লাহর স্মরণে তা প্রশান্তি পায়।

যিকিরের দ্বারা যে কলবে প্রশান্তি আসে তার একটা প্রমাণ হল– যে কোন কারণে আপনার অন্তরে টেনশন পেরেশানী এসেছে, কোনভাবে সে টেনশন পেরেশানী দূর হচ্ছে না, তাহলে উযূ করে, পাক-পবিত্র হয়ে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা শুরু করুন, দেখবেন আপনার টেনশন পেরেশানী

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দূর হয়ে যাবে। কুরআনের তেলাওয়াতও একটা যিকির, এই যিকির দ্বারা আপনার মনের পেরেশানী দূর হবে এবং প্রশান্তি এসে যাবে। কেউ যখন যিকির শুরু করবে, তার সব পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।

যিকিরের দ্বারা যে কলবে প্রশান্তি আসে তার আর একটা প্রমাণ হল ওয়াজ নছীহত ও তালীমের মজলিস। যাদের টেনশন পেরেশানীতে ঘুম আসে না, ঘুমের টেবলেট খেয়েও ঘুম আসেনা, তাদেরও দেখা ওয়াজ নছীহত ও তালীমের মজলিসে বসলে ঘুম এসে যায়। কেন ঘুম আসে? এর কারণ হল– ওয়াজ নছীহত ও দ্বীনী তালীম হল এক প্রকার যিকির, এই যিকির দ্বারা কলবের টেনশন ও পেরেশানী দূর হয়ে যায়, অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, যার ফলে ঘুম এসে যায়। যদিও এই ঘুম এসে যাওয়া নিশ্চিত কোন বিষয় নয় যে, এটা ওয়াজ নছীহত ও দ্বীনী তালীমের কারণেই হচ্ছে। কারও ঘুম নাও আসতে পারে। হতে পারে এ কারণেই হচ্ছে। তবে যিকির দ্বারা যে কলবে প্রশান্তি আসে এটা নিশ্চিত। এটা কুরআন হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত, বাস্তব অভিজ্ঞতায়ও প্রমাণিত।

এ হল চতুর্থ বিষয় যে, আল্লাহর যিকির দ্বারা মনকে এতমীনানপূর্ণ তথা প্রশান্তিপূর্ণ বানাতে হবে। তারপর

পঞ্চম বিষয় বলা হয়েছে–

وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً.

অর্থাৎ, যে তার স্বভাব-চরিত্রকে সোজা তথা সুস্থ বানায়।

স্বভাব-চরিত্র সোজা থাকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারও স্বভাব বাকা হয়ে গেলে তাকে ভাল কথা মানানো যায় না। কারও স্বভাব বাকা হয়ে গেলে সে সোজা কথা সোজা করে না বুঝে বাকা করে বোঝে। কারও স্বভাব বাকা হয়ে গেলে সে সোজা পথে না চলে বাকা পথে চলে। কারও স্বভাব বাকা হয়ে গেলে মানুষের সাথে তার কথা-বার্তা, লেন-দেন, আচার ব্যবহার, সমাজ-সামাজিকতা সব কিছু অস্বাভাবিক হয়ে যায়। এভাবে স্বভাব বাকা হওয়ার কারণে সে সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে যায়। সিরাতে মুস্তাকীম অর্থও সোজা পথ। সিরাতে মুস্তাকীমের সবকিছুই সোজা স্বভাবের অনুকূল। তাই বাকা স্বভাব হলে সিরাতে মুস্তাকীমে চলা যায়না। তাই দ্বীনের উপর চলার জন্য স্বভাব-চরিত্র সোজা থাকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দুনিয়াতে যারা সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলে অর্থাৎ, সোজা পথে চলে, কেয়ামতের দিনও তারা পুল সিরাত দিয়ে পার হয়ে যেতে পারবে। দুনিয়ার সিরাতে মুস্তাকীমই আখেরাতে পুলসিরাতে রূপ নিবে। তাই দুনিয়াতে যারা সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলতে পারবে, পরকালেও সে পুল সিরাতের উপর দিয়ে চলতে সক্ষম হবে, যদিও পুলসিরাত চুলের চেয়ে সরু এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। যাহোক পঞ্চম বিষয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাব-চরিত্রকে সোজা করার কথা বলেছেন। কামিয়াব তথা সফলকাম হলে হলে স্বভাব-চরিত্রকে সোজা করতে হবে।

ষষ্ঠ বিষয় বলা হয়েছে–

وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً.

অর্থাৎ, যে তার কানকে ভাল কথা শ্রবণকারী বানায়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এখানে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, কান দিয়ে ভাল কথা শোনা যাবে, খারাপ কথা শোনা যাবে না। কেননা, কান দিয়ে খারাপ কথা বা খারাপ কিছু শুনলে মনের ভিতর তার খারাপ প্রভাব পড়বে, ফলে তার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে যাবে এবং তার খারাপ মন-মানসিকতা তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করবে। এভাবে কান দিয়ে খারাপ কিছু শোনার ফলে সে খারাপ হয়ে পড়বে এবং তার জীবন ব্যর্থ হবে। পক্ষান্তরে কান দিয়ে ভাল কথা বা ভাল কিছু শুনলে তার মনের ভিতর ভাল প্রভাব পড়বে, ফলে তার মন-মানসিকতা ভাল হয়ে গড়ে উঠবে এবং তার ভাল মন-মানসিকতা তাকে ভাল পথে পরিচালিত করবে। এভাবে কান দিয়ে ভাল কিছু শোনার ফলে সে ভাল হয়ে গড়ে উঠবে এবং তার জীবন সফল হবে।

দেখা গেল মানুষের জীবন সফল বা ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে কানের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কামিয়াব বা সফলকাম হবে সেই ব্যক্তি যে তার কানকে ভাল কথা শ্রবণকারী বানায়।

এই হল ষষ্ট বিষয় যে, কানকে ভাল কথা শ্রবণকারী বানাতে হবে।

সপ্তম বিষয় বলা হয়েছে–

وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً.

অর্থাৎ, যে তার চোখকে ভাল জিনিস দর্শনকারী বানায়।

এখানে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, চোখ দিয়ে ভাল জিনিস দেখা যাবে, খারাপ জিনিস দেখা যাবে না। কেননা, চোখ খারাপ জিনিস দেখলে মনের ভিতর তার খারাপ প্রভাব পড়বে, ফলে তার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে পড়বে এবং তার খারাপ মন-মানসিকতা তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করবে। এভাবে চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখার ফলে সে খারাপ হয়ে পড়বে এবং তার জীবন ব্যর্থ হবে। পক্ষান্তরে চোখ দিয়ে ভাল জিনিস দেখলে তার মনের ভিতর ভাল প্রভাব পড়বে, ফলে তার মন-মানসিকতা ভাল হয়ে গড়ে উঠবে এবং তার ভাল মন-মানসিকতা তাকে ভাল পথে পরিচালিত করবে। এভাবে চোখ দিয়ে ভাল কিছু দেখার ফলে সে ভাল হয়ে গড়ে উঠবে এবং তার জীবন সফল হবে।

দেখা দেল মানুষের জীবন সফল বা ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে কানের মত চোখেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কামিয়াব বা সফলকাম হবে সেই ব্যক্তি যে তার চোখকে ভাল জিনিস দর্শনকারী বানাবে।

কান আল্লাহ তাআলার দেয়া বড় এক নেয়ামত। যার চোখ নেই সে বোঝে এটা কত বড় নেয়ামত। আল্লাহর দেয়া এত নেয়ামতকেআল্লাহর নাফরমানীর কাজে ব্যবহার না করা চাই।

যাহোক, এই হল সপ্তম বিষয় যে, চোখকে ভাল জিনিস দর্শনকারী বানাতে হবে।

অষ্টম বিষয় বলা হয়েছে–

وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا.

অর্থাৎ, আর নিশ্চিত কামিয়াব হবে সেই ব্যক্তি, যে তার অন্তরকে ভাল জিনিসের সংরক্ষণকারী বানাবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, অন্তরে শুধু মাত্র ভাল জিনিসকে স্থান দিতে হবে। অন্তরে শুধুমাত্র ভাল চিন্তা-চেতনাকে স্থান দেয়া যাবে, কোন খারাপ চিন্তা-চেতনাকে স্থান দেয়া যাবেনা। যে চিন্তা-চেতনাকে শরীয়ত সমর্থন করে সেটাই হল ভাল চিন্তা-চেতনা। অতএব শরীয়ত বিরোধী কোন চিন্তা-চেতনাকে মনে স্থান দেয়া যাবে না। কাউকে ক্ষতি করার চিন্তা মনে স্থান দেয়া যাবে না, কারণ, শরীয়ত সেটা সমর্থ করে না। কোন গোনাহের চিন্তা মনে স্থান দেয়া যাবে না, কারণ শরীয়ত সেটা সমর্থন করে না। কুরআন-হাদীছ বিরোধী কোন চিন্তা-চেতনা মনে স্থান দেয়া যাবে না, কারণ সেটা শরীয়ত সমর্থন করে না। অন্তরে কোন কু-সংস্কারকে স্থান দেয়া যাবেনা, কারণ শরীয়ত সেটা সমর্থন করে না। এমনিভাবে কোন খারাপ চিন্তা-চেতনা তথা শরীয়ত বিরোধী চিন্তা-চেতনাকে অন্তরে স্থান যাবে না, অন্তরে শুধু ভাল চেতনারই স্থান থাকবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি কামিয়াব ও সফলকাম হবে যে তার অন্তরকে ভাল জিনিসের সংরক্ষণকারী বানাবে।

এই হল অষ্টম বিষয় যে, অন্তরকে ভাল জিনিসের সংরক্ষণকারী বানাতে হবে।

সারকথা– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জীবনকে কামিয়াব তথা সফলকাম বানানোর জন্য, জীবনে কামিয়াব তথা সফল হওয়ার জন্য আটটি জিনিস করতে হবে। তাহল–

১. কলবকে ঈমান ও ঈমানী চেতনার জন্য একান্ত করে নিতে হবে,
২. অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে হবে,
৩. জবানকে সত্য বানাতে হবে,
৪. আল্লাহর যিকির তথা আল্লাহর স্মরণ দ্বারা মনে প্রশান্তি আসে মনকে এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে,
৫. স্বভাব-চরিত্রকে সোজা বানাতে হবে,
৬. কানকে শুধু ভাল কথার শ্রবণকারী বানাতে হবে,
৭. চোখকে শুধু ভাল জিনিসের দর্শনকারী বানাতে হবে,
৮. অন্তরকে শুধু ভাল জিনিসের সংরক্ষণকারী বানাতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই নছীহতগুলির উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, এই আটটা জিনিস অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং - ১৭

৯ টি বিশেষ নছীহত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَرَنِيْ رَبِّيْ بِتِسْعٍ خَشْيَةِ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدِ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِيْ وَاُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِيْ وَاَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ وَاَنْ يَّكُوْنَ صَمْتِيْ فِكْرًا وَنُطْقِيْ ذِكْرًا وَنَظْرِيْ عِبْرَةً وَاٰمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيْلَ بِالْمَعْرُوْفِ. (كذا في جامع الأصول للجزري برقم ٩٣١٧.)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের মধ্যে যা কিছু বলেছেন সবটাই নছীহত। তেমনি ভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন মানুষকে যা বলে গেছেন সবটাই নছীহত। কুরআন শরীফের অনেকগুলো নাম আছে, তার তার মধ্যে একটা নাম হল "যিকির"। যিকির অর্থ নছীহত। তাই কুরআন শরীফের সব কথাই হল আমাদের জন্য নছীহত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সব কথাও আমাদের জন্য নছীহত। এর মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নছীহত নামেই বিশেষ বিশেষ কিছু কথা বলে গেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ানের মধ্যে বললেন যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাকে ৯টা বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ, ৯টা বিষয়ে নছীহত করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া বা তাঁকে নছীহত করার অর্থ উম্মতকে নির্দেশ দেয়া, উম্মতকে নছীহত করা। আল্লাহ পাক তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন, কাজেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন এমনিতেই আদর্শ সমৃদ্ধ। তাঁকে নির্দেশ দেয়া বা তাঁকে নছীহত করার আর কোন প্রয়োজন নেই। অতএব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নছীহত করার উদ্দেশ্য হল মানুষকে নছীহত করা। যাহোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার প্রতিপালক আমাকে নয়টা বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তথা নছীহত করেছেন। সেই নয়টা বিষয়ের মধ্যে

প্রথম নম্বরে বলা হয়েছে–

خَشْيَةِ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

অর্থাৎ, গোপনে হোক, প্রকাশ্যে হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

এখানে সর্বাবস্থায় মনের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখতে বলা হয়েছে। মানুষের ইবাদত ঠিক হওয়ার জন্য, আমল ঠিক হওয়ার জন্য, যিন্দেগী ঠিক হওয়ার জন্য আল্লাহর ভয় হচ্ছে একটি মৌলিক বিষয়। যার ভিতরে আল্লাহর ভয় এসে যায় তার ইবাদত ঠিক হয়ে যায়। যার ভিতর আল্লাহর ভয় এসে যায় তার আমল ঠিক হয়ে যায়। যার ভিতর আল্লাহর ভয় এসে যায় সে গোনাহ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হয়। এভাবে আল্লাহর ভয় এসে গেলে গোটা যিন্দেগী দোরস্ত হয়ে যায়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমরা যখন পাপ করি, তখন আমাদের মনে আল্লাহর ভয়, অর্থাৎ, আল্লাহর শাস্তির ভয় জাগ্রত থাকেনা বলেই আমরা পাপ করতে পারি। আল্লাহর শাস্তির ভয় মনে জাগ্রত থাকলে পাপ করতে পারতাম না। একজন মানুষের মনে যদি এই চিন্তা জাগ্রত থাকে যে, আমার সামনে যে বাঙআছে তার ভিতরে বিষাক্ত সাপ আছে, তাহলে সে কখনোই ঐ বাক্সে মধ্যে হাত ঢোকাতে পারবে না। কারণ তার ভয় আছে হাত ঢুকালেই সাপে ছোবল মারবে, তাতে জীবন শেষ হয়ে যাবে। এই ভয়ে সে ঐ বাক্সে ভিতরে হাত দিতে পারবে না। দেখা গেল একটা ভয় তাকে এ বাক্সে হাত দেয়া থেকে বিরত রাখছে। তদ্রূপ যার মনে ভয় থাকবে যে, আমি পাপ কাজ করলে আমাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, এই ভয় যার ভিতরে জাগ্রত থাকবে, সে কোন পাপ কাজ করতে পারবে না। মুসলিম শরীফের একটা লম্বা হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে ঈমান-বিশ্বাস থাকে, সে যেনা করতে পারেনা। অর্থাৎ, যেনা করলে শাস্তি হবে এই বিশ্বাস যদি যার মধ্যে জাগ্রত থাকবে সে যেনা করতে পারবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে ঈমান-বিশ্বাস থাকে, সে শরাব খেতে পারে না। যার মধ্যে ঈমান-বিশ্বাস থাকে, সে ছিনতাই করতে পারে না। যার মধ্যে ঈমান-বিশ্বাস থাকে, সে লুটতরাজ করতে পারে না। ঈমান-বিশ্বাস থাকলে সে এ পাপগুলি করতে পারেনা, কারণ তার বিশ্বাসই তাকে এসব পাপ থেকে বিরত রাখবে।

এভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তথা আল্লাহর আযাবের বিশ্বাস মানুষকে বিরত রাখবে অর্থাৎ, পাপ থেকে বিরত রাখবে। যদি কারও মধ্যে এই বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা সদা সর্বদা আমার সবকিছু দেখেন, আমার গোপনটাও দেখেন, প্রকাশ্যটাও দেখেন, ভিতরেরটাও দেখেন বাইরেরটাও দেখেন। অন্যায় করলে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন এই বিশ্বাস যদি মনে সব সময় তাজা থাকে, তাহলে সে পাপ করতে পারবে না। আমরা প্রকাশ্যে অনেক পাপ কাজ থেকে বিরত থাকি, কিন্তু গোপনে যখন একাকি থাকি তখন মনে করি কেউ দেখবে না তখন অনেক পাপ কাজ করি। বোঝা গেল আমরা প্রকাশ্যে যে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকি সেটা আল্লাহর ভয়ে নয় বরং মানুষের ভয়ে বিরত থাকি। এখানেও একটা ভয়ই আমাদেরকে বিরত রাখে। কিন্তু মানুষ যেহেতু গোপনে দেখে না, তাই গোপনে পাপ করি। কিন্তু যখন এই বিশ্বাস এসে যাবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সর্বাবস্থায় দেখেন, গোপনেও পাপ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হব। দুনিয়ায় আর কারও ভয় গোপনীয় পাপ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারে না। কারণ আল্লাহ ব্যতীত গোপনীয় বিষয় আর কেউ অবগত নয়। দেশের আইন যত কড়া হোক, পুলিশ যত কড়া হোক, তবুও মানুষ গোপনে পর্দার আড়ালে যেয়ে পাপ করবে, যখন বুঝবে পুলিশের চোখ আমাকে দেখছে না, আইনের চোখ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তখন সে অপরাধ করবে। আইন থেকে গা বাচানোর জন্য ফাঁক-ফোঁকড় বের করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আল্লাহ পাক এমন যে, তাঁর থেকে কোন কিছু লুকানো যায়না, মনের মধ্যে যে চিন্তার উদয় হয় তাও আল্লাহ জানেন। আল্লাহর কাছে গোপনীয় বলে কিছুই নেই। কাজেই একমাত্র আল্লাহর চিন্তা ও আল্লাহ আযাবের ভয়ই মানুষকে সব রকমের অন্যায় অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে, আল্লাহর ভয় মানুষের যিন্দেগী দোরস্ত করে দিতে পারে। এজন্য প্রথম নছীহতে বলা হল যে, তুমি গোপনে হোক সদরে হোক, প্রকাশ্যে হোক, অপ্রকাশ্যে হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় মনের ভিতরে জাগ্রত রাখবে।

দ্বিতীয় নম্বরে বলা হয়েছে–

وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا.

অর্থাৎ, রাগের অবস্থায় থাক বা সন্তুষ্টির অবস্থায় থাক সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথা বলা।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এখানে বলা হয়েছে– তোমার মনের অবস্থা যেমন থাকুক, মন খুশী থাকুক বা রাগান্বিত থাকুক, সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথা বলতে হবে। সাধারণত আমাদের অবস্থা হল যখন আমাদের মধ্যে রাগ এসে যায় তখন আমাদের ব্যালেন্স থাকে না। রাগ এসে গেলে তখন ইনসাফ বে-ইনসাফির চিন্তা মন থেকে উধাও হয়ে যায়। তখন যা খুশী তাই মুখ থেকে বের হতে থাকে, যেমন ইচ্ছা তেমন সিদ্ধান্ত আসতে থাকে। এমন হতে পারবে না। ভিতরে রাগ থাকুক আর খুশী থাকুক সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথা বলতে হবে। সর্বাবস্থায় ব্যালেন্স থাকবে হবে। রাগের কারণেও ব্যালেন্স হারা হওয়া যাবে না, খুশীর চোটেও ব্যালেন্স হারা হওয়া যাবে না। কারও প্রতি রাগের কারণেও বে-ইনসাফী করা যাবে না, আবার কারও প্রতি খুশী থাকার কারণেও তার পক্ষ অবলম্বন করে ইনসাফ থেকে সরা যাবে না।

নছীহতের এ অংশে ব্যালেন্স রক্ষা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমরা যখন ব্যালেন্স হারা হয়ে যাই অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যাই, তখন এমন ধরনের কথাও বলে ফেলি যাতে অন্যের মনে কষ্ট আসে, তখন এমন ধরনের কাজও করে বসি যাতে অন্যের উপরে জুলুম হয়ে যায়, তখন এমন ধরনের আচরণও করে বসি যাতে সমাজ-সামাজিকতা নষ্ট হয়ে যায়। রাগের মুহূর্তে মানুষ অন্যের সাথে এমন আচরণ করে বসে যে পরে ক্ষমা চাইতে হয়। এই রাগের কারণেই সংসার পর্যন্ত ভাঙ্গা-ভাঙ্গি হয়ে যায়। রাগের মুহূর্তে ব্যালেন্স না থাকার কারণেই এগুলি হয়ে থাকে। নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে এমন হতে পারে না। নছীহতের এই অংশে এই ব্যালেন্স রক্ষার কথাই বলা হয়েছে। রাগের অবস্থায় হোক বা সন্তুষ্টির অবস্থায় হোক সর্বাবস্থায় ইনসাফের উপর অর্থাৎ, সঠিক অবস্থানের উপর অটল থাকতে বলা হয়েছে।

রাগের সময় মন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে চাইলে মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে তার বিভিন্ন পদ্ধতি কুরআন হাদীছে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে রাগের সময় তুমি দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, বসা থাকলে শুয়ে পড়বে কিংবা ঠান্ডা পানি পান করে নিবে বা উযূ করে নিবে। এগুলো করলে রাগ দমন হয়ে যায়। কারণ রাগ হল একটা উত্তেজনা, রাগ হল রক্তের মধ্যে এক ধরনের তেজীভাব এসে যাওয়া। এই উত্তেজনা এবং তেজীভাবের কারণেই বসা অবস্থায় কারও রাগ আসলে সে দাঁড়িয়ে যায়, শোয়া অবস্থায় রাগ এলে সে উঠে বসে। তাই বলা হয়েছে রাগের যে গতি তার উল্টোটা কর অর্থাৎ, দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়, বসা থাকলে শুয়ে পড়। তাহলে রাগের গতি ব্যাহত হবে। কিংবা ঠাণ্ডা পানি পান করে নাও বা উযূ করে নাও তাহলে রক্তের তেজীভাব কমে যাবে, রক্ত ঠান্ডা হবে, ফলে আর রাগ থাকতে পারবে না। আর রাগের কারণে মানুষের দ্বারা এই সব পাপ ও খারাবী সৃষ্টি হয় বলে শয়তান চায় মানুষ রাগান্বিত হোক। তাই রাগের পেছনে শয়তানেরও উস্কানী থাকে। এজন্য রাগ দমন করার পদ্ধতির মধ্যে এটাও বলা হয়েছে যে, রাগ এলে শয়তানকে তাড়ানোর জন্য "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম" পড়ে নিবে।

যখন কারও রাগ আসে তখন মনে হয় বাহাদূরের মত একটা কিছু ঘটিয়ে তছনছ করে ফেলব। একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারাই তখন বাহাদূরী মনে হয়। এই মনোভাব রাগকে আরও অগ্রসর করে দেয়। তাই এই মনোভাবকে দূর করার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (متفق عليه – البخاري برقم ٦١١٤ ومسلم برقم ٦٨٠٩)

অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি বাহাদূর নয় যে অন্যকে আছাড় দিয়ে ফেলতে পারে। বরং প্রকৃত বাহাদূর হল সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যাহোক এই দ্বিতীয় নছীহতে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় নম্বরে বলা হয়েছে–

وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى.

অর্থাৎ, অস্বচ্ছলতা হোক বা স্বচ্ছলতা হোক সর্বাবস্থায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা গ্রহণ করার অর্থ হল যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশীও ব্যয় না করা আবার তার চেয়ে কমও না করা। এখানেও ব্যালেন্স শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিমাণ ব্যয় না করে বখীলীর পরিচয়ও দিবে না আবার কখনও সেন্টিমেন্টাল হয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশীও ব্যয় করে বসবে না। আমাদের অনেকেরই এরকম অবস্থা হয় যে, যখন কিছু টাকা-পয়সা হাতে আসে, তখন এমন জযবা এসে যায় যে, প্রচণ্ড ভাবে ব্যয় করা শুরু করি। তারপর পরবর্তীতে আভাব দেখা দিলে মানুষের কাছে হাত পাততে হয়, মানুষের কাছে ছোট হতে হয়। এভাবে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করার কারণে পরবর্তিতে পস্তাতে হয়। আবার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিমাণ ব্যয় না করলে একদিকে দায়িত্ব আদায়ে ত্রুটি হয় আবার কার্পণ্যের কারণে মানুষের কাছে ছোট হতে হয়। তাই ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স রক্ষা করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ, মধ্যম পন্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক সূরা বনী ইসরাঈলে মধ্যম পন্থার কথা এভাবে বলেছেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

অর্থাৎ, তুমি তোমার হাত একেবারে গলার সাথে বেঁধে রেখ না। আবার হাত একেবারে খুলেও দিবে না। তাহলে তুমি নিন্দিত হবে, নিঃস হবে। (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ২৯)

এখানে বলা হয়েছে হাত একেবারে গলার সাথে বেধে রেখ না। অর্থাৎ, বখীলী কর না। আমরা বখীলী কথাটা বোঝানোর জন্য যেমন বলি লোকটা পকেটে হাত ঢুকিয়েছে তো আর বের-ই করে না। বা বলি হাত এমন মুঠ করছে যে আর খুলতেই চায় না। আরবীতেও একথাটা বোঝানোর জন্য বলা হয় গলার সাথে হাত বেধে রেখেছে। তাই আল্লাহ পাক বললেন যে, হাত গলার সাথে বেধে রেখনা অর্থাৎ, বখিলী কর না। তারপর বলেছেন হাত একেবারে প্রসারিতও করে দিও না অর্থাৎ, খুব বেশীও ব্যয় করনা বরং মাঝিমাঝি অবস্থানে থাক, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। যেখানে যতটুকু ব্যয় করতে হয় ততটুকু কর, তারচেয়ে বেশীও করনা কমও কর না। তারপর আল্লাহ পাক বলেছেন, যদি এই মধ্যম পন্থা অবলম্বন না কর বরং বখীলী কর, তাহলে নিন্দিত হবে আর আতিরিক্ত ব্যয় করলে নিঃস হয়ে পড়বে। অর্থাৎ, ব্যয় করার স্থানে ব্যয় না করলে তুমি নিন্দিত হবে। সমাজের মানুষ নিন্দা করবে, বখীল বলবে, কৃপণ বলবে। এভাবে সমাজের কাজে লজ্জিত হতে হবে, আল্লাহর কাছেও লজ্জিত হতে হবে। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি সম্পদ নিয়ে বখীলী করে, কেয়ামতের দিন সেই সম্পদ তার গলায় বেড়ী পরিয়ে তাকে উঠানো হবে। তখন সমস্ত মানুষের সামনে সে লজ্জিত হবে। এই হল বখীলীর ক্ষতি। আর অতিরিক্ত ব্যয় করলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় অর্থ কড়ির সংকট দেখা দিতে পারে। তাই ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্পণ্যও নয়, অতিরিক্ত ব্যয়ও নয় বরং মধ্যপন্থা গ্রহণের নীতি রাখা হয়েছে।

এখানে একটা বিষয় বোঝার দরকার রয়েছে। তাহল প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করলে গোনাহ হয়, এই প্রয়োজন বলতে কি বুঝায়? প্রয়োজন কাকে বলে? প্রয়োজন কতটুকু তা নির্ণয় করতে আমরা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ভুল করি। অনেক সময় বিবাহ-শাদী আসলে আমরা এক লাখ, দুই লাখ, পাঁচ দশ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করে থাকি। লাইটিং করি, আলোকসজ্জা করি, এটা করি সেটা করি। আর মনে করি এগুলি প্রয়োজন, এগুলি না করলে সমাজে চলা যায় না। অথচ শরীয়তের আলোকে এগুলির প্রয়োজন নেই। শরীয়তের আলোকে যার প্রয়োজন নেই সেটা প্রয়োজন বলে স্বীকৃতি পাবেনা। শরীয়ত আমাদের আবেগ অনুযায়ী চলে না, সমাজের হাওয়া যখন যেভাবে চলে শরীয়ত সেভাবে চলবে না। শরীয়ত সমাজের তালে চলবে না বরং সমাজকে শরীয়তের তালে চালাতে হবে। শরীয়তের আলোকে বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল শুধু ওলীমা খাওয়াতে যতটুকু খরচ করা দরকার ততটুকু খরচ করা, তার চেয়ে বেশী নয়।

যাহোক তৃতীয় নম্বর নছীহতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

চতুর্থ নম্বরে বলা হয়েছে–

وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِيْ.

অর্থাৎ, আমার সাথে যারা সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি যেন তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি।

আমরা এই নছীহতের উপর আমল করতে পারি না। আমাদের স্বভাব হল কেউ আমাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলে আমরাও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি আর আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে আমরাও সেই তালে চলি। কেউ ভাল ব্যবহার করলে আমরা ভাল ব্যবহার করি, আর খারাপ ব্যবহার করলে আমরাও তখন খারাপ ব্যবহার করি। যে আত্মীয় স্বজন আমার সাথে খুব উঠা-বসা করে, হাদিয়া তোহফা নিয়ে আমার বাসায় আসা যাওয়া করে, তার বাসায় আমি খুব যাই, কিন্তু যারা আসে না তাদের বাসায় যাই না। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমার সাথে সে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথেও যেন সম্পর্ক বজায় রাখি।

আমরা এরূপ করতে পারি না। কারণ এরূপ করলে গেলে মনের উপরে অনেক চাপ আসে। আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব– এরূপ করলে গেলে মনের উপর অনেক চাপ আসে, এরূপ করতে গেলে মনের সাথে অনেক মোজাহাদা করতে হয়। এটা করতে গেলে মনের সাথে মোজাহাদা করতে হয় বলেই এ আমলের দাম বেশী। যে আমলে নফসের সাথে যত বেশী মোজাহাদা হয় সে আমলের দাম তত বেড়ে যায়। গভীর রাতে আরামের বিছানা ত্যাগ করে আরামের ঘুম ছেড়ে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে নফসের সাথে মোজাহাদা বেশী হয়, তাই তাহাজ্জুদের মর্তবা অনেক বেশী। আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান মাল ব্যয় করতে নফসের সাথে মোজাহাদা বেশী হয়, তাই আল্লাহর রাস্তায় জান মাল দিয়ে জেহাদ করার মর্তবা অনেক বেশী। শীতের সময় ভালভাবে উযূ করতে নফসের সাথে মোজাহাদা বেশী হয়, তাই শীতের সময় সুন্দর ভাবে উযূ করার মর্তবা অনেক বেশী। এমনিভাবে যে আমলে নফসের সাথে যত বেশী মোজাহাদা হয় সে আমলের দাম তত বেড়ে যায়। পঞ্চম এবং ষষ্ট নছীহতেও এমন দুটো আমলের কথা বলা হয়েছে যাতে নফসের সাথে মোজাহাদা করতে হয়।

পঞ্চম নম্বরে বলা হয়েছে–

وَاُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِيْ.

অর্থাৎ, যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দেই।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এই নছীহতের উপরও আমরা অনেকে আমল করতে পারি না। কারণ যে আমাকে বঞ্চিত করল তাকে আমি দিতে উদ্বুদ্ধ হই না। তাকে দিতে গেলে নফসের সাথে মোজাহাদা করতে হয়। আমাদের স্বভাব হল যে আমাদেরকে উপকার থেকে বঞ্চিত করে অর্থাৎ, আমাদের উপকার করে না আমারাও তার উপকার করি না। যে আমাদেরকে ভাল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করে আমরাও তার সাথে ভাল ব্যবহার করি না। কিন্তু আল্লাহ পাক নছীহত করছেন যে, তোমাকে যে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও। এ হল পঞ্চম নম্বর নছীহত।

ষষ্ট নম্বরে বলা হয়েছে–

وَاَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ.

অর্থাৎ, যে আমার প্রতি জুলুম করে আমি যেন তাকে ক্ষমা করে দেই।

এই নছীহতের বেলায়ও আমাদের অবস্থা ঐ আগের মতই। যে আমাদের প্রতি জুলুম করে অনেক সময়ই তাকে আমরা ক্ষমা করতে পারি না। তাকে ক্ষমা করতে গেলে নফসের সাথে মোজাহাদা করতে হয়। এজন্যই জালেমকে ক্ষমা করতে পারা অনেক মর্তবার বিষয়। আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে খাস করে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা নফসের সাথে মোজাহাদা করে পেরে উঠি না বলেই এ আমলগুলো করতে পারি না। আমাদের অবস্থা হল আমাদের সাথে যে যেমন করবে আমরাও তার সাথে তেমন করব। ভাল করলে ভাল করব মন্দ করলে মন্দ করব। এটা হল গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়া। এটা কোন মজবূত মনের কাজ নয়। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا ولٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءُوْا فَلَا تَظْلِمُوْا. (رواه الترمذي في سننه برقم ٢٠٠٧ وقال : حسن غريب)

অর্থাৎ, তোমরা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যেও না এই বলে যে, মানুষ যদি আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে তবে আমরাও ভাল ব্যবহার করব আর মন্দ ব্যবহার করলে আমরাও মন্দ ব্যবহার করব। বরং তোমরা নিজেদের মনকে এভাবে মজবূত করে নাও যে, লোকেরা ভাল ব্যবহার করলেও ভাল ব্যবহার করবে মন্দ করলেও মন্দ করবে না।

যাহোক ষষ্ট নম্বর নছীহতে জুলুমের বদলায় ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে।

সপ্তম নম্বরে বলা হয়েছে–

وَاَنْ يَّكُوْنَ صَمْتِيْ فِكْرًا.

অর্থাৎ, আমার চুপ থাকাটা যেন হয় চিন্তা-ভাবনায় সমৃদ্ধ।

এখানে বলা হয়েছে আমাদের চুপ থাকার সময়টাও যেন বেকার না যায়। বরং আমরা যখন চুপ থাকব তখনও যেন চিন্তা-ভাবনার মধ্যে সময়টা কাটে। কী চিন্তার মধ্যে সময়টা কাটতে হবে? ভাল চিন্তার মধ্যে সময়টা কাটতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে, আল্লাহর কুদরত নিয়ে ভাবতে হবে, দ্বীনের কথা নিয়ে ভাবতে হবে, ঈমানের কথা ভাবতে হবে, নেক আমলের কথা ভাবতে হবে, ভাল কাজের কথা ভাবতে থাকব। এক কথায় এমন ভাবনার মধ্যে কাটতে হবে যে ভাবনাটা আমার জন্য ছওয়াবের হবে। এ হল সপ্তম নম্বর নছীহত।

অষ্টম নম্বরে বলা হয়েছে–

وَنُطْقِيْ ذِكْرًا.

অর্থাৎ, আমার বলাটা যেন হয় যিকির সমৃদ্ধ।

www.maktabatulabrar.com

চুপ থাকাটা হবে ফিকির, আর বলাটা হবে যিকির। অর্থাৎ, চুপ থাকার সময়টাও কাটবে ছওয়াবের চিন্তায় আর বলার সময়ও কাটবে ছওয়াবের বলায়। চুপ থাকার সময়টা যেন এমন চিন্তায় না কাটে যেটা আমার জন্য খারাপ হবে, পাপের হবে। এমনিভাবে বলার সময়টাও যেন এমন বলার ভিতর না কাটে যা আমার জন্য গোনাহের হবে পাপের হবে। এমন কথা যেন আমার মুখ থেকে বের না হয় যার দ্বারা আমার গোনাহ হবে। এই হল অষ্টম নম্বর নছীহত। আর

নবম নম্বরে বলা হয়েছে–

وَنَظْرِيْ عِبْرَةً.

অর্থাৎ, আমার নজর যেন হয় নছীহত গ্রহণের নজর। আমার নজর যেন নছীহত গ্রহণের জন্য নিবেদিত হয়।

আমরা যা কিছু দেখব সবকিছুর ভিতর থেকে নছীহত বের করে নিতে হবে। সবকিছু থেকে শিক্ষা গ্রহনের চেষ্টা করতে হবে। আমরা যা কিছুই দেখি তার ভিতর আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কি আছে সেটা চিন্তা করতে হবে।

একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা মরা ছাগল দেখলেন। ছাগলটা পচে গলে গেছে। তিনি এটা দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে কেউ এই ছাগলটা কিনতে প্রস্তুত আছ কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এর তো কোনই দাম নেই, এটা কেউ কিনতে রাজি হবে না। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর নিকট দুনিয়া এর চেয়েও বেদামী। আর একটা ঘটনা শুনুন। দেওবন্দ মাদ্রাসার উস্তাদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগার হুসাইন সাহেব (রহ.) একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব (রহ.)। রাস্তার ধারে কয়েকটা বালক বালিকা সারাদিন ধরে এক সঙ্গে যে গোবর কুড়িয়েছে, তা ভাগ করছিল। ভাগাভাগি নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। তখন সাইয়্যেদ আসগার হুসাইন সাহেব (রহ.) মুফতী শফী সাহেব (রহ.) কে বললেন, শফী! দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে যারা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত, তাদের অবস্থাও এরকমই। সকলেই নাপাক গান্ধা জিনিস নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত আছে। সোবহানাল্লাহ! একেই বলে সবকিছুর ভিতর থেকে নছীহত খুঁজে নেয়া। এই নবম নম্বর নছীহতে একথাই বলা হয়েছে যে, আমরা যা কিছুই দেখব সবকিছুর ভিতর থেকে নছীহত বের করে নিতে হবে। আমাদের নজর যেন হয় নছীহত গ্রহণের নজর।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে এই নয়টি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ, নয়টি নছীহত করেছেন। এর সাথে আরও একটা বলেছেন যা সব সময়ই মনে রাখতে হবে। তাহল–

وَاْمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيْلَ بِالْمَعْرُوْفِ.

অর্থাৎ, আমি যেন মানুষকে নেক কাজের কথা শিক্ষা দেই, নেক কাজের কথা বলি, আমি যেন সব ব্যাপারে মানুষকে নছীহত করতে থাকি। তাহলে নছীহত হয়ে গেল মোট দশটা।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দশটা নছীহতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -১৮

সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণ প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا. وَفِى الْحَدِيْثِ لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে শরীয়তের যত হুকুম-আহকাম যত বিধি-বিধান দিয়েছেন সবকিছুর উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়া। আরবীতে বলা হয় তায়াল্লুক মাআল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়া। সব আমলের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাওয়া। যখন কেউ নামায পড়ে তা দ্বারা আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক জোড়ে, যখন রোযা রাখে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ে, আল্লাহর দেয়া সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ে। হজ্জ করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ে। এমনিভাবে যা কিছু আমল করে তার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ে। যত আমল করে তত সম্পর্ক জুড়তে থাকে। আর যত আমল পরিত্যাগ করে তত আল্লাহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হতে থাকে।

আমলের দ্বারা সম্পর্ক জোড়ার কারণ হল– আমল করলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। যে যতবেশী আমল করে আল্লাহর কথা তার তত বেশী স্মরণ হয়, আর আল্লাহর স্মরণ দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়তে থাকে। অতএব যে যত বেশী আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর সাথে তার বেশী সম্পর্ক জুড়তে থাকে। পক্ষান্তরে যে যত আমল বর্জন করে, আল্লাহর কথা তার তত কম স্মরণ হয় সে কারণে আল্লাহ থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে।

সব আমলের মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ে। তবে তার মধ্যে একটা সহজ আমল রয়েছে যার দ্বারা সহজে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে যেতে পারে। সেই সহজ আমলটা হল– জীবনের সবকিছু করার সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখা। চিন্তা করলে মনে হবে এটা সহজ নয় বরং খুব কঠিন যে, জীবনের সবকিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। এটা খুব কঠিন মনে হতে পারে, তবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে কঠিন নয় বরং সহজ। কিছুদিন অভ্যাস করলে কঠিন থাকবে না বরং সহজ হয়ে যাবে, তখন সব কাজ করার সময় অটোমেটিক আল্লাহর স্মরণ এসে যেতে থাকবে। আমরা সবকিছুর ক্ষেত্রে দুনিয়ার চিন্তা করে থাকি। আমরা সবকিছুর ক্ষেত্রে দুনিয়ার চিন্তা করতে অভ্যস্ত। এজন্য আমরা যা কিছু করি করার সময় আমাদের ভিতরে দুনিয়ার চিন্তা এসে যায় যে, এই কাজটা করলে লাভ হবে না ক্ষতি হবে। এতে আমাদের পয়সা আসবে না আসবে না। কোন চেষ্টা করা ছাড়াই এই চিন্তা এসে যায়। কারণ এটাতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ঠিক এভাবেই আমরা যদি প্রত্যেকটা কাজ করার সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই, তাহলে একটা সময় এরকম আসবে যে, বিনা ফিকিরে, বিনা চিন্তায় আল্লাহর কথা স্মরণ এসে যাবে, প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর কথা স্মরণে এসে যাবে। তখন প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহকে স্মরণ করা কঠিন থাকবে না বরং সহজ হয়ে দাঁড়াবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

কুরআনে কারীমে আমাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে আমরা যেন আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করি। ইরশাদ হয়েছে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. (সূরা আহযাব: ৪১)

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণ কর।

এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে খুব বেশী বেশী স্মরণ করা বলতে কি বুঝায়? খুব বেশী স্মরণ করা বলতে বোঝায় সব কাজে আল্লাহকে স্মরণ করা, জীবনের সবকিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ করা। এর থেকে বেশী তো আর কিছু হতে পারে না, আমরা যা কিছুই করব আল্লাহকে স্মরণ করে করব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও হাদীছে এরকম বর্ণনাই এসেছে যে, তিনি জীবনের সবকিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ করতেন। এক হাদীছে এসেছে–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ. (البخاري برقم ٦٣٣ ومسلم برقم ٨٥٢)

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ রাখতেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এমন কোন মুহূর্ত অতিবাহিত হত না যখন আল্লাহর কথা স্মরণ থাকত না। তিনি যা কিছুই বলতেন আল্লাহকে স্মরণ করে বলতেন, যা কিছুই করতেন আল্লাহকে স্মরণ করে করতেন।

জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণ কিভাবে আসবে তার একটা সহজ পদ্ধতিও রয়েছে। আমাদের জীবনে যত কিছু করতে হয় তার প্রায় সবটার জন্যই বিভিন্ন দুআ রয়েছে, প্রত্যেকটা পদে পদে এই দুআগুলি পড়লে আল্লাহকে স্মরণ হবে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাবে। ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুম যাওয়া পর্যন্ত প্রায় সবকিছুর ক্ষেত্রে দুআ রয়েছে। ঘুম থেকে উঠব, তখন দুআ রয়েছে। তারপর বাথরুমে যাব, বাথরুমে যাওয়ার দুআ এবং বের হওয়ার দুআ রয়েছে। এর পর উযূ করব উযুর দুআ রয়েছে। উযূ শেষ করে দুআ রয়েছে। তারপর কাপড় পরিধান করব তার দুআ রয়েছে। তারপর ঘর থেকে বের হব বের হওয়ার দুআ রয়েছে। নামায পড়তে মসজিদের দিকে যাব যাওয়ার দুআ রয়েছে। মসজিদে ঢুকব দোয়া রয়েছে। বের হওয়ার দোয়া রয়েছে। পথে চলার সময় যদি উঁচু থেকে নীচুতে নামি দুআ রয়েছে। সেটা হল সুবহানাল্লাহ। নীচের থেকে উপর দিকে উঠলে দুআ রয়েছে সেটা হল আল্লাহু আকবার। সমতল যায়গায় চললে দুআ রয়েছে সেটা হল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। চলতে চলতে কারও সাথে দেখা হলে সালাম দেয়ার বিধান রয়েছে। এই সালামও একটা দুআ। মুসাফাহা করা যেতে পারে, তারও দুআ রয়েছে। কিংবা অনেক দিন পরে সাক্ষাত হলে মুআনাকার বিধান রয়েছে, এই মুআনাকা করারও দুআ রয়েছে। যদি যানবাহনে চলি, তাহলে যানবাহনেরও দুআ রয়েছে। বাজারে গেলে দুআ রয়েছে। বাজার থেকে জিনিস-পত্র কেনার সময় দুআ রয়েছে। খানা সামনে আসলে দুআ আছে। খানা খাওয়া শুরু করার দুআ রয়েছে। খানা শেষ হলে দুআ রয়েছে। দস্তরখানা উঠানোর দুআ আছে। এইভাবে সারাদিন রাতে সব কাজে সব পদে পদে দুআ রয়েছে। সব কাজ শেষে যখন ঘুম পড়তে যাব তখনও দুআ রয়েছে। এই ভাবে ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুম যাওয়া পর্যন্ত যত কাজ করা হয়ে থাকে তার প্রায় সবটার ক্ষেত্রেই দুআ রয়েছে। কেউ বলতে পারেন যে, হুজূর! এত দুআতো মুখস্থ করা সম্ভব নয়। আসলে কঠিনও নয়। হিসাব করলে দেখা যায় ৫০-৬০ টা দুআর বেশী হয় না। ৫০-৬০ টা দুআ কি মুখস্থ করা সম্ভব নয়? অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক সম্ভব কি না। মনে না থাকলে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মনে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি যে, হে আল্লাহ! আমার যেন সব দুআ মনে থাকে। এরপরও যদি মুখস্থ না হয় বা মনে না থাকে, তাহলে আল্লাহ দেখবেন যে, বান্দা চেষ্টা করেছিল। আসলে আমরা অনেকেই যথাযথ চেষ্টা না করে আগের থেকেই গা বাঁচানোর চেষ্টা করি যে, মুখস্থ হয় না, মনে থাকে না ইত্যাদি। অনেক আমলের ব্যাপারেই আমাদের চেষ্টা-মেহনতের অভাব রয়েছে। আমরা বহু ভাই এরকম আছি যে, আমরা চাকুরী বা কর্ম থেকে অবসরপ্রাপ্ত, আয়-উপার্জনের জন্য আমাদের তেমন কিছু করতে হয়না। একটু বাজার ঘাট করা ছাড়া বিশেষ কোন কাজও নেই। অনেকেরতো এই বাজার ঘাট করার কাজও নেই। যাদের আয়-উপার্জনের জন্য চাকুরী বা মেহনত করতে হয়, তাদেরও অনেক সময় বাঁচে যা তারা কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু আমরা এই সব সময় দ্বীনের জন্য লাগাতে চাই না। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প-গুজব করে সময় পার করে দেই। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিভিশন কম্পিউটারে আজে বাজে জিনিস দেখে, গোনাহের জিনিস দেখে সময় নষ্ট করে দেই। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা পেপার-পত্রিকা পড়ে সময় কাটাই। পেপার পত্রিকা ধরে অ থেকে ত পর্যন্ত পড়ি, এমনকি পাত্র-পাত্রীর খবর পর্যন্ত বাদ যায় না। এভাবে সময় কাটাই। কিন্তু যিন্দেগী গঠনের জন্য এই সময়টা যদি মাসলা মাসায়েলের কিতাব পড়তাম, দুআ দুরূদের কিতাব পড়তাম, আলেম উলামার সোহবতে গিয়ে জানার বিষয় জেনে বুঝে নিতাম, তাহলে দ্বীন ধর্মের অনেক কিছুই জানা এবং মুখস্ত করা সম্ভব হত। এই ৫০-৬০টা দুআ মুখস্ত করাও এমন কোন কঠিন বিষয় থাকত না।

যাহোক বলা হচ্ছিল– জীবনের প্রত্যেকটা কাজে প্রত্যেকটা পদে পদে দুআ রয়েছে, নির্দিষ্ট দুআ না থাকলেও নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে চেয়ে নেয়ার রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআগুলি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। জীবনের প্রত্যেকটা কাজে প্রত্যেকটা পদে পদে এই দুআগুলি আমল করলে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ হবে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাবে।

জীবনের প্রত্যেকটা কাজে প্রত্যেকটা পদে পদে যেসব দুআ কুরআন হাদীছে বর্ণিত আছে সেগুলি যদি কারও মুখস্থ না থাকে, তাহলে প্রত্যেকটা কাজের পূর্বে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে দুআ করে নিতে হবে। আবার এমন অনেক বিষয়ও আছে যেগুলির জন্য নির্দিষ্ট কোন দুআ বর্ণিত নেই; সেসব ক্ষেত্রেও নিজের ভাষায় দুআ করে নিতে হবে যেন সেই কাজটা সুন্দরভাবে হয়, যেন সেই কাজটা মঙ্গলজনক হয়। সব কাজের শুরুতে আল্লাহর কাছে দুআ করে নিতে হবে, সবকিছু আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে। যেমন আমি ঘর থেকে বের হচ্ছি, আল্লাহর কাছে দুআ করে নিজ যে, হে আল্লাহ! আমি এই কাজের জন্য বের হচ্ছি, আমার এই বের হওয়াটা যেন আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, আমার এই কাজটা যেন ভালভাবে সু-সম্পন্ন হয়। আমি অফিসে যাচ্ছি, দুআ করে নিব যে, হে আল্লাহ! অফিসে যাচ্ছি, অফিসের সব কাজ-কাম যেন ঠিক মত সুসম্পন্ন করতে পারি, কোন ঝামেলার সন্মুখীন যেন না হই, কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সন্মুখীন যেন না হই। আমি দোকানদার, দোকান খুলছি, দুআ করে নিব যে, হে আল্লাহ! আজ যেন আমার ব্যবসায় বরকত হয়, আমি যেন ক্ষতির সন্মুখীন না হই, আমি যেন হালাল তরীকায় ব্যবসা করতে পারি। আমি ক্রেতা, দোকানে বা বাজারে যাচ্ছি, দুআ করে নিব যে, হে আল্লাহ! আমার জন্য যা ভাল তা-ই যেন ক্রয় করতে পারি, আমি যেন ধোঁকা না খাই, আমি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হই। আমি ডাক্তার, রুগী দেখব, আল্লাহর কাছে দুআ করে নিব যে, হে আল্লাহ! আমি যেন সঠিকভাবে রুগীর রোগ নির্ণয় করে সঠিক ব্যবস্থা দিতে পারি, আমার দ্বারা যেন রুগীর স্বাস্থ্যের উপকার হয় কোন ক্ষতি না হয়। আমি রুগী, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, দুআ করে নিব যে, হে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহ! আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, ডাক্তার যেন সঠিকভাবে আমার রোগটা নির্ণয় করতে পারে, ডাক্তার আমার জন্য যে ঔষধ নির্বাচন করবে সেটা যেন সঠিক নির্বাচন হয়। আমি গাড়ি চালক, গাড়ি চালাতে যাচ্ছি, আল্লাহর কাছে দুআ করে নিব যে, হে আল্লাহ! আমার দ্বারা যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, আমার দ্বারা যেন কারও জান মালের কোন ক্ষতি না হয়। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে, আল্লাহর কাছে সবকিছু চেয়ে নিতে হবে। এমনকি যখন কোন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হতে যাচ্ছে, তখন আল্লাহর কাছে দুআ করে নিব যে, হে আল্লাহ! লোকটা যেন আমার জন্য ভাল কিছুর সংবাদ নিয়ে আসে, কোন খারাপ সংবাদ নিয়ে যেন না আসে। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে দুআ করে নিতে হবে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলতেন যে, আমার কাছে কেউ মাসলা জিজ্ঞাসা করতে আসলেও এবং মাসআলা জানা থাকলেও আমি আল্লাহর কাছে দুআ করে নেই যে, হে আল্লাহ! আমি যেন সঠিকভাবে তাকে মাসআলা বলে দিতে পারি, আমার মাসলা বলা যেন সহীহ হয়, এই মাসআলা যেন তার জন্য উপকার বয়ে আনে। এটাই নিয়ম– আমরা যখন কাউকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে যাব বা কাউকে কোন কিছু শিক্ষা দিতে চাইব কিংবা ওয়াজ-নছীহত করতে চাইব, তখন আল্লাহর কাছে দুআ করে নিব যে, হে আল্লাহ! আমি যেন সঠিকভাবে দ্বীনের কথা উপস্থাপন করতে পারি, আমার বলা দ্বারা শ্রোতার ফায়দা হয়। যাদের কাছে দ্বীনের কথা পেশ করা হবে বা যারা ওয়াজ-নছীহত শুনবেন তারা দুআ করে নিবেন যে, হে আল্লাহ! আমার যেন দ্বীনের কথা সঠিকভাবে বুঝে আসে, আমি যা শুনব তার উপর যেন আমল করতে পারি।

কেউ যদি প্রত্যেক পদে পদে এভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করে নেয়, তাহলে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহকেও স্মরণ করা হয়, ফলে আল্লাহ পাক তার প্রতি প্রীত হন এবং তার সব কাজ সুন্দর সঠিকভাবে সু-সম্পন্ন করে দেন। এভাবে সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণও করা হয়, তার কাজকর্মও সঠিক সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়, আল্লাহর সাথেও তার সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দেখা গেল প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ রাখলে একটা ফায়দা এই হয় যে, আল্লাহর সাথে তার সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ রাখলে আর একটা ফায়দা এই হয় যে, তার কাজকর্ম সঠিক সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ রাখলে আর একটা ফায়দা এই হয় যে, গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেউ যখন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর কথা স্মরণ রাখে তখন ঐ ক্ষেত্রে তার দ্বারা কোন গোনাহ হয় না, আল্লাহর স্মরণ তাকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে। মানুষের যত গোনাহ হয়, অন্যায়-ত্রুটি হয় তা এ কারণে হয় যে, তারা আল্লাহকে স্মরণ রাখে না। আল্লহর কথা স্মরণ রাখলে পাপ হতে পারে না। আল্লাহর ভয় তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে পাপ করার মূল, আর আল্লাহকে স্মরণ রাখা হল পাপ দূর করার মূল। আল্লাহকে যত বেশী ভুলে যাবে তত বেশী পাপ হবে আর যত বেশী স্মরণ হবে তত পাপ কমে যাবে এবং নেকী বেশী হবে। এক হাদীছে বলা হয়েছে,

لَايَزْنِى الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. الحديث. (البخاري ٢٤٧٥ ومسلم ٢١١)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, ঈমান-বিশ্বাস থাকলে কোন যেনাকারী যেনা করতে পারে না। ঈমান-বিশ্বাস থাকলে কোন চোর চুরি করতে পারে না। ঈমান-বিশ্বাস থাকলে কোন শরাবখোর শরাব খেতে পারে না।

এটা একটা লম্বা হাদীছ। এর ভিতর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোনাহের কথা উল্লেখ করে করে বলেছেন, কারও মধ্যে ঈমান-বিশ্বাস থাকলে সে এই পাপগুলি করতে পারে না। এখানে বলা হয়েছে ঈমান-বিশ্বাস থাকলে এই পাপগুলি করতে পারে না অর্থাৎ, আল্লাহ দেখেন, আল্লাহ শাস্তি দিবেন এই বিশ্বাস থাকলে এই পাপগুলি করতে পারে না। এই বক্তব্যের সারকথাও এই যে, আল্লাহর কথা স্মরণ থাকলে পাপ করতে পারে না। আল্লাহর স্মরণ পাপ থেকে বিরত রাখে। একজন মানুষ শরাব খায়, গোপনে হোটেলে গিয়ে খায়, মনে করে কেউ তাকে দেখে না। কিন্তু যদি আল্লাহর কথা তার স্মরণ থাকে যে, কেউ না দেখলেও আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন, তাঁর চক্ষুকে তো ফাকি দেয়া যায় না, এই স্মরণ মজবূত থাকলে মানুষের আগোচরেও সে শরাব খেতে পারবে না। এমনিভাবে যদি কারও ভিতরে এই চেতনা জাগ্রত থাকে যে, আল্লাহ আমার সব কিছু দেখছেন, আমার ভিতর-বাহির, গোপন-সদর সবকিছু আল্লাহ পাক দেখছেন, তাহলে তার দ্বারা কোন পাপই হতে পারে না। এই চেতনা জাগ্রত রাখার জন্যই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ. (সূরা আনআম: ৬৯)

অর্থাৎ, গহিন জঙ্গলে গাছ থেকে একটা পাতা ঝরে পড়ে, কিংবা মাটির গভীর অন্ধকারে একটা বীজ থেকে অঙ্কুর গজায়, এমনিভাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ সবই আল্লাহ জানেন। ঘটার সময় জানেন তা নয় বরং ঘটার পূর্বেও জানেন। অনাদি কালে লওহে মাহফুজে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এ আয়াতের সারকথা হল কোন কিছুই আল্লাহর অজানা নয় সবকিছুই তিনি জানেন।

প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ রাখলে আর একটা ফায়দা এই হয় যে, তার সব কাজ আছান হয়ে যায়। প্রত্যেকটা আমলের সাথে সাথে যদি আল্লাহকে স্মরণ রাখা হয় এবং আল্লাহর কাছে দুআ করে নেয়া হয় তাহলে আল্লাহ পাক দেখেন যে, এই বান্দা আমাকে ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, সে সব কিছু আমার উপর সোপর্দ করে দিচ্ছে, আমি ছাড়া তার এসব আর কে সম্পন্ন করে দিতে পারে? তখন প্রত্যেকটা কাজেই আল্লাহ পাকের নুসরত বা তার সাহায্য হতে থাকে। আর কোন ব্যাপারে যখন আল্লাহর সাহায্য হয় তখন সেই কাজ আছান হয়ে যায়, সেই কাজের সব জটিলতা দূর হয়ে যায়। আল্লাহর নুসরত বা আল্লাহর সাহায্য না হলে জটিলতা দূর হয় না। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই কোন একটা সহজ কাজও শুধু জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে, শুধু প্যাঁচ লাগতেই থাকে, প্যাঁচ আর ছাড়ায় না। এটা কেন হয়? আল্লাহ পাকের নুসরত থাকে না বলেই এমন হয়। আল্লাহ পাকের নুসরত সাথে থাকলে জটিল কাজও আছান হয়ে যায়। আল্লাহ পাকের নুসরত সাথে থাকলে পাথরের পাহাড়ও বরফের মত গলে যায়।

প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ রাখলে আর একটা ফায়দা এই হয় যে, সব কাজ সহীহ তরীকায় হয়। কারণ আল্লাহকে স্মরণ করলে তখন কীভাবে কাজটা আল্লাহর মনোনীত হবে সেই চিন্তাও ভিতরে আসে। এই চিন্তা থেকেই তার কাজটা সহীহ তরীকায় তথা আল্লাহর মনোনীত তরীকায় সম্পন্ন হয়। দেখা গেল প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লহর স্মরণ মানুষকে সহীহ তরীকায় নিয়ে আসে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ রাখলে আর একটা ফায়দা এই হয় যে, সব কাজ আল্লাহর নেছবতে হয়ে যায়, অর্থাৎ, দ্বীনের নেছবতে, দ্বীনের আঙ্গিকে হয়। যার ফলে দুনিয়ার কাজও দ্বীনের কাজে পরিণত হয়। কোন কাজ যদি আল্লাহর নেছবতে তথা দ্বীনের নেছবতে হয়, তাহলে সেটা দুনিয়ার কাজ হলেও দ্বীনের কাজে পরিণত হয়। যেমন খানা খাওয়া একটা দুনিয়াবী কাজ। কিন্তু যদি এই নিয়তে খাওয়া হয় যে, এই খানা খাওয়া দ্বারা আমার দেহে শক্তি সঞ্চারিত হবে, আমি সুস্থ্য থাকতে সক্ষম হব, আর দেহে শক্তি থাকলে, সুস্থ্য থাকলে সঠিকভাবে ইবাদত করতে সক্ষম হব, তাহলে এই খাওয়াটাও দ্বীনের কাজে পরিণত হবে, এই খাওয়াটাও ছওয়াবের কাজ হবে। কারণ এই খাওয়াটা দ্বীনের নেছবতে অর্থাৎ, দ্বীনের আঙ্গিকে করা হল। যদি এই নিয়তেও খাওয়া হয় যে, হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক আমার দেহেরও আমার উপর হক রয়েছে, আমি সেই হক আদায় করার জন্য খাচ্ছি, তাহলে এই খাওয়াটাও দ্বীনের কাজে পরিণত হবে। কারণ এই খাওয়াটা দ্বীনের আঙ্গিকে করা হল।

আমি বাজার করতে যাচ্ছি, সাধারণ দৃষ্টিতে এটা একটা দুনিয়াবী কাজ যে, খুব ভাল বাজার করব, খুব মজা করে খাব, সাধারণ দৃষ্টিতে এটা নফসের খাহেশ পূরণ করার জন্যই হচ্ছে। তাই মনে হবে এটা কোন ছওয়াবের কাজ নয়। কিন্তু যদি দ্বীনী আঙ্গিকে এই কাজটা করা হয় যে, পরিবারের ভরণ-পোষণ দেয়া আমার কর্তব্য, আমি যদি বাজার ঘাট না করি, তাহলে পরিবারের ভরণ-পোষণ দেয়ার দায়িত্ব আদায় হবে না, তাহলে আমি পাপী হয়ে যাব। অতএব আমি বাজার করব আমার কর্তব্য পালন করার জন্য, আমার দায়িত্ব আদায় করার জন্য, পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, তাহলে এটা দ্বীনের কাজে পরিণত হবে, ছওয়াবের কাজ হবে।

আমি বিবি ব্যবহার করব, সাধারণ দৃষ্টিতে নিছক একটা যৌন খাহেশাত পূরণ করার কাজ। কিন্তু যদি এই নিয়তে করা হয় হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক আমার বিবিরও আমার উপর এর হক রয়েছে, আমি সেই হক আদায় করার জন্য এটা করছি তাহলে এটা ছওয়াবের কাজে পরিণত হবে। কিংবা যদি এই নিয়তে করা হয় যে, এইভাবে আমি আমার যৌন চাহিদা পূরণ না করলে আস্তে আস্তে আমি যেনার দিকে চলে যাব, জাহান্নামের পথে ধাবিত হব, আমি যেনা থেকে বাঁচার জন্য, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এটা করছি, তাহলেও এটা ছওয়াবের কাজে পরিণত হবে। কারণ তখন এটা করা হবে দ্বীনের নেছবতে, দ্বীনের আঙ্গিকে।

সারকথা হল আল্লাহকে স্মরণ করে কোন কিছু করলে, দ্বীনের আঙ্গিকে কোন কিছু করলে তা দুনিয়ার কাজ হলেও দ্বীনের কাজে পরিণত হয়। প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ রাখলেই, প্রত্যেক পদে পদে দ্বীনকে সামনে রাখলেই এভাবে কাজ করা সম্ভব। তাই খুব বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করা চাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণ কর।

এই স্মরণ করার মধ্যে সাধারণভাবে যিকির বলতে যা বোঝায় তাও রয়েছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি যিকিরও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে দুইটা সময় যিকির করার কথা বলেছেন, ইরশাদ হয়েছে,

وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا.

অর্থাৎ, সকাল সন্ধা তাসবীহ পাঠ কর।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এখানে "তাসবীহ" বলতে ঐ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। সকাল সন্ধা এই তাসবীহ বা যিকিরগুলো করতে বলা হয়েছে। তাই বুযুর্গানে দ্বীন কুরআনের এই আয়াত ও বিভিন্ন হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক মানুষের জন্য ওজীফা রেখেছেন, প্রতিদিন সকাল সন্ধায় এই তাসবীহগুলো অন্তত একশত বার করে পাঠ করা। সুবহানাল্লাহ একশত বার, আলহামদুলিল্লাহ একশত বার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ একশত বার, আল্লাহু আকবার একশত বার এবং সাথে সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ একশত বার এবং ইস্তেগফার একশত বার। হাদীছে এসেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন একশতবার ইস্তেগফার করতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'সূম তথা নিষ্পাপ ছিলেন, তাঁর তওবা ইস্তেগফারের কোন প্রয়োজন ছিল না, তিনি তার মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য এটা করেছেন তাছাড়া আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যও করেছেন, যেন আমরা প্রতিদিন শতবার তওবা ইস্তেগফার করি।

যাহোক সকাল-সন্ধায় উপরোক্ত তাসবীহ, দুরূদ ও ইস্তেগফার করা চাই। এছাড়াও আরও যত বেশী পারা যায় যিকির করা চাই। সম্ভব হলে সদা সর্বদা জবানে যিকির জারী রাখা। হাদীছে এসেছে– এক সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন,

اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟

অর্থাৎ, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল কোন্‌টা? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللهِ. (رواه الترمذي برقم ٣٣٧٥)

অর্থাৎ, তোমার জবান যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে ভিজা থাকে।

অর্থাৎ, সদা সর্বদা যেন জবানে আল্লাহর যিকির জারী থাকে। সদা সর্বদা যিকির করাকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল কেন বলা হল? কারণ এর দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে থাকে।

আজকের বয়ানের সারকথা হল- প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়বে, প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহর কাছে সবকিছু চেয়ে নিলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়বে, প্রত্যেক পদে পদে যেসব দুআ রয়েছে, তা আমল করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়বে, সদা সর্বদা যিকির করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়বে। এগুলি হল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ার সহজ আমল। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং - ১৯

আল্লাহর ওলী হওয়ার উপায়

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ. وَفِى الْحَدِيْثِ اِيَّاكُمْ وَالتَّقْوٰى. فَاِنَّ التَّقْوٰى رَأْسُ الْاَمْرِ كُلِّهٖ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল– প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়বে, প্রত্যেক পদে পদে আল্লাহর কাছে সবকিছু চেয়ে নিলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়বে, প্রত্যেক পদে পদে যেসব দুআ রয়েছে, তা আমল করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়বে, সদা সর্বদা যিকির করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়বে। এগুলি হল আল্লাহর সাথে তায়াল্লুক সৃষ্টি করার, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ার সহজ আমল। এই সম্পর্ক জোড়ার পর মানুষ যদি প্রত্যেকটা পদে পদে গোনাহ থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে। প্রত্যেক পদে পদে গোনাহ থেকে বিরত থাকতে গেলে আল্লাহর ভয় অর্থাৎ, তাকওয়া ভিতরে আনতে হবে। তাই তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ওলী হয়ে যেতে পারে।

আমরা মনে করি ওলী হতে গেলে বুঝি বড় আলেম হতে হয়, বড় হুজুর হওয়া লাগে, বড় পীর সাহেব হওয়া লাগে ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন-হাদীছে এটা বলা হয়নি যে, আল্লাহর ওলী তথা আল্লাহর বন্ধু হতে গেলে বড় আলেম হতে হবে, বড় হুজূর হতে হবে, বড় পীর হতে হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ওলী কিভাবে হওয়া যায় তাও বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

(সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩)

অর্থাৎ, জেনে রাখ অবশ্যই যারা আল্লাহর ওলী তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন দুঃখ থাকবেনা। ওলী ঐসব লোক যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অর্জন করে।

এ আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা ওলীদের সুন্দর পরিণাম সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁদের কোন ভয় থাকবে না অর্থাৎ, শাস্তির কোন ভয় থাকবে না। আরও বলা হয়েছে তাদের কোন দুঃখ থাকবে না। অর্থাৎ, পরকালের আল্লাহর দেয়া নাজ-নেয়ামত পেয়ে তাঁরা শুধু আনন্দই আনন্দই পাবেন। দুনিয়ার কোন কিছু চিন্তা করে তাদের দুঃখ আসবে না যে, দুনিয়াতে ইবাদত মুজাহাদা করতে যেয়ে কত কষ্ট হয়েছে, দুনিয়াতে হক হালাল পন্থায় থাকতে গিয়ে কত অভাব-স্বভাবের মধ্যে সংসার চালাতে হয়েছে। দুনিয়াতে দ্বীনের পথে চলতে যেয়ে কত মানুষ তাদেরকে কত কষ্ট দিয়েছে, কত টিকা-টিপ্পনি কেটেছে, কত নিন্দা-সমালোচনা ও গালী-গালাজ করেছে। এই সবকিছু তাঁরা ভুলে যাবেন, এগুলির জন্য তাদের কোন দুঃখ হবে না। এই হল আল্লাহর ওলীদের সুন্দর পরিণাম। এরপর আল্লাহ পাক বলেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আল্লাহর ওলী কাদেরকে বলা হয়। আল্লাহর ওলী হল যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অর্জন করে। ঈমান অর্থ আমরা জানি। তাকওয়া অর্থ হল প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর ভয়। এই ভয় থাকলে মানুষ গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে। আল্লাহর ওলীদের মধ্যে জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে তাকওয়া অর্থাৎ, আল্লাহর ভয় থাকে, যার ফলে তাঁরা গোনাহ থেকে বিরত থাকেন। ঈমান এবং এই তাকওয়া যার মধ্যে থাকে, তারা হলেন আল্লাহর ওলী। বোঝা গেল আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য বড় আলেম হতে হবে, বড় হুজুর হতে হবে, বড় পীর সাহেব হতে হবে কিংবা শত শত রাকআত নফল নামায পড়তে হবে, হাজার হাজার রাত্র জাগরণ করতে হবে– আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য এরকম শর্ত নেই। বরং ঈমানের সাথে সাথে গোনাহ থেকে বিরত থাকার উপরে জোর দেয়া হয়েছে। এই গোনাহ থেকে বিরত থাকার মধ্যে ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি জরুরী ইবাদতের কথাও এসে গেছে, কারণ ফরয ওয়াজিব আদায় না করলে তো গোনাহ হয়। তাই গোনাহ থেকে বিরত থাকার মধ্যে ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি জরুরী ইবাদত আদায় করার কথাও এসে গেছে।

একজন মু'মিন বান্দা ফরয ওয়াজিব তো আমল করবেই, এরপরে খুব বেশী নফল ইবাদত করতে পারুক বা না পারুক, কিন্তু সে যদি গোনাহ থেকে বিরত থাকে তাহলে সে আল্লাহর ওলী, আল্লাহর প্রিয় মানুষ। এর বিপরীত একজন মু'মিন বান্দা নফল ইবাদত-বন্দেগী অনেক করল, নফল দান-সদকা অনেক করল, কিন্তু গোনাহ থেকে মুক্ত হতে পারল না, তাহলে সে আল্লাহর ওলী নয়।

একজন মু'মিন বান্দা যদি ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি জরুরী ইবাদত আদায় করার পর গোনাহ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার গোনাহের পাল্লা ভারি হবে না, ফলে সে নাজাত পেয়ে যাবে। আরেকজন নেক আমল অনেক করেছে কিন্তু সাথে সাথে গোনাহও অনেক, তাহলে ঐ কারণে তার গোনাহের পাল্লা ভারি হয়ে যেতে পারে, যার ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হতে পারে। (আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন।) তাই ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি নেক আমল করার পর নফল ইবাদত-বন্দেগীও করতে হবে, তার ফযীলত তো রয়েছেই, কিন্তু বেশী গুরুত্ব দিতে হবে গোনাহ থেকে বিরত থাকার উপর। আল্লাহ পাক তাঁর ওলীদের পরিচয় দিতে গিয়ে এই গোনাহ থেকে বিরত থাকার কথাই উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল গোনাহ হতে বিরত থাকার উপর জোর দিতে হবে। যাহোক আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য তাকওয়া অর্জন করতে হবে অর্থাৎ, গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

তাকওয়া তথা গোনাহ থেকে বিরত থাকা একটা অত্যন্ত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَقْوَى اللهِ رَأْسُ كُلِّ حِكْمَةٍ. (المقاصد الحسنة)

অর্থাৎ, তাকওয়া হল সমস্ত তত্ত্বকথার মূল।

এখানো বোঝানো হয়েছে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় হল সমস্ত নেক আমলের মূল। তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় এসে গেলে সমস্ত নেক আমল এসে যাবে, তাই তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় হল সমস্ত নেক আমলের মূল। আর তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় এসে গেলে সমস্ত গোনাহ থেকেও বিরত থাকা সম্ভব হবে, তাই তাকওয়া হল সব রকম পাপ থেকে বিরত থাকার মূল বা সব রকম পাপ থেকে বিরত থাকার মজবূত পন্থা।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় এসে গেলে মানুষ সব রকম পাপ ও অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে। শুধু ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত পাপ-অপরাধ নয় এমনকি দুনিয়াবী পাপ-অপরাধ থেকেও বিরত হতে পারে। সব রকম পাপ ও অন্যায়-অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ই হল সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে বেশী কার্যকরী পন্থা। অন্যায়-অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য যত শক্ত আইনই করা হোক, যত শক্ত শাস্তির ব্যবস্থাই করা হোক তারপরেও মানুষ অন্যায়-অপরাধ করতে পারে। যেখানে আইনের চোখ দেখে না, যেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন দেখে না, সেখানে যেয়ে মানুষ অন্যা-অপরাধ করতে পারে, পর্দার আড়ালে যেয়ে মানুষ অন্যায়-অপরাধ করতে পারে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যদি কারও মধ্যে আল্লাহর ভয় এসে যায়, তাহলে সে পর্দার আড়ালে গিয়েও, মাটির গর্তে লুকিয়েও, পানির মধ্যে ডুব দিয়েও অন্যায়-অপরাধ করতে পারবে না। কারণ তখনও তার মনে হবে যে, কেউ না দেখলেও আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন, এই অন্যায়-অপরাধ করলে আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন। তাই আল্লাহ সদা সর্বদা আমাকে দেখেন– এই উপলব্ধি এই চেতনা যদি কারও মধ্যে জাগ্রত থাকে, তাহলে সে সব রকম পাপ ও অন্যায়-অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং সে আল্লাহর ওলী হয়ে যেতে পারে।

এক বুযুর্গ তার দুই মুরীদকে পরীক্ষা করতে চাইলেন যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর ওলীর স্তরে উপনীত হতে পেরেছে। তিনি তার দুই মুরীদকে ডাকলেন। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মুরগি দিয়ে বললেন যে, এমন স্থানে গিয়ে জবাই করে নিয়ে আস যেখানে কেউ দেখে না। এক মুরীদ তার মুরগিটা জবাই করে নিয়ে আসল, আরেকজন জবাই ছাড়াই নিয়ে আসল। যিনি জবাই করে নিয়ে আসলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল কোথায় যেয়ে জবাই করে নিয়ে এসেছ? জবাব দিলেন যে, ঐ দেয়ালের আড়ালে গিয়ে, কেউ দেখেনি। যিনি জবাই করেননি তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন যে, কোথাও এমন জায়গা খুঁজে বের করতে পারলাম না, যেখানেই যাচ্ছি মনে হচ্ছে আল্লাহ তো দেখছেন। তাই জবাই করতে পারিনি। বুযুর্গ এই মুরীদকে খেলাফত দিয়ে দিলেন যে, তার মধ্যে আসল জিনিস অর্থাৎ, সদা সর্বদা আল্লাহ দেখেন– এই উপলব্ধি এই চেতনা এসে গেছে। যাহোক বলা হচ্ছিল যে, সদা-সর্বদা আল্লাহ দেখেন এই চেতনা যখন ভিতরে জাগ্রত হয়, তখন মানুষ ভাল মানুষ হয়ে যায়, খাঁটি মানুষ হয়ে যায়। এরকম যখন হয়ে যায় তখন সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যায়, আল্লাহর ওলী হয়ে যায়।

তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ের সবচেয়ে বড় ফায়দা হল এই যে, তাকওয়া দ্বারা আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়, আল্লাহর ওলী হওয়া যায়। তাকওয়ার আরেকটা ফায়দা হল যা কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا. (সূরা তালাক: ২)

অর্থাৎ, যার ভিতরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় এসে যায় আল্লাহ তার জন্য পথ করে দেন।

এখানে বোঝানো হয়েছে যার মধ্যে আল্লাহর ভয় আসে তার জন্য আল্লাহ পথ করে দেন। কিসের জন্য পথ করে দেন? তার সব সমস্যা সমাধানের পথ করে দেন, তাকওয়ার উপর চলতে অর্থাৎ, গোনাহ থেকে বিরত থাকতে কোন সমস্যা হলেও সে সমস্যার সমাধান করে দেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা আমরা জানি। জুলায়খা একে একে সাতটা দরজা বন্ধ করে হযরত ইউসুফ (আ.) কে ভিতরের এক রুমে নিয়ে গিয়ে যেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। হযরত ইউসুফ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(আ.)-এর ভিতরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় জাগ্রত ছিল। তিনি যেনা থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাঁচার উপায় কি? সবগুলো দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। দৌড় দিয়েও পালাবার কোন পথ নেই। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য তিনি দৌড় দিয়েছেন, এক এক দরজার সামনে গিয়েছেন আর সেই দরজা খুলে গিয়েছে। এভাবে একে একে সব দারজা খুলে গেছে। তিনি গোনাহ থেকে বাঁচতে চেয়েছেন, সমস্যা দেখা দিয়েছে আল্লাহ পাক সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন।

গোনাহ থেকে বাঁচতে চাইলে যে আল্লাহ তার ব্যবস্থা করে দেন, তার আরও একটা ঘটনা শুনুন। ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী তার প্রসিদ্ধ কিতাব তাম্বীহুল গাফিলীনে ঘটনাটি লিখেছেন। আমি ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণণা করছি। বনী ইসরাঈলদের একজন পরহেজগার মানুষ টুকরি বিক্রি করে তার জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন টুকরি বিক্রি করতে করতে বাদশাহর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। রাণীর এক দাসী দেখল যে, এত সুন্দর একজন মানুষ টুকরি বিক্রি করছে, এরকম সুন্দর চেহারার মানুষ আর সে কখনও দেখেনি। সে ভিতরে যেয়ে রাণীকে খবর দিল যে, রাণীমা! এরকম সুন্দর পুরুষ আর কখনও দেখিনি। রাণী বলল, তাকে ভিতরে ডেকে আন! তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল। রাণীর হাবভাবে সে বুঝল যে, রাণীর উদ্দেশ্য ভাল নয়। রাণী তাকে পাপ কাজে জড়াতে চায়। সে রাণীকে বলল যে, আপনার ঘরের ছাদের উপরে কি একটু উঠা যাবে, আমি একটু উযূ করতে চাই। রাণী বুঝতে পারেনি যে, উযূ করলে তো ঘরেই করতে পারে ছাদে কেন উঠতে চায়। যা হোক ছাদে উঠার ব্যবস্থা করা হল। রাণী ভিতরে আছে, ভাবছে ও যাবে কোথায়? লোকটা ছাদের উপরে যেয়ে চিন্তা করছে সত্তর বৎসর ইবাদত বন্দেগী করে আল্লাহর যতটুকু নৈকট্য অর্জন করলাম, আজ তো সব শেষ হয়ে যাবে। এখন ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া ব্যতীত এই গোনাহ থেকে বাঁচার আর কোন পথ নেই। সে এই চিন্তা করছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে বললেন, জিব্রাঈল! তোমার ডানা বিছিয়ে দাও। ডানার উপরে করে তাকে নীচে নামিয়ে নিয়ে আস। হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাই করলেন। এই ঘটনা থেকে এটাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কেউ যদি পাপ থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহ পাক তাকে পাপ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহর ভয় যখন এসে যায় আল্লাহ পাক তার সবকিছুর পথ খুলে দেন, সব সমস্যাকে আছান করে দেন। শুধু দ্বীনের লাইনের সমস্যা নয় দুনিয়াবী লাইনের সমস্যাও আছান করে দেন। তাই পরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (সূরা তালাক : ৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দিবেন সে ধারণাও করতে পারে না।

গোনাহ থেকে বাঁচতে চায়, খারাপ পথে যেতে চায় না, মনে হচ্ছে হারাম পথে না গেলে, সুদ-ঘুষের লাইনে না গেলে, দুর্নীতির পথে না গেলে আয়-উপার্জনের কোন ব্যবস্থা নেই, দুনিয়ায় ফকীর হয়ে থাকতে হবে, গরীব হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ পাক হালাল রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন, এমন স্থান থেকে ব্যবস্থা করে দিবেন যার কল্পনাও হবে না। এভাবে তাকওয়ার ওছীলায় দুনিয়ার লাইনের সমস্যাও আল্লাহ পাক আছান করে দেন। যেহেতু তাকওয়া অবলম্বন করার ফলে সে আল্লাহর ওলী হয়ে গেছে, আল্লাহর আপন মানুষ, আল্লাহর প্রিয় মানুষ হয়ে গেছে, তাই আল্লাহ পাক তাকে সমস্যায় রাখবেন না বরং তার সমস্যা দূর করে দিবেন।

যাহোক আলোচনা করা হচ্ছিল যে, আল্লাহর ওলী কারা। কুরআনে কারীমের বর্ণণা মতে যাদের মধ্যে সহীহ ঈমান আছে এবং তাকওয়া পরহেযগারী আছে, তারাই আল্লাহর ওলী। আল্লাহর ওলী হতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

গেলে বড় আলেম হতে হবে, বড় হুজুর হতে হবে, বড় পীর হতে হবে এমন জরূরী নয়। বরং সহীহ ঈমান ও পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া পরহেযগারী থাকলেই আল্লাহর ওলী হওয়া যায়। একজন ইংরেজী শিক্ষিত মানুষও আল্লাহর ওলী হতে পারে, যদি তার ঈমান সহীহ হয় এবং তার মধ্যে পূর্ণ তাকওয়া পরহেযগারী থাকে। একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষও আল্লাহর ওলী হতে পারে, যদি তার ঈমান সহীহ হয় এবং তার মধ্যে পূর্ণ তাকওয়া পরহেযগারী থাকে। একজন রিকশাওয়ালা বা ঠেলাওয়ালাও আল্লাহর ওলী হতে পারে, যদি তার ঈমান সহীহ হয় এবং তার মধ্যে পূর্ণ তাকওয়া পরহেযগারী থাকে। একজন কৃষক বা দিনমজুর কিংবা একজন কুলিও আল্লাহর ওলী হতে পারে, যদি তার ঈমান সহীহ হয় এবং তার মধ্যে পূর্ণ তাকওয়া পরহেযগারী থাকে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। তাহল– পূর্ণ তাকওয়া পরহেযগারী বলতে কি বোঝায়? এটা ব্যাখ্যা করার পূর্বে তাকওয়া শব্দের অর্থ শুনুন। তাকওয়া শব্দের ফার্সীতে অর্থ করা হয় পরহেযগারী। বাংলা অর্থ হল বিরত থাকা। এখন কি কি জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে তা বুঝলেই তাকওয়ার সব সাইড অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া পরহেযগারী কথাটা বুঝে আসবে। তাহলে শুনুন– ছয়টা জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে, তাহলে পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া পরহেযগারী অর্জিত হবে।

১ নম্বর– কুফর ও শিরক থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব কি কি জিনিস কুফর ও শিরক তা জানতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২ নম্বর– হারাম ও গোনাহে কবীরা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব কি কি জিনিস হারাম ও গোনাহে কবীরা তা জানতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩ নম্বর– গোনাহে ছগীরা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব কি কি জিনিস গোনাহে সগীরা তা জানতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে। সংক্ষেপে কি কি জিনিস কুফর ও শিরক, কি কি জিনিস গোনাহে কবীরা এবং কি কি জিনিস গোনাহে সগীরা তার একটি তালিকা "আহকামে যিন্দেগী"তে দেয়া হয়েছে সেটা দেখে নিতে পারেন।

৪ নম্বর– যেখানে হালাল না হারাম–এই সন্দেহ থাকে সেখান থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন আপনার কোন আত্মীয়ের আপনার অফিসে কোন কাজ আছে। এ অবস্থায় সে আপনার বাসায় কোন হাদিয়া তোহফা নিয়ে এল। এখন সন্দেহ হয় যে, সে এই হাদিয়া কি অফিস থেকে কাজ উদ্ধারের জন্য নিয়ে এসেছে, নাকি আত্মীয় হিসেবে হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে এসেছে। অফিস থেকে কাজ উদ্ধারের জন্য এনে থাকলে সেটা হবে ঘুষ যা গ্রহণ করা হারাম। আর আত্মীয় হিসেবে হাদিয়া স্বরূপ এনে থাকলে সেটা গ্রহণ করা হালাল। এখানে যেহেতু উভয় দিকের সন্দেহ রয়েছে তাই তাকওয়া পরহেযগারী হল এ থেকে বিরত থাকা।

৫ নম্বর– অনর্থক কাজ ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাদীছে এসেছে–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ. (رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٢٢٩ والحديث حسن لغيره)

অর্থাৎ, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল অনর্থক কাজ ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা। এ হাদীছের ভাবার্থ হল– সুন্দর মুসলমান হওয়ার জন্য অনর্থক কাজ ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬ নম্বর– যে সব মোবাহ কাজ গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন মাগরিবের নামাযের পরে ঘুম পড়া মোবাহ বা জায়েয। কিন্তু এই মোবাহ কাজ একটা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

গোনাহের দিকে টেনে নিতে পারে। তাহল ঘুমিয়ে পড়লে ঈশার নামায কাযা হয়ে যেতে পারে। তাই তাকওয়া পরহেযগারী হল এ সময় ঘুমানো থেকে বিরত থাকা। এমনিভাবে যে কোন মোবাহ কাজ কোন গোনাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে বিরত থাকা হল তাকওয়া।

এই ছয়টা জিনিস থেকে বিরত থাকলে পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া পরহেযগারী অর্জিত হবে এবং আল্লাহর ওলী হওয়া যাবে।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য কি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী করার প্রয়োজন নেই, শুধু এই ছয়টা জিনিস থেকে বিরত থাকলেই চলবে? তাহলে শুনুন। আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয ওয়াজেব ইবাদত-বন্দেগী করারও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এগুলি বর্জন করাতো হারাম ও গোনাহে কবীরা। আর দ্বিতীয় নম্বরেই হারাম ও গোনাহে কবীরা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। কাজেই নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয ওয়াজেব ইবাদত-বন্দেগী অবশ্যই করতে হবে। এমনকি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সুন্নাত, মুস্তাহাব, আদবও আমল করা চাই। হাদীছে এসেছে– "বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, এমনকি সে আমার প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়, আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি।" তাই সুন্নাত ও নফল ইবাদতও গুরুত্বপূর্ণ। আগামী জুমুআয় ইনশাআল্লাহ সুন্নাত, মুস্তাহাব ও আদবের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এখানে আরও একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য ছগীরা কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে বিরত থাকা চাই। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত আর কেউই এমন নেই যার দ্বারা গোনাহ হয়না। একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন মা'সূম তথা নিষ্পাপ, তাঁদের দ্বারা কোনা গোনাহ হয় না, অন্য কেউ মা'সূম নয়, অন্য সকলের দ্বারাই পাপ হতে পারে এবং কম বেশী হয়েও থাকে। তাহলে তো আরও কারও পক্ষেই আল্লাহর ওলী হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রশ্নের জওয়াব হল গোনাহ হলে তওবা করে নিতে হবে। হাদীছে এসেছে,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّاذَنْبَ لَهُ. (رواه ابن ماجة وقال السندي : الحديث ذكره صاحب الزوائد في زوائده وقال : إسناده صحيح .)

অর্থাৎ, গোনাহ থেকে যে ব্যক্তি তওবা করে নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যায় যার কোন গোনাহ নেই। অতএব গোনাহ হয়ে গেলে তওবা করে নিতে হবে, তাহলে আল্লাহর ওলী হওয়ার পক্ষে কোন বাঁধা থাকবে না।

অনেকে মনে করে আল্লাহর ওলী হতে গেলে আগে কারামত দেখাতে হবে, অনেক অলৌকিক কিছু দেখাতে হবে আরও কত কিছু। আসলে এরকম কিছুই জরূরী নয়। আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য শুধু জরূরী হল ঈমান যেন দূরস্ত থাকে, কোন গোনাহ যেন না হয়, কোন আমল যেন ছুটে না যায়। আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য কারামত প্রকাশ পাওয়া, অলৌকিক কিছু দেখাতে পারা এগুলি কিছুই জরূরী নয়।

একটা ঘটনা শুনুন। হযরত মোজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহ.) সম্পর্কে আমরা অনেকে জানি। তিনি একজন সর্বজন স্বীকৃত আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ বা ধর্ম সংস্কারক বলা হয়। ভারতের সেরহিন্দে তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি গিয়েছিলেন যে, শুনেছি

www.maktabatulabrar.com

মোজাদ্দেদে আলফে ছানী একজন বড় বুযুর্গ। যিনি গিয়েছিলেন তিনিও বুযুর্গ মানুষ ছিলেন। তবুও এক বুযুর্গ আরেক বুযুর্গের কাছে গিয়ে থাকেন। তাই তিনি মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর খেদমতে গেলেন। তিনি মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর সোহবতে একে একে দশ বছর থাকলেন। কিন্তু এই দশ বছরে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) থেকে অলৌকিক কিছুই দেখতে পেলেন না। তাই একদিন রাত্রে মনে মনে ভাবলেন আগামীকাল চলে যাব। দশ বৎসর থাকলাম, কোন কারামত দেখলাম না, কোন অলৌকিক কিছু দেখলাম না, তাই আগামীকাল চলে যাব। ঐ দিন ফজরের নামাযের পর হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) তাকে জিজ্ঞসা করলে دل میں کیا بات آئی অর্থাৎ, দিলের ভিতরে কি কথা এসেছে বল! হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) তার দিলের কথা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। বুযুর্গদেরকে আল্লাহ পাক অনেক গোপন কথা জানিয়ে দেন। এটাকে বলা হয় কাশ্‌ফ। তাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা অনেক কিছু উদয় করে দেন। এভাবে তাঁরা অনেক কিছু জানতে পারেন। যাহোক তিনি একথা প্রশ্ন করার পর সেই লোকটা ভাবল আমিতো ধরা পড়ে গেছি, এখন তো আর স্বীকার না করে উপায় নেই। তিনি বললেন, হুজুর! আমার দিলে একথা এসেছে যে, দশ বছর আপনার খেদমতে থাকলাম, কোন কারামত দেখলাম না। অথচ ছোট খাট কারামত আমিও দেখাতে পারি। তাই ভাবলাম আপনার কাছে থেকে আমার কী লাভ হবে? তখন হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি কারামত দেখতে পার? তিনি বললেন, আমি ধ্যান করে কবরের ভিতরে ঢুকে মুর্দার সাথে কথা বলে আসতে পারি। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) বললেন, তুমি তো কবরের ভিতরে ঢুকে কথা বলবে আর আমি তো এখানে বসে ডাক দিলে সেরহিন্দের সব রূহ এখানে এসে হাজির হয়ে যাবে। এখানে বসে কথা বলব। কিন্তু এটাতো কোন বুযুর্গী নয়। আসল বুযুর্গী হল যার কোন আমল ছোটে না। তুমি আমার কাছে দশ বৎসর থেকেছ, বল কোন ফরয ওয়াজিব নয় কোন সুন্নাত, মোস্তাহাব আমার থেকে ছুটতে দেখেছ? তিনি বললেন, না হুজুর দেখিনি। তখন হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) বললেন, এটাই হল বুযুর্গী, এটাই হল কামাল। তাই বলা হচ্ছিল আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য শুধু জরূরী হল ঈমান যেন দূরস্ত থাকে, কোন গোনাহ যেন না হয়, কোন আমল যেন ছুটে না যায়। আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য কারামত প্রকাশ পাওয়া, অলৌকিক কিছু দেখাতে পারা এগুলি কিছুই জরূরী নয়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করুন এবং ঈমান ও তাকওয়া গুণ অর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহর ওলী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং - ২০

সুন্নাত ও মোস্তাহাবের গুরুত্ব

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুসলমান হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। নামে মাত্র মুসলমান হওয়ার হুকুম নয়, বরং খাঁটি মুসলমান এবং পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। যদি কেউ শুধু নামে মুসলমান হয়, মুসলমানী কাজ কিছু না করে সে হল নামে মুসলমান, খাঁটি মুসলমান নয়। এরকম মুসলমান হওয়ার হুকুম দেননি। কেউ যদি শুধু নামে মুসলমান নয় বরং কাজও কিছু কিছু করে কিন্তু পুরোপুরি করে না, সে হল অপূর্ণাঙ্গ মুসলমান। এরকম মুসলমান হওয়ার হুকুমও দেননি। আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে হুকুম দিয়ে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. (সূরা বাকারা: ২০৮)

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা তোমরা পুরোপুরি ইসলামের ভিতরে প্রবেশ কর। অর্থাৎ, পুরো মুসলমান হয়ে যাও, পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হয়ে যাও।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ মুসলমান কাকে বলা হবে? যে ব্যক্তি ইসলামের সব কিছু মেনে চলে সে হল পূর্ণাঙ্গ মুসলমান। জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান রয়েছে, জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যে ক্ষেত্রে ইসলাম কোন বিধান দেয়নি। এই সব বিধি-বিধান যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে মেনে চলে সে হল পূর্ণ মুসলমান। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে এই কথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর জন্য বিধি-বিধান দিয়েছেন। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ. (সূরা আনআম: ৩৮)

অর্থাৎ, আমি কিতাবে কোন কিছু বলতে ছেড়ে দেয়নি।

এ আয়াত থেকেও বোঝা যায় জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে কোন না কোন বিধান অনুপস্থিত। সবটার ক্ষেত্রে বিধান আছে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন বিধান আছে তেমনিভাবে ব্যক্তি জীবনকে কিভাবে চালাতে হবে, পরিবারকে কিভাবে চালাতে হবে, সমাজকে কিভাবে চালাতে হবে, সবকিছুর বিধি-বিধান রয়েছে। ব্যক্তি জীবনের উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা, উযূ গোসল, পোষাক-পরিচ্ছদ, এমনকি জুতা পরিধান করার বিধান পর্যন্ত আছে। এই সবকিছু যে পূর্ণভাবে মেনে চলবে সে হল পূর্ণাঙ্গ মুসলমান।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

জীবনের সব ক্ষেত্রে এই যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, তা কয়েক পর্যায়ের। কিছু আছে ফরয, কিছু আছে ওয়াজেব, কিছু আছে সুন্নাত, কিছু আছে মোস্তাহাব, কিছু আছে আদব পর্যায়ের। এই সব পর্যায়ের বিধানগুলি যে মানবে সে হল পূর্ণাঙ্গ মুসলমান। এক কথায় জীবনের সবক্ষেত্রের সব পর্যায়ের বিধি-বিধান যে মানবে সে হল পূর্ণাঙ্গ মুসলমান। কিছু মানলাম কিছু মানলাম না, ফরয মানলাম সুন্নাত মানলাম না, সুন্নাত মানলাম কিন্তু মোস্তাহাবের ধার ধরলাম না, তাহলে আমি পূর্ণাঙ্গ মুসলমান নই। তাই সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলিও গুরুত্বপূর্ণ।

মোট কথা **সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার একটি দিক হল–** পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে হলে এই সব ধরনের বিধি–বিধানের উপরই আমল করতে হবে।

সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আর একটি দিক হল– শরীয়তে সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলির মধ্যে যদিও স্তরগত কিছু পার্থক্য আছে, গুরুত্বের মধ্যে কিছু কম বেশী আছে, কিন্তু সবটাই আল্লাহ আল্লাহর রসূলের বিধান। ফরয ওয়াজেবগুলি যেমন আল্লাহ আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে এসেছে, সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলিও আল্লাহ আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকেই এসেছে, অন্য কোন মানুষের পক্ষ থেকে আসেনি। এ হিসেবে কোনটাই গুরুত্বহীন নয়, কোনটাই তুচ্ছ করার নয়, কোনটাই ক্ষুদ্র জানার নয়। অতএব এ কথা মনে করা ঠিক নয় যে, শুধু ফরয পড়লেই সারে সুন্নাত নাইবা পড়লাম কিংবা মুস্তাহাব তো আর ফরয ওয়াজেবের মত গুরুত্বপূর্ণ নয় না করলেও গোনাহ তো নেই, নাই বা করলাম। এরূপ মনে করা ঠিক নয় এজন্য যে, এতে সুন্নাত মুস্তাহাবের প্রতি তুচ্ছ মনোভাবকে স্থান দেয়া হয়। শরীয়তের কোন বিধানের প্রতিই তুচ্ছতার মনোভাব রাখা যাবে না, চাই সেটা যে পর্যায়েরই হোক না কেন। সবটাই তো আল্লাহ আল্লাহর রসূলের বিধান, এ হিসেবে সবটাই গুরুত্বপূর্ণ।

সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আর একটি দিক হল– ফরযকে রক্ষার স্বার্থেই সুন্নাতকে দেয়া হয়েছে। সুন্নাতকে রক্ষার সার্থে মোস্তাহাব আদব দেয়া হয়েছে। মুস্তাহাবকে রক্ষার স্বার্থে আদব দেয়া হয়েছে। সুন্নাত মোস্তাহাব ও আদব রক্ষা না হলে শেষ পর্যন্ত ফরয ওয়াজেবও রক্ষা পায় না। যেমন একটা উদাহরণ– বিল্ডিং বানাতে গেলে অনেকগুলো জিনিস লাগে, ইট লাগে, সিমেন্ট লাগে, বালু লাগে, রড লাগে, খোয়া লাগে ইত্যাদি। এই সবগুলো জিনিস দিয়ে একটা বিল্ডিং তৈরী হয়। এগুলো না হলে বিল্ডিংই হবে না। মনে করুন এগুলো হল করযের সমতুল্য। এছাড়া আরও কিছু কাজ আছে যা না হলেও বিল্ডিং হয়ে যায়, কিন্তু না করলে বিল্ডিং ভাল থাকেনা। যেমন প্লাষ্টার করা, যদি কেউ প্লাষ্টার নাও করে তবুও বিল্ডি হয়ে যায়, কিন্তু প্লাষ্টার না করলে বিল্ডিং ভাল থাকেনা, শেষ পর্যন্ত বিল্ডিং নষ্ট হয়ে যায়। মনে করুন এই প্লাষ্টার করা হল সুন্নাত পর্যায়ের। এই প্লাষ্টারও ভাল থাকবে না যদি এর উপরে রং লাগানো না হয়। মনে করুন এই রং লাগানো হল মোস্তাহাব পর্যায়ের। এই রংটাও ভাল থাকবে না যদি ঝাড়া-মোছা করা না হয়। মনে করুন এই ঝাড়া-মোছা করা হল আদব পর্যায়ের। এখানে দেখার বিষয় হল– যদিও প্লাষ্টার করা, রং লাগানো, ঝাড়া-মোছা করা রড সিমেন্ট ইত্যাদি বিল্ডিংয়ের জরুরী জিনিসের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু এগুলি না করলে শেষ পর্যন্ত ঐই জরুরী জিনিসগুলিও রক্ষা পায় না। ঝাড়া-মোছা না করলে ধীরে ধীরে রং নষ্ট হয়ে যায়, রং না করলে ধীরে ধীরে প্লাষ্টার নষ্ট হয়ে যায়, প্লাষ্টার না করলে ধীরে ধীরে বিল্ডিং নষ্ট হয়ে যায়। অতএব দেখা গেল সুন্নাত, মুস্তাহাব ও আদব পর্যায়ের জিনিসগুলিও এই অর্থে জরুরী যে, এগুলি না করলে শেষ পর্যন্ত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ফরয ওয়াজেব পর্যায়ের জিনিসও রক্ষা পায়না। বিল্ডিংয়ের উদাহরণ থেকে বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে বুঝে আসে। এক হাদীছে ইসলামে আমলগুলোকেও এই বিল্ডিং এর সঙ্গে উদাহরণ দেয়া হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, ইসলামের ঘরটাকে দাঁড় করানো হয়েছে পাঁচটা জিনিসের উপর। (১) ঈমান (২) নামায (৩) রোযা (৪) হজ্জ (৫) যাকাত।

এখানে ইসলামটাকে একটা ঘরের সঙ্গে তুলনা দেয়া হয়েছে। তখন এরকম বিল্ডিং ছিল না, তখন তাবু ঘরের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাই তাবুর সঙ্গে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে। তাবু বানাতে গেলে পাঁচটা খুঁটি লাগে। চার কোণায় চারটা ছোট্ট খুঁটি আর মাঝখানে তাবুকে উঁচু করে রাখার জন্য লম্বা একটা খুঁটি। এই তাবুর সঙ্গে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, এই পাঁচটা খুঁটি যেমন তাবুর জন্য মৌলিক, ইসলামেরও এরকম পাঁচটা মৌলিক বিষয় রয়েছে। এর ভিতরে ঈমানের অবস্থা হল ঐ মাঝখানের খুঁটির মত। আর নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এই চারটা হল চার কোণার খুঁটির মত। তাবুর মাঝখানের খুঁটি যদি না থাকে, তাহলে চার কোণার চারটা খুঁটি থাকলেও সেই তাবুর নীচে কেউ বাস করতে পারবে না, কারণ মাঝখানের খুঁটি না থাকলে তাবু দাঁড়ই থাকবে না, ভেঙ্গে পড়বে। তদ্রূপ ঈমান হল মাঝখানের খুঁটির মত। ঈমান ঠিক না থাকলে অবশিষ্ট খুঁটিগুলি থাকলেও তা কাজে আসবে না। ঈমান ঠিক না থাকলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত কোনটাই কাজে আসবে না।

এ হাদীছে ইসলামকে ঘরের সঙ্গে তুলনা দেয়া হয়েছে। তাই ইসলামের বিষয়গুলোকে ঘরের সঙ্গে তুলনা করে বোঝা যেতে পারে। তাই আমরা বিল্ডিংয়ের সঙ্গে আমলগুলোর উদাহরণ দিয়ে বলেছি ফরয ওয়াজেব রক্ষার জন্য সুন্নাত, সুন্নাত রক্ষার জন্য মোস্তাহাব আর মোস্তাহাব রক্ষার জন্য আদব। আদব রক্ষা না হলে মুস্তাহাব রক্ষা হবেনা, মুস্তাহাব রক্ষা না হলে সুন্নাত রক্ষা হবে না আর সুন্নাত রক্ষা না হলে ফরয ওয়াজেব রক্ষা হবে না। যেমন জামাআতে নামায পড়া সুন্নাত এবং গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কেউ যদি এই সুন্নাতটা ছেড়ে দেয় যে, জামাআতে নামায পড়া সুন্নাত, ঘরে পড়লেও তো নামায হয়ে যায়। এই মনে করে ঘরে নামায পড়তে থাকল। দেখা যাবে আস্তে আস্তে তার মধ্যে নামাযের সময়ের নিয়মানুবর্তীতা কমে আসছে। ভাববে সময়তো আছে একটু পরে পড়ে নেব। এভাবে দেখা যাবে কোন একদিন মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ছে। আরেকদিন মাকরূহ ওয়াক্তেও পড়বে না, ভাববে আজকে খুব কাজের ব্যস্ততা আছে, আচ্ছা পরে কাযা পড়ে নেব। এই তার নামায কাযা হওয়া শুরু হল অর্থাৎ, ফরয ছোটা আরম্ভ হল। দেখা গেল জামাতে নামায পড়া সুন্নাত, এই সুন্নাত রক্ষা না করার কারণে তার ফরয রক্ষা হল না। সব আমলের ক্ষেত্রেই এরকম।

সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আর একটি দিক হল– কেউ যখন সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদব পর্যায়ের আমল ছাড়তে শুরু করে, তখন আমলের লাইনে তার এমন বে-বরকতী শুরু হয় যে, শেষ পর্যন্ত সে ফরয ওয়াজেব ছাড়তে শুরু করে, এমনকি এর বে-বরকতীতে শেষ নাগাদ কাফের পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদব পর্যায়ের আমল হল উঁচু পর্যায়ের আমল। এই উঁচু পর্যায় থেকে যখন কেউ নামতে শুরু করে, তখন নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত চরম পর্যায়ের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অধঃপতনে চলে যেতে পারে অর্থাৎ, কাফের হয়ে যেতে পারে। যেমন একটা গাড়ী উপর দিকে উঠছে। যখন কোন গাড়ি উপর দিকে ওঠা শুরু করে, তখন নিয়ম হল তার গতি আর কমতে পারবে না বরং গতি বাড়িয়েই যেতে হবে। যদি গতি একবার কমে যায়, তাহলে গাড়ি নীচের দিকে অর্থাৎ, পিছন দিকে যাওয়া শুরু করবে। আর একবার নীচের দিকে যাওয়া শুরু হলে তখন গাড়িকে আর উপর দিকে উঠানো অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। নীচের দিকে যাওয়া শুরু করলে আর উপর দিকে উঠতে চাইবে না বরং পিছন দিকেই যেতে থাকবে। এভাবে পিছন দিকে যেতে যেতে খাদে পড়ে গাড়ী ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক এরকম– মানুষ যখন সুন্নাত, মোস্তাহাব ছেড়ে দেয়া শুরু করে, তার অধঃপতন শুরু হয়, তার ফরয ওয়াজেব ছুটতে শুরু করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তার ঈমানও নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আর একটি দিক হল– বিশেষভাবে সুন্নাত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে যে, সুন্নাতের সাথে মহব্বত কায়েম হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মহব্বত কায়েম হয়, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মহব্বত কায়েম হলে জান্নাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্য লাভ করা যাবে। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِى الْجَنَّةِ. (كذا في المشكاة عن الترمذي)

অর্থাৎ, যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে তো আমাকেই ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সান্নিধ্য লাভ করবে।

সুন্নাতের উপরে আমল করতে থাকলে আস্তে আস্তে সুন্নাতের সাথে মহব্বত পয়দা হয়ে যাবে। আর এই মহব্বত শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে শুধু জান্নাতেই পৌঁছাবে না বরং জান্নাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ করাবে। এ দৃষ্টিভংগিতে সুন্নাতের উপর আমল করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সুন্নাতের উপর মজবুতির সাথে আমল করা চাই।

সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আর একটি দিক হল– হাদীছে এসেছে– কেয়ামতের দিন যখন কারও ফরয ওয়াজেবের হিসাবে ঘাটতি থাকবে, তখন তার নফল দেখা হবে, যদি তার নফল ইবাদত থাকে, তাহলে সেই নফল দ্বারা ফরয ওয়াজেবের ঘাটতি পূরণ করা হবে এবং তার নাজাতের ব্যবস্থা হবে। তাই সব ধরনের আমলের ক্ষেত্রে ফরযের সাথে সাথে কিছু নফলও করে রাখা চাই। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সব ধরনের আমলের ক্ষেত্রেই ফরযের সাথে সাথে নফলও করে রাখা চাই। নফল নামায দ্বারা ফরয ওয়াজেব নামাযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। নফল রোযা দ্বারা ফরয রোযার ঘাটতি পূরণ করা হবে। নফল হজ্জ দ্বারা ফরয হজ্জের ঘাটতি পূরণ করা হবে। নফল দান-সদকা দ্বারা ফরয যাকাতের ঘাটতি পূরণ করা হবে। আর নফল না থাকলে ফরয ওয়াজেবের ঘাটতি পূরণ হওয়ার ব্যবস্থা হবে না, যার ফলে নাজাত নাও হতে পারে। দেখা গেল নফল তখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নফল নাজাত হওয়া না হওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভূমিকা রাখবে। এ হিসেবে নফল ইবাদত তখন ফরযের মতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব– এগুলি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আর একটি দিক হল– এর দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। বিশেষভাবে সুন্নাত সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত মোতাবেক আমল করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা হবে। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলার অনুসরণ করা হবে। আর আল্লাহ তাআলার অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা লাভ করা যাবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি মানুষকে বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে তোমরা আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।

এতো গেল সুন্নাত সম্পর্কে কথা। মোস্তাহাব ও নফল আমল দ্বারাও মানুষ আল্লাহর প্রিয় হয়ে যেতে পারে একথা হাদীছে কুদছীতে এসেছে। মোস্তাহাব ও নফল আমল দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা লাভ হয়। এর দ্বারা মানুষ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হতে পারে, আল্লাহর ওলী হয়ে যেতে পারে– এ বিষয়ে গত জুমুআয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দেখা গেল সুন্নাত, মোস্তাহাবের এত দাম যে, সুন্নাত মোস্তাহাবের উপরে আমল করার দ্বারা মানুষ আল্লাহর বুযুর্গ, আল্লাহর ওলী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে সুন্নাত মোস্তাহাবের উপরে আমলের তেমন গুরুত্ব নেই। জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে কয়টা সুন্নাত, কয়টা মোস্তাহাব, কয়টা আদব এগুলি আমল করাতো দূরের কথা ঠিকমত অনেকে জানিও না। সবচেয়ে বড় ইবাদত হল নামায, এই নামযের কয়টা সুন্নাত তাও আমরা জানি না। অনেকে তো ফরয ওয়াজিব কয়টা তাও বলতে পারে না। বড়ই দুঃখজনক বিষয়। নামাযে পঞ্চাশের উপরে সুন্নাত রয়েছে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে আসি যাই, এই মসজিদে ঢোকার সময় ছয়টা সুন্নাত রয়েছে। বের হওয়ার সময়ও ছয়টা সুন্নাত রয়েছে। এগুলি আমল করলে প্রতি দিনে পাঁচ ওয়াক্তে ৬০টা সুন্নাতের উপরে আমল হয়। এমনিভাবে প্রতিদিন আমরা খাওয়া-দাওয়া করি, খাওয়ার সময় প্রায় ৩৫টা সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদব রয়েছে। আমরা পানি পান করি, এই পানি পান করার ১৪টা সুন্নাত আদব রয়েছে। প্রতিদিন আমরা ঘুমাই, এই ঘুমানোর চল্লিশটার উপরে সুন্নাত আদব রয়েছে। আমরা কাপড়-চোপড় পরিধান করি, জুতা পরিধান করি, এই পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত প্রায় ৪২টা সুন্নাত আদব রয়েছে। আমরা হাটা-চলা করি, এই হাটা-চলা করার ভিতরেও আমাদের প্রায় ২৮টা সুন্নাত আদব আমল করার রয়েছে। এর অনেকটা আমরা জানি না, করি না, বা করলেও সেটা সুন্নাত বা আদব এটা খেয়াল না করেই করি। জানতে হবে, সুন্নাত আমল করার নিয়তে করতে হবে। সুন্নাত মোস্তাহাবের ফযীলত অর্জন করার নিয়তে করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় এসমবের কোন খবর রাখি না। এভাবে আমাদের জীবন সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদব বর্জন করার জীবন চলছে।

যাহোক এ পর্যন্ত সুন্নাত, মোস্তাহাব কেন গুরুত্বপূর্ণ তার সাতটি দিক তুলে ধরা হল।

সবশেষে আদব সম্পর্কে বিশেষ আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজনীয় মনে করছি। আমরা অনেকে আদবের গুরুত্ব দেই না। মনে করি আদব সুন্নাত মুস্তাহাবও নয়, তার চেয়ে নিম্নমানের বিষয়। অথচ আদবও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদব অনেক ব্যাপক বিষয়। ইবাদতের ক্ষেত্রেও আদব আছে, লেন-দেনের ক্ষেত্রেও আদব আছে, সমাজ সামাজিকতার ক্ষেত্রেও আদব আছে। এক কথায় দ্বীনের ক্ষেত্রেও আদব আছে দুনিয়ার ক্ষেত্রেও আদব আছে। দুনিয়াবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে আদবের গুরুত্বও

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অনেক। অর্থাৎ, মুরব্বী ও গুরুজনদের সাথে আদব-তাজীম রক্ষা করার গুরুত্ব অনেক। এমনকি এই আদবের গুরুত্ব বর্ণনা করতে যেয়ে এক কবি বলেছেন,

بے ادب محروم گشت از فضل رب.

অর্থাৎ, বে-আদব আল্লাহর ফজল তথা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

আদবের বিপরীত হল বে-আদবী। যার মধ্যে বে-আদবী থাকে সে হল বে-আদব। এ কবিতার মধ্যে বলা হয়েছে বে-আদব আল্লাহর অনুগ্রহ তথা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। দ্বীনের ক্ষেত্রে যদি কেউ বে-আদবী করে, তাহলে সে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। দ্বীনের ক্ষেত্রে বে-আদবী হল যেমন দ্বীনী কথা হচ্ছে, দ্বীনী কথার আদব রক্ষা করা হল না, বসার ভিতর আদব থাকল না, মনোযোগিতার সাথে শোনার আদব রক্ষা করা হল না। উলামায়ে কেরাম কথা বলছেন, তাদের কথার উপর কথা বলা হল, তাদের কথাকে ওভারটেক করে কথা বলা হল। উলামায়ে কেরামের সাথে বে-আদবী প্রকারান্তরে দ্বীনের সাথে বে-আদবী, উলামায়ে কেরামের সাথে বে-আদবী প্রকারান্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বে-আদবী। কারণ উলামায়ে কেরাম হলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিছ বা প্রতিনিধি। অতএব উলামায়ে কেরামের সাথে বে-আদবী প্রকারান্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বে-আদবী। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বে-আদবী এতবড় জঘন্য যে, তাতে মানুষের ঈমান পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে করীমে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ. الاية. (সূরা হুজুরাত: ২)

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা। নবীর কথার আওয়াজের চেয়ে তোমাদের কথার আওয়াজ যেন বড় না হয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল– যখন নবীর সাথে কথা বলবে, তখন আওয়াজের ক্ষেত্রেও তোমরা ওভারটেক করতে পারবে না। আল্লাহর নবীর কথার উপরেও তোমরা কোন কথা বলবে না। যে ব্যাপারে যেটা বলবেন, সেটাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে, তার উপর নিজের থেকে কোন মন্তব্য পেশ করতে পারবে না। বলার ক্ষেত্রে যেমন নবীকে ওভারটেক করতে পারবে না, অন্যান্য ক্ষেত্রেও ওভারটেক করতে পারবে না। তাই চলার ক্ষেত্রেও নবীর আগে চলতে পারবে না। অবশ্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতেন যে, যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনি এক সাথে চলতেন, তখন তিনি নিজে পিছনে চলতেন আর সাহাবায়ে কেরামকে আগে করে দিতেন। এর কারণ হাদীছে এসেছে যে, সামনে চললে অহংকার প্রকাশ পায় এজন্য তিনি পিছনে থাকতেন। যেমন নেতারা সামনে থাকে আর তাদের দলবল পিছনে চলতে থাকে। এতে অহংকার প্রকাশ পায়। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াজু বা বিনয় শিক্ষা দেয়ার জন্য সামনে না চলে পিছনে চলতেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম চাইতেন যে, আমরা পিছনে থাকি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে থাকুন। কারণ, নবীর মর্যাদার দাবী হল নবী আগে থাকবেন। নবীর মর্যাদার দাবী হল নবীকে কোনভাবে কেউ ওভারটেক করতে পারবে না।

এর কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, নবীকে ওভারটেক করলে নবীর সাথে বে-আদবী হবে আর তাতে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক বলেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ. (সূরা হুজুরাত: ২)

অর্থাৎ, নতুবা তোমাদের অজান্তে তোমাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এ আয়াতে নবীর সাথে যে আদব রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে উলামায়ে কেরামের সাথেও অনুরূপ আদব রক্ষা করতে হবে। কারণ সহীহ হাদীছে এসেছে,

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, উলামায়ে কেরাম হলেন নবীগণের ওয়ারিছ তথা স্থলাভিষিক্ত।

শেষ নবী হলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। এখনকার উলামায়ে কেরাম শেষ নবী নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিম্মাদারী পালন করছেন, তারা নবীর মত মানুষকে দ্বীন শিখাচ্ছেন, তারা নবীর মত মানুষের আধ্যাত্মিক পরিশোধন করছেন, যা নবীওয়ালা কাজ যা ছিল তারা তা আঞ্জাম দিচ্ছেন। নবীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তারা একাজ গুলো করে যাচ্ছেন। কাজেই নবীর সাথে যে আদবগুলি পালনীয় ছিল উলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও সেটা পালন করতে হবে। উলামায়ে কেরামের সাথে কথা বলার সময় উলামায়ে কেরামের আওয়াজের চেয়ে যেন আওয়াজ উঁচু না হয়। উলামায়ে কেরামের কথাকে ওভারটেক করে যেন কথা বলা না হয়। চলার সময় উলামায়ে কেরামের আগে না চলা। উলামায়ে কেরামকে সম্মানের সাথে ডাকা, সামান্য একটু বয়সে বড় হওয়ার কারণে যেন কোন আলেমকে নাম ধরে গেয়ো মানুষের মত ডাকা না হয়। ইত্যাদি। অনেক মানুষকে দেখা যায় কোন আলেম থেকে বয়সে একটু বড়, কিন্তু সে নিজে আলেম নয়। দেখা যায় এ ধরনের লোক ঐ আলেমকে নাম ধরে ডাকে বা চলার সময় সে বড় এই মনে করে আগে আগে চলার মনোভাব রাখে। এটা ঠিক নয়। বয়সে বড় হওয়ার চেয়ে ইলমে বড় হওয়ার গুরুত্ব বেশী। তাই ইলমে বে বড়, তাকে শুধু বয়সে ছোট হওয়ার কারণে নাম ধরে ডাকা না চাই, চলা ফেরা, কথাবার্তা সব ক্ষেত্রে তাকে সম্মান করা চাই।

যাহোক আদব রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত কিছু কথা রাখা হল। ইনশাআল্লাহ আগামী জুমুআয় সমাজ –সামাজিকতার ক্ষেত্রে আদব-তাজীমের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

আজকের বয়ানের সারকথা হল– শরীয়তে ফরয ওয়াজিবের সাথে সাথে সুন্নাত, মোস্তাহাব, আদব–এগুলি রক্ষার গুরুত্বও অনেক। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ গুরুত্বের উপলব্ধি নসীব করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং - ২১

আদব-তাজীমের গুরুত্ব

(১ম পর্ব)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আদবের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছিল। আমরা অনেকে মনে করি আদব-তাজীম এমন একটা বিষয় যা থাকলে সুন্দর হয়, না থাকলেও এমন কোন ক্ষতি হয় না। অথচ বিষয়টা এত হালকা বিষয় নয়। আদব-তাজীম শুধু চারিত্রিক সৌন্দর্যই না। আদব-তাজীম শুধু ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন জিনিস নয়। পরিবার ও সমাজের সাথেও এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পরিবার ও সমাজ গঠনেও আদব-তাজীমের গুরুত্ব অনেক। ইসলাম যে রকম পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে চায়, তা গুরুজনদের প্রতি আদব-তাজীম রক্ষা করা ব্যতীত সম্ভব নয়।

ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক নীতিতে গুরুজন মান্যতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবারে গুরুজন মান্যতা না থাকলে পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। পরিবারে গুরুজন মান্যতা না থাকলে আদর্শ পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও আদর্শ পারিবার গড়ে তোলার জন্য গুরুজনদের প্রতি আদব-তাজীম একটা মৌলিক বিষয়। তদ্রূপ সমাজের ব্যাপারেও এই একই কথা। সমাজে গুরুজন মান্যতা না থাকলে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। সমাজে গুরুজন মান্যতা না থাকলে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

এখন কথা হল পারিবার ও সমাজে গুরুজন মান্যতা বলতে কি বোঝায়? পারিবার ও সমাজে গুরুজন মান্যতা বলতে বোঝায় পরিবার ও সমাজে যারা ছোট এবং অধীনস্ত তারা বড় এবং উর্ধতনের আদব রক্ষা করবে, যারা ছোট এবং অধীনস্ত তারা বড় এবং উর্ধতনের আনুগত্য করবে এবং যারা ছোট এবং অধীনস্ত তারা বড় এবং উর্ধতনের দ্বারা শাসিত হবে। এভাবে পারিবারিক ও সামাজিক গুরুজনদের আদব তা'জীম রক্ষা করা, তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের দ্বারা শাসিত হওয়ার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে 'চেইন অব কমাণ্ড' রক্ষা পায়, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়, উর্ধতন গুরুজনদের প্রভাবে অধীনস্তরা অন্যায় ও অপরাধ করার দুঃসাহস করা থেকে বিরত থাকে, তারা লাইনচ্যুত হতে সাহস পায় না, তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও বল্গাহীনতা প্রশ্রয় পায় না। এভাবে গোটা পরিবার ও গোটা সমাজ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা মুক্ত এবং নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ইসলাম পারিবারের গুরুজনদের আদব তা'জীম রক্ষা ও তাদের আনুগত্য রক্ষা পূর্বক এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবার গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়েছে। পারিবারিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে যে যার মত স্বেচ্ছাচারিতা ও বল্গাহীনতার প্রবাহে ভেসে চলবে ইসলাম সে শিক্ষা দেয়নি। স্ত্রী স্ত্রীর মত চলবে, ছেলে-মেয়ে ছেলে-মেয়ের মত চলবে, যার যেমন খুশী সে তেমন চলবে– ইসলাম এরকম পরিবারের কথা বলেনি। পরিবারের বড়রা ছোটদেরকে শাসন করবে, ছোটরা বড়দের আদব তা'যীম রক্ষা করবে, তাদের আনুগত্য করে চলবে– এটাই ইসলামের শিক্ষা। পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে কোনভাবেই যেন ছেলে-মেয়ে, ছোট ভাই-বোন বা অধীনস্তদের কেউ মাথায় চড়ে যেতে না পারে। পরিবারের চেক এ্যান্ড ব্যালেন্স এবং পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার স্বার্থেই এটা লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি ছেলে-মেয়ে, ছোট ভাই-বোন বা অধীনস্তদের কেউ মাথায় চড়ে যায়, তাহলে এক দিকে পরিবারের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে, আরেক দিকে আদর্শ পরিবার গঠনে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে।

সন্তানের আদবের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম বলেছে সন্তানদেরকে আদব শিক্ষা দেয়াই সন্তানের জন্য পিতা-মাতার সবচেয়ে ভাল কিছু করা। আমরা যেমন মনে করি সন্তানের জন্য গাড়ি বাড়ি টাকা-পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স রেখে যেতে পারাই সবচেয়ে ভাল করতে পারা ইসলাম তা বলেনি। বরং ইসলাম বলেছে, পিতা-মাতা যদি সন্তানকে আদব শিক্ষা দিয়ে যেতে পারে, এটাই হল সন্তানের জন্য তাদের রেখে যাওয়া সবচেয়ে ভাল করতে পারা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي والحاكم والحديث ضعيف)

অর্থাৎ, পিতা-মাতা সন্তানের জন্য যা রেখে যায় বা যা উপহার দেয়, তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল রেখে যাওয়া এবং ভাল উপহার হল উত্তম আদব।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– পিতা-মাতা যদি সন্তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে পারে, এটাই হল সন্তানের জন্য পিতা-মাতার সবচেয়ে ভাল কিছু করে যাওয়া। আদব-কায়দা ও গুরুজন মান্যতা শিক্ষা দানই সন্তানের জন্য পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সবচেয়ে উত্তম উপহার। কারণ তার দ্বারাই সন্তানের জীবন আদর্শ মণ্ডিত হয়ে ওঠে, তাদের ভবিষ্যত সুন্দর হয়।

সন্তান লালন-পালন করার সময় তাদের আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখার পর্যায়ে এতটা সুক্ষ্ম বিষয়ও খেয়াল রাখতে হয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَحِمَ اللهُ وَالِدًا اَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ. (المقاصد الحسنة عن ابى الشيخ فى الثواب)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঐ পিতা (মাতা)কে রহম করবেন যে পিতা (মাতা) আদর্শ ও নেকীর বিষয়ে সন্তানের সহযোগিতা করবে।

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- এমন কোন বিষয়ে সন্তানকে হুকুম দেয়া সঙ্গত নয়, যে ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে, হয়তোবা সন্তান সে হুকুম মানবে না। এরকম বিষয়ে হুকুম দেয়া সন্তানের বে-আদব হওয়ার ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার কারণ হতে পারে। কারণ পিতা-মাতা যখন বুঝবেন যে, সন্তান সে হুকুম মানবে না, তারপরও হুকুম দিবেন এবং হুকুম দেয়ার পর দেখা যাবে সন্তান মানল না, তাহলে সন্তানের মধ্যে পিতা-মাতার হুকুম অমান্য করার দুঃসাহস বাড়তে থাকবে। ফলে আজ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

একটা হুকুম অমান্য করবে, কাল দুটো অমান্য করবে, সামনে চারটা অমান্য করবে। এভাবে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার হুকুম অমান্য করাটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে গুরুজন মান্যতা লোপ পাবে এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন ছুটির সময় বাচ্চারা একটু খেলা-ধূলা করতে চায়। তখন তাদের পড়া-শোনা করার মন-মানসিকতা স্তিমিত থাকে। ছুটি প্রদান করাও হয় একটু পড়া-শোনার বিরতির জন্য। তখন যদি কোন পিতা-মাতা বাচ্চাদেরকে পড়া-শোনার জন্য চাপ দেন, খেলা-ধূলা একেবারে বন্দ রাখতে বলেন, তাহলে হতে পারে বাচ্চারা সে আদেশ মানবে না। এটাই স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। অতএব ছুটির অবসরে বাচ্চাদেরকে পড়া-শোনার জন্য চাপ দেয়া অনুচিৎ। এতে করে বাচ্চাদের মধ্যে পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে এবং এ মনোবৃত্তি আরও বিস্তৃত হয়ে তাদের মন থেকে সব ধরনের গুরুজন মান্যতা লোপ পেতে পারে। ইসলাম গুরুজন মান্যতা লোপ পেতে পারে এমন কোন নীতি, কর্ম বা পদক্ষেপকে সমর্থন করে না। তাই ইসলামী তরীকা মোতাবেক সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে সন্তানরা বে-আদব হয় না, তারা গুরুজনের অবাধ্য হয় না, পিতা-মাতার অবাধ্য হয় না।

ইদানিং পাশ্চাত্যে বাচ্চাদেরকে গায়ে হাত দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি উস্তাদ মুখে একটু তিরষ্কার করতে বা বকুনীও দিতে পারেন না। একদিন আমেরিকার একজন উস্তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, তাদের অবস্থা হল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মারধরতো দূরের কথা, কোন তিরষ্কার করা বা বকুনী দেয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, যে কোন প্রকার শাসন করাই নিষিদ্ধ। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এমনভাবে উস্তাদের মাথায় চড়ে যায়, আর উস্তাদের এমন অসহায় অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়, যেন উস্তাদ একটা অবলা গাধার মত, ছাত্র-ছাত্রীরা তার দুই কান ধরে দুই দিকে টানছে, কেউ লেজ ধরে টানছে, কেউ দুই হাত পা ধরে টানছে, এমন বেহাল অবস্থায়ও উস্তাদ কিছুই বলতে পারছেন না। এটা সম্পূর্ণ ভারসাম্যহীন অবস্থা। এটা বাচ্চাদেরকে বে-আদব বানানো। এটা গুরুজন মান্যতাবোধ লোপ করে দেয়ার পদক্ষেপ। ইসলাম এরূপ ভারসাম্যহীন নীতিকে সমর্থন করে না।

ইসলামের কোন নীতি ভারসাম্যহীন নয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও শাসন বর্জন করতে হবে– এ নীতি যেমন ইসলাম সমর্থন করেনা, তদ্রূপ শাসন করতে যেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া হবে তাও ইসলাম সমর্থন করে না। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শাসন করার অর্থ আদৌ গরু পেটা করা নয়। শাসনের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য থাকতে হবে। শাসনেরও মাসআলা রয়েছে। ফতুয়ার প্রসিদ্ধ কিতাব শামীতে আছে, কোন উস্তাদ তার ছাত্রকে বা কোন পিতা-মাতা তার সন্তানকে এমনভাবে মারতে পারবেন না যে, হাত পা ভেঙ্গে যাবে বা চামড়া ফেটে যাবে বা গায়ে দাগ পড়ে যাবে। বাচ্চাদেরকে শাসনের স্বার্থে একটু আধটু মারধর তথা শাসনেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভারসাম্য বর্জিত মারধর বা ব্যালেন্স হারা শাসনের কথা ইসলাম বলেনি। সর্বক্ষেত্রেই ব্যালেন্স কাম্য। পরিবারের ছোটরা বড়দের আনুগত্য করবে এবং সমাজের অধীনস্তরা গুরুজনদের আনুগত্য করবে– এ ক্ষেত্রেও ব্যালেন্স বা ভারমাস্য রয়েছে। যেমন তাদের সম্পূর্ণ আনুগত্যহীনতাও চলবেনা, তেমনি আনুগত্য করতে যেয়ে শর্তহীন আনুগত্যও করা যাবে না। কোন গুরুজন যদি কোন পাপ কাজের বা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেন, তাহলে সেটা মান্য করা যাবে না। যতক্ষণ তারা শরীয়তের ভিতরে থেকে নির্দেশ দিবেন ততক্ষণ তাদের মান্যতা চলবে, যেই শরীয়তের বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ দিবে তখন আর মান্যতা রক্ষা করা যাবে না– এই হল ব্যালেন্স। হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. (كشف الخفاء عن أحمد و الحاكم)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য হয় তথা পাপ হয় এভাবে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না।

পারিবারিক শৃঙ্খলা গড়ে তোলার জন্য এবং আদর্শ পারিবার গড়ে তোলার জন্য যে আদব-কায়দা এবং গুরুজন মান্যতার কথা বলা হচ্ছে, এটা শুধু ছোট ছেলে-মেয়েদের বেলায় নয় বরং পরিবারের মূল সদস্য অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও এই আদব-কায়দা এবং গুরুজন মান্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীর আদব কায়দা রক্ষা করে চলবে, স্বামীর আনুগত্য করে চলবে। মনে রাখতে হবে– স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধু ভালবাসার সম্পর্ক নয়, তাদের মধ্যে আদব তা'জীমের সম্পর্কও রয়েছে, মান্যতার সম্পর্কও রয়েছে। স্ত্রী স্বামীর আদব তা'জীম রক্ষা করে চলবে, স্বামীর আনুগত্য করে চলবে এবং প্রয়োজনে স্বামী স্ত্রীকে পরিমিত ও বিজ্ঞচিত শাসনও করবে, এটাই ইসলামের শিক্ষা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কও থাকবে, আদব তা'জীম ও মান্যতার সম্পর্কও থাকবে। ভালবাসা আর আদব তা'যীম-এই দুটোর ভিতরে সমন্বয় করে চলতে হবে। স্বামী স্ত্রীকে আদর সোহাগ করবে, ভালবাসবে, তবে আদর-সোহাগ ও ভালবাসা চর্চায় এতটা নেমে যাবেনা যে, স্ত্রীকে শাসন করার মত অবস্থায়ই সে থাকবে না। স্বামী স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করবে, ভালবাসবে আবার শাসনও করবে। স্ত্রীও স্বামীকে ভালবাসবে, তবে ভালবাসার সাথে সাথে স্বামীর আদব তা'যীমও রক্ষা করে চলবে, স্বামীর আনুগত্যও বহাল রেখে চলবে। দুটোর ভিতরে সমন্বয় করে চলবে।

স্ত্রীকে স্বামীর এতটা আদব-তাজীম রক্ষা করে চলতে হবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (رواه الترمذي برقم ١١٥٩ وقال: حسن غريب)

অর্থাৎ, যদি কোন মানুষকে হুকুম দিতাম অন্য কোন মানুষকে সাজদা করার, তাহলে একমাত্র স্ত্রীকে হুকুম দিতাম সে তার স্বামীকে সাজদা করবে।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সাজদা করা জায়েয নেই। কোন মানুষ কোন মানুষকে সাজদা করতে পারবে না। যদি কোন মানুষের পক্ষে কোন মানুষকে সাজদা করার অনুমতি থাকত তাহলে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে সাজদা করার অনুমতি থাকত। বরং স্ত্রীকে হুকুম দেয়া হত সে যেন তার স্বামীকে সাজদা করে।

এ হাদীছের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়- আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের পরে স্ত্রীর কাছে সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধার পাত্র হলেন তার স্বামী। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধু মহব্বত ভালবাসার সম্পর্ক নয়, আদব তা'জীমের সম্পর্কও থাকতে হবে। স্ত্রী স্বামীর আদব তা'যীমও রক্ষা করে চলবে। এ জন্যেই স্ত্রীর প্রতি হুকুম হল, সে তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে না। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর নাম ধরে ডাকা নিষেধ। কারণ এটা স্বামীর আদবের খেলাফ। তবে প্রয়োজনের সময় নাম উচ্চারণ করা নিষেধ নয়। অনেক মহিলা প্রয়োজনের সময়ও স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে চায় না, বলে অমুকের বাপ বা আমদের বাড়ির উনি ইত্যাদি। এরকম নয়, প্রয়োজনের সময় নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ নয়, নাম ধরে ডাকা নিষিদ্ধ। কারণ, স্বামী হল স্ত্রীর মুরব্বী, তাই স্ত্রীকে মুরব্বী হিসেবে স্বামীর আদব রক্ষা করে চলতে হবে। যখন স্বামীর সাথে এক সাথে হাঁটবে বা চলবে, পিছনে পিছনে থাকবে, যেমন মুরব্বীদেরকে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

সামনে রেখে চলতে হয়। তবে আজকাল কোথাও পথে ঘাটে নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে স্বামী স্ত্রীকে আগে আগে রেখে পথ চললে সেটা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা নয়। স্বামী যেহেতু স্ত্রীর মুরব্বী, তাই মুরব্বীদের সাথে যেমন রুক্ষ স্বরে কথা বলা যায় না, স্বামীর সাথেও স্ত্রী রুক্ষ স্বরে কথা বলতে পারবে না। স্বামীর সাথে জোর আওয়াজে কথা বলা যায় না, স্বামীর সাথে ঝাঝালো সুরে কথা বলা যায় না। স্ত্রী স্বামীর সাথে চড়া গলায় কথা বলতে পারবে না, স্বামীর সামনে বে-আদবী হয় এভাবে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারবে না। এগুলি হল ইসলামের শিক্ষা দেয়া আদব। স্বামীর সাথে জীবন যাপনের বেলায় স্ত্রীকে এ সমস্ত আদব রক্ষা করে চলতে বলা হয়েছে। এগুলো দ্বারাই পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। এভাবে ইসলাম পারিবারিক অঙ্গনে গুরুজন মান্যতার বিধান প্রবর্তন করে পারিবারিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

শুধু পরিবারের মুরব্বী নয়, সমাজের মুরব্বী ও গুরুজনদের মান্যতা করার শিক্ষাও ইসলাম দিয়েছে। সব মুরব্বীদের সাথেই আদব রক্ষা করতে হবে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. (صحيح الجامع للالباني برقم ٥٤٤٣ وقال : حسن)

অর্থাৎ, যে বড়দের শ্রদ্ধা করে না, ছোটদের আদর-স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদের হক চেনে না, সে আমাদের উম্মতভুক্ত নয়।

বয়সের মুরব্বী হোক বা ইল্‌মের মুরব্বী হোক, দ্বীনী মুরব্বী হোক বা দুনিয়াবী মুরব্বী হোক সব ধরনের মুরব্বীর সাথে আদব তা'জীম রক্ষা করে চলতে হবে। এজন্যই কোন ধরনের মুরব্বীর নাম ধরে ডাকা নিষেধ। মুরব্বীদেরকে সামনে রেখে হাঁটতে হয়, মুরব্বীদের সাথে রুক্ষ স্বরে কথা বলা যায় না, মুরব্বীদের সাথে জোর আওয়াজে কথা বলা যায় না, মুরব্বীদের সাথে ঝাঝালো সুরে কথা বলা যায় না, মুরব্বীদের সামনে চড়া গলায় কথা বলা যায় না, মুরব্বীদের সাথে বে-আদবী হয় এমনভাবে মাথা উঁচু করে কথা বলা যায় না। এগুলি হল সামাজিক আদব। সমাজের সকলকে এই সমস্ত আদব রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এভাবে সামাজিক অঙ্গনেও গুরুজন মান্যতার পরিবেশ কায়েম হবে। এগুলো দ্বারাই সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা পাবে, এগুলির দ্বারাই সমাজে চেইন অব কমাণ্ড রক্ষা পাবে, এগুলো দ্বারাই অনেক সামাজিক অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হবে। সমাজে গুরুজন মান্যতা প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের ছোটরা গুরুজনদের প্রভাবে অন্যায় ও অপরাধ করার দুঃসাহস করা থেকে বিরত থাকবে, তারা লাইনচ্যুত হতে সাহস পাবে না, তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও বল্গাহীনতা প্রশ্রয় পাবে না। এভাবে গোটা সমাজ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা মুক্ত এবং নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা মণ্ডিত হয়ে উঠবে।

পরিবার ও সমাজ থেকে এই আদব তা'জীম ও গুরুজন মান্যতা উঠে যাওয়ার কাণে আজ পরিবারের অধীনস্তরা গুরুজনদের সামনে অবলিলায় অপরাধ করে যাচ্ছে, সমাজের গুরুজনদের সামনে ছোটরা নিঃশঙ্কচিত্তে অন্যায় অপরাধ সংঘটিত করে চলছে। খুব বেশী দূরে নয়, এই নিকট অতীতেও আমরা লক্ষ্য করেছি মুরব্বী ও গুরুজনদের সামনে কিশোররা আজে বাজে কোন বই পাঠ করতে সাহস পেত না, অনর্থক খেলাধূলায় লিপ্ত হতে পর্যন্ত সাহস পেত না, যুবকরা বিড়ি সিগারেট খাওয়ার মত ছোটখাট অপরাধ করতে পর্যন্ত সাহস পেতনা। মুরব্বী ও গুরুজনদের উপস্থিতি টের পেলে গান-বাদ্য বন্ধ করে দেয়া হত। রাস্তা-ঘাটে এলোমেলো দাঁড়িয়ে থাকলে পরিপাটি হয়ে একপাশে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সরে মাথা নীচু করে দাঁড়াত। এভাবে মুরব্বী ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তাদেরকে বহু অপরাধ ও অসভ্যতা থেকে বিরত রাখত। অথচ আজ সমাজের কিশোর যুবকরা মাথা উঁচু করে এবং বুক টান করে অবলিলায় গুরুজনদের সামনে সব অপরাধ সংঘটিত করে যাচ্ছে। গুরুজনরা দেখছে, জানছে- এজন্য তাদের এতটুকু দ্বিধা সংকোচ নেই! মুরব্বী এবং গুরুজনদের প্রতি আদব-তা'জীম ও শ্রদ্ধাবোধ উঠে যাওয়ার ফলেই এমনটি হচ্ছে।

মুরব্বী এবং গুরুজনদের প্রতি আদব-তা'জীম ও শ্রদ্ধাবোধ উঠে যাওয়ার পেছনে অনেকগুলি কারণ রয়েছে। যে কারণগুলি আমরা অবলম্বন করে চলছি। এর অনেকটাই হচ্ছে টেলিভিশন, ভি সি আর, সিডি এবং ডিস চ্যানেলের কারণে। টেলিভিশন, ভি সি আর, সিডি এবং ডিস চ্যানেলের অনেকটাতেই অশ্লীল জিনিস বরং চরম অশ্লীল জিনিসও দেখানো হচ্ছে, আর পরিবারের গুরুজনরা ছেলে-মেয়ে ও ছোটদের নিয়ে একসাথে এসব জিনিস উপভোগ করছে। এর কারণে গুরুজনদের প্রতি ছোটদের লজ্জা-শরমবোধ ভেঙ্গে যাচ্ছে, গুরুজনদের প্রতি ছোটদের ভক্তি-শ্রদ্ধা বোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর এ কারণে গুরুজনদের প্রতি মান্যতাবোধ উঠে যাচ্ছে। অথচ ইসলাম শিক্ষা দিয়েছিল বড় শিশু বা কিশোর কিশোরীর সামনে নয় বরং একটা দুধের শিশুর সামনেও যখন সে জাগ্রত থাকে পিতা-মাতা কোন যৌন কথা-বার্তা বা কোন যৌন আচরণে লিপ্ত হবে না। দুধের শিশু যদিও এসব কিছুই বোঝে না, কিন্তু যা কিছু তার সামনে করা হবে, তার মনে তার একটা চিত্র পড়তে থাকবে। ভবিষ্যতে ঐ চিত্রগুলি তার মন-মানসিকতায় ভেসে উঠবে এবং এটা তার মন-মানসিকতা ও চরিত্রে প্রভাব ফেলবে। শিশুদের মনে একবার যে চিত্র অংকিত হয়, সে চিত্র কোনদিন মুছে যায় না। সে এখন না বুঝলেও এটা তার মানসিকতার উপর কু-প্রভাব ফেলবে এবং ভবিষ্যত জীবনে তার মধ্যে এর প্রভাব প্রকাশ পেতে দেখা যাবে। কাজেই শিশুদের মনে যেন পিতা-মাতা সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে না পারে এবং তাদের চরিত্রে যেন কোন কু-প্রভাব পড়তে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা চাই। এমন কিছু করা চাই না, যার কারণে শিশুদের মন থেকে গুরুজন মান্যতা কমে যেতে পারে। টেলিভিশন, ভি সি আর, সিডি এবং ডিস চ্যানেলের অশ্লীল জিনিসগুলি থেকে অবশ্যই বিরত থাকা চাই। নিজেদের চরিত্র রক্ষার স্বার্থে এটা করা চাই। ছেলে-মেয়েদের চরিত্র রক্ষার স্বার্থে এটা করা চাই। ছেলে-মেয়েদের আদব-কায়দা ও মুরব্বীদের তাজীম শ্রোদ্ধা রক্ষার স্বার্থে এটা করা চাই। গোটা সমাজের স্বার্থে এটা করা চাই। যারা সমাজ নিয়ে ভাবে এরকম বুদ্ধিজীবীরা এ ব্যাপারে মোটেই মুখ খোলে না। জানিনা বিষয়টা তাদের চিন্তায় ধরা পড়েনা না কি জেনে বুঝেই অশ্লীলতাকে ধরে রাখার কু-স্বার্থে তারা এটা বলে না।

স্বামী স্ত্রীদের মধ্যেও আগের তুলনায় গুরুজন মান্যতা অনেক লোপ পেয়েছে। তারও অনেক কারণ রয়েছে। বর্তমানে নারী স্বাধীনতা ও নারীদের স্বাবলম্বিতার নামে নারীদেরকে অতিমাত্রায় আত্মনির্ভর করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই চেষ্টার অংশ হিসেবে স্ত্রীদেরকে স্বামী মান্যতা থেকে বের করে আনা হচ্ছে, স্বামীর আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই এই সবক দেয়া হচ্ছে। কিছু কিছু বিধর্মী এনজিও নারীদেরকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসার উস্কানী দিচ্ছে, তারা নারীদেরকে স্বামীর আনুগত্য থেকে বের হয়ে বল্গাহীনভাবে চলার শিক্ষা দিচ্ছে।

সামাজিক অঙ্গনেও গুরুজন মান্যতা লোপ পাওয়ার কারণ কম নেই। পারিবারিক ক্ষেত্রে গুরুজন মান্যতা না করার যে অভ্যাস ও স্বভাব গড়ে উঠছে, সামাজিক অঙ্গনেও এই স্বভাব ছড়িয়ে পড়ছে। সেই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

সাথে সাথে কিশোর যুবকদের মধ্যে যারা সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে, যারা অপরাধ জগতের সাথে জড়িয়ে পড়ছে, তাদের হাতে অবৈধ শক্তি এসে যাওয়ার ফলে মুরব্বীরা পর্যন্ত তাদের কাছে যিম্মী হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন সেই মুরব্বীগণকে তারা কোনভাবেই পাত্তা দিচ্ছে না, মুরব্বীরা তাদের সামনে মাথা উঁচু করে থাকতে পারছেন না। এভাবেও সমাজ থেকে গুরুজন মান্যতা উঠে যাচ্ছে। আর এভাবে গুরুজন মান্যতা উঠে যাওয়ার ফলে কিশোর ও যুবকদের দ্বারা সমাজে অপরাধ বেশী সংঘটিত হচ্ছে। আমাদের সমাজে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে কিশোর যুবকদের দ্বারা এত বেশী অপরাধ সংঘটিত হত না, যতটা আজ হতে দেখা যাচ্ছে। দেখা গেল সমাজের অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা দূর করার ক্ষেত্রেও গুরুজন মান্যতার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সমাজ থেকে গুরুজন মান্যতা উঠে যেতে থাকলে সমাজের অবস্থা আরও খারাপ হবে। যারা সমাজ নিয়ে ভাবেন, তারা হয়তো এ বিষয়ওটা আদৌ এভাবে চিন্তা করেন না, বরং আদব ও গুরুজন মান্যতার বিষয়কে তারা সেকেলে দৃষ্টিতে দেখেন যে, এসব আদব কায়দার কথা হল সেকেলে কথা, এগুলো হল ধর্মীয় পুরাতন ধ্যান-ধারণা। অথচ তারা সমাজ নিয়ে অনেক কিছু ভাবেন, সমাজের উন্নতি চান, সমাজের মঙ্গল চান। সত্যিকার ভাবে সমাজের উন্নতি এবং মঙ্গল চাইলে এ বিষয়টাকেও তাদের গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা উচিত এবং সমাজে আদব-কায়দা ও গুরুজন মান্যতা প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

আজকের আলোচনার সারকথা হল– আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার জন্য পরিবারে আদব-তাজীম চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পরিবারে 'চেইন অব কমান্ড' রক্ষা করার জন্য পরিবাবে আদব-তাজীম চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার জন্য সমাজে আদব-তাজীম চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজ থেকে অপরাধ ও অন্যায় কমানোর জন্য সমাজে আদব-তাজীম চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গুরুজনদের প্রতি আদব-তাজীম পরিবার ও সমাজের জন্য একটা মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা জাগ্রত হওয়া চাই, এখনও সময় থাকতে বোধোদয় হওয়া চাই, সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনা চাই, যে পরিবেশে মুরব্বী ও গুরুজনদের আদব-তা'জীম চর্চিত হবে, যে পরিবেশে মুরব্বী ও গুরুজন সমাজের কিশোর যুবকদেরকে অন্যায় অপরাধ ও অসভ্যতার জন্য তিরস্কার করতে পারেন, শাসন করতে পারেন, প্রয়োজনে শাস্তি দিতে পারেন। তাহলেই সমাজের কল্যাণ হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ বুঝ নসীব করেন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং - ২২

আদব-তাজীমের গুরুত্ব

(২য় পর্ব)

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আদব-তাজীমের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা পেশ করা হয়েছিল। আজ এ সম্পর্কে আরও কিছু কথা পেশ করতে চাই। আদব-তাজীম কথাটা খুবই ছোট এবং আমরা অনেকে এটাকে ক্ষুদ্র বিষয় বলেই মনে করি থাকি, কিন্তু শরীয়তে এর গুরুত্ব অনেক। আমরা এটাকে ক্ষুদ্র বিষয় মনে করি, কিন্তু আসলে এটা ক্ষুদ্র বিষয় নয়। আমরা এটাকে ক্ষুদ্র মনে করার কারণে আজ সমাজ থেকে বড়দের আদব-তাজীম প্রায় উঠে গেছে। অথচ শরীয়ত এটাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসেবে বিবেচনা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে আদব-তাজীম একটা বড় ধরনের আদর্শ। এমনকি এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا. (رواه الترمذي برقم ١٩١٩ وقال الالباني صحيح)

অর্থাৎ, যারা ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দেরকে আদব সম্মান করে না তারা আমার আদর্শভুক্ত নয় বা তারা আমার উম্মতভুক্ত নয়।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– আমার আদর্শভুক্ত হতে হলে, আমার উম্মতভুক্ত হতে হলে দুইটা আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। একটা হল– বড়দের আদব-তাজীম করা, আর একটা হল– ছোটদের স্নেহ করা। যে বড়কে আদ-সম্মান করবে না সে আমার উম্মত ভুক্ত থাকবে না অর্থাৎ, আমার উম্মতের আদর্শ ভুক্ত থাকবে না। তদ্রূপ যে ছোটকে স্নেহ করবে না সেও আমার উম্মত ভুক্ত থাকবে না অর্থাৎ, আমার উম্মতের আদর্শ ভুক্ত থাকবে না। অতএব বড়দের আদব-তাজীম করা এবং ছোটদের স্নেহ করা– এদুটো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন বড় ধরনের দুটো আদর্শ যে, কারও মধ্যে এই আদর্শ না থাকলে সে যেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতভুক্তই নয়।

যে যত বড়, তাকে তত বেশী আদব-সম্মান করতে হবে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এজন্য কুরআনে কারীমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদব সাথে কিভাবে আদব রক্ষা করতে হবে এ ব্যাপারে অনেকগুলো আয়াত নাযেল করা হয়েছে। সেই আয়াতগুলোতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা এ আদব রক্ষা না কর, তাহলে তোমাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। লক্ষ্য করার বিষয় হল– এই আদব রক্ষা না করা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

কত বড় ধরনের অপরাধ যে, তার কারণে আমল বরবাদ হয়ে যাবে। কুরআন হাদীছে বহু জায়গায় বহুভাবে বলা হয়েছে, যারা কাফের হয়ে যায় তাদের আমল নষ্ট হয়ে যায়। কাফের হয়ে যাওয়া অর্থাৎ, কুফরী করা হল এমন অপরাধ যে, তার কারণে অন্যান্য সব আমল বরবাদ হয়ে যায়। তাহলে রসূলের সাথে আদব রক্ষা না করলে যখন আমল বরবাদ হওয়ার কথা বলা হচ্ছে তার অর্থ হল রসূলের সাথে আদব রক্ষা না করা হচ্ছে বড় ধরনের অপরাধ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় ব্যক্তি, তাই তাঁর সাথে আদব-সম্মান রক্ষা করার গুরুত্বও সবচেয়ে বেশী। এত বেশী যে, মু'মিন থাকতে হলে এ আদব রক্ষা করতে হবে। এজন্যই যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে বে-আদবী করে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবমাননা হয় এরকম কোন উক্তি করে, তাদেরকে আমরা মুসলমান বলে গণ্য করি না।

কুরআন শরীফের ২৬ পারার সূরা হুজুরাত-এর শুরুতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কি কি আদব রক্ষা করতে হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ.

এ আয়াতে বলা হয়েছে– হে মু'মিনরা তোমরা আল্লাহ আল্লাহর রসূলের আগে বেড়ে কোন কথা বলো না। অর্থাৎ, আল্লাহ আল্লাহর রসূলকে ওভারটেক করে কোন কথা বলো না। তারপর বলা হয়েছে– তোমরা তোমাদের আওয়াজকে নবীর আওয়াজের উপর উঁচু কর না। অর্থাৎ, নবীর সামনে নীচু আওয়াজে কথা বলবে, নবীর আদবের খেলাফ হয় এভাবে জোরে কথা বলবে না। তারপর বলা হয়েছে– তোমরা একে অপরকে যেমন নাম ধরে ডাক নবীকে সেভাবে ডাকবে না। তোমরা একে অপরকে যেভাবে চিৎকার করে ডাক নবীকে ওরকম চিৎকার করে ডাকতে পারবে না। বলা হয়েছে– নবীর শানে এ আদবগুলো রক্ষা না করলে তোমাদের সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

এ আয়াত নাযেল পর সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম আমল শুরু করলেন। তারা তো সবকিছুই জানার সাথে সাথে আমল শুরু করতেন। এ আয়াতের ব্যাপারেও তাই হল। প্রথম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, আজ থেকে রসূলের সামনে আমার কথা এরকম হবে একজন মানুষ কানে কানে বললে যেরকম হয়, তার চেয়ে জোরে হবে না। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) এত আস্তে কথা বলতে শুরু করলেন যে, তিনি কিছু বললে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার জিজ্ঞেস করতে হত তুমি কি বলেছ? একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস (রা.)। তাকে বলা হত "খতীবুল আনাসার" অর্থাৎ, আনসারী সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ভাষণদাতা। তিনি ভাল ভাষণ দিতে পারতেন। ভয়েজ ছিল উঁচু। ছোট আওয়াজে কথা বলতে পারতেন না। অভ্যাসই ছিল জোর আওয়াজে বলা। এ আয়াত নাযেল হওয়ার পর তিনিতো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসা বন্ধ করে দিলেন যে, যদি দরবারে যাই আর কথা উঁচু হয়ে যায়, তাহলে তো আমার ঈমান-আমল বরবাদ হয়ে যাবে। পরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক দিয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাকে ডেকে শান্তনা দিয়েছেন যে, স্বভাবগত ভাবে যদি কারও আওয়াজ উঁচু হয়, চেষ্টা করা সত্ত্বেও জোর হয়ে যায়, তাহলে তার ব্যাপার ব্যতিক্রম, আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিবেন। এই শান্তনা পাওয়ার পর হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস (রা.) আবার মজলিসে আসা শুরু করলেন। সুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কেরামের শান কী ছিল!

সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতগুলির উপর এমনভাবে আমল শুরু করলেন যে, আর কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বয়সে বড় হলেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি নাম ধরে ডাকতেন না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) বয়সেও বড় ছিলেন আবার আত্মীয়তার সম্পর্কেও বড় ছিলেন অর্থাৎ, তিনি ছিলেন চাচা আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ভাতিজা। তবুও তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম ধরে ডাকতেন না বরং ইয়া রসূলাল্লাহ! বলে ডাকতেন। একদিন হযরত আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে ডাকেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে যেভাবে বসেন তাতে মনে হয় উনি বড় আর আপনি ছোট! আসলে আপনাদের ভিতরে কে বড় কে ছোট? সাধারণ দৃষ্টিতে তো চাচা বড়, ভাতিজা ছোট, এটা তো পরিস্কার কথা। কিন্তু তখন হযরত আব্বাস (রা.) এই প্রশ্নের জবাবে এমন একটা কথা বলেছিলেন যা এক ঐতিহাসিক কথা হয়ে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন,

هُوَ اَكْبَرُ مِنِّيْ وَاَنَا اَسَنُّ مِنْهُ.

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ আমার চেয়ে বড়, আমি তার চেয়ে বয়সী।

অর্থাৎ, বয়স আমার বেশী কিন্তু বড় তিনি। এই কথা থেকে শরীয়তের অনেক নীতি বের হয়। যেমন একজনের বয়স বেশী, আরেকজনের ইল্‌ম বেশী। যার বয়স বেশী তিনি আলেম নন, যার বয়স কম তিনি আলেম। এমতাবস্থায় যিনি আলেম নন তিনি বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও যিনি আলেম তাকে নাম ধরে ডাকতে পারবেন না। গ্রাম দেশের মানুষ এ বিষয়টা মোটেই মানতে রাজি নয়। দেখা যায় একজন আলেম বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাকে আরেকজন মানুষ সামান্য একটু বয়সে বড় হওয়ার সুবাদে নাম ধরে ডাকে, তার সাথে আদব-তাজীম রক্ষা করে চলে না। ভাবে আমি বড়, কারণ আমার বয়স বেশী। অথচ নীতি হল একজনের ইল্‌ম বেশী আরেকজনের বয়স বেশী– এর মধ্যে যার ইল্‌ম বেশী তিনিই ইজ্জত সম্মান বেশী পাওয়ার হকদার।

যাহোক সূরা হুজুরাতের শুরুর কয়েকটি আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আদব-তাজীম রক্ষা করে চলার ব্যাপারে জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। যদিও এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে বলা হয়েছে। কিন্তু মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, উলামায়ে কেরামের সাথেও এসব আদব রক্ষা করে চলতে হবে। কারণ উলামায়ে কেরাম হলেন আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিছ বা প্রতিনিধি। অতএব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে যেসব আদব-তাজীম প্রযোজ্য, উলামায়ে কেরামের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। তাই উলামায়ে কেরামের সাথে কথা বলার সময় তাদের আগে বেড়ে কথা না বলা চাই, তাদের চেয়ে উঁচু আওয়াজে কথা না বলা চাই, একসাথে চলার সময় তাদের আগে না চলা চাই, তাদের নাম ধরে ডাকা না চাই। চলা-ফেরা,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

উঠা-বসা, সবক্ষেত্রেই তাদের আদব রক্ষা করে চলা চাই। এগুলি হল উলামায়ে কেরামের আদব, যাদের ইল্‌ম আছে তাদের সাথে আদব।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে হাতে কলমেও এই সব আদব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। একদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত আবুদ্ দারদা (রা.) এক সাথে হাঁটছিলেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) হাঁটতে হাঁটতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আগে বেড়ে গেলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হলেন ইল্‌ম ও বুযুর্গীর দিক থেকে সবার উপরে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। এই ব্যক্তির চেয়ে আগে বেড়ে গেছেন আবুদ্ দারদা (রা.)। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে হযরত আবুদ দারদা (রা.)কে সম্বোধন করে বললেন, তুমি এমন ব্যক্তির আগে গেলে যে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! তুমি তার আগে হাঁটতে পারনা, তুমি তার পিছনে পিছনে চলবে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পারস্পরিক আদব-তাজীম কেমন ছিল, তার আরও কিছু বর্ণনা শুনুন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) সাহাবাদের মধ্যে অনেক উঁচু দরজার সাহাবী ছিলেন। যাকে "রঈসুল মুফাসসিরীন" বলা হয়। "রঈসুল মুফাসসিরীন" অর্থ মুফাসসিরদের নেতা। মুফাসসির বলা হয় যারা কুরআনের ব্যাখ্যা ভাল বোঝেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা যারা ভাল বুঝতেন তাদের মধ্যে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) ছিলেন শীর্ষস্থানীয় একজন। তিনি ছিলেন মুফাসসিরদের নেতা। এই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মধ্যেও কেমন আদব ছিল শুনুন। তিনি কোন আলেম সাহাবীর বাড়িতে কোন হাদীছ শেখার জন্য গেলে তার দরজার কড়া নাড়তেন না। বরং দরজার কাছে বসে আপেক্ষা করতে থাকতেন। যখন তিনি বের হতেন তখন তার কাছে হাদীছ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন। আর একজন সাহাবী হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.)। তিনিও একজন উঁচু দরজার সাহাবী। তিনিও বলেছেন, আমি কোন আলেম সাহাবীর দরোজায় গিয়ে কোন দিন কড়া নাড়িনি। বরং দরোজার সামনে বসে থাকতাম। যখন তিনি নিজের প্রয়োজনে বের হতেন, তখন তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে নিতাম। নবীর সাথেও এরকম আদব রক্ষা করা হত। নবীকে ঘর থেকে ডাকা হত না। তদ্রূপ উলামায়ে কেরামের সাথেও সেই আদব রক্ষা করা হচ্ছে।

এটা উলামায়ে কেরামের সাথে আদব, উস্তাদের সাথে আদব। উলামায়ে কেরাম এমনিভাবে যারা উস্তাদ ও শিক্ষক তাদের সাথে এরকম আদব রক্ষা করতে বলা হয়েছে। উলামায়ে কেরামও আমাদের উস্তাদ। যার থেকে আমি একটা কথা শিখলাম সেও আমার উস্তাদ। আর উস্তাদের অধিকার এতবড় যে, প্রসিদ্ধ আছে– হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আমি যার থেকে একটা অক্ষর শিখলাম, আমার গায়ের চামড়া খুলে যদি তাঁর পায়ের জুতা বানিয়ে দেই, তাহলেও তাঁর হক আদায় হবে না। উস্তাদের হক এত বড়! আলেম সমাজও আমাদের উস্তাদ, তারা আমাদের ধর্মীয় উস্তাদ। সব উস্তাদের সাথেই এরকম আদব রক্ষা করে চলতে হবে। উস্তাদের আগে হাঁটা যাবেনা, উস্তাদের সামনে উঁচু স্বরে কথা বলা যাবে না। উস্তাদের সামনে নিজের থেকে কোন মন্তব্য পেশ করা যাবে না। উস্তাদের কথার উপর কোন অভিযোগ আরোপ করা যাবে না। এগুলি উস্তাদের সাথে পালনীয় আদব।

আজ সমাজ থেকে আলেম উলামা, উস্তাদ, মুরব্বী ও গুরুজনদের সাথে পালনীয় এসব আদব মিটে গেছে এবং মিটে যাচ্ছে। যার ফলে সমাজ রসাতলে যাচ্ছে। আগে মুরব্বীদের দেখলে বাচ্চারা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কোন অন্যায় অপরাধ করতে সাহস পেত না। অন্যায় অপরাধের স্থান থেকে ভেগে যেত। এখন ভাগছে না। আগে মুরব্বীদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়া হত, এখন হচ্ছে না। এই কিছু দিন পূর্বেও দেখা গেছে মুরব্বীদের সামনে ছোটরা মাথা নীচু করে থাকত, এখন থাকছে না। কারণ, আগের সেই আদব বোধ, আগের সেই সম্মানবোধ নেই। যদি মুরব্বীদের প্রতি আগের মত সেই আদব-সম্মান বোধ থাকত, তাহলে এগুলো করতে পারত না। তাহলে সমাজের অবস্থাও এত খারাপ হত না।

অনেকে এসব আদব-কায়দাকে সেকেলে বিষয় মনে করে। তারা বলে যে, আধুনিক যুগে এসব চলেনা। এখন প্রগতির যুগ, এখন বাচ্চা-কাচ্চাদেরকে স্মার্ট বানাতে হবে। তারা মুরব্বী ও গুরুজনদের সামনে মাথা নত করে থাকাকে প্রগতির পরিপন্থী মনে করে। মনে করে স্মার্ট হতে গেলে এসব করলে চলবে না। স্মার্ট হতে গেলে সকলের সামনে মাথা উঁচু করে থাকতে হবে, সকলের সাথেই চটপট করে কথা বলতে হবে, কাচুমাচু করা ছেড়ে দিতে হবে ইত্যাদি। আমরা সন্তানকে স্মার্ট বানানোর বিরুদ্ধে নই। কিন্তু স্মার্ট বানানোর নামে বে-আদব যেন বানানো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা চাই। স্মার্ট হওয়া আর বে-আদব হওয়া এক কথা নয়। দুটোর মধ্যে পার্থক্য ভাল করে বুঝতে হবে। এই স্মার্ট বানানোর নামে মুরব্বী ও গুরুজনদের প্রতি আদব-তাজীম যেন শেষ করে দেয়া না হয়। স্মার্ট বানানোর নামে তাদেরকে যেন বে-আদব বানানো না হয়। তাহলে বে-আদব বানানোর দায়ে দায়ী হতে হবে।

মুরব্বী ও গুরুজনদের প্রতি আদব-তাজীম না থাকায় পরিবারও শেষ হয়ে যাচ্ছে, সমাজও শেষ হয়ে যাচ্ছে। আদব-তাজীম না থাকার কারণে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে যাচ্ছে, পরিবারের কেউ কাউকে মানছে না– ছোট ভাই বড় ভাইকে মানছে না, সন্তান পিতাকে মানছে না, স্ত্রী স্বামীকে মানছে না। ফলে পরিবাবের মধ্যে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকছে না, প্রত্যেকে যার যার মত চলছে, লাগামহীন চলছে, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও পারিবারিক বন্ধন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সমাজ থেকেও মান্যতা আগের তুলনায় বহুগুণ কমে গেছে। যার ফলে সমাজে আগের তুলনায় বহুগুণ বেশী অন্যায় অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। আগের যুগে অপরাধ কম হত। কারণ, তখন মুরব্বীদেরকে মানা হত, মুরব্বীরা শাসন করত, মুরব্বীদের ভয়ে ছোটনা অন্যায় থেকে বিরত থাকত। এখন মুরব্বীদের ভয়ও নেই মান্য-গণ্যতাও নেই। যার কারণে নির্দ্বিধায় অন্যায় অপরাধ ঘটে চলছে। এভাবে আদব-তাজীম উঠে যাওয়ায় পরিবারও শেষ, সমাজও শেষ, সবকিছু শেষ।

ছোটদের মধ্যে এবং অধীনস্তদের মধ্যে আদব-কায়দা গড়ে তোলার জন্য আবার আগের যুগের মত নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে। যে সমস্ত কাজ দ্বারা ছোটদের মধ্য থেকে আদব-কায়দা উঠে যায় সেগুলো বন্ধ করতে হবে। ছোটদের সামনে এবং অধীনস্তদের সামনে গান-বাজনা শোনা বন্ধ করুন। গান-বাজনা এমনিতেই তো হারাম। ছোটদের সামনে এবং অধীনস্তদের সামনে যে কোন রকম যৌন আলোচনা, যৌন নিবেদনমূলক কর্মকান্ড বন্ধ করুন। বড়দের প্রভাব নষ্ট হয় এমন কোন কাজ বা কথা ছোটদের সামনে এবং অধীনস্তদের সামনে বন্ধ রাখুন।

ছোটদের মধ্যে এবং অধীনস্তদের মধ্যে আদব-কায়দা গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় উপায় হল আমরা যারা বড় আমরা যারা উপরস্থ রয়েছি, তাদের মধ্যে আগে আদব-কায়দা গড়ে উঠতে হবে। আমরা বড়রা করলে ছোটরাও করবে, আমরা উপরস্থরা করলে অধীনস্তরাও করবে। আমরা শুধু ছোটদের দিয়ে এবং অধীনস্তদের দিয়ে করাতে চাইব, কিন্তু নিজেরা করব না, তাহলে হবে না। আমার বিশিষ্ট উস্তাদ হযরত মাওলানা নূর হোছাইন কাছেমী সাহেবকে বহুবার বলতে শুনেছি যে, ছাত্ররা

www.maktabatulabrar.com

কিতাব পড়ার চেয়ে উস্তাদকে পড়ে বেশী। অর্থাৎ, কিতাবে যা পড়ে, সেটা আমল করে কম, উস্তাদকে যেমন করতে দেখে সেটা আমল করে বেশী। তিনি একথাই বোঝাতে চাইতেন যে, ছোটদের নীতি কথায় যা সংশোধন হয় তার চেয়ে বেশী সংশোধন হয় মুরব্বীদেরকে দেখে। আমি মুরব্বী– আমি পিতা কিংবা আমি বড় ভাই, এমতাবস্থায় আমি যদি গান-বাজনা শুনি, আমি যদি অশ্লীল সবকিছু দেখি, আমি যদি সমানে বিড়ি-সিগারেট টানি, আর ছেলে-মেয়ে ও ছোট ভাই-বোনদেরকে নছীহত করি যে, তোমরা গান-বাদ্য শুন না, বিড়ি-সিগারেট খেও না, তাহলে আমার এই নছীহতে তেমন কাজ হবে না। বরং তারা আমাকে যা করতে দেখবে সেটারই অনুসরণ করবে। আর আমি যদি মানি, তাহলে তারাও মানবে। আমার সন্তানরা যদি আমার মধ্যে আমল দেখে যে, আব্বা কত সুন্দর নামায পড়েন, তাহাজ্জুদ পড়েন, কুরআন তেলাওয়াত করেন, যিকির-আযকার করেন, তাহলে আমি নছীহত না করলেও আমার এই আমলগুলোর দ্বারা প্রতি মুহূর্তে তাদের মনের উপরে আছর পড়তে থাকবে। পিতার আমলই সন্তানের জন্য নছীহত হয়ে দাঁড়াবে, বড়দের আমলই ছোটদের জন্য নছীহত হয়ে দাঁড়াবে, গুরুজনদের আমলই অধীনস্তদের জন্য নছীহত হয়ে দাঁড়াবে। তাই এ কথাই বলছিলাম যে, আমরা বড়রা করে ছোটদেরকে শেখাতে হবে, উপরস্থরা করে অধীনস্তদেরকে শেখাতে হবে। কথার নছীহতের চেয়ে আমলের নছীহতে আছর বেশী হয়। তাই ছোটদের মধ্যে এবং অধীনস্তদের মধ্যে আদব-কায়দা গড়ে তোলার জন্য আমাদের বড়দের মধ্যে এবং উপরস্তদের মধ্যে আগে আদব-কায়দা গড়ে উঠতে হবে। আমরা যদি মাতা-পিতা, বড় ভাই-বোন, এলাকা ও সমাজের গন্যমাণ্য মুরব্বী, গুরুজন ও উলামায়ে কেরামের সাথে আদব-সম্মান রক্ষা করে চলি, তাহলে আমাদের ছোটরা এবং অধীনস্তরাও তা করবে। আমাদেরটা দেখেই তারা শিখবে।

দ্বীনের দাওয়াত এবং তালীম দুইভাবে হয়। মুখে বলেও হয়, আমলের মাধ্যমেও হয়। এখন তো আমরা মুখে বলে খুব দাওয়াত দেই, বলে খুব শিখাতে চাই। আমলের মাধ্যমে শেখাতে চাইনা। দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা তাইয়্যেব সাহেব (রহ.) "দ্বীনী দাওয়াতকে কুরআনী উসূল" নামক বইতে লিখেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের জামাআত সম্পর্কে ইতিহাস পাওয়া যায়– তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন। মানুষকে দ্বীন বোঝানোর জন্য, ইসলাম মানার জন্য, ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাজ করেছেন। এই সাহাবায়ে কেরামের এরকম ইতিহাস পাওয়া যায় যে, তাঁরা একটা গোত্রের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেছেন, তারা জিজ্ঞাস করেছে আপনারা কোন্ ইসলাম বোঝাতে চান? যে ইসলাম আপনারা মানেন সেই ইসলাম? সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, হ্যাঁ। তখন তারা বলেছে, তাহলে আর বোঝানোর করকার নেই। যে ইসলামের কারণে মানুষ এত সুন্দর হয়ে যায় সেই ইসলাম আর বোঝানোর দরকার নেই। আমরা বুঝেছি এ ধর্ম সত্য। এভাবে তারা মুসলমান হয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরামকে দেখেই তারা ইসলামের শিক্ষা বুঝে গেছে। এটাই হল আমলের মাধ্যমে দাওয়াত ও শিক্ষা। মুখের দাওয়াত ও তালীমের চেয়ে এই দাওয়াত ও তালীমের দ্বারাই আছর বেশী হয়।

আজ আমাদের মধ্য থেকে আমলের মাধ্যমে শেখানোর পন্থা উঠে যাওয়ার মত অবস্থা। আজ শুধু ভাষণ আর ভাষণ চলছে। শুধু বয়ান ভাষণ দিয়েই অন্যদেরকে ভাল বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তা হচ্ছেনা। রেডিও-টেলিভিশনে বয়ান ভাষণ চলছে, সভা-সমিতির মঞ্চে বয়ান ভাষণ চলছে, পত্র-পত্রিকা মেগাজিনে বয়ান ভাষণ চলছে, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না। আমরা নিজেরা ভাল হই না, কিন্তু চাই সন্তানরা ভাল হোক, আমরা গুরুজনরা ভাল হই না কিন্তু চাই আমাদের অধীনস্তরা ভাল

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমরা সমাজপতিরা ভাল হই না কিন্তু চাই সমাজের সাধারণ সব লোক ভাল হোক। এটা হওয়ার আশা ক্ষীণ। আগেরা নিজেরা ভাল হতে হবে, তাই দেখে অন্যরা ভাল হবে।

আমরা সমাজের ছেলে-মেয়েদেরকে দোষ দেই যে, এই যুগের ছেলে-মেয়েরাই খারাপ। সমাজের ছেলে-মেয়েদেরকে দোষ দিলে কি হবে! আমাদের অবস্থা কি? আমরা যখন মানি না তখন আমাদের সন্তানরা কী দেখে মানতে উদ্বুদ্ধ হবে? আগে আমাদের মানতে হবে, আগে আমাদেরকে মডেল হতে হবে। এই মডেল দেখেই আমাদের সন্তানাদি এবং পরবর্তী প্রজন্ম মানতে শিখবে। যারা নছীহত করে তাদের নিজেদের মধ্যেই যদি আমল না থাকে, তাহলে তাদের নছীহতে ফায়দা হয় কম। এজন্য নছীহতকারীদেরকে নছীহত করার সাথে সাথে নিজেদরকেও আমল করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ. (সূরা সাফ্ফ: ২)

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা নিজেরা যা আমল কর না, অন্যদেরকে তা বল কেন?

এ আয়াতে নছীহতকারীগণ নিজেরাও যেন আমল করে তার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যাতে তাদের নছীহতে ভাল ফায়দা হয়।

যুগ যমানার দোষ দেয়া নিষেধ। হাদীছে এসেছে,

لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٠٠٣)

অর্থাৎ, তোমরা যুগ যমানাকে দোষ দিও না। কেননা, যুগ যমানা পরিচালনা করেন আল্লাহ তাআলা।

এ হাদীছে যুগ যমানার দোষ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। যুগ যমানার দোষ নিজেদের দোষ ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করে দোষ মুক্ত হওয়া যাবে না।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবকিছু সঠিকভাবে বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং - ২৩

মানব সেবা ও মানব প্রেম প্রসঙ্গ

(১ম পর্ব)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُسْلِمُوْنَ كَجَسَدٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ وَاِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমাদেরকে জীবনের ছোট বড় সব আমলের হিসাব দিতে হবে। এরকম নয় যে, বড় বড় আমলের হিসাব দিতে হবে আর ছোট ছোট আমলের হিসাব দিতে হবে না। আমাদের সাথে যে আমলনামা রয়েছে এই আমলনামায় ছোটটাও যেমন লেখা হয়, বড়টাও লেখা হয়। ছোট বড় কোনটাই লিখতে বাদ দেয়া হয় না। কেয়ামতের দিন এই আমলনামা হাতে পেয়ে মানুষ বিস্ময়ের সাথে বলবে,

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا . (সূরা কাহ্ফ: ৪৯)

অর্থাৎ, কি অদ্ভুত এই আমলনামা– জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়েনি!

আমি যা করেছি কোন কিছুই তো বাদ যায়নি– সবকিছু এতে লিপিবদ্ধ আছে। এখন যদি এই লেখা অনুযায়ী আমার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হয়, তাহলে আমার বাঁচার কোন উপায় নেই। হাদীছেও তাই বলা হয়েছে,

مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ يَهْلِكُ. (متفق عليه – البخاري برقم ١٠٣ ومسلم برقم ٧٤٠٨)

অর্থাৎ, যার সব আমলের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য।

তাই সব আমলের ব্যাপারেই সাবধান থাকা চাই। না জানি কোন আমলের কারণে ধরা পড়ে যাই। বড় বড় আমলের প্রতিও খেয়াল রাখা চাই, ছোট ছোট আমলের ব্যাপারেও খেয়াল রাখা চাই। আমরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বড় বড় ইবাদতগুলো যেমন খেয়াল করে যত্নের সাথে করি, ছোট ছোট ইবাদতগুলিও এরকম খেয়াল করে যত্নের সাথে করা চাই। না জানি! একটা ছোট আমল না করার কারণে আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যাই।

তবে আল্লাহ পাক সব মু'মিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিবেন না। বরং মু'মিনদের অনেকের হিসাব সহজ করে দিবেন। অনেককে বিভিন্ন ছোটখাট আমলের ওছীলাতেও নাজাত দান করবেন। তাই ছোট খাঁট আমলকেও তুচ্ছ জানতে নেই। ছোট-খাট আমলও যত্নের সাথে ভক্তির সাথে করা চাই। কেননা, হতে পারে এই ছোট্ট আমলের ওছীলাতেই আমার নাজাত হয়ে যাবে। হতে পারে একটা ছোট্ট আমলই আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়ার ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে। ফার্সীতে বলা হয়–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

رحمت حق بہانہ می جوید + بہانمی جوید

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য ওছীলা খুঁজতে থাকবে, পাকড়াও করার জন্য বাহানা খুঁজবে না।

দুনিয়াতে আমাদের স্বাভাবিক চরিত্র হল আমরা একজন মানুষকে কোন্ ওজুহাতে ধরতে পারি এই চেষ্টা করি, ছুতানাতা অজুহাতে আঁটকানোর চেষ্টা করি। কিন্তু আল্লাহর রহমতের অবস্থা হবে এর সম্পূর্ণ উল্টো। আল্লাহর রহমত কোন্ ওছীলায় কাকে নাজাত দেয়া যায়, কোন্ ওছীলায় কাকে পার করে দেয়া যায় তাই খুঁজবে।

সাধারণভাবে আল্লাহর রহমত লাভ করার উপায় হল নেক আমল। যেমন কুরআন শরীফের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

اِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ. (সূরা আ'রাফ: ৫৬)

অর্থাৎ, যারা নেক আমল করে আল্লাহর রহমত তাদের নিকটবর্তী।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে– যে যত বেশী নেক আমল করতে পারবে আল্লাহর রহমত সে তত বেশী পাবে। যে যত বড় নেককার হবে আল্লাহর রহমত সে তত বেশী লাভ করবে।

এটা হল আল্লাহর রহমত পাওয়ার সাধারণ নিয়ম। এই সাধারণ নিয়মের বাইরেও এমন অনেক কিছু আছে যার ওছীলায় আল্লাহ পাক রহমতের ফয়সালা করে থাকেন।

এখন জানার বিষয় হল সেই ওছীলাগুলো কি, যার ভিত্তিতে আল্লাহ রহমানুর রহীম আমাদের প্রতি রহমত করবেন, সে ব্যাপারেও কুরআন হাদীছে কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে। এরকম বিভিন্ন আমল রয়েছে, যার ওছীলায় আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে, মুক্তি পাওয়া যাবে। তার মধ্যে একটা বিশেষ আমল হল মানুষের প্রতি দয়া, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। এটা এমন একটা আমল যার ওছীলায় আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে, এটা এমন একটা আমল যার ওছীলায় কেয়ামতের দিন বহু লোকের নাজাত হয়ে যাবে।

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ. (رواه الترمذي برقم ١٩٢٤ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ. (رواه البخاري برقم ١٢٨٤)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র দয়ালুদের প্রতিই দয়া করে থাকেন।

অতএব আমরা মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি দয়া করবেন। আমরা মানুষকে সাহায্য করলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আমরা মানুষের সাথে যেমন করব, আল্লাহও আমাদের সাথে তেমন করবেন। আমরা মানুষকে অপমানিত করলে আল্লাহ আমাদেরকে অপমানিত করবেন, আমরা ছুতা-নাতা অজুহাত দিয়ে মানুষকে আঁটকানোর চেষ্টা করলে আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে সহজে পার করবেন না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বহু হাদীছে এ বিষয়টা বলা হয়েছে যে, আমরা মানুষের সাথে যেমন করব, আল্লাহও আমাদের সাথে তেমন করবেন। মানুষের সাথে আমাদের মুআমালা যেমন হবে, আমাদের সাথেও আল্লাহর মুআমালা তেমন হবে। যেমন কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَاغْفِرُوْا يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ. (رواه أحمد برقم ٧٠٤١ وإسناده حسن)

অর্থাৎ, তোমরা ক্ষমা করো আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর এক হাদীছে এসেছে–

مَنْ لَّا يَرْحَمُ لَايُرْحَمُ. (رواه البخاري برقم ٦٠١٣)

অর্থাৎ, যে দয়া করবে না তার প্রতি দয়া করা হবে না। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে–

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٧٠٢٨)

অর্থাৎ, যে মানুষের দোষ গোপন করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকও তার দোষ গোপন করে দিবেন।

এক হাদীছে এসেছে– কেয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলামীন এক ব্যক্তিকে ডাকবেন। ডেকে তার আমলনামা দেখাবেন। জিজ্ঞাসা করবেন বান্দা এই পাপগুলো করেছিলে? তখন সে মনে মনে খুব ভয় পেতে থাকবে যে, এই সব পাপের কারণে যদি আমাকে ধরা হয়, তাহলে কোন উপায় নেই! অবশেষে আল্লাহ পাক বলবেন যে, তুমি দুনিয়াতে আমার বান্দার দোষ গোপন করেছিলে, তাই আজ আমি তোমার সব দোষ গোপন করে দিলাম, কাউকে জানতে দিলাম না যে, তুমি এত বড় পাপী। তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। কাজেই কোন মানুষের দোষ কোনভাবে জেনে গেলেও তা গোপন করা চাই, অন্যের সামনে তা প্রকাশ করা না চাই, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকও আমার দোষ গোপন করবেন। ময়দানে হাশরেও আমার দোষ প্রকাশ করে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।

যাহোক এসব হাদীছ থেকে বোঝা যায় যে, এক বান্দার সাথে আরেক বান্দার মুআমালা যেমন হবে তার সাথে আল্লাহ পাকের মুআমালাও তেমন হবে। অতএব মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহর দয়া পাওয়া যাবে। মানুষের নুসরত বা সাহায্য করলে আল্লাহর নুসরত বা সাহায্য পাওয়া যাবে। মানুষের সহযোগিতায় থাকলে আল্লাহ পাক সহযোগিতায় থাকবেন। মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ পাকও ভালবাসবেন। আর আল্লাহ পাকের নুসরত, সহযোগিতা ও ভালবাসা সাথে থাকলে কোথাও আঁটকাতে হবে না, সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনও আঁটকাতে হবে না, নাজাত হয়ে যাবে। তাই বলা হচ্ছিল, নাজাতের একটা বিশেষ ওছীলা হল মানুষের প্রতি দয়া করা। এই ছোট্ট একটা আমল দ্বারাও আমরা আল্লাহর কাছে নাজাত পেয়ে যেতে পারি।

দয়ার বিধান অনেক ব্যাপক– নিজের লোকদের প্রতিও দয়া করতে হবে, অন্য লোকদের প্রতিও দয়া করতে হবে, আপনজনের প্রতিও দয়া করতে হবে, যারা আপনজন নয় তাদের প্রতিও দয়া করতে হবে। এটা হল সাধারণ দয়া যা সকলের প্রতি করতে হবে। বিশেষভাবে সমাজের এতীম-মিসকিনদের প্রতি, সমাজের বিধবাদের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি দয়ার কথা হাদীছে এসেছে। এ সকল লোকের প্রতি দয়া করার ফযীলতও বেশী রাখা হয়েছে। এতীমদের প্রতি দয়ার ফযীলত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বিষয়ে এক হাদীছে এসেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে দেখিয়ে বলেছেন,

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى. (البخاري برقم ٦٠٠٥)

অর্থাৎ, আমি এবং এতীমের তত্বাবধানকারী এ দুজন জান্নাতে এরকম পাশা-পাশী থাকব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদত ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।

আর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيْمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ اِلَّا لِلّٰهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ اَحْسَنَ اِلٰى يَتِيْمَةٍ اَوْ يَتِيْمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى. (رواه أحمد في مسنده برقم ٢٢٢٠٧ والحديث صحيح لغيره)

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে, যে সমস্ত চুলের উপর দিয়ে তার হাত অতিক্রম করবে তার প্রতিটির বিনিময়ে তার জন্য ছওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি তার তত্তাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীম বালক-বালিকার সাথে ভাল আচরণ করবে আমি ও সে ব্যক্তি জান্নাতে এ দুই আঙ্গুলের মত (মিলিত) থাকব। এই বলে তিনি নিজের শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলালেন তবে দুটোর মধ্যে একটু ফাঁক রাখলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত হুবহু মর্যদা আর কেউ লাভ করতে পারবে না। পার্থক্য থাকবেই। এই হাদীছেও সেই পার্থক্যের দিকে ইংগিত পাওয়া যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুটো আঙ্গুল একত্র করে দেখিয়েছেন তার মধ্যে একটা বড় আরেকটা ছোট। যাহোক এ হাদীছে এতীমের তত্বাবধানকারী ও এতীমের লালন-পালনকারী এর মর্যাদা অনেক বড় তা বোঝানো হয়েছে।

এ হাদীছ দ্বারা এতীমদের প্রতি দয়ার ফযীলতও বুঝে আসে। এতীমদের মাথায় হাত বুলানো তাদের প্রতি মায়া-দয়া থেকেই হয়ে থাকে। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, এতীমদের প্রতি মায়া-দয়া করাতে অসংখ্য ছওয়াব হবে। এতীমকে একটু আদর করা অনেক ছওয়াবের কাজ।

এতীমদের লালন-পালন, এতীমদেরকে আদর সোহাগ করা এত ছওয়াবের কাজ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজের অসহায় এতীমদের ব্যাপারে নিজে দায়িত্ব নিয়ে নিতেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন–

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَاِلَىَّ وَعَلَىَّ. (رواه مسلم برقم ٢٠٤٢)

অর্থাৎ, কেউ যদি মাল রেখে মারা যায় তাহলে সে মাল তার ওয়ারিছদের প্রাপ্য। কেউ যদি ঋণ রেখে মারা যায় কিংবা এমন এতীম সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চলে যায় যার কোন লালন-পালনকারী না থাকে, এরকম অসহায় এতীমদের দায়িত্ব আমি নিয়ে নিলাম। এ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝিয়েছেন সমাজের সব এতীমের দায়িত্ব আমার।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে এতীমদের দায়-দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নিয়েছিলেন, হতে পারে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি এ দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যদিও তখনকার যুগে আমাদের মত এরকম নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল না। তারপরও একটা রাষ্ট্র তো ছিল, যার প্রধান ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই হতে পারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাহলে এখনকার সমাজেও রাষ্ট্রপ্রধানদের দায়িত্ব অসহায় এতীমদের লালন-পালন করা, তাদের তত্বাবধান করা, তাদের শিক্ষা-দিক্ষা খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি সবকিছুর ব্যবস্থা করা। আবার এমনও হতে পারে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নয়, বরং ব্যক্তি হিসেবে এ দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এটা বোঝা যায় এভাবেও যে, তিনি তো এতীমদের লালন-পালন করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাহলে এটা শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের করণীয় বিষয় নয় বরং ব্যক্তিগতভাবেও সকলের করণীয় বিষয়। ব্যক্তিগতভাবেও নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী এতীমদের দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়া চাই। এমনিভাবে সমাজের যারা নিঃস্ব, অসহায়, যাদের কিছুই নেই, যারা মিসকীন, যারা স্বামীহারা– স্বামী মারা গেছে অথবা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গেছে এরকম স্বামীহীনা, তাদের ব্যাপারেও দায়-দায়িত্ব নেয়ার কথা বিশেষভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিনি বিধবা ও মিসকীনদের দায়িত্ব গ্রহণ করা ও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার ফযীলত বয়ান করে বলেছেন,

اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ. (متفق عليه– البخاري برقم ٥٣٥٣ ومسلم برقم ٧٦٥٩)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকীনদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে রত কিংবা ঐ ব্যক্তির মত যে সারা রাত নফল নামায পড়ে আর সারা দিন নফল রোযা রাখে।

বিধবা ও মিসকীনদের দায়-দায়িত্ব দুই ভাবে গ্রহণ করা যায় (১) নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের খরচ-পাতি চালিয়ে যাওয়া (২) তারা নিজেরা যেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এরকম কোন ব্যবস্থা করে দেয়া। যেভাবেই হোক বিধবা ও মিসকীনদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার ফযীলত হল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার মত অথবা সারারাত নফল নামায পড়া আর সারাদিন নফল রোযা রাখার মত। সুবহানাল্লাহ!

জেহাদের সাথে বিধবা ও মিসকীনদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার একটা মিল আছে। তা হল জেহাদের মাধ্যমে বহু মানুষের জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হয়। যদি জেহাদের বিধান না হত, তাহলে আমাদের সকল কে শেষ করে দেয়া হত, শত্রুরা কাউকে বাঁচতে দিত না। তাই জেহাদের বিধান রাখা হয়েছে যে, তোমরা জেহাদের মাধ্যমে দুই চারজনের জীবন দিয়ে আর বহু লোকের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা নাও। তাই জেহাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষা হয়। তদ্রূপ এতীম, অসহায়, বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার অর্থ হল তাদের জীবন রক্ষা করা। এভাবে জেহাদের সাথে বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার একটা মিল রয়েছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাই বলা হয়েছে বিধবা ও মিসকীনদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করাতে জেহাদের সমপরিমাণ ছওয়াব হবে। অথবা বলা হয়েছে– সারা রাত নফল নামায পড়া ও সারা দিন নফল রোযা রাখার সমপরিমাণ ছওয়াব হবে। কারণ, নিজে ব্যক্তিগতভাবে ইবাদত-বন্দেগী করা দ্বারা নফসের উপর ততটা চাপ যায় না, যতটা নিজের পকেটের পয়সা বের করে দিতে চাপ যায়। বিধবা ও মিসকীনদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে গেলে পকেটের উপর চাপ যায়, তাতে নফসের সাথে মুজাহাদা বেশী হয়। তাই সারারাত নফল নামায পড়া আর সারাদিন নফল রোযা রাখার চেয়ে বিধবা ও মিসকীনদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার ফযীলত কম হওয়ার কথা নয়।

শুধু বিধবা ও মিসকীন নয় বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম সমাজের সব রকম অসহায় মানুষের দায়-দায়িত্ব নেয়ার আদর্শ রেখে গেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন। তাঁর সঙ্গে বহু সাহাবী মক্কায় তাদের ঘর-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা-পয়সা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে হিজরত করে চলে আসেন। তাদেরকে বলা হয় মুহাজির সাহাবী। এই মুহাজির সাহাবীগণ যখন মদীনায় আসেন, তখন তাঁরা হলেন একটা বিরাট অসহায় জনগোষ্ঠি যাদের কিছুই নেই। কারণ মক্কা থেকে তারা কিছুই সাথে নিয়ে আসতে পারেননি। কাফেরদের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে কোন রকম জান বাঁচিয়ে চলে এসেছেন। এই ছিল তাঁদের অবস্থা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অসহায় জনগোষ্ঠির জন্য কি ব্যবস্থা নিলেন? তিনি আনসারী সাহাবীদেরকে ডাকলেন। তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যাদের সচ্ছলতা আছে, তোমরা যারা পার, এক এক জন এক এক জনের দায়িত্ব নিয়ে নাও। এভাবে প্রথম পর্যায়ে ৪৫ জন আনসারী সাহাবী ৪৫ জন মুহাজিরের দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। একটা বিরাট সামাজিক সমস্যার কত সুন্দর সমাধান তিনি করলেন। এই আনসারী সাহাবীদের সহযোগিতায় উক্ত মুহাজিরগণ আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম সমাজের অসহায় মানুষের দায়-দায়িত্ব নেয়ার আদর্শ কায়েম করেছেন।

আজ আমরা এই ব্যবস্থা অনুসরণ করলে আমাদের সমাজের চেহারা বদলে যেতে পারে। যারা শহরে বাস করে, তাদের অনেকের পক্ষে গ্রামের অসহায় একজন দুজনের দায়িত্ব নিয়ে নেয়া এমন কঠিন কিছু নয়। গ্রাম দেশের একজন মানুষ দশ হাজার, বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে জীবন চালানোর মত একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারে।

সমাজের অসহায় মানুষদের সেবা করার মনোভাব থাকলে অনেকভাবে অনেক কিছু করা যায়। সমাজের অসহায় মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা থাকলে তাদের জন্য আমরা অনেকভাবেই অনেক কিছু করতে পারি। করাও উচিত। মুসলমান হয়ে মুসলমানের প্রতি যদি সহমর্মিতা না থাকে তাহলে সেতো খাঁটি মুসলমানই নয়। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে কেমন সহমর্মিতা থাকতে হবে সে সম্পর্কে এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَلْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى عَيْنُهُ وَاِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ.

(رواه مسلم برقم ٦٧٥٤)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, সমস্ত মুসলমান জাতি মিলে একটা ব্যক্তির মত। এক দেহের এক অঙ্গ যদি ব্যথিত হয় সারা অঙ্গ সেই ব্যথা উপলব্ধি করে। এক চোখে ব্যথা হলে সারা শরীরে সে ব্যথা উপলব্ধি করে। মাথায় ব্যথা হলে সারা দেহ সেই ব্যথা উপলব্ধি করে।

এ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, সমস্ত মুসলমান মিলে এরকম এক বডি, এক দেহ, এক শরীর, কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমি যেমন আমার কোন অঙ্গকে খাটো করে দেখি না, কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি না যে, হাতের ব্যথা হয়েছে তাতে আমার কী হয়েছে? চোখের অসুখ হয়েছে তাতে আমার কী হয়েছে? মাথার যন্ত্রণা হয়েছে তাতে আমার কী হয়েছে? আমি এরকম বলিও না, এরকম ভাবিও না। কারণ, হাতের ব্যথাতো আমার-ই ব্যথা, চোখের ব্যথাতো আমার-ই ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা তো আমার-ই যন্ত্রণা। এভাবে আমি কোন অঙ্গকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি না, বরং পুরোটা মিলেই আমি। এভাবে সমস্ত মুসলমান এক দেহ এক শরীর, কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, কাউকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যাবেনা। তাই সকলকে নিজের মত করেই ভাবতে হবে, নিজের জন্য যা কিছু ভালবাসতে হবে অন্যের জন্যও তেমন কিছু ভালবাসতে হবে, নিজের জন্য যেমন কল্যাণ চিন্তা করতে হবে অন্যের জন্যও তেমন কল্যাণ চিন্তা রাখতে হবে। এরই নাম মুসলমানদের পারস্পরিক একাত্মতা, এরই নাম মুসলমানদের পারস্পরিক সহমর্মিতা। সকলকে এক করে ভাবতে হবে, সকলের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের মত করে দেখতে হবে। সকলের অসুবিধাকে নিজের অসুবিধার মত করে ভাবতে হবে এবং সেভাবে সকলের অসুবিধা দূর করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সমস্যাকে নিজের সমস্যার মত করে ভাবতে হবে এবং সেভাবে তার সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে হবে। সকলের দুঃখ-কষ্টকে নিজের দুঃখ-কষ্টের মত করে ভাবতে হবে এবং সেভাবে তা লাঘব করার জন্য তৎপর হতে হবে। এরূপ করলেই সে খাঁটি মুসলমান।

আজ আমরা মুসলমান এ আদর্শ থেকে অনেক দূরে। খৃষ্টান সমাজ মানব সেবার অঙ্গনে এগিয়ে আছে। খৃষ্টান সমাজ মানব প্রেমের অঙ্গনে এগিয়ে আছে। যা দেখে অনেকে মনে করছে, খৃষ্টধর্ম মানব সেবার ধর্ম, খৃষ্টধর্ম মানব প্রেমের ধর্ম, ইসলামে বুঝি এরকম মানব সেবার কথা নেই, ইসলামে বুঝি এরকম মানব প্রেমের কথা নেই। অথচ মানব সেবার কথা খৃষ্টধর্মে যা বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মে তার চেয়ে অনেক বেশী বলা হয়েছে, মানব প্রেমের কথা খৃষ্টধর্মে যা বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মে তার চেয়ে অনেক বেশী বলা হয়েছে। শুধু আমাদের মধ্যে তার আমলের অভাব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইনশাআল্লাহ মানব সেবা ও মানব প্রেমের গুরুত্ব এবং তার ফযীলত সম্পর্কে আগামী জুমুআয় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং - ২৪

মানব সেবা ও মানব প্রেম প্রসঙ্গ

(২য় পর্ব)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ. اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় মানব সেবা ও মানব প্রেম সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল– মানুষের সেবা করা, মানব প্রেম এমন একটা আমল, যার দ্বারা আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়। "শুআবুল ঈমান" হাদীছ গ্রন্থের এক হাদীছে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ. (رواه البيهقى فى شعب الايمان برقم ٧٤٤٨)

অর্থাৎ, সমস্ত মাখলুক, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক প্রিয়, যে আল্লাহর পরিবারের প্রতি এহসান তথা অনুগ্রহ করে।

বোঝা গেল যারা সৃষ্টিকে ভালবাসবে, যারা সৃষ্টির সেবা করবে, তারাই হল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আর যারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে তাদের নাজাত পেতে কোন বেগ পেতে হবে না। যখন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিয়ে পার হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তখন বিভিন্ন আমল তার নাজাতের জন্য ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে। তার ভিতরে এই সৃষ্টির সেবাও একটা আমল, যা দ্বারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া যায়, যা মানুষের মুক্তির ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে। অতএব যদি আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে চাও তাহলে মানুষকে ভালবাস। যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও তাহলে মানুষকে ভালবাস। যদি আল্লাহর প্রেম অর্জন করতে চাও তাহলে মানুষের প্রতি, সৃষ্টির প্রতি প্রেম নিবেদন কর। এখানে মানুষকে প্রেম করার অর্থ যৌন সুড়সুড়ি মূলক প্রেম নয়, এখানে প্রেম অর্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাদের কল্যাণের চিন্তা, তাদের মঙ্গলের চিন্তা, কাজ কর্মের মাধ্যমে তাদের প্রতি ভালবাসার পরিচয় দেয়া ইত্যাদি। আর "মানব সেবা" বলতে বোঝায় অভাবীর অভাব দূর করা, গরীব অসহায় মানুষদের অন্ন-বস্ত্র দান করা, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, রোগ-ব্যধিতে সেবা করা, দূর্গত মানুষদেরকে ত্রাণ-সামগ্রি দান করা, মজলূমের ফরিয়াদে সাড়া দেয়া ইত্যাদি।

আমরা মানব সেবা করব, শুধু মুক্তি হবে– এই নিয়তে নয় বরং মানব সেবা ইসলামে ফরয। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যেমন শরীয়তে ফরয, মানব সেবা করাও ফরয। এই ফরয

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

আদায়ের নিয়তেও মানব সেবা করতে হবে। যার যতটুকু সাধ্য আছে সে ততটুকু মানব সেবা করবে। যেভাবে পারবে, সেভাবে করবে। যার সম্পদ আছে সে সম্পদ দিয়ে মানব সেবা করবে, যার বিদ্যা-বুদ্ধি আছে সে বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে মানব সেবা করবে, যার শক্তি আছে সে শক্তি দিয়ে মানব সেবা করবে। যার যতটুকু সাধ্য সেভাবে মানুষের সেবা করবে।

মানব প্রেম ও মানব সেবার বিষয়টা এত খাঁটো করে দেখার বিষয় নয়, বরং অনেক গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। এমনকি মানব প্রেমকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ. (رواه مسلم برقم ١٧٩)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য মুসলমানদের জন্য ভাল না বাসবে যা নিজের জন্য ভালবাসে।

এ হাদীছের বর্ণনা থেকে বোঝা গেল– নিজের জন্য আমি যা ভালবাসি, আমার আরেক মুসলমান ভাইয়ের জন্য যদি সেরকমটা ভাল না বাসি, নিজের জন্য যেরকম চাই, অপরের জন্য যদি সেরকমটা না চাই, তাহলে আমার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। এর অর্থই হল মানব প্রেম ঈমানের অংশ।

আমার নিজের জন্য আমি যা ভালবাসি অন্যের জন্যও সেরকমটা ভালবাসতে হবে। মানুষ নিজের জন্য কি ভালবাসে? মানুষ নিজের জন্য ভালবাসে অর্থাৎ, কামনা করে যে, তার উন্নতি হোক, তার ধন-সম্পদ হোক, তার সুখ-শান্তি হোক, তার ছেলে মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হোক, তার ছেলে মেয়েদের ভাল ঘরে বিবাহ হোক, প্রত্যেকে চায় যে, আমি যেন ভাল চাকুরী পাই, আমি যেন ভাল পদ পাই, আমি যেন ইজ্জত-সম্মান পাই ইত্যাদি। আমরা প্রত্যেকে নিজের জন্য এগুলো ভালবাসি। অতএব অন্যের জন্যও এগুলো ভালবাসতে হবে। আমি নিজের জন্য বিপদ-আপদ চাই না, অতএব অন্যের জন্যও আমি বিপদ আপদ চাইতে পারব না। আমি নিজের জন্য নিরাপত্তা চাই, অতএব অন্যের জন্যও নিরাপত্তা চাইতে হবে। আমি আমার মঙ্গলের জন্য কল্যাণের জন্য যেমন চেষ্টা করি, অন্যের জন্যও তেমন চেষ্টা করতে হবে। আমি চাই অনাহারে যেন না থাকি, অতএব অন্যের জন্যও তা চাইতে হবে। এক কথায় সকলকে নিজের মত করে দেখতে হবে, সকলের জন্য নিজের মত করে চাইতে হবে, সকলকে নিজের মত করে ভাবতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা অনেক বড় জিনিস। এমনকি এটাকে ঈমানের অঙ্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরকম না হতে পারলে আমরা মু'মিন নই। মানব প্রেমের কথা, মানব সেবার কথা এত শক্তভাবে আর কোন ধর্মে বলা হয়নি। অতএব ইসলাম ধর্মেই মানব প্রেমের কথা এবং মানব সেবার কথা বেশী বলা হয়েছে। আমরা পুরোপুরি করতে পারিনা বা করি না সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু ইসলামে বলা হয়েছে। আমলে না থাকলে সেটা ইসলামের দোষ নয় রবং সেটা আমাদের দোষ।

মানব প্রেম ও মানব সেবা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অনেক ফযীলতের কাজ। এ সম্পর্কে কয়েকটি ফযীলতের হাদীছ আপনাদেরকে শোনাচ্ছি।

মানব সেবার একটি ফযীলত হল– মানব সেবা দ্বারা আল্লাহর দয়া লাভ করা যায়। গত জুমুআয় এ সম্পর্কিত একটি হাদীছ শোনানো হয়েছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ. اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ. الحديث.

(الترمذي برقم ١٩٢٤ وقال حسن صحيح)

অর্থাৎ, যারা দয়ালু তাদের প্রতি দয়ালু আল্লাহ দয়া করেন। (সুতরাং) তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর আসমানবাসী (অর্থাৎ, আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। বোঝা গেল মানব সেবার দ্বারা আল্লাহ তাআলার দয়া লাভ করা যায়।

মানব সেবার আর একটি ফযীলত হল– মানব সেবা দ্বারা আল্লাহ সাহায্য লাভ করা যায়। বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে–

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (متفق عليه– البخاري ٢٤٤٩ ومسلم ٦٧٤٣)

অর্থাৎ, মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার প্রতি জুলুম করবে না, তাকে সাহায্য করা ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন পেরেশানী দূর করবে, আল্লাহ তার কেয়ামতের দিনের বহু পেরেশানী থেকে কোন পেরেশানী দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ (জেনেও) গোপন করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।

মানব সেবার আর একটি ফযীলত হল– মানব সেবা দ্বারা জান্নাত লাভ হয়। শুআবুল ইমান গ্রন্থের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ مِنْ اُمَّتِيْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يُّسِرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِيْ، وَمَنْ سَرَّنِيْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ. وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٧٦٥٣)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারও অভাব পূরণ করবে, এতে তার উদ্দেশ্য হল ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

মানব সেবার একটি বিশেষ দিক হল অন্নহীনকে অন্ন দান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান। এটা একটা বিশেষ ফযীলতের কাজ। আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْيٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا يُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ. (رواه ابو داود في سننه برقم ١٦٨٤)

অর্থাৎ, যে কোন মুসলমান অন্য কোন উলঙ্গ মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। যে কোন মুসলমান অন্য কোন ক্ষুদার্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল থেকে আহার করাবেন। যে কোন মুসলমান অন্য কোন পিপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে "রহীকে মাখ্তূম" থেকে পান করাবেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

"রহীকে মাখ্তূম" হল মেশক আম্বর দ্বারা মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানি যা জান্নাতীদেরকে পান করতে দেয়া হবে। দুনিয়াতে কোন পিপাসার্ত মানুষকে পানি পান করালে তার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাআলা রহীকে মাখতূম থেকে পান করাবেন।

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে– জনৈক সাহাবী বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا اِلَّا كَانَ فِيْ حِفْظٍ مِّنَ اللّٰهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ. (رواه الترمذي برقم ٢٤٨٤ وقال حسن غريب)

অর্থাৎ, যে কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কাপড়ের একটা টুকরা তার শরীরে থাকবে।

এ দুই হাদীছে যাদের খাবার নেই তাদেরকে খাবার দেয়া, যাদের বস্ত্র নেই তাদেরকে বস্ত্র দেয়া একটা বিশেষ ফযীলতের আমল বুঝে আসে। আমাদের দেশে মাঝে মধ্যে বন্যা দেখা দেয়, দুর্গত এলাকার মানুষের তখন অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়, বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়। তখন অন্ন বস্ত্র ও বিশুদ্ধ পানি নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে গেলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাতের ফল থেকে আহার করাবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কাপড়ের একটা টুকরা তাদের শরীরে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করবেন, তাদেরকে বিশুদ্ধ পানি পান করালে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মেশক আম্বর দ্বারা মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানি "রহীকে মাখ্তূম" থেকে পান করাবেন। শুধু বন্যা দুর্গত এলাকার লোকদের ব্যাপারেই হাদীছটি সীমাবদ্ধ নয়, সকল শ্রেণীর গরীব-মিসকীনকে অন্ন বস্ত্র ও খাদ্য-পানি দিয়ে সাহায্য করলেই এই ফযীলত লাভ হবে।

মানব সেবার আর একটা ফযীলত হল– মানব সেবা দ্বারা আল্লাহ তাআলার ক্ষমা পাওয়া যায়। বিশেষভাবে রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এই ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেললে মানুষ কষ্ট থেকে রক্ষা পায়। এই আমলেরও ফযীলত রয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহর ক্ষমা এবং পুরস্কার লাভ করা যায়। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ طَرِيْقٍ اِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. (رواه الترمذي برقم ١٩٥٨ وقال : حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল পেল। সে ডালটি রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজের বিনিময়ে তাকে পুরস্কৃত করলেন। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল– রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা দ্বারাও মানুষের সেবা হয় এবং তার দ্বারাও ছওয়াব পাওয়া যায়।

মানব সেবার আর একটা ফযীলত হল– মানব সেবা দ্বারা জেহাদ ও নফল রোযা এবং নফল নামাযের ছওয়াব পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে এ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে গত জুমুআয় হাদীছ শোনানো হয়েছিল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ. (متفق عليه– البخاري برقم ٥٣٥٣ ومسلم برقم ٧٦٥٩)

অর্থাৎ, বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগিতাকারী আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর ন্যায় কিংবা রাতের বেলায় নফল আদায়কারী ও দিনের বেলায় নফল রোযা পালনকারীর ন্যায়।

মনে রাখতে হবে আমাদের সম্পদ শুধু আমাদের জন্য নয়। আমাদের সম্পদে গরীব মিসকীন ও অসহায় মানুষদেরও হক রয়েছে। কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে বলা হয়েছে,

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ. (সূরা যারিয়াত: ১৯)

অর্থাৎ, যাদের সম্পদ আছে তাদের সম্পদে ঐসব লোকদের অধিকার রয়েছে যাদের সম্পদ নেই।

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আমার সম্পদ আছে এই সম্পদ আমার জন্য যেমন, যাদের নেই তাদের জন্যও তেমন। এই সম্পদে আমার যেমন অধিকার আছে গরীব মিসকীন ও অসহায় মানুষদেরও তেমন অধিকার আছে।

গরীব মিসকীন ও অসহায় মানুষদের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে আমাদের সামনে দুইটা বাধা থাকে। একটা হল আমরা মনে করি অন্যকে সম্পদ দিলে আমারটা কমে যাবে। আসলে অন্যকে দিলে আমারটা কমবে না বরং আমারটা বাড়বে। আমরা মনে করি গরীবদেরকে দিলে সম্পদ কমে যাবে, কিন্তু কুরআন শরীফে বলা হয়েছে এর বিপরীত। ইরশাদ হয়েছে,

وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ. (সূরা বাকারা: ২৭৬)

অর্থাৎ, দান-সদকা করলে আল্লাহ বরকত দেন, বৃদ্ধি করে দেন।

এখানে বলা হয়েছে, দান-সদকা করলে সম্পদ কমেনা বরং সম্পদ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পাওয়া দুই ভাবে হতে পারে। কখনো কখনো বাহ্যিক ভাবেই সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যায়। কখনো কখনো বাহ্যিক ভাবে সম্পদ বৃদ্ধি না পেলেও সম্পদের মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা বেড়ে যায়। সম্পদের মূল উদ্দেশ্য হল সম্পদ নিজের কাজে লাগা– দান-সদকা দ্বারা এই জিনিসটা বেড়ে যায়, অর্থাৎ, দান-সদকা করলে যতটুকু সম্পদ থাকে তা নিজের খুব কাজে লাগে, নিজের খুব উপকারে আসে, নিজের কল্যাণে আসে। এভাবে দান-সদকা দ্বারা সম্পদের বরকত বৃদ্ধি পায়। দান-সদকা না করলে মনে হবে সম্পদ থেকে যাচ্ছে কিন্তু সেই সম্পদে বরকত হবে না।

দান-সদকা করতে আমাদের সামনে আর একটা বাধা হল আমরা মনে করি সম্পদ আমার, এতে অন্যের হক থাকবে কেন, আমার সম্পদে গরীব মিসকীনদের কোন অবদান আছে বলে আমরা মনে করি না। অথচ আমাদের এই ধারণা ভুল। আমাদের সম্পদে গরীব-মিসকীনদেরও অবদান রয়েছে। কথাটা সহজে বোধগম্য হবে না। তাহলে এর ব্যাখ্যা শুনুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মদীনায় দুই ভাই ছিল। তাদের এক ভাই পেশার কাজ করত আর এক ভাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে পড়ে থাকত। একদিন যেভাই পেশার কাজ করত সে রসূল

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নালিশ করল যে, ও সারাক্ষণ আপনার এখানে পড়ে থাকে আর যত কাজ সব আমাকেই করতে হয়। ওর কি কোন কর্তব্য নেই? আমি শুধু একাই কাজ করব আর ও এখানে বসে শুধু জ্ঞান অর্জন করবে? তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ. (رواه الترمذي برقم ٢٣٤٥ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, সম্ভবত ওর কারণে তোমাকে রিযিক দেয়া হচ্ছে।

এখানে বোঝানো হয়েছে– ওযে দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করছে এ কারণেই তোমাকে রিযিক দেয়া হচ্ছে। ওর দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করা বন্ধ হয়ে গেলে তোমার যতটুকু ফসল উৎপান্ন হচ্ছে তা আরও কমে যেত। ওর কারণেই তোমার ফসল হচ্ছে, ওর কারণেই তোমার রিযিক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٨٩٦)

অর্থাৎ, সমাজের সব দূর্বল শ্রেণীর লোকদের ওছীলাতেই তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং রিযিক প্রাপ্ত হও।

বোঝা গেল– যদি সমাজে দূর্বল শ্রেণীর লোক না থাকত, তাহলে তোমাদের রিযিক বন্ধ হয়ে যেত বা অন্তত কমে যেত। কারণ তোমাদেরকে রিযিক বেশী দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তা থেকে তোমরা দূর্বলদেরকে দিবে। যদি ওদেরকে দেয়ার প্রশ্নই না থাকত তাহলে তোমাদেরকে বেশী দেয়ারও কোন কারণ থাকতনা, তখন তোমাদেরটা কমে যেত। বোঝা গেল আমাদের সম্পদ প্রাপ্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির পেছনে গরীব মিসকীনদেরও ভূমিকা রয়েছে, যারা দ্বীনী কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সম্পদ অর্জনে সময় ব্যয় করতে পারে না, তাদেরও আমাদের সম্পদ প্রাপ্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির পেছনে ভূমিকা রয়েছে। আরও বোঝা গেল যে, আমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ বেশী দিয়েছেন তা এজন্যও যেন আমরা গরীব-মিসকীন ও দ্বীনী কাজে লিপ্তদের জন্য ব্যয় করি।

এতক্ষণ পর্যন্ত মানব প্রেম ও মানব সেবার ফযীলত বর্ণনা করা হল। শুধু মানব প্রেম এবং মানব সেবা নয় বরং সমস্ত মাখলূকের প্রতি প্রেম ভালবাসা থাকতে হবে, সমস্ত মাখলূকের সেবা করতে হবে। শুরুতে যে হাদীছখানা তেলাওয়াত করেছিলাম তাতে শুধু মানুষের কথা বলা হয়নি বরং সমস্ত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে– সমস্ত সৃষ্টি হল আল্লাহর পরিবার, অতএব যারা আল্লাহর পরিবারের প্রতি দয়া করবে তারাই হল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। অতএব শুধু মানুষ নয় সমস্ত সৃষ্টির প্রতি দয়া করতে হবে। এমনকি একটা জানোয়ারের প্রতিও দয়া দেখাতে হবে। একটা জানোয়ারকেও বিনা অপরাধে মার-ধর করা বা আঘাত দেয়া শরীয়তে জায়েয নেই। মানুষকে কষ্ট দেয়া তো দূরের কথা একটা জানোয়ারকেও বিনা প্রয়োজনে কষ্ট দেয়া শরীয়তে জায়েয নেই। বোখারী শরীফের এক হাদীছে এসেছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عُذِّبَتْ اِمْرَاَةٌ فِيْ هِرَّةٍ، حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ. قَالَ فَقَالَ اللهُ اَعْلَمُ لَا اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا وَلَا سَقَيْتِيْهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا وَلَا اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٣٦٥)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, জনৈক মাহিলাকে একটা বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে বিড়ালটি আঁটকে রেখেছিল। ফলে সে ক্ষুধার্ত হয়ে মারা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি তাকে আহারও প্রদান করনি, পানিও প্রদান করনি, আবার ছেড়েও দেওনি যে, সে ভূমির পোকা-মাকড় খেয়ে প্রাণে বাঁচতে পারে।

মানব সেবা যেমন ফযীলতের বিষয়, মানুষ ছাড়া অন্য সৃষ্টির সেবাও ফযীলতের বিষয়। এক হাদীছে এসেছে–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْبَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً. (البخاري برقم ٢٣٢٠)

অর্থাৎ, কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপন করলে বা কোন ক্ষেত লাগালে আর তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ বা প্রাণী আহার করলে তার বিনিময়েও তার সদকার ছওয়াব হবে।

এক হাদীছে এসেছে–

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلَ الَّذِيْ بَلَغَ بِيْ فَنَزَلَ بِئْرًا فَمَلَاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَاِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ اَجْرًا؟ قَالَ: فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ. (رواه البخاري في صحيحه ٢٣٦٣)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একদা জনৈক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার প্রচণ্ড পিপাসা পেল। সে একটি কুঁয়ায় নেমে পানি পান করল। কুঁয়া থেকে উঠে দেখে একটি কুকুর পিপাসার কারণে কাদা মাটি চাটছে। তখন লোকটা মনে মনে বলল, এর পিপাসায় সেই অবস্থা হয়েছে যা আমার হয়েছিল। সে আবার কুঁয়ায় নামল। তার চামড়ার মোজায় পানি ভরে দাঁত দিয়ে সেটি কামড়ে ধরে উপরে উঠল। তা থেকে কুকুরটিকে পানি পান করাল। এর ফলে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করলেন– তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এ হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় শুধু মানুষ নয় অন্য যে কোন প্রাণী পাখির সেবা করাও ফযীলতের কাজ। এর দ্বারাও সদকার ছওয়াব পাওয়া যায়।

সারকথা– ইসলামে সৃষ্টির প্রতি প্রেম ও সৃষ্টির সেবা অনেক গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়, অনেক ফযীলতের বিষয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং - ২৫

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُّوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত দুই জুমুআয়া মানব সেবা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল, মানুষকে ভালবাসার কথা বলা হয়েছিল, মানুষের সাথে সু-সম্পর্কের কথা বলা হয়েছিল। আমরা যদি সকলের সাথে সু-সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যাই, তাহলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তাহলে আমাদের দুনিয়া সুন্দর হয়ে যায়। আমাদের অনেক সমস্যাই পরস্পরে সু-সম্পর্ক না থাকার কারণে হয়, পরস্পরে সহযোগিতা না থাকার কারণে হয়, একজন আরেকজনকে বিপদে ফেলার কারণে হয়। মানুষ যদি একে অপরের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে, মানুষের মধ্যে যদি পরস্পরে একে অপরের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা থাকে, মানুষের মধ্যে যদি পরস্পরে সহানুভূতি থাকে, তাহলে মানুষের বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, বহু অসুবিধা দূর হয়ে যায়।

এই একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা, একে অপরের সহানুভূতি, পরস্পরে সু-সম্পর্ক সবই হবে যদি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিল-মহব্বত থাকে, পরস্পরে ভালবাসা থাকে। পরস্পরে ভালবাসা থাকলে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে, পরস্পরে ভালবাসা থাকলে একে অপরের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে, পরস্পরে ভালবাসা থাকলে একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা বোধে উদ্বুদ্ধ হবে, পরস্পরে ভালবাসা থাকলে একজন আরেক জনকে বিপদে ফেলবে না বরং একজন আরেকজনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে। তাই পারস্পরিক ভালবাসা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই পারস্পরিক ভালবাসা যদি আল্লাহর ওয়াস্তে হয়, তাহলে তার ফযীলতও অনেক। আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসাকে আরবীতে বলা "হুব্বু ফিল্লাহ" অর্থাৎ, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে গুণকে ভালবাসেন তাকে ভালবাসা এক কথায় আল্লাহ্‌র জন্য দুস্তী রাখা বা আল্লাহ্‌র ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসা। এর বিপরীত হল "বুগ্‌য ফিল্লাহ" অর্থাৎ, আল্লাহর ওয়াস্তে রাগ রাখা বা আল্লাহর ওয়াস্তে অসন্তোষ রাখা, আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে দোষকে ঘৃণা করেন, না পছন্দ করেন, তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা। এক কথায় আল্লাহ্‌ পাকের উদ্দেশ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা বা আল্লাহ্‌ পাকের দুশমনের সঙ্গে দুশমনী রাখা। এই দুটোকে একসাথে আরবীতে বলা হয় হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ। মানুষের প্রতি ভালবাসা হোক বা অ-ভালবাসা হোক সবটাই হতে হবে আল্লাহর ওয়াস্তে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমাদের সবকিছুই হতে হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, আল্লাহর চিন্তাকে কেন্দ্র করে। ইবাদত-বন্দেগীও হতে হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, আচার-আচরণ, আয়-রোযগার, ইত্যাদি দুনিয়াবী সবকিছুও হতে হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, আল্লাহর চিন্তাকে কেন্দ্র করে। এমনকি মনের চিন্তা-চেতনাও পরিচালিত হবে আল্লাহর চিন্তাকে কেন্দ্র করে। মানুষের প্রতি ভালবাসা হোক বা রাগ হোক, ভালবাসা হোক বা অ-ভালবাসা হোক এটা একটা মনের চেতনার বিষয়, এই বিষয়টাও হতে হবে আল্লাহর চিন্তাকে কেন্দ্র করে। আমাদের সবকিছু এমনকি আমাদের সব চিন্তা-চেতনাও আল্লাহর মধ্যে কুরবানী হয়ে যেতে হবে। আমি সবকিছু করব আল্লাহকে কেন্দ্র করে, আমি সবকিছু চিন্তা করব আল্লাহকে কেন্দ্র করে। আমি নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় কোন কিছুই করব না, নিজেকে কেন্দ্র করে কোন কিছুই করব না। যা কিছুই করব এবং ভাবব সব আল্লাহকে কেন্দ্র করে। আমার সবকিছুই আল্লাহর জন্য কুরবানী করে দিব। আমার নিজস্বতা বলতে কিছুই থাকবে না, আমার আমিত্ব বলতে কিছুই থাকবেনা, আমার সবকিছু আল্লাহর মধ্যে বিলীন করে দিব। এক বুযুর্গ এ বিষয়টাই ফার্সী কবিতার মাধ্যমে এভাবে বলেছেন,

من تو شدم تو من شدی من تن شدم توجاں شدی + تاکس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تودیگری

অর্থাৎ, আল্লাহকে সম্বোধন করে বলেছেন হে আল্লাহ! আমি হয়ে গেছি তুমি আর তুমি হলে আমি। আমি হলাম দেহ আর তুমি হলে আত্মা। যাতে কেউ একথা বলতে পারবে না যে, তুমি আর আমি ভিন্ন ভিন্ন।

তিনি বুঝিয়েছেন যে, আমার নিজস্ব সত্তা বলতে কিছুই নেই, আমার আমিত্য বলতে কিছুই নেই, আমি আলাদা কিছুই নই। আমি হলাম তোমার হুকুমের গোলাম, তোমার আদেশ নিষেধের দাস, আমার নিজস্বতা বলতে কিছুই নেই, আমার আমিত্য বলতে কিছুই নেই, আমার সবকিছু তোমার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। একেই বলা হয় আল্লাহর সত্তার মধ্যে নিজেকে কুরবানী করে দেয়া, একেই বলা হয় আল্লাহর মহব্বতের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়া।

এভাবে যখন নিজের চিন্তা-চেতনাকে আল্লাহর জন্য কুরবানী করে দেয়া হয়, আল্লাহর মহব্বতের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়া হয়, তখন সবকিছুই আল্লাহর চেতনায় হতে থাকে, সবকিছুই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে থাকে। তখন কোন মানুষকে ভালবাসলে তাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, কাউকে ভাল না বাসলে তাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, কারও প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাও আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়। অর্থাৎ, তখন হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ-র মাকাম অর্জন হয়।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ-র মাকাম অর্জন হলে সে কোন সৃষ্টির সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে না এ কারণে যে, সে তখন চিন্তা করে– এ আল্লাহর মাখ্‌লূক, আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর মহব্বতের পয়দা করা জিনিস, এর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারি না।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ-র মাকাম অর্জন হলে কুরআন হাদীছের কথা ভাল লাগবে, কুরআন হাদীছ বিরোধী কথা খারাপ লাগবে। ইবাদত-বন্দেগী ভাল লাগবে, গোনাহের কাজ ও পাপের কাজ খারাপ লাগবে। কারণ যার সাথে ভালবাসা হয়, তার কথা ভাল লাগে, তার কথা মত কাজ করতে ভাল লাগে, তার কথার বাইরে যেতে খারাপ লাগে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ-র মাকাম অর্জন হলে কোন ফাসেক ফাজের ও পাপীর সাথে তার দিলের মহব্বত পয়দা হবে না, এ কারণে যে, সে তখন ভাববে, আল্লাহর সাথে এ লোকের সু-সম্পর্ক নেই, কাজেই তার সাথে আমার সু-সম্পর্ক হতে পারে না। আমার কোন আপন মানুষ, আমার খুব মনের মানুষ, আমার খুব ক্লোজ মানুষও যদি আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নাফরমানী করে, তাহলেও তার সাথে আমার বন্ধুত্ব কমে যাবে। কারণ, তার সাথে আমার যে বন্ধুত্ব সেটাতো আল্লাহকে কেন্দ্র করে। কাজেই সে যত আল্লাহ থেকে সরে যাবে, তার থেকে আমার বন্ধুত্বও তত গুটিয়ে আসবে।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌য ফিল্লাহ-র মাকাম অর্জন হলে আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক যত বেশী তাকে তত বেশী ভাল লাগবে। আল্লাহর প্রিয় মানুষদেরকে ভাল লাগবে, মুত্তাকী পরহেযগার লোকদেরকে ভাল লাগবে, বুযুর্গ মানুষদেরকে ভাল লাগবে, ওলী-আউলিয়াদেরকে ভাল লাগবে, সিদ্দিকীন শুহাদা সালেহীনদেরকে ভাল লাগবে। কারণ তাঁরা আল্লাহর প্রিয় মানুষ, তাই তাদেরকে ভাল লাগবে, তাদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক কায়েম হবে। যাকে ভালবাসি তার সবকিছুই ভাল লাগে। যার সাথে ভালবাসা হয়, তার প্রিয় মানুষদেরকে ভাল লাগে, তার চলা-ফেরা উঠা-বসা সবকিছুই ভাল লাগে, এমনকি তার কাপড়-চোপড়টাও ভাল লাগে, তার লাঠি-সোটাটাও ভাল লাগে, তার ইশারা-ইংগিত, টীকা-টিপ্পনীও ভাল লাগে। তদ্রূপ আল্লাহর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে গেলে আল্লাহর ভালবাসা লোকদেরকে ভাল লাগবে, আল্লাহর প্রিয় লোকদেরকে ভাল লাগবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত মানুষদেরকে ভাল লাগবে, পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ থেকে দূরে তাদেরকে খারাপ লাগবে। এটা হবে তখন, যখন আল্লাহর সাথে এমন ভালবাসার সম্পর্ক হবে যে, তার জন্য নিজের চিন্তা-চেতনাকে পর্যন্ত বিলীন করে দেয়া হবে। কামেল মু'মিনের চিন্তা এমন-ই হওয়া উচিৎ, খাঁটি মু'মিনের চিন্তা এমন-ই হওয়া উচিৎ। এজন্যই ঈমানদার ও মুত্তাকী-পরহেযগার মানুষ ব্যতীত অন্য কেউ মু'মিনের বন্ধু হতে পারে না। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ. (সূরা মায়িদা: ৫৫)

অর্থাৎ, মু'মিনদের বন্ধু তো হবে আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং ঐসব দ্বীনদার পরহেযগার মানুষ যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়।

অন্য এক আয়াতে কাফের মুশরিক ও ধর্ম বিরোধী লোকদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করা হয়েছে, যারা ধর্ম নিয়ে উপহাস করে তাদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ. (সূরা মায়িদা: ৫৭)

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস্য বানায়, যারা কাফের, তাদেরকে তোমরা বন্ধু বানিও না।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ. (সূরা মায়িদা: ৫১)

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা ইয়াহুদ নাসারাদেরকে বন্ধু বানিও না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদ, নাসারা ও ধর্ম বিরোধীদেরকে বন্ধু বানানো নিষেধ এ সম্পর্কিত বহু আয়াত রয়েছে। মুসলমানদের বন্ধুত্ব হবে একমাত্র মুসলমানদের সাথে, ধর্মপ্রাণ মানুষদের সাথে, আল্লাহওয়ালা মানুষদের সাথে। ইসলামে এটার গুরুত্ব অনেক।

হুব্বু ফিল্লাহ তথা আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসার গুরুত্ব যেমন অনেক, তেমনি ফযীলতও অনেক। এর ৬টি বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ-এর একটা বিশেষ ফযীলত হল– এর দ্বারা ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়। মুস্তাদরক হাকিমের এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَنْكَحَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ. (المستدرك برقم ٢٦٩٤ وقال: صحيح على شرط الشيخين و اقره عليه في التلخيص)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কিছু দিতে হলে আল্লাহর ওয়াস্তে দিল অথবা দেওয়া থেকে বিরত থাকলেও আল্লাহর ওয়াস্তেই বিরত থাকল এবং আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসল অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে কারও সাথে শত্রুতা রাখল, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিল।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হল আল্লাহর জন্য নিজের সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে দিতে হবে, আল্লাহর মধ্যে নিজের সবকিছুকে বিলীন করে দিতে হবে। যারা নিজের মনের ভালবাসা বা দুশমনীর মত মনের বিষয়কেও আল্লাহর মধ্যে বিলীন করে দিতে পারে তাদের দ্বারা ঈমানের দাবী পূর্ণ হয়, তাই এ হাদীছে বলা হয়েছে, যাদের দেয়া না দেয়া, ভালবাসা বা দুশমনী সবকিছু আল্লাহর ওয়াস্তে হয়, তাদের ঈমান পূর্ণ হয়।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ-এর আর একটা বিশেষ ফযীলত হল– হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ আল্লাহ্ পাকের নিকট একটা শ্রেষ্ঠ আমল। মুস্তাদরক হাকিমের আর এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. (رواه أحمد في المسند برقم ٢١٣٤١ والحديث حسن لغيره)

অর্থাৎ, আমলসমূহের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আমল হল আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা রাখা এবং আল্লাহর জন্য দুশমনী রাখা।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ-এর আর একটা বিশেষ ফযীলত হল– হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কেয়ামতের দিন বিশেষ ছায়া লাভ করবে। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ؟ اُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّيْ. (رواه مسلم برقم ٦٧١٣)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "আমার সুমহান ইজ্জতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছিল আজ তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ এমন দিন, আমার এই বিশেষ ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, এই বিশেষ ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর আরশের ছায়া। সেদিন ছায়ার খুব মূল্য থাকবে, সূর্য মাথার কাছে এসে যাবে, গরমে মানুষের ঘাম কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও গলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, সেদিন আল্লাহর বিশেষ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। যারা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে তারা সেদিন সেই ছায়ায় স্থান পাবে। আল্লাহ পাক আমাদের জন্যও সেই ছায়ার ফয়সালা করেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ. اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ. وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. (متفق عليه – رواه البخاري برقم ٦٦٠ ومسلم برقم ٢٤٢٧)

অর্থাৎ, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন সেদিন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তারা হল–

১. ইনসাফগার শাসক।
২. যে যুবক তার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়।
৩. যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে লাগানো থাকে।
৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসে– এরই ভিত্তিতে তারা একত্রিত হয় আবার এরই ভিত্তিতে তারা পৃথক হয়ে যায়।
৫. যে ব্যক্তিকে কোন বংশীয় সুন্দরী নারী কু-কর্মের দিকে আহবান জানায় আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।
৬. যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কী ব্যয় করে।
৭. আর সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ-এর আর একটা বিশেষ ফযীলত হল– হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কেয়ামতের দিন নূরের মেম্বার লাভ লাভ করবেন। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে এসেছে– হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُّوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ. (رواه الترمذي في سننه برقم ٢٣٩٠ وقال : حديث حسن صحيح)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, আমার মর্যাদার খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে, তাদের জন্য (পরকালে) নূরের এমন সুউচ্চ মেম্বর হবে যে, তাদের প্রতি নবী এবং শহীদগণও ঈর্ষা করবে।

কেয়ামতের ময়দানে নূরের মেম্বর স্থাপন করা হবে। সেই আসনে তারা সমাসীন থাকবে। কেয়ামতের ময়দানে মানুষ এত পেরেশান হবে, এত পেরেশান হবে যে, শুধু আমাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর অন্যান্য সকল নবীদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তারা বলবে ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী অর্থাৎ, হায় আমার কী উপায় হবে? হায় আমার কী উপায় হবে? এরকম ভয়াবহ এবং বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যেও তারা নূরের মেম্বরের উপরে সমাসীন থাকবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা কোন নবী হবেন না, জেহাদের ময়দানে যারা জীবন উৎসর্গ করে সেই শাহীদও তারা নন, অথচ তাদের এই মর্যাদা। এই মর্যাদা দেখে নবী এবং শহীদগণ ঈর্ষা করতে থাকবেন।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ-এর আর একটা বিশেষ ফযীলত হল– হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اِنَّ رَجُلًا زَارَ اَخًا لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى، فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا اَتٰى عَلَيْهِ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِيْ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ لَا غَيْرَ اَنِّيْ اَحْبَبْتُهُ فِى اللّٰهِ. قَالَ فَاِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ. (رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب برقم ٦٧١٤)

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি অন্য এক বসতীতে তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হল। আল্লাহ তাআলা তার গমন পথে একজন ফেরেশতাকে অপেক্ষমান রাখলেন। লোকটি সেখানে পৌঁছলে ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ? সে বলল, এই গ্রামে আমার এক ভাই আছে, তার সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, তার প্রতি তুমি কোন অনুগ্রহ করেছ কি, যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ? লোকটি বলল, না। আমি তাকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাস।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ-এর আর একটা বিশেষ ফযীলত হল– হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ পরস্পরে একসাথে জান্নাতে থাকবে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– হযরত হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে,

اِنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ مَا اَعْدَدْتَّ لَهَا؟ قَالَ مَا اَعْدَدْتُّ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلٰوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ. وَلٰكِنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ. قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ. (متفق عليه– البخاري برقم ٦١٧١ ومسلم برقم ٦٨٨٣)

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ইয়া রসূলাল্লাহ! কেয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, আমি তার জন্য কিছুই প্রস্তুতি নেইনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে।

আর এক রেওয়ায়েতে আছে– বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন, ইসলামের পর মুসলমানদেরকে আমি এতটা খুশী হতে দেখিনি, যতটা তারা এ কথা শুনে খুশি হয়েছিলেন।

মুসলিম শরীফের অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে,

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَرٰى فِيْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ. (رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب برقم ٦٨٨٨)

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে তার কখনও সাক্ষাত হয়নি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে ব্যক্তি তাদের সাথেই থাকবে যাদেরকে সে ভালবাসে।

অতএব আল্লাহর রসূলের সাথে আমাদের ভালবাসা থাকলে আল্লাহর রসূলের সাথে আমরা থাকতে পারব, অর্থাৎ, জান্নাতে রসূলের সঙ্গ লাভ করতে পারব, সাহাবীদের সাথে আমাদের ভালবাসা থাকলে সাহাবীদের সাথে আমরা থাকতে পারব, আল্লাহর ওলীদের সাথে আমাদের ভালবাসা থাকলে আল্লাহর ওলীদের সাথে আমরা থাকতে পারব, মুত্তাকী-পরহেযগার লোকদের সাথে আমাদের ভালবাসা থাকলে মুত্তাকী-পরহেযগারদের সাথে আমরা থাকতে পারব। যাদের সাথে আমাদের ভালবাসা থাকবে তাদের সাথে আমরা থাকতে পারব।

হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ-এর এই ৬টি বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণনা করা হল। সারকথা হল–

১. হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ দ্বারা ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়।
২. হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ একটা শ্রেষ্ঠ আমল।
৩. হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ দ্বারা কেয়ামতের দিন বিশেষ ছায়া লাভ হবে।
৪. হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ দ্বারা কেয়ামতের দিন নূরের মেম্বার লাভ হবে।
৫. হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের ভালবাসা লাভ হয়।
৬. প্রত্যেকের ভালবাসার ব্যক্তির সাথে তার জান্নাত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগ্‌যু ফিল্লাহ-এর মাকাম অর্জন করার তাওফীক দান করুন, আমাদের ভালবাসা অ-ভালবাসার সব চেতনা যেন আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং - ২৬

কুসংস্কার বর্জন প্রসঙ্গ

(১ম পর্ব)

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুই ধরনের দায়িত্ব দিয়েছেন। এক ধরনের দায়িত্বকে বলা হয় ঈমান। আরেক ধরনের দায়িত্বকে বলা হয় আমল অর্থাৎ, নেক আমল। এই দুই ধরনের দায়িত্বের মধ্যে ঈমান হল বুনিয়াদ বা ফাউণ্ডেশন। এই ফাউণ্ডেশনের উপরে দাঁড় হবে আমলের বিল্ডিং। ফাউণ্ডেশন যদি ঠিক না থাকে তাহলে তার উপর কোন বিল্ডিং ঠিকমত দাঁড় হতে পারবে না। কোন বিল্ডিংয়ের ফাউণ্ডেশন ঠিক না থাকলে সেই বিল্ডিং যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে। যে বিল্ডিং-এর ফাউণ্ডেশন ঠিক নেই, সে বিল্ডিং যত চাকচিক্যময় হোক, যত বেশী তলা বিশিষ্ট হোক কেউ সেই বিল্ডিং কে দাম দিবে না। বলবে এর ফাউণ্ডেশন ঠিক নেই, যে কোন সময় ধ্বসে পড়তে পারে। ফাউণ্ডেশন ঠিক থাকলে যতটুকুই থাকুক তার মূল্য আছে। তদ্রূপ ঈমান আর আমলের মধ্যে ঈমান হল ফাউণ্ডেশন আর আমল হল বিল্ডিং। যদি ঈমান ঠিক থাকে, তাহলে আমল যতটুকুই থাকুক তার মূল্যায়ন হবে। ঈমান ঠিক থাকবে না, আকীদা-বিশ্বাস ঠিক থাকবে না, তাহলে যত আমল-ই করা হোক আল্লাহর কাছে সেই আমলের কোন মূল্য নেই। ঈমান ঠিক না থাকলে আমলের কোন মূল্য নেই– একথাটিকে আল্লাহ তা'আলা একটা উদাহরণ দিয়ে এভাবে বুঝিয়েছেন–

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا.

(সূরা নূর: ৩৯)

অর্থাৎ, যারা কাফের, যাদের ঈমান ঠিক নেই, যাদের আকীদা-বিশ্বাস ঠিক নেই, তাদের আমল হল মরুভূমির মরিচিকার মত। যেটাকে পিপাসার্ত মানুষ দূর থেকে দেখে মনে করে কত যেন পানি। কিন্তু কাছে আসলে দেখতে পায় যে, কিছুই না।

এ আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বুঝাচ্ছেন যে, যারা কাফের, যাদের ঈমান ঠিক নেই, যাদের আকীদা-বিশ্বাস ঠিক নেই, তাদের আমলগুলো ওরকম মূল্যহীন। তারা যখন আমলের কাছে যাবে তখন কিছুই পাবে না অর্থাৎ, কেয়ামতের ময়দানে যখন তারা আমলের কাছে আসবে তখন দেখবে কিছুই নেই। শুধু দেখবে আল্লাহ বিচারক আছেন, কিন্তু তাদের আমল কিছুই নেই।

এজন্যই যারা কাফের, তারা দুনিয়াতে যত ভাল কাজই করুকনা কেন পরকালে তাদের নাজাত হবে না, অনন্তকাল তাদেরকে জাহান্নামে থাকতে হবে। অনেকের মনে সন্দেহ আসতে পারে যে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অ-মুসলমান বিধর্মীরা কত ভাল কাজ করে– সমাজ সেবা করে, মানুষের উপকার করে, দেশ ও জাতির কল্যাণে কত কাজ করে, তবুও তারা কিছুই পাবে না, তাদের ভাল কাজের পুরস্কার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে এটা কেমন কথা! তাহলে শুনুন– তাদের ভাল কাজের পুরস্কার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয় না। তারা ভাল যা কিছুই করে তার বদলা তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়। এজন্যই তুলনামূলকভাবে দুনিয়াতে মুসলমানদের চেয়ে বিধর্মীদের সুখ-শান্তি বেশী হয়। এই বেশিটা হল তাদের ভাল কাজের পুরস্কার। তারা যতটুকু ভাল কাজ করছে, তার বিনিময় তারা দুনিয়াতেই পেয়ে যাচ্ছে, যেহেতু পরকালে তারা কিছুই পাবে না। কুরআনে কারীমে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا.

অর্থাৎ, ইয়াহুদ নাসারাদের মধ্যে যারা কাফের এবং যারা মুশরিক তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে থাকবে। (সূরা বাইয়্যিনাহ: ৬)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যারা কাফের আল্লাহকে অস্বীকার করে কিংবা আল্লাহর সাথে শরীক করে, একাধিক খোদায় বিশ্বাস করে। তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। বর্তমান যুগের ইয়াহুদী খৃষ্টানরাও একাধিক খোদায় বিশ্বাস করে, অন্যান্য যত ধর্ম আছে সব ধর্মের লোকেরাই একাধিক খোদায় বিশ্বাস করে। হিন্দুরা তো ৩৩ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে। এরূপ একাধিক খোদায় বিশ্বাসীকে বলা হয় মুশরিক। এভাবে কাফের হোক মুশরিক হোক সকলকেই অনন্তকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। কোন দিনই কোন ভাবেই তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পারে না। কিন্তু কোন মুসলমান –যার ঈমান ঠিক আছে, যার আকীদা-বিশ্বাস ঠিক আছে– সে যদি আমলে ত্রুটি থাকার কারণে এবং পাপের পরিমাণ বেশী হওয়ার কারণে জাহান্নামে যায়ও, তবুও একদিন না একদিন শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যেতে পারবে। তাই ইসলামে আমলের চেয়ে ঈমান-আকীদার গুরুত্ব বেশী। আমলের ত্রুটি থাকলে একদিন না একদিন নাজাত পাওয়া যাবে, কিন্তু ঈমান ও আকীদা– বিশ্বাসে ত্রুটি থাকলে কোনদিন নাজাত হবে না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসকে দোরস্ত করার প্রতি জোর দিতেন। ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসে কোন ত্রুটি থাকলে সেটাকে সংশোধন করে দিতেন। তৎকালীন যুগে মানুষের মনে ঈমান ও সহীহ আকীদা-বিশ্বাস বিরোধী যেসব কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল, যে সমস্ত গলত আকীদা-বিশ্বাস মনের মধ্যে স্থান গেড়ে নিয়েছিল সেগুলি সংশোধন করে দিতেন, যাতে মানুষের নাজাতের রাস্তা ক্লিয়ার থাকে। এক হাদীছে এরকম কিছু বদ্ধমূল কুসংস্কার দূর করার জন্য তিনি বলেছেন,

لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ. (رواه الشيخان)

অর্থাৎ, রোগ সংক্রমনের ধারণা ঠিক নয়, পাখি দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের বিশ্বাস ঠিক নয়, পেঁচা সংক্রান্ত ধারণা ঠিক নয় এবং নক্ষত্র সম্পর্কিত ধারণা ঠিক নয়।

এ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত চারটা কুসংস্কার দূর করেছেন।

এক নম্বর কুসংস্কার হল– রোগ সংক্রমনের ধারণা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কু-সংস্কার দূর করার জন্য বললেন, রোগ সংক্রমনের ধারণা ঠিক নয়। রোগ সংক্রমনের বিশ্বাস

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রাখতে পারবে না। আমরা কিছু কিছু ব্যাধির ব্যাপারে বলি সংক্রামক ব্যাধি, কিন্তু এখানে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, রোগের মধ্যে নিজস্ব সংক্রমন ক্ষমতা নেই। ঐ ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন লোকের কাছে কেউ গেলে আল্লাহর ইচ্ছা হলে সে আক্রান্ত হয় নতুবা আক্রান্ত হয় না। তাই দেখা যায় আমরা যারা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন লোকের কাছে যাই তখন কেউ আক্রান্ত হই কেউ হই না। বুঝা গেল ঐ রোগের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার বা ছড়ানোর নিজস্ব ক্ষমতা নেই। নিজস্ব ক্ষমতা থাকলে যেই যেত সে আক্রান্ত হত।

এক বেদুঈন সাহাবী তিনি উট পালন করতেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন–

اَرَأَيْتَ الْبَعِيْرَ يَكُوْنُ بِهِ الْجَرْبُ فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا؟

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি দেখেছেন একটা উটের খোস-পাচড়া হয়, ফলে পালের সমস্ত উট আক্রান্ত হয়ে যায়।

তার এই প্রশ্নের মূল কথা ছিল একটার কারণে যখন পালের সবগুলো আক্রান্ত হয়, তাহলে কি করে বুঝব যে, রোগের মধ্যে সংক্রমন ক্ষমতা নেই? বরং এতে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় প্রথমটা থেকে বাকীগুলোর মধ্যে এ রোগ সংক্রমিত হয়েছে। এমনিভাবে আমরাও দেখি এক এলাকায় প্লেগ আসলে সেই এলাকার প্রায় গোটা মানুষ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই সাহাবীও ওরকম প্রশ্ন করলেন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্টা প্রশ্ন করলেন যে,

فَمَنْ اَجْرَبَ الْاَوَّلَ؟ (رواه ابن ماجة) قَالَ ذَالِكَ الْقَدَرُ

অর্থাৎ, এটা তাকদীরের কারণে হয়েছে। প্রথমটার খোস-পাচড়া এল কোত্থেকে?

অর্থাৎ, প্রথমটা কার কাছে গিয়েছে যে, সেটা আক্রান্ত হল? সাহাবী লা-জওয়াব হয়ে গেলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝাতে চাইলেন যে, প্রথমটার মধ্যে রোগ যেমন অন্য কোনটা থেকে সংক্রমিত হয়নি, বরং আল্লাহর ফয়সালাতেই হয়েছে, তদ্রূপ আক্রান্তের কাছে আসার পর যারা আক্রান্ত হয় তাদের রোগটাও আল্লাহর ফয়সালাতেই হয়। প্রথমটা যেমন আল্লাহর ফয়সালা থেকে হয়, পরবর্তীগুলোও আল্লাহর ফয়সালাতেই হয়ে থাকে। রোগের মধ্যে নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা নেই, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তবে কাজের মাধ্যমেও তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। এক হাদীছে এসেছে–

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِ مَجْزُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِى الْقَصْعَةِ. وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجة برقم ٣٩٢٧ وسنده ضعيف)

অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে নিজের সাথে বসালেন, তার সঙ্গে একসাথে খাবার খেলেন এবং বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা করে খাও।

এ ঘটনার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হননি। তবে হাঁ এখানে ঐসব লোকের ব্যাপারে ভয় আছে, যারা কোন কুষ্ঠ রোগীর কাছে বা যে কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের কাছে গেল, তার সাথে উঠা-বসা করল, তার সংস্পর্শে থাকল, তারপর যদি আল্লাহর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ফয়সালায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তবুও তাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে যে, রোগ সংক্রমনের ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে ভুল বলা হয়েছে, এই যে আমি গেলাম, ফলে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম! এভাবে তার ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্যই বলা হয়েছে যে, যার আকীদা-বিশ্বাসে যতদিন মজবূতি না আসে ততদিন এরকম রোগীর কাছে সে যাবে না। এরকম লোকদের ব্যাপারেই আর এক হাদীছে বলা হয়েছে,

فِرَّ مِنَ الْمَجْزُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْاَسَدِ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٩٧٢٠ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح)

অর্থাৎ, কুষ্ঠ রোগীর কাছ থেকে তুমি ভেগে যাও যেমন সিংহ দেখলে তুমি ভেগে থাক।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন দূর্বল ঈমান লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে। নতুবা তিনি নিজে তো কুষ্ঠ রোগীর সাথে এক সাথে বসে খেয়েছেন। যার ঈমান দূর্বল, তাকে যদি এখন-ই বলা হয় তুমি কুষ্ঠ রোগীর সাথে উঠা বসা শুরু করে দাও, তাহলে তার ঈমান-আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেটুকু ঈমান আছে সেটুকুও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই তার ঈমান-আকীদা রক্ষার জন্যই বলেছেন, তুমি কুষ্ঠ রোগীর সংস্পর্শে থেক না।

দেখা গেল সবার ব্যাপারে শরীয়তে এক নীতি গ্রহণ করা হয় না। কিছু কিছু আমল এমন আছে যা সকলকেই করতে হয়, তাতে কারও প্রতি কোন ছাড় নেই, কারও ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম নেই। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। এসব ফরয ওয়াজেবের ব্যাপারে কারও প্রতি কোন ছাড় নেই। কিন্তু আবার অনেকগুলো বিষয় এমনও আছে যার ভিতরে তারতম্যও করা হয়। যেমন দান-সদকা করলে সম্পদ বেড়ে যায়– একথা কুরআন হাদীছে বহু জায়গায় বলা হয়েছে। দান-সদকা করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কীভাবে বেড়ে যায়? অনেক সময় বরকত হয়, অনেক সময় বাস্তবেও সম্পদের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে। মোটকথা দান-সদকা করলে সম্পদ বেড়ে যায়, চাই কোয়ালিটি বাড়ুক বা কোয়ান্টিটি বাড়ুক। কিন্তু একজন মানুষ যার ঈমান মযবুত নয়, সে যদি দান-সদকা করলে সম্পদ বেড়ে যায়– এই ওয়াজ শুনে তার সব সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়, আর পরবর্তীতে আল্লাহর সাহায্য আসতে যদি একটু বিলম্ব হয়, –একটু বিলম্ব তো হতেই পারে– তাহলে বিলম্ব দেখে সেই লোকের তো ঈমানই নষ্ট হয়ে যেতে পারে যে, কৈ দান-সদকা করলে নাকি সম্পদ বাড়ে, এখন তো আমি না খেয়ে মরছি! হুজুরদের কথায় বরকত হবে শুনে সব দান করে দিলাম, কৈ আল্লাহ বরকত দেন কৈ! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক! এভাবে তার ঈমানই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্যই এ ধরনের দূর্বল ঈমান লোকদের সামনে সব আল্লাহর রাস্তায় দান করার ওয়াজ না করা চাই।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সবার ব্যাপারে এক নীতি অবলম্বন করতেন না। তাবূকের যুদ্ধের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর সব ধন-সম্পদ নিয়ে এলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন আবূ বকর! ঘরে কি রেখে এসেছো? তিনি বললেন, ঘরে শুধু আল্লাহ আল্লাহর রসূলকে রেখে এসেছি, আর কিছুই রাখিনি, সব নিয়ে এসেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করেছেন। আবার অন্য এক সাহাবী বলেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মসজিদে নববীর পাশে আমার যে একটা বাগান আছে, এই বাগানটা পুরো আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতে চাই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, না সব নেয়া হবে না। শেষ পর্যন্ত তার এক তৃতীয়াংশ নিয়েছেন। সবটা নেননি।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যাহোক, এক নম্বরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ সংক্রমন সম্পর্কে যে কু-সংস্কার ছিল তা দূর করলেন।

দুই নম্বর কুসংস্কার হল– পাখি দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কু-সংস্কার দূর করার জন্য বললেন, পাখি দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের ধারণা ঠিক নয়।

সেই যুগের মানুষ পাখি ছেড়ে দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করত। যে কোন কাজ করার শুরুতে একটা পাখি ছেড়ে দিত, পাখিটা যদি ডান দিকে উড়ে যেত, তাহলে তারা মনে করত এটা ভাল লক্ষণ। তখন তারা সেই কাজ করত। আর যদি পাখিটা বাম দিকে উড়ে যেত, তাহলে তারা মনে করত এটা খারাপ লক্ষণ। তখন তারা সে কাজ করত না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ধারণা ঠিক নয়। একটা পাখি ডান দিকে বা বাম দিকে উড়ে গেল তার সাথে ভাল-মন্দের কী সম্পর্ক? পাখি তো গায়েব জানে না। সে লোকটার সেই কাজে মঙ্গল হবে না অ-মঙ্গল হবে পাখি তা কী করে জানবে?

এই যুগেও পাখি ভাগ্য নির্ণয় করতে পারে বলে কিছু লোকের বিশ্বাস রয়েছে। দেখা যায় রাস্তার পাশে একজন কয়েকটা টিয়া পাখি নিয়ে বসে আছে। সামনে অনেকগুলো খাম রয়েছে। খামগুলোর মধ্যে গদ বাধা কিছু কথা লেখা আছে। কেউ নিজের ভাগ্য জানতে চাইলে নির্ধারিত ফী দিলে টিয়া পাখির মালিক পাখিটাকে খামের উপর ছেড়ে দেয়। তখন পাখিটা কোন একটা খাম ঠোঁট দিয়ে তুলে আনে। সেই খামের মধ্যে যা লেখা আছে সেটাই নাকি ঐ লোকের ভাগ্য। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক! টিয়া পাখি মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে কোত্থেকে জানতে পেল? লক্ষ কোটি মানুষের লক্ষ কোটি রকমের ভাগ্য, ঐ সীমাবদ্ধ কয়েকটা খামের গদবাধা কথায় লক্ষ কোটি মানুষের ভাগ্যের বর্ণনা কী করে আসতে পারে? এটা ঈমান বিরোধী ধারণা, এটা ঈমান বিরোধী কু-সংস্কার। টিয়া পাখি গায়েব জানে না। কোন পাখিই গায়েব জানে না। গ্রাম দেশে দেশে দেখা যায় হলুদ রংয়ের এক ধরনের পাখি আছে, অনেক এলাকায় সেটাকে বলা হয় কুটুম পাখি। যখন সেই পাখি বাড়ির উপর দিয়ে ডাক দিয়ে যায়, তখন অনেকে বলে, আজ কুটুম বা অতিথি আসবে, আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসবে। কুটুম পাখি কি গায়েব জানে? আমি নিজে বহুবার পরীক্ষামূলকভাবে লক্ষ্য রেখেছি এই পাখি ডেকে যাওয়ার পরও সেই দিন কোন অতিথি বেড়াতে আসেনি।

যাহোক, দুই নম্বরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাখি সম্পর্কে যে কু-সংস্কার ছিল তা দূর করলেন।

তিন নম্বর কুসংস্কার হল– পেঁচা সংক্রান্ত ধারণা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কু-সংস্কার দূর করার জন্য বললেন, পেঁচা সংক্রান্ত ধারণা ঠিক নয়।

পেঁচা অর্থাৎ, ভুতুম পেঁচা সম্পর্কে জাহেলী যুগে ধারণা ছিল যে, কাউকে যদি হত্যা করা হয় আর ঐ হত্যার প্রতিশোধ নেয়া না হয়, তাহলে সেই নিহত ব্যক্তির আত্মা পেঁচার আকৃতি নিয়ে দুনিয়াতে আসে। এসে তার সুরে ডাকতে থাকে যে, আমাকে রক্ত পান করাও, রক্ত পান করাও অর্থাৎ, রক্তের প্রতিশোধ নাও। যতদিন হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া হয়, ততদিন তার আত্মা তৃপ্তি লাভ করতে পারে না, ফলে সে এভাবে ডাকতে থাকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধারণা খণ্ডন করে বলেছেন যে, পেঁচা সংক্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত, এটা কু-সংস্কার। আমাদের মধ্যেও এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, যতদিন হত্যার বদলা না নেয়া হয় ততদিন নিহত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পায় না। এই

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ধারণা ঠিক নয়, বরং যে ব্যক্তি মাজলুমভাবে নিহত হয়, তার আত্মা তো খুব শান্তিতে থাকে। যেহেতু সে শহীদের মর্যাদা পায়। যদিও পরিভাষায় তাকে শহীদ বলা হয় না, কেননা, পরিভাষায় শহীদ বলা হয় একমাত্র সেই ব্যক্তিকে যে জেহাদে যেয়ে কাফেরদের সাথে লড়াই করে নিহত হয়। এছাড়াও আরও বেশ কয়েক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা পরিভাষায় শহীদ না হলেও তারা শাহাদাতের মর্যাদা পান। কেউ যদি মজলুমভাবে নিহত হয়, কেউ যদি পেটের পিড়ায় মারা যায়, কেউ যদি দেয়াল চাপা পড়ে বা গাড়ী চাপা পড়ে মারা যায়, কেউ যদি মহামারিতে মারা যায়, এসব শ্রেণীর লোকেরাও শহীদের মর্যাদা পায়। অতএব তাদের আত্মা খুব শান্তিতে থাকে। কারণ, তারা আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মর্যাদা পাচ্ছে, অনেক উঁচু মর্যাদা পাচ্ছে। উঁচু মর্যাদায় থেকে অশান্তিতে থাকার কথা নয়। আর যদি কেউ জেহাদে শাহাদাত বরণ করে, তাহলে তার আত্মা তো অবশ্যই শান্তিতে থাকে। তার হত্যার বদলা নেয়া হল কি হলনা এজন্য তার আত্মা অতৃপ্ত থাকবে– এরকম কোন বর্ণনা কুরআন হাদীছে নেই; বরং উল্টোটা রয়েছে যে, তাদের আত্মা শান্তিতে থাকে।

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ. (সূরা আলে ইমরান: ১৭০)

অর্থাৎ, শহীদগণ আল্লাহর কাছে যে নাজ-নেয়ামত ও শান্তির উপকরণ পায় তা নিয়ে তারা খুব আনন্দিত থাকে।

কাজেই এখন যদি এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, কারও হত্যার বদলা না নেয়া হলে তার আত্মা অতৃপ্ত থাকবে, এটা কুরআন হাদীছে যে আকীদা-বিশ্বাস দেয়া হয়েছে তার পরিপন্থী।

তদুপরি কারও আত্মা দুনিয়াতে আসে এসে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ডাকে একথা মানতে হলে কুরআন-হাদীছের প্রমাণ ছাড়া মানা যাবে না। আর এরকম কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীছে নেই। এটা জাহেলী যুগের ধারণা। জাহেলী যুগের লোকেরা মনে করত যে, নিহত ব্যক্তিদের আত্মা দুনিয়াতে আসে। আমাদের অনেকের মধ্যেও এর কাছাকাছি ধারণা রয়েছে। গ্রাম গঞ্জের কেউ কেউ বলে যে, রাতের বেলা ঘরের বাইরে পানি ফেল না, মৃতদের আত্মা এসে ঘোরা ফেরা করে, পানি ফেললে তাদের গায়ে পানি পড়বে। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক!) তারা বলে যে, মরে যাওয়ার পর মুরব্বীদের আত্মা পরিবারের খোঁজ খবর নিতে আসে। অথচ কুরআন-হাদীছে এর কোন প্রমাণ নেই। কুরআনে কারীমে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, একবার যে যায় সে আর ফিরে আসে না। কাজেই স্বশরীরেও কেউ দুনিয়াতে ফেরত আসে না, কারও আত্মাও ফিরে আসে না। বিশেষ বিশেষ দিন বা বিশেষ বিশেষ রাত হোক যেমন শবে বরাতে হোক, আশুরার দিনে হোক, লাইলাতুল কদরে হোক, কোন সময়-ই কোন আত্মা দুনিয়াতে ফেরত আসে না। কোন আত্মা দুনিয়াতে ফেরত আসে বলে কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীছে নেই। কাজেই এরূপ বিশ্বাস রাখা কু-সংস্কার, এরূপ বিশ্বাস ঈমান-আকীদা পরিপন্থী। এসব ধারণা থেকে বিরত থাকা চাই।

যাহোক বলা হচ্ছিল যে, নিহত ব্যক্তির আত্মা পেঁচার আকৃতি নিয়ে দুনিয়াতে এসে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আহবান জানাতে থাকে, এ বিশ্বাস জাহেলী যুগের বিশ্বাস, এটা কু-সংস্কার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধারণা খণ্ডন করেছেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমাদের দেশেও পেঁচা সম্পর্কে বিভিন্ন রকম কু-সংস্কার রয়েছে। অনেকে মনে করে– ভুতুম পেঁচা ডাকার অর্থ কোন মহামারী বা মড়কের ইংগিত। তাই ভুতুম পেঁচা ডাকলে অনেকে আশংকা বোধ করে না জানি আমাদের কে মারা যায়। পেঁচা সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত উক্তি এ ধারণাকেও খণ্ডন করে। কারণ, জাহেলী যুগেও পেঁচা সম্পর্কে এরূপ ধারণা ছিল। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কথায় বলে দিয়েছেন যে, পেঁচা সম্পর্কিত ধারণা ঠিক নয়। ভবিষ্যতে কি বিপদ আসবে বা আসবেনা তা পাখি জানে না। পাখি ভবিষ্যত জানে না। পাখি তো আপন মনে ডেকে যাচ্ছে বা তার নিজের ভাষায় তার মনের কথা ব্যাক্ত করছে, আর আমরা মনে করে বসছি যে, সে মহামারির ভবিষ্যদ্বাণী শুনাচ্ছে। পাখির ডাক শুনে এরূপ কুলক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কোন কিছু থেকেই কু-লক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কে আগামী জুমুআয় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

যাহোক, তিন নম্বরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেঁচা সম্পর্কে যে কু-সংস্কার ছিল তা দূর করলেন।

চার নম্বর কুসংস্কার হল– নক্ষত্র সম্পর্কিত ধারণা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কু-সংস্কার দূর করার জন্য বললেন, নক্ষত্র সম্পর্কিত ধারণা ঠিক নয়।

নক্ষত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক কিছু ঘটে, রৌদ্র হওয়া না হওয়া, বৃষ্টি হওয়া না হওয়া, গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটা ইত্যাদি অনেক ধারণা-বিশ্বাস আগের যুগে ছিল এ যুগেও তার কিছু কিছু রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বললেন, গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত এসব ধারণা ঠিক নয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের এসমস্ত বিষয় বিশ্বাস করতে পারবে না। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُوْمِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ الْكُفْرِ. (كذا في الإتحاف للزبيدي)

অর্থাৎ, জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটা কথা বিশ্বাস করা একটা কুফ্‌রী কথা বিশ্বাস করা। অতএব জ্যোতিষ শাস্ত্রের যতটা কথা বিশ্বাস করা হবে ততটা কুফ্‌রী কথা বিশ্বাস করা হবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব কু-সংস্কার ও কুফ্‌রী থেকে হেফাজত করেন। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে আগামী জুমুআয় আরও কিছু আলোচনা পেশ করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং - ২৭

কুসংস্কার বর্জন প্রসঙ্গ

(২য় পর্ব)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় কু-সংস্কার বর্জনের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল মানুষ ঈমান ও ইসলাম আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীতে যে সমস্ত কুসংস্কারের মধ্যে লিপ্ত, যে সমস্ত কুসংস্কার মূলক ধ্যান-ধারণা সংশধোন করার উপরে ইসলামে বিশেষভাবে তাকীদ দেয়া হয়েছে। এজন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে যাতে মানুষের ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস সহীহ হয়ে যায়। যদি ঈমান সহীহ না হয়, যদি আকীদা-বিশ্বাস সহীহ না হয়, তাহলে মানুষের কোন আমল কবূল হয় না। ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস হল আমলের বুনিয়াদ। যদি ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস দোরস্ত না হয়, তাহলে বুনিয়াদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমল বরবাদ হয়ে যায়, আমলের কোন মূল্য থাকে না। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে আমাদের মনের মধ্যে যেসব কুসংস্কার মূলক ধ্যান-ধারণা আছে সেগুলো খণ্ডন করছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিভিন্ন হাদীছে সেগুলো খণ্ডন করেছেন। গত জুমুআয় একটা হাদীছ বয়ান করা হয়েছিল, যার মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটা কু-সংস্কার সম্বন্ধে খণ্ডন আরোপ করেছেন। এক হল– রোগ সংক্রমনের ধারণা ঠিক নয়, দুই হল– পাখি দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের ধারণা ঠিক নয়। তিন হল– পেঁচা সম্পর্কিত ধারণা ঠিক নয়। চার হল– নক্ষত্র সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ঠিক নয়। গত জুমুআয় এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যাও পেশ করা হয়েছিল।

গত জুমুআয় এ হাদীছের ব্যাখ্যায় একথাও আলোচনা করা হয়েছিল যে, আমাদের মধ্যেও এসব কু-সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা রয়েছে। আসলে আগের যুগের কু-সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণার অনেকটাই আমদের মধ্যে এখনও দেখা যায়। হাদীছেও এসেছে– রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. (رواه الترمذي برقم ٢١٨٠ وقال : حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, ঐ সত্তার কছম যার হাতে আমার জীবন! অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্যান-ধারণার অনুসরণ করবে।

এখানে বোঝানো হয়েছে– এই উম্মতের উপর আগের যুগের ধ্যান-ধারণার প্রভাব পড়বে। অনেক ক্ষেত্রে হুবহু পড়বে। এ রেওয়ায়েতে এসেছে– একটা জুতা যেমন আরেকটা জুতার মত হুবহু

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হয়ে থাকে, এরকম হয়ে যাবে। আগের যুগের মানুষের মধ্যে যেমন ধ্যান-ধারণা ছিল, এই যুগের মানুষের মধ্যেও তেমন ধ্যান-ধারণা দেখা যাবে।

তাই দেখা যায় এখনও আগের যুগের মত আমাদের মধ্যে রোগ সংক্রমনের ধারণা বহাল রয়েছে। এখনও আগের যুগের মত নক্ষত্র বিদ্যায় ও ফোলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমরা বিশ্বাস করে চলছি, এখনও আমরা গণকের কথায় বিশ্বাস করি, এখনও আমরা জ্যোতিষীদের দিয়ে ভাগ্য যাচাই করে তাদের কথায় বিশ্বাস করে চলছি। দেখা গেল এখনও আগের যুগের মত ধ্যান-ধারণা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আগের যুগের মানুষ যেমন মনে করত পাখি গায়েব জানে, সেজন্য পাখি দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করত, এখন এই যুগেও আমরা মনে করে চলেছি যে, পাখিরা গায়েব জানে। সেজন্য এখনও আমরা টিয়া পাখি দিয়ে ভাগ্য যাচাই করাই, কুটুম পাখি বাড়ির উপর দিয়ে ডেকে গেলে মনে করি অতিথি আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী জানিয়ে যাচ্ছে, ভুতুম পেঁচা ডাকলে মনে করি মহামারী বা বিপদাপদের সংবাদ শোনাচ্ছে, চড়ুই পাখিকে বালিতে গোসল করতে দেখলে মনে করি বৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছে, কুকুর হু--- করে লম্বা ডাক দিতে থাকলে মনে করি কী যেন বিপদের আগাম সংবাদ জানাচ্ছে! অথচ এগুলি সবই অমূলক ধ্যান-ধারণা, এগুলি সবই কু-সংস্কার। টিয়া পাখি, চড়ুই পাখি বা কোন পাখি গায়েব জানেনা, কুকুর বা কোন প্রাণী গায়েব জানে না। এমনকি জিনরাও গায়েব জানে না।

আমাদের মধ্যে অনেকের এই ধারণা রয়েছে যে, জিনরা গায়েব জানে। তাই চল অমুকের ঘাড়ে জিন এসেছে তাকে বিভিন্ন জিনিস জিজ্ঞাসা করি, অমুকটা কোথায় আছে, এটা কি হয়েছে, অমুকে কোথায় আছে? ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে দেখি। অথচ জিনেরা গায়েব জানে না। জিনেরা গায়েব জানে এরকম ধারণা সেই আগের যুগেও ছিল এখনও রয়েছে। অথচ জিনরা গায়েব জানে না।

জিনেরা যে গায়েব জানে না কুরআন শরীফে তার একটা বর্ণনা যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা শুনুন। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর ঘটনা আমরা অনেকেই জানি। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করছিলেন এবং এই সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ জিনরা করেছিল। জিন হযরত সুলাইমান (আ.)-এর অনুগত ছিল, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর হুকুম মত তারা সব করতে বাধ্য থাকত। যখন নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে, আর বছর খানেক কাজ হলে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই সময় হযরত সুলাইমান (আ.)-এর কাছে ওহী আসল যে, আপনার মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে। হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন, এই বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ আমার পিতা হযরত দাউদ (আ.) শুরু করেছিলেন, আমার যুগে প্রায় সমাপ্ত হয়ে আসছে, এখন যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে এই কাজটা অসমাপ্ত থেকে যাবে, আমার মৃত্যু ঘটলে জিনেরা অবশিষ্ট কাজ আর করবে না। আল্লাহর কাছে তিনি সুপারিশ করলেন যে, আমার যদি মৃত্যু ঘটে যায়, তাহলে আমার দেহটা যেন লাঠিতে ভর করে টিকে থাকে যেভাবে আমি এখন লাঠিতে ভর করে আছি। আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দুআ কবূল করলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহটা সেভাবেই লাঠির উপর ভর করা অবস্থায় থাকল যেভাবে তিনি সিংহাসনে লাঠিতে ভর করে বসে ছিলেন। জিনেরা মনে করছিল, তিনি জীবিত বসে আছেন। কাছে গিয়ে যাচাই করার মত সাহসও কারও ছিল না। তাই তারা নির্মাণ কাজ চালিয়ে যেতে থাকল। এদিকে উই পোকা ধীরে ধীরে লাঠির একটা অংশ খেয়ে ফেলল। অবশেষে এক বৎসরের মাথায় বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজও শেষ হল, লাঠিটাও পড়ে গেল, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দেহও বসা অবস্থা থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন জিনদের সামনে প্রকাশ পেল যে, হযরত সুলাইমান (আ.) বহু পূর্বেই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ইন্তেকাল করে গেছেন। জিনদের নিজেদেরও দাবী ছিল যে, তারা গায়েব জানে। এ ঘটনায় তাদের কাছেও প্রমাণ হল যে, তাদের গায়েব জানার দাবী সত্য নয়। সত্য হলে তারা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ও টের পেত এবং এই এক বৎসর নির্মাণ কাজের কষ্ট তারা করত না। কুরআন শরীফে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ. (সূরা সাবা: ১৪)

অর্থাৎ, যখন সুলাইমানের মৃত্যু হয়ে গেল, উই পোকাই তাঁর মৃত্যুর বিষয় জানিয়ে দিল। তখন জিনদের সামনে তাদের গায়েব জানার দাবীর হাকীকতও প্রকাশ পেল যে, তারা যদি গায়েব জানত, তাহলে এই লাঞ্ছনাকর কষ্টে তারা থাকত না।

এ ঘটনায় পরিষ্কার বোঝা গেল জিনেরা গায়েব জানে না। যদি জিনেরা গায়েব জানত, তাহলে এক বছর আগেই তারা জানতে পারত যে, সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যু হয়ে গেছে। কিন্তু তারা জানতে বুঝতে পারেনি। কুরআন শরীফে পরিস্কার বলা হয়েছে।

অতএব কোন মানুষের ঘাড়ে জিন আসলে বা কেউ জিন হাজির করলে সেই জিনের কাছে গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করা উচিৎ নয়। এই জিজ্ঞাসা করার দ্বারা এটাই বোঝা যাবে যে, জিনেরা গায়েব জানে বলে আমরা বিশ্বাস করি। যদি কখনও দেখা যায় যে, জিনেরা না দেখা কোন বিষয় বলে দিয়েছে আর তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে তারা যেহেতু সর্বত্র চলাফেরা করতে সক্ষম তাই তারা হয়তো সে বিষয়টা দেখেই বলেছে। নতুবা তারা গায়েব জানে না। যদি তারা গায়েব জানতই তাহলে তাদের কোন সংবাদ কখনও মিথ্যা প্রমাণিত হতনা। অথচ জিনদের বলা অনেক কথাই অনেক সময় মিথ্যাও প্রমাণিত হয়।

যাহোক কোন পাখি গায়েব জানে না, কোন প্রাণী গায়েব জানে না, কোন জিন গায়েব জানে না, কোন মানুষও গায়েব জানে না। অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন লোক হুজুরদের কাছে এসে বলে, হুজুর! আমার কী হয়েছে একটু দেখে বলুন তো। আমার এই সমস্যা সেই সমস্যা, এই বিপদ সেই বিপদ, একটু দেখে বলুনতো আমার কি হয়েছে, কেউ ক্ষতি করেছে কিনা বা কি হয়েছে। তারা মনে করে কামেল হুজুররা গায়েব জানেন, পীর সাহেবরা গায়েব জানেন। অথচ কোন হুজুর গায়েব জানেন না, কোন পীর সাহেব গায়েব জানেন না। কোন হুজুর সাহেব বা কোন পীর সাহেব বা কোন শ্রেণীর মানুষ গায়েব জানে– এই বিশ্বাস রাখা শিরক পর্যায়ের গোনাহ।

কোন মানুষ –তা সে যত কামেল পর্যায়েরই হোক সে– কোন গায়েব জানে না। এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গায়েব জানতেন না। কুরআন শরীফে পরিস্কার করে একথা বলা আছে। এক আয়াতে এসেছে–

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ. (সূরা নাম্‌ল: ৬৫)

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও, আসমান যমীনের গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গায়েব জানে না। এমনকি কোন নবী রসূলও গায়েব জানতেন না। এমনকি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গায়েব জানতেন না।

কেউ কেই বলে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন। যদি বলা হয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন, তাহলে বলতে হবে ওহুদের ময়দানে যে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন, ৭০ জন আহত হয়ে গেলেন, তাও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই জানতেন। তাহলে কীকরে তিনি জেনে শুনে এতজন সাহাবীকে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিলেন? তাহলে বলতে হবে তিনি জেনে শুনে এতগুলো সাহাবীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন, এটা ঐ সাহাবীদের প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দয় আচরণ হয়েছে। নাউযু বিল্লাহ! বীরে মাউনার ঘটনায় ৭০ জন সাহাবীকে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানলে এই সাহাবীদেরকে পাঠালেন কেন? যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ আরোপ করা হয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশান হয়ে গেছেন, হযরত আয়েশা (রা.)কে বলেছেন, তুমি আমার থেকে পৃথক থাক যতদিন তোমার সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে প্রকৃত ঘটনা কি তা না জানান। যদি তিনি গায়েব জানতেন, তাহলে তো বলে দিতেন যে, এটা মিথ্যা অপবাদ, যাকে জড়িয়ে এই কথা রটানো হচ্ছে সে লোক নির্দোষ, আয়েশাও নির্দোষ। তিনি গায়েব জানলে তা বললেন না কেন? তিনি গায়েব জানলে লোকদেরকে মিথ্যা রটিয়ে পরিবেশ নষ্ট করার সুযোগ দিলেন কেন? তিনি গায়েব জানলে নিজে পেরেশান হলেন কেন? তিনি গায়েব জানলে আয়েশাকে পৃথক করে দিয়ে এভাবে কষ্ট দিলেন কেন? এসব ঘটনায় স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব তথা না দেখা বিষয় বা অদৃশ্য বিষয় কিংবা ভবিষ্যত বিষয় জানতেন না।

হ্যাঁ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে দুই একটি ঘটনা এমনও ঘটেছে যাতে দেখা যায় তিনি না দেখা বিষয় সম্পর্কে বা ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু তথ্য বলেছেন। যেমন মুতার যুদ্ধের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে বলছিলেন, মুসলমানদের সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেছা পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল, সে জেহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে বললেন যে, মুসলমানদের পরবর্তী সেনাপতি জাফর ইবনে আবী তালেব আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল, সেও জেহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে বললেন, মুসলমানদের পরবর্তী সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল, সেও জেহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। এখন তলোয়ার হাতে নিয়েছে আল্লাহর এক তলোয়ার খালেদ ইবনে ওলীদ। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করবেন। তিনি মদীনার মেম্বরে বসে এ কথাগুলো বলছিলেন, তিনি মুতার যে ময়দানে জেহাদ হয়েছিল সে ময়দানে উপস্থিত ছিলেন না। তবুও তিনি এই নেতাদের শাহাদাতের খবর বলে দিয়েছেন। ওহীর মাধ্যমে জেনে তিনি একথাগুলো বলেছেন।

এভাবে আরও বেশ কিছু গায়েবের বিষয় তিনি বলেছেন। এটা হল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর কাছে ওহী আসত। ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে কোন কোন ভবিষ্যতের ঘটনা আল্লাহ জানিয়ে দিতেন, সেই সুবাদে তাঁরা কোন কোন না দেখা বিষয়ও বলে দিয়েছেন, কোন কোন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীও

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

করেছেন। কিন্তু তাঁরা সেটা নিজেদের গায়েব জানার শক্তি বলে নয়, গায়েব জানতেন এই সুবাদে নয়, তাঁদের মধ্যে ভবিষ্যত জানার নিজস্ব ক্ষমতা ছিল এই হিসেবে নয়। এমনিভাবে ওলী আউলিয়ার অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বিষয়ের কাশ্‌ফ হয়, তাদের অন্তরে কোন কোন বিষয় উদয় হয়ে যায়, অনেক সময় ভবিষ্যতের বিষয়ও উদয় হয়ে যায়, এটাকে গায়েব জানা বলা হয় না। নবীগণ ওহীর মাধ্যমে এবং ওলীগণ কাশ্‌ফের মাধ্যমে কিছু কিছু না জানা বিষয় যা বলেছেন, সেগুলোকে বেশীর থেকে বেশী আংশিক অদৃশ্যের খবর বলা যায়, তাও স্বেচ্ছা নির্ভর নয়। স্বেচ্ছায় এবং সামগ্রিকভাবে গায়েব জানার ক্ষমতা বা ভবিষ্যতের কোন বিষয় জানার ক্ষমতা না কোন ওলীর মধ্যে আছে না নবীর মধ্যে আছে।

অতএব বলতে হবে দুই চারাটা গায়েবের খবর যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তা আল্লাহ পাক তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন তাই বলেছেন। যদি কুরআন হাদীছে এরকম স্পষ্টভাবে কোন বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবী আলাইহিস সালাম গায়েবের অমুক বিষয়টা বলেছেন, তাহলে সে ব্যাপারে আমরা বলব যে, তিনি ওহীর মাধ্যমে সেটা অবগত হয়ে বলেছেন, নিজের গায়েব জানার সুবাদে বলেননি। অতএব কুরআন হাদীছে যেটার ব্যাপারে প্রমাণ নেই এরকম কোন বিষয় সম্পর্কে বলা যাবেনা যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক গায়েব জানতেন বা জানেন।

এক শ্রেণীর মানুষ যারা বলে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন। তারা বলেন, মিলাদের সময় দুরূদ শরীফ পড়া হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পারেন, যেহেতু তিনি গায়েব জানেন এবং জানতে পেরে উক্ত মজলিসে হাজির হয়ে যান। তাই মীলাদ মাহফিলে দুরূদ শরীফ পাঠ করার সময় কেয়াম করতে হবে অর্থাৎ, দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানোকে আরবীতে বলে কেয়াম করা। এজন্যই তারা মিলাদ মাহফিলে দুরূদ শরীফ পড়ার সময় কেয়াম করে থাকে। এটা এই বিশ্বাস থেকে এসেছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না।

যদি কুরআন হাদীছে এমন কোন স্পষ্ট বর্ণনা থাকত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে দুরূদ শরীফ পড়া হলে গায়েব জানার সুবাদে তিনি তা জানতে পারেন এবং তিনি হাজির হয়ে যান, তাহলে এ বিষয়টা আমরা মেনে নিতাম। কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। বরং উল্টো প্রমাণ আছে যে, দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজির হন না বরং নির্ধারিত ফেরেশতাগণ তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে দেন। নাসায়ী শরীফের এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِى السَّلَامَ. (رواه النسائي في سننه في كتاب الافتتاح)

অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক একদল ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন তারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে আমার উম্মতের দুরূদ সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেন।

এ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে দুরূদ সালাম পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে, তিনি হাজির হয়ে দুরূদ সালাম গ্রহণ করেন তা বলা হয়নি।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যাহোক যে কথা বলছিলাম পাখি গায়েব জানে না, জিনরা গায়েব জানে না, মানুষ গায়েব জানে না, এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও গায়েব জানেন না। গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। পাখি গায়েব জানে, জিনেরা গায়েব জানে, মানুষ গায়েব জানে– এগুলো ঈমান-আকীদা পরিপন্থী ধারণা, এগুলো কু-সংস্কার।

আমাদের সমাজে আরও অনেক রকম কু-সংস্কার রয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেক কিছু থেকে কু-লক্ষণ গ্রহণ করার প্রবনতা রয়েছে। অথচ কোন কিছু থেকেই কু-লক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কোন কিছু থেকে কু-লক্ষণ গ্রহণ করা কু-সংস্কার। কেউ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় হোঁচট খেল, ব্যাস মনে করল আজকের যাত্রা অশুভ। কেউ ঘর থেকে বের হয়েই কোন নারী দেখল বা মেথর দেখন বা কাল কলসি দেখল বা পেছন থেকে কেউ ডাক দিল, ব্যাস মনে করল আজকের যাত্রা অশুভ। কেউ কোথাও যাত্রা শুরু করেছে, সেই মুহূর্তে কেউ হাচি দিল, ব্যাস মনে করে বসল আজকের যাত্রা খারাপ, কাজ হবে না। কারও চোখ ফড়কাল, ব্যস মনে করল কোন বিপদ আছে। ঘরে মাকড়সায় জাল বাধল, ব্যস মনে করল এবার ঋণগ্রস্ত হওয়ার পালা। কেউ ঝাড়ু দেয়ার সময় কারও শরীরে সেই ঝাড়ুর ছোয়া লাগল, ব্যস মনে করল তার শরীর শুকিয়ে যাবে। কোন বাড়িতে কোন বাচ্চা মারা গেল আর অন্যরা মনে করল সেই বাড়িতে গেলে তার বাচ্চাও মারা যাবে। দোকান খুলে প্রথমেই কেউ বাকী চাইল, ব্যস মনে করল শুরুতেই বাকী দিলে সারাদিন ফাকি যাবে। এগুলি কুসংস্কার। আমি বিসমিল্লাহ বলে বের হব, তাহলে আমার বের হওয়ার ভিতরে বরকত হবে। বের হয়ে হোচট খেলাম বা কি দেখলাম তাতে কোন অমঙ্গল হওয়ার কোন ইংগিত নেই। হোঁচট খেলাম বা আমার সামনে কি ঘটল বা না ঘটল– এগুলি দৈব ব্যাপার। এতে যাত্রাকারীর কোন ইচ্ছার দখল নেই। এতে অমঙ্গল হবে বা যাত্রা অশুভ হবে–এরূপ ধারণা কু-সংস্কার। যে ব্যাপারে আমি দায়ী নই, তার কারণে আমার অমঙ্গল ঘটানো হবে কেন? যুক্তিগত ভাবেও এটা ঠিক বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। মরা বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চা মারা যাবে একথা ভুল। মৃত্যু কারও আগেও আসে না, পরেও আসে না, নির্ধারিত সময়েই আসে। দোকান খুলে শুরুতেই বাকী দিলে সারাদিন ফাকি যাবে না। বরং হতে পারে আল্লাহর এক বান্দাকে বাকী দিয়ে উপকার করার ওছীলায় সারাদিন তার ব্যবসায় বরকত হবে। এক চিরুনীতে দুজন চুল আচড়ালে তাদের মধ্যে ঝগড়া লাগবে মনে করাও কু-সংস্কার।

এটা হলে যাত্রা শুভ, ওটা হলে যাত্রা অশুভ, অমুক দিনক্ষণ ভাল, অমুক দিনক্ষণ মন্দ, অমুক দিন বিবাহ নাস্তি, অমুক দিন যাত্রা নাস্তি– এগুলো কুরআম হাদীছ বিরোধী ধ্যান-ধারণা, এগুলি কু-সংস্কার। হিন্দুদের সংস্পর্শে থেকে এবং হিন্দুদের পঞ্জিকা থেকে মুসলমানদের মধ্যে এসব কু-সংস্কার এসেছে। এক যুগে হিন্দুরা পঞ্জিকা লিখত, তার ভিতরে হিন্দুদের এই সব ধারণার কথা লেখা হত। তিথি, লগ্ন অনেক কিছুর ধারণা তারা পোষণ করে যে, অমুক তিথিতে বিবাহ নাস্তি, অমুক লগ্নে যাত্রা নাস্তি ইত্যাদি। পরবর্তীতে যদিও মুসলমানরা পঞ্জিকা লেখা শুরু করেছেন, কিন্তু হিন্দুদের দেখা-দেখি ঐ সমস্ত কথা মুসলমানদের পঞ্জিকায়ও এসে গেছে। আর এখান থেকে মুসলমান সমাজে এসব ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুদের সংস্পর্শে থেকে এসব কথা শুনতে শুনতেও মুসলমান সমাজে এসব ধারণা ছড়িয়েছে। এগুলি কু-সংস্কার। আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু করব, আল্লাহর নামে যে কোন কাজ শুরু করব, তাতেই আল্লাহ মঙ্গল করবেন। ভাল-মন্দ সব আল্লাহর ফয়সালাতেই ঘটে থাকে। কোন সময়ের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

সাথে এর সম্পর্ক নেই। ইসলামে অশুভ লগ্ন বলে কোন ধারণা নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন সময় খারাপ নয়, সব সময়ই ভাল। এক হাদীছে কুদছীতে এসেছে যে, আল্লাহ পাক বলেন,

لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٠٠٣)

অর্থাৎ, তোমরা সময়কে অশুভ বলো না। সময় তো আমিই পরিচালনা করি।

সুতরাং অমুক দিন অমুক লগ্ন খারাপ, অতএব অমুক দিন বিবাহ করা যাবে না, অমুক দিন যাত্রা করা যাবে না এগুলো শরীয়ত বিরোধী কথা, এগুলো কু-সংস্কার। আল্লাহর নামে যে কোন সময় যাত্রা করা যায়, তাতেই মঙ্গল হবে। বিসমিল্লাহ বলে যে কোন দিন বিবাহ করা যায়, তাতেই মঙ্গল হবে। হ্যাঁ শরীয়তে এতটুকু বলা হয়েছে যে, শুক্রবার যেহেতু বরকতের দিন, তাই শুক্রবারে বিবাহ করলে ভাল। যেসব ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারিত আছে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য যে কোন দুনিয়ার কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলেই তাতে মঙ্গল হবে, চাই তা যে সময় এবং যে লগ্নেই করা হোক না কেন।

অনেক অঞ্চলে এই কু-সংস্কার আছে যে, বিবাহে রওয়ানা দেয়ার সময় বরকে কোন ঝাল জাতীয় জিনিস খেতে দেয়া হয় না বরং মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেতে দেয়া হয়। তারা মনে করে বিবাহের জন্য যাত্রা কালে ঝাল মুখ করে গেলে বিবাহ ঝাল হয়ে যাবে অর্থাৎ, খারাপ হবে। মিষ্টি মুখ করে গেলেই বিবাহ ভাল হবে। এটাও কু-সংস্কার। বরকে প্রথমে দুধ না খাওয়ালে বা প্রথমে মিষ্টি মুখ না করালে বিবাহের পরিণতি খারাপ হতে পারে এই ধারণাও কু-সংস্কার। এভাবে বিবাহের ক্ষেত্রে অনেক কু-সংস্কার রয়েছে। আমাদের সমাজে বিবাহ এবং বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কত রকম যে কু-সংস্কার রয়েছে তা হিসাব করাও কঠিন। এক এক এলাকায় এক এক রকম কু-সংস্কার। এই করলে এই হয়, সেই করলে সেই হয় ইত্যাদি অনেক কু-সংস্কার রয়েছে। মুসলমানদের উচিত ঈমান ও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণের স্বার্থে এসব কু-সংস্কার থেকে দূরে থাকা। যেসব বিষয়ে কুরআন হাদীছে কোন প্রমাণ নেই, লোক দেখাদেখি বা প্রচলন অনুসারে তা বিশ্বাস করা বা তা করাই হল কু-সংস্কার। সব রকমের কু-সংস্কার থেকেই দূরে থাকা চাই।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে কু-সংস্কার থেকে হেফাজত করেন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং - ২৮

অন্ধ-অনুকরণ বর্জন প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত দুই জুমুয়া বিভিন্ন রকম কুসংস্কার ও বিভিন্ন রকম ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কু-সংস্কার দূর না করলে ঈমান সহীহ্ হবে না। ঈমানকে সহীহ করতে হলে আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে যেসব কু-সংস্কার রয়েছে সেগুলোকে দূর করতে হবে। এমনিভাবে আমলকে সহীহ করতে হলেও আমলের মধ্যে যেসব কু-সংস্কার রয়েছে সেগুলোকে দূর করতে হবে। কু-সংস্কার দূর না করলে যেমন ঈমান সহীহ হয় না, কু-সংস্কার দূর না করলে আমলও সহীহ হয় না। আমাদের মধ্যে ঈমানের ক্ষেত্রেও কু-সংস্কার রয়েছে, আমলের ক্ষেত্রেও কু-সংস্কার রয়েছে। সহীহ ঈমান আমলের উপরে উঠে আসতে হলে এই সব কু-সংস্কার বর্জন করতে হবে।

এতদিন যাবত আমার কি আকীদা-বিশ্বাস চলে আসছে, আমার বাপ-দাদারা কি আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতেন সেটা দেখার বিষয় নয়, বরং দেখার বিষয় হল কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী কী আকীদা-বিশ্বাস রাখা চাই। কুরআন হাদীছে যা আছে তা আমি বিশ্বাস করব, কুরআন-হাদীছে যা নেই তা আমি বিশ্বাস করব না– এই মানসিকতা পয়দা করতে হবে। এ পর্যন্ত আমার ধ্যান-ধারণা বা আকীদা-বিশ্বাস আগে যাই থাকুক না কেন, কুরআন-হাদীছের আলোকে তা ভুল বা কু-সংস্কার বলে প্রমাণিত হতে তা আমাকে বর্জন করতে হবে। আমাদের বাপ-দাদারা যে ধ্যান-ধারণা বা যে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে থাকুন না কেন, কুরআন-হাদীছের আলোকে তা ভুল বা কু-সংস্কার বলে প্রমাণিত হলে তা আমাদেরকে বর্জন করতে হবে। একথা বলা যাবে না যে, নতুন নতুন হুজুর বের হচ্ছে আর নতুন নতুন মাসলা বের হচ্ছে। একথা বলা যাবে না যে, আমরা এসব নতুন নতুন মাসলা বুঝি না, আমরা এতদিন যাবত যা করে আসছি, তার উপরই থাকব। এ কথা বলা যাবে না যে, এতদিন যাবত আমাদের বাপ-দাদারা কী ভুল করে আসছে? হাঁ পূর্ব পুরুষদের কোন বিষয়ে ভুল থাকতেও পারে। পূর্ব পুরুষদের কোনই ভুল ছিল না তা কী করে গ্যারান্টি দেয়া যায়? তাই কুরআন হাদীছের আলোকে নিজেদের কোন ধ্যান-ধারণা বা নিজেদের কোন কথা ভুল প্রমাণিত হলে তার উপর গো না ধরা চাই। কুরআন হাদীছের আলোকে পূর্ব পুরুষদের কোন ধ্যান-ধারণা বা পূর্ব পুরুষদের কোন কথা ভুল প্রমাণিত হলে তার উপর গো না ধরা চাই। কোন বিষয়ে পূর্ব পুরুষদের ভুল প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তার অনুকরণ করলে সেটা হবে অন্ধ অনুকরণ। এরূপ অন্ধ অনুকরণ মানুষকে গোমরাহীর উপর ধরে রাখে। এরূপ অন্ধ অনুকরণ মানুষকে সহীহ তরীকার উপর আসতে দেয় না। এরূপ অন্ধ অনুকরণ মানুষকে হেদায়েতের উপর আসতে দেয় না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

কুরআন-হাদীছ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নিজের ধ্যান-ধারণার উপর গো ধরে থাকলে হেদায়েতের উপর উঠে আসা যায় না। কুরআন-হাদীছ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বাপ-দাদারা কি মনে করত বা তারা কি করত, তার উপর গো ধরে থাকলে হেদায়েতের উপর উঠে আসা যায় না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন, তখন যারা বাপ-দাদাদের ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থেকেছিল তারা হেদায়েতের উপর উঠে আসতে পারেনি, তারা ইসলামের উপর উঠে আসতে পারেনি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূর্তি পূজা করতে বারণ করেছেন, তারা বলেছে, সেই বাপ-দাদার আমল থেকে এই পূজা চলে আসছে, এখন তুমি নতুন মতবাদ নিয়ে এসেছ, আমরা আমাদের বাপ-দাদার আদর্শ ছাড়তে পারি না। এভাবে বাপ দাদাদের অন্ধ অনুকরণের ফলে তারা হেদায়েতের উপর উঠে আসতে পারেনি। বাপ-দাদারা করে আসছে বলে আমাদেরও করতে হবে– এই কু-সংস্কারের ফলেই তারা সঠিক দ্বীনের উপর উঠে আসতে পারেনি। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে এ বিষয়টার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন,

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا. (সূরা বাকারা: ১৭০)

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ কুরআনে যা বলেছেন তোমরা সেটা মান, তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদারা যা করে আসছে আমরা তারই অনুসরণ করব।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, সেই জাহেলী যুগের লোকেরা বলতে চাইত– আমাদের বাপ-দাদারা যা করে আসছে আমরা তা-ই করব, নতুন কোন কথা আমরা মানব না। এই যুগে আমাদের মধ্যেও অনেক ভাইকে দেখা যায় কোন আলেম বেদআত-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বললে তারা মন্তব্য করে বসেন যে, এতকাল আমরা দেখে আসছি করে আসছি এক রকম, এখন নতুন নতুন হুজুর নতুন নতুন কথা বলে! এটা তো সেই জাহেলী যুগের লোকদের সূর। এই সূর হেদায়েতের জন্য বাঁধা। এই নীতির উপর থাকলে অতীতের কোন ভুলকে সংশোধন করা যাবে না, এই নীতির উপর থাকলে অনেকে ক্ষেত্রেই সহীহ তরীকার উপর আসা যাবে না। এই নীতির উপর থাকলে অনেক ভ্রান্ত জিনিসকেই সঠিক বলার মত অপরাধ হয়ে যাবে।

এই নীতির উপর থাকলে হিন্দু ধর্মকে ভ্রান্ত বলার কী যুক্তি থাকবে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হল– তাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্ম চলে আসছে, শত শত বছর যাবত, হাজার বছর যাবত তাদের ধর্ম চলে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই সনাতনের যুক্তি দিয়ে, এই পুরাতনের যুক্তি দিয়েই এই ধর্ম মেনে আসছে। নতুবা যার সামান্য বুদ্ধি আছে, যার এতটুকু বিবেক আছে সে এ ধর্ম পালন করতে পারে না। এ ধর্মে এমন অবাস্তব, এমন অযৌক্তিক এবং লজ্জাকর সব ধ্যান-ধারণা আছে যা কোন সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোক মানতে পারে না। যেমন তারা লিঙ্গ পূজা করে। এর চেয়ে লজ্জাকর আর কী হতে পারে। এই পূজাকে চরম অযৌক্তিক ছাড়া আর কী বলা যায়? তাদের তিনজন বড় খোদা। তার মধ্যে একজন হল মহাদেব বা শিব, আরেক জন হল ব্রহ্মা আরেক জন হল বিষ্ণু। এই শ্রেষ্ঠ তিনজন খোদার তিনটা কাহিনী শুনুন। শিব বা মহাদেব নাকি ব্যভিচার করার ফলে তার লিঙ্গ খসে পড়ে। এখন হিন্দুরা সেই লিঙ্গেরই পূঁজা করে। আর কোন এক যুগে নাকি ব্রহ্মার পাঁচটা মাথা ছিল। এখন চারটা আছে। একটা মাথা খসে পড়েছে। কিভাবে খসে পড়েছে? মহাদেবের সাথে বেয়াদবী করার কারণে নাকি মহাদেব শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, ব্যাস একটা মাথাটা খসে পড়েছে। যে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

খোদা নিজের মাথা ঠেকাতে পারে না, এমন অথর্ব খোদার পূজা করাকে কোন যুক্তি বা বুদ্ধি মেনে নিবে? আর বিষ্ণু তুলশি নামক এক মহিলার সাথে ব্যাভিচার করেছে, ফলে ঐ মহিলার অভিশাপে বিষ্ণু পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। তাই হিন্দুরা এখন বিষ্ণুরূপী এক গোল পাথরের পূঁজা করে। চিন্তা করুন খোদা হয়ে ব্যভিচার করে, আবার সেই নারীর অভিশাপে তিনি পাথরে পরিণত হন! এমন বেহায়া এবং অথর্ব খোদার পূজাঁ, আবার ব্যভিচারের প্রমাণ সেই পাথরের পূঁজা? কীভাবে এ ধর্মকে মেনে চলা যায়? তারপরও বহু লোক সেটা মেনে চলছে। তাদের মানার পেছনে বড় একটা যুক্তি এই যে, পূর্ব পুরুষরা করে আসছে। তাই বলছিলাম পূর্ব পুরুষদের বরাত দিয়ে ভুল-ভ্রান্তি ও কু-সংস্কারের উপর টিকে থাকলে কোনদিন সহীহ কথার উপর উঠে আসা হয়ে উঠবে না।

হাঁ পূর্ব পুরুষরা সঠিক যা কিছু করেছে, তা মানতে কোন অসুবিধা নেই। পূর্ব পুরুষদের মানায় অসুবিধা সেখানে, যেখানে তাদের বুঝের অভাব থাকায় বা যে কোন কারণে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন,

اَوَ لَوۡ كَانَ اٰبَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ شَيۡـئًا وَّ لَا يَهۡتَدُوۡنَ. (সূরা বাকারা: ১৭০)

অর্থাৎ, তাদের পূর্ব পুরুষদের সহীহ জ্ঞান ছিল না, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না তবুও কি তারা তারা তাদের অনুসরণ করবে?

এখানে আল্লাহ পাক বোঝাতে চেয়েছেন যে, পূর্বসুরীদের অনুসরণ করা যায়, তাদের কথা মানা যায়, যদি তারা সঠিক বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী হয়ে থাকে, যদি তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ, সঠিক মত ও পথের অধিকারী হয়ে থাকে। যেমন আমরা হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কুরআন হাদীছের যে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তা মানি। হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) যে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তা মানি। হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) যে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তা মানি। হযরত ইমাম গায্যালী (রহ.) যে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তা মানি। মাওলানা রূমী কি বলে গেছেন তা মানি। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) কি বলে গেছেন তা মানি। হযরত মঈনউদ্দীন চিশতী (রহ.) কি বলে গেছেন তা মানি। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) কি বলে গেছেন তা মানি। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) কি বলে গেছেন তা মানি। এভাবে পূর্বসুরীদেরকে আমরাও মানি। কিন্তু এই মানা আর বেদআত-কুসংস্কারপন্থীদের মানার মধ্যে বড় একটা পার্থক্য আছে। আমরা যাকে মানি মানার আগে দেখি যে, তিনি সঠিকভাবে কুরআন হাদীছ বুঝতেন কি না এবং সঠিক মত ও পথের অধিকারী ছিলেন কি না। যখন দেখি তারা কুরআন হাদীছ সঠিকভাবে বুঝতেন, কুরআন হাদীছ সঠিকভাবে মানতেন, কুরআন-হাদীছের বাইরে কোন কথা বলতেন না, তখন তাদেরকে আমরা মানি। এই অবস্থায় তাদেরকে মানা মূলত কুরআন হাদীছকেই মানা। কেননা, তারা কুরআন-হাদীছের পরিপন্থী কিছু বলতেননা, কুরআন-হাদীছের পরিপন্থী কিছু করতেন না। যদি কখনও আমাদের কাছে কোন একটা বিষয়েও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ বিষয়টা তারা করলেও এটা কুরআন-হাদীছের অনুকূল নয়, তাহলে আমরা সেটা মান্য করিনা। কোন বিষয়ে তাদের বুঝে ত্রুটি প্রমাণিত হলে, কোন বিষয়ে তাদের ভুল প্রমাণিত হলে আমরা তার অনুসরণ করি না। কিন্তু বেদআত-কুসংস্কারপন্থীরা এটা বিচার বিবেচনায় আনেন না যে, তাদের পূর্ব পুরুষদের জানায় ত্রুটি ছিল কি না, তাদের ভুল ছিল কি না। তাদের পূর্ব পুরুষদের ভুল ছিল বলে প্রমাণিত হলেও তারা তা থেকে সরে আসেন না। অথচ পূর্ব পুরুষদের ভুল ও ভ্রান্তি প্রমাণিত হলে তাদের অনুসরণ চলবেনা। আল্লাহ পাক তাই বলেছেন, তাদের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বাপ-দাদাদের সঠিক জ্ঞান ছিল না, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে? এখানে আল্লাহ পাক ইশারা করেছেন যে, পূর্বসুরীদের যদি সহীহ জ্ঞান থাকে, তারা যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কথা মানা যায়, নতুবা মানা যায় না। বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষদের সঠিক জ্ঞান ছিল কিনা, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল কিনা এটা বাছ-বিচার না করে শুধু বাপ-দাদারা করে আসছেন এই বরাত দিয়ে বেদআত-কুসংস্কার করে যাওয়ার অনুমতি নেই, এরূপ করলে কোন দিন সহীহ মত ও পথে উঠে আসা যাবে না। এরূপ করলে কোন মতেই হেদায়েতের উপর উঠে আসা যাবে না।

আমাদের সমাজে যে সমস্ত কু-সংস্কার চলছে তার পেছনে বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণই কাজ করছে বেশী। যতই বলা হয় যে, প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান কুরআন হাদীছে কোথাও নেই, কেউ মরে গেলে আমরা চতুর্থ দিনে কুলখানি করি, এটাও কুরআন হাদীছে নেই, ৪০ দিনের দিন চল্লিশা করি, এটাও কুরআন হাদীছে নেই, ১ বৎসর হলে মৃত্যু বার্ষিকী পালন করি, এটাও কুরআন হাদীছে নেই, শবে বরাতে হালুয়া রুটি করি, এটাও কুরআন হাদীছে নেই, আশুরা আসলে খিচুড়ী পাকাই, এটাও কুরআন হাদীছে নেই, এগুলো হল আমাদের বাপ-দাদারা করে আসছে আমরা তার অনুসরণে করছি। এগুলিকে বলা হয় বেদআত-কুসংস্কার। কিন্তু যতই বলা হচ্ছে যে, এগুলি বেদআত-কুসংস্কার, এগুলি বর্জন করা চাই, তবুও অনেকে সেটা মানছেন না। তাদের ঐ এক কথা যে, এগুলি আমাদের বাপ-দাদারা করে আসছে। তাহলে তো তাদের বক্তব্যের সারকথা এই বের হয় যে, যেহেতু বাপ-দাদারা করে আসছে তাই আমরাও করব, কুরআন-হাদীছে আছে বা নেই তা আমরা দেখব না। এটাকেই বলা হয় অন্ধ অনুকরণ। এরূপ অন্ধ অনুকরণ মানুষকে হেদায়েত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

অনেকে বলে থাকেন, আগে কি কুরআন হাদীছ ছিলনা, তখনকার আলেমরা কেন বলেননি? তাহলে আমরা উল্টো প্রশ্ন করতে পরি যে, তখনকার আলেমরা বলেননি বলে কি তা জায়েয হয়ে যাবে? তাছাড়া আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। তা হল– এখন আগের তুলনায় উলামায়ে কেরামের সংখ্যাও বেড়েছে, কুরআন হাদীছের চর্চাও বেড়েছে, গবেষণাও বেড়েছে। আগে এরকম পরিস্থিতি ছিল না। তাই তখনকার অবস্থা দিয়ে দলীল দেয়া চলবে না। আমাদের বাপ দাদারা –যারা এগুলোর সূচনা করেছেন, তারা– যদি কুরআন হাদীছের ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়ে থাকতেন, ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে হয়ে থাকতেন, তাহলে তাদের নীতির উপর চলতে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তো সেরকম নয়। আমাদের মানসিকতা এই থাকা চাই যে, যখনই আমাদের সামনে কোন হক কথা আসবে, আমরা তা মেনে নিব। যখনই আমাদের কোন ভুল প্রমাণিত হবে, আমরা তা সংশোধন করে নিব। আমাদের সামনে হক কথা আসল, আমাদের ভুল ধরিয়ে দেয়া হল, তবুও আমরা বাপ-দাদারা করে আসছে যুক্তি দিয়ে সেকথা মানলাম না, সংশোধন হলাম না, তাহলে হেদায়েতের উপরে উঠে আসতে পারব না।

বর্তমান যুগে আর বেশ কিছু কু-সংস্কার চালু হয়েছে। যেগুলি বিজাতির দেখাদেখি আমরা মুসলমানরাও করতে শুরু করেছি। যেমন জন্ম বার্ষিকী পালন করা, জন্মদিন পালন করার সময় কেক কাটা, বিবাহ বার্ষিকী পালন করা, কেউ মারা গেলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা, কারও মৃত্যুর প্রতি শোক প্রকাশ করার জন্য কাল পতাকা উত্তোলন করা বা কাল ব্যাজ ধারণ করা ইত্যাদি অনেক কিছু। এগুলি হল বিজাতির অন্ধ অনুকরণ। কুরআন হাদীছের আলোকে এগুলি করার অবকাশ নেই। এগুলি করার পেছনে কোন সুস্থ যুক্তিও নেই।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যেমন ধরুন– যুক্তির নিরিখে কোন দিবস পালনের যথার্থতা বিচার করতে গেলে প্রথমেই ভাবতে হয় আমরা কি দিবস পালন করি, না তারিখ পালন করি ? দিবস পালন করলে যে দিবসে অর্থাৎ, যে বারে ঘটনা ঘটে সে বারেই তা পালিত হওয়ার কথা, কিন্তু আমরাতো বার দেখিনা বরং তারিখ দেখি। শুধু তারিখটা স্মরণ রেখে সেই তারিখেই তা পালন করি, যদিও ঘটনার বার আর সেই ঘটনার দিবস পালনের বারে পার্থক্য ঘটে যায়। তাহলে 'অমুক দিবস' নাম না দিয়ে 'অমুক-তারিখ' নাম দেয়াইতো যুক্তিযুক্ত ছিল। মৃত্যুদিবস, জন্মদিবস ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রেই 'দিবস' শব্দের স্থলে 'তারিখ' শব্দটি প্রয়োগ করাই যুক্তিসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আমরা তা করছি কৈ?

যদি কেউ বলতে চান ঘটনার দিবসটা মুখ্য নয়, বরং তারিখটাই মুখ্য। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় ঘটনার ছোয়া যেমন তারিখের সাথে লেগেছে, দিবসের সাথেও লেগেছে; এমতাবস্থায় তারিখের দিকটাকে প্রাধান্য দেয়ারতো কোন যুক্তিসংগত কারণ অনুপস্থিত। তবুও বিনা কারণেই তাকে প্রাধান্য দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন?

আরও প্রশ্ন থেকে যায়– যদি দিবসই পালন করতে হয়, তাহলে একটা দিবস যেহেতু প্রতি সপ্তাহেই একবার ঘুরে আসে; সেমতে প্রত্যেকটা ঘটনার দিবস প্রতি সপ্তাহেই পালন করা যুক্তিগংগত। কিন্তু সেটা বৎসরে মাত্র একবার করা হয় কেন?

আরও একটা কথা থেকে যায় এই যে, একটা ঘটনা যখন ঘটে, সেটার তারিখ বাংলা, ইংরেজী ও আরবী সনের হিসেবে সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে কোন এক সময় সব রকম সনের তারিখ এক হয়ে গেলেও পরবর্তী বৎসর অবশ্যই ঐ দিনে তারিখের পার্থক্য ঘটবেই। উভয় ক্ষেত্রেই পরবর্তী বৎসর দিবস পালন করতে গিয়ে কোন্ সনটার অনুসরণ করে দিবস পালন করতে হবে– বাংলার, না ইংরেজীর, না আরবীর ? দেখা যায় কোন কোন ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা আরবী সন-তারিখের অনুসরণ করি, কোন কোনটার ক্ষেত্রে বাংলা সন-তারিখের অনুসরণ করি, আবার কোন কোনটার ক্ষেত্রে ইংরেজী সন-তারিখের অনুসরণ করি। কোন্ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের সনের অনুসরণ করতে হবে, তার কোন নির্দিষ্ট নীতি নেই বা তার যুক্তিসংগত ও সর্বজনস্বীকৃত নীতি নেই এবং সেরকম নীতি নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়। তাহলে এটাকে কেন অযৌক্তিক বলা হবে না ?

আরও একটা কথা থেকে যায়– যে সময় কোন একটা ঘটনা ঘটে থাকে, পরবর্তীতে যার স্মরণে আমরা দিবস পালন করি, এখানে প্রশ্ন হল পরবর্তী বৎসর ঐ তারিখে যে সময়টাতে আমরা দিবস পালন করি, সেটা কি পূর্বের বৎসরের সেই সময়টাই, যা রিটার্ণ ব্যাক করেছে, না কি এটা একটা নতুন সময় ? বস্তুত যে সময় চলে যায় সে সময় আর কোন দিন ফিরে আসে না। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, আমাদের দিবস পালন করাটা একটা নতুন সময়েই ঘটে থাকে। যদি তা-ই হয়, তাহলে দিবস পালনের নামে আমরা পূর্বের ঘটনার স্মৃতিচারণ, নানা রকম ঘটাকরণ ইত্যাদি যা কিছুই করে থাকি তা পরবর্তী বৎসরের নির্দিষ্ট তারিখে কেন, বৎসরের যে কোন তারিখে ও যে কোন সময়ে করতে পারি। কিন্তু কেন তা করা হয়না বা কেন সে রকম ভাবা হয়না কিংবা সেরকম করলে কেউ সেটাকে দিবস পালন কেন মনে করেওনা- কিছুইতো স্পষ্ট হচ্ছেনা। এমন অস্পষ্টতার মধ্যে থাকতে হবে কেন?

এ সব দিবস পালনে কি কি করা হয় বা কি কি করতে হবে, তারও কোন সুনির্দিষ্ট ফিরিস্তী নেই। কোন কোন দিবস পালন করা হয় কোন নির্দিষ্ট স্থানে ফুল দিয়ে, কোন কোন দিবস পালন করা হয় আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে, কোন কোন দিবস পালন করা হয় মৃতের বক্তৃতার ক্যাসেট বাজিয়ে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

আবার কোথাও কোথাও মৃতের মৃত্যুদিবস পালনের ক্ষেত্রে মীলাদ ও কাঙ্গালী ভোজের আয়োজনও রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ কিছু দিবসে কাল পতাকা উত্তোলন করে মৃতের প্রতি শোক প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কোন কোন দিবস পালন করা হয় রাস্তায় রাস্তায় নানান রং বেরংয়ের পতাকা উড়িয়ে ও ফেষ্টুন লাগিয়ে। আবার কোন কোন দিবস পালিত হয় শুধু পত্র-পত্রিকায় প্রচারের মাধ্যমে, যে ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা পাঠ না করলে বোঝাই যায় না আজ কি দিবস পালিত হয়েছে। এভাবে যার যেভাবে মনে চায় সেভাবেই করাই হচ্ছে দিবস পালনের পদ্ধতি। এর কোনো সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতির বালাই নেই, এমনকি এর স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তিও নেই।

অবশ্য এসব দিবস পালনের প্রবক্তারা এসবের স্বপক্ষে একেবারেই কোন যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন না তা নয়। তারা এসব দিবস পালনের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তিরও অবতারণা করে থাকেন এবং এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক ও প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে সে জাতীয় কথা বক্তব্য প্রচারিতও হয়ে থাকে। তাদের যুক্তিগুলির মধ্যে একটা বড় যুক্তি হল এভাবে মৃত ব্যাক্তিদের মূল্যায়ন হয় এবং তাদের ন্যায় ব্যক্তিত্ব ও কর্মময় জীবন গঠনের প্রেরণা উজ্জীবিত হয়। কিন্তু এটা কি অন্যদিনে আলোচনা করলে হয় না?

দিবস পালন করতে গিয়ে কেউ কেউ মৃত ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভে ফুল অর্পন করে থাকেন। এর স্বপক্ষে বড় যুক্তি হল এতে নাকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয়ে থাকে। কিন্তু কথা হল শ্রদ্ধা পাওয়ার ব্যক্তি রইল কোথায় আর ফুল দেয়া হল কোথায়? ব্যক্তি রইল একখানে, আর অন্যত্র ফুলের তোড়া অর্পন করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মহড়া দেয়া হল– এর পেছনে কি যুক্তি রয়েছে ? তাদের কবরে ফুল অর্পন করলেও অন্তত বলা যেত ব্যক্তি যেখানে ফুল দেয়াও হল সেখানে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেক্ষেত্রেও এটা হল যে, কবর একটা ভিন্ন জগত আর ফুল দেয়া হল আর একটা ভিন্ন জগতে। কাজেই যে কোন স্থানে ফুল দিলেও চলত। অতএব স্মৃতিস্তম্ভে বা কবরে ফুল দেয়ার পেছনেও কোন যুক্তি থাকল না।

মৃতের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ নিরবতা পালন করে শোক প্রকাশ করার পেছনেও কোন যুক্তি নেই। আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকাহত, এমনকি শোকে বেদনায় আমাদের বাক পর্যন্ত লোপ পেয়েছে- এটা প্রকাশের জন্যই নিরবতা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু আসলেই যদি সেরকম শোকাহত না হয় আর সেই নিরবতা পালনের মাধ্যমে সেই ভাব প্রকাশ করা হয়, তাহলে তো সেটা হল শোকের অভিনয়। শোক প্রকাশের নামে শোক প্রকাশের অভিনয় করলে তো মৃতের প্রতি আরও উপহাস করা হয়।

কারও মৃত্যুতে কালো রংয়ের পতাকা বা কাল ব্যাজ ধারণের মাধ্যমে শোক প্রকাশের পেছনেও কোন যুক্তি নেই। কালো রংকে যেমন শোকের প্রতীক মনে করা হয়, তেমনি অশুভ সংকেতও মনে করা হয়ে থাকে, আবার কাল রঙকে প্রেম প্রীতির প্রতীক বলা যায়। কেননা, প্রেমিকার চুলের কাল রঙ প্রেমকেই তো উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই কালো পতাকা বা কাল ব্যাজ প্রদর্শন করলেই শোক প্রকাশ যে নিশ্চিত হবে, তা ঠিক নয়।

সবচেয়ে একটা বড় কথা হল– বিভিন্ন ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব বিবেচনায় যেভাবে আমরা দিবস পালন শুরু করেছি, তাতে পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত এরূপ এত অজস্র ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব অতিবাহিত হয়েছে যার সবটার দিবস পালন করতে গেলে বৎসরের প্রতিদিনে শত শতটা দিবস পালন করতে হবে। তাহলে জীবন জগতের জন্য আর অন্য কিছু করার অবকাশ থাকবে না, ২৪ ঘন্টা শুধু দিবস পালনেই মগ্ন থাকতে হবে। তেমন করতে গেলে দুনিয়ার অন্য সব কাজের কী অবস্থা হবে?

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ২৯

ইসলামী লেবাস-পোশাক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ বর্জন করা সম্বন্ধে এবং বিজাতির অন্ধ অনুকরণ বর্জন করা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। সবক্ষেত্রেই পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ বর্জন করা চাই, সবক্ষেত্রেই বিজাতির অন্ধ অনুকরণ বর্জন করা চাই। ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, আচার-আচরণ, সমাজ-সামাজিকতা, উঠা-বসা, চলাফেরা সবক্ষেত্রেই অন্ধ অনুকরণ বর্জন করা চাই।

ইসলামে ইবাদত-বন্দেগী যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আচার-আচরণ, সমাজ-সামাজিকতা, উঠা-বসা, চলাফেরা ইত্যাদি তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে ইবাদত-বন্দেগীর যেমন নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে, আচার-আচরণ, সমাজ-সামাজিকতা, উঠা-বসা, চলাফেরা ইত্যাদি তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে।

তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির অঙ্গনে নিজস্ব পন্থা ও পদ্ধতির উপর টিকে থাকার গুরুত্ব এত বেশী যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه ابو داود في سننه برقم ٤٠٣٣ والحديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, যে বিজাতির রূপ গ্রহণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

বিজাতির রূপ গ্রহণ করার অর্থ হল– ধর্মীয় রীতি-নীতি, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা সংস্কৃতি যে কোন ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ অনুসরণ করা। অতএব ধর্মীয় রীতি-নীতি, তাহযীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা সংস্কৃতি কোন ক্ষেত্রেই বিজাতির অনুকরণ করা যাবে না। করলে কেয়ামতের দিন সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠতে হবে। এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল– যদি সঠিকভাবে মুসলমান জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকতে হয় এবং আল্লাহর কাছে মুসলমান হয়ে উঠতে হয়, তাহলে কোন ক্ষেত্রেই বিজাতির অনুকরণ অনুসরণ করা যাবে না। সঠিকভাবে মুসলমান গণ্য হওয়ার জন্য মুসলমানদের নিজস্ব রীতি নীতি ও নিজস্ব কৃষ্টি কালচারের উপর থাকা জরূরী। বিশেষভাবে এ হাদীছে বিজাতির কৃষ্টি কালচার অনুকরণ করা যাবে না– এ বিষয়টাই বোঝানো উদ্দেশ্য।

বিজাতির কৃষ্টি কালচার অনুসরণ করে খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না। আমরা মনে করে বসে আছি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি করলেই খাঁটি মুসলমান বলে গণ্য হওয়া যায়, এই ধারণা ঠিক নয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত অবশ্যই করতে হবে। এগুলি ফরয। খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য অবশ্যই এগুলি করতে হবে। তবে শুধু এগুলির উপরই ক্ষান্ত করলে হবে না, এগুলির সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব কৃষ্টি সভ্যতার উপরও কায়েম হতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

মৃত্যু দিবস, জন্ম দিবস পালনের বাইরেও আজকাল আরও বিভিন্ন ধরনের দিবস পালনের প্রচলন শুরু হয়েছে। যেমন অন্ধ দিবস, শিশু দিবস, বৃদ্ধ দিবস ইত্যাদি। এসবের পক্ষে বড় যুক্তি হল এসব দিবস পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে এসব বিষয়ে সচেতন করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। যদি তাই হয়, তাহলে এ ছাড়া আরও শত শত হাজার হাজার বিষয় রয়ে গেছে, যেগুলি সম্পর্কেও সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন। আর সে সবগুলিকে কেন্দ্র করে দিবস পালনের পন্থা গ্রহণ করা হলে বৎসরের প্রতিদিন একটা করে নয় শত শতটা করে দিবস পালন করতে হবে। চারিত্রিক অধঃপতন ও নৈতিক অবক্ষয়ের এই যুগে শত শহস্র বিষয় এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। সেমতে সত্য কথা দিবস, সততা দিবস, সন্ত্রাসমুক্ত দিবস, দূর্নীতিমুক্ত দিবস, ঘুষমুক্ত দিবস, দায়িত্ব সচেতনতা দিবস, ভদ্রতা দিবস, নম্রতা দিবস প্রভৃতি শত শহস্র দিবসের প্রচলন ঘটাতে হয়। আর তেমন করা হলে প্রতিদিনে ২৪ ঘন্টার সাথে আরও কয়েক ২৪ ঘন্টা যোগ হলেও অন্য কিছু করা নয় শুধু দিবস পালনেই মগ্ন থাকতে হবে। তাই বলছিলাম, এসব দিবস পালনের পেছনে কোন সুস্থ যুক্তি নেই, কোন বেদআত-কুসংস্কারের পেছনেও সুস্থ যুক্তি নেই।

যদি স্থূল দৃষ্টিতে বেদআত-কুসংস্কারের স্বপক্ষে কোন শক্তিশালী যুক্তি কেউ দাঁড় করাতে পারেও, তবুও সেই যুক্তির ভিত্তিতে তা করা সঠিক হয়ে উঠবে না। কুরআন হাদীছ বিরোধী কোন যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলমানের জীবন কুরআন হাদীছকে বাদ দিয়ে নিছক যুক্তির ভিত্তিতে চলবে না। কুরআন হাদীছকে বাদ দিয়ে নিছক যুক্তির ভিত্তিতে মুসলমানদের কোন নীতি দাঁড় হবে না।

আর কোন কিছুর পেছনে যদি কোন যুক্তিও না থাকে, নিছক অন্ধ অনুকরণ করে তা করা হয় বা বিজাতির অনুকরণ করে করা হয়, তাহলে তা আরও খারাপ। ইসলামে বিজাতির অনুকরণ করতে শক্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه ابو داود في سننه برقم ٤٠٣٣ والحديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, যে বিজাতির রূপ গ্রহণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

অতএব ইসলামকে বর্জন করে ইয়াহুদ নাসারাদের অনুকরণ করলে কেয়ামতের দিন তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠতে হবে। ইসলামকে বর্জন করে নাস্তিক মুরতাদদের অনুকরণ করলে কেয়ামতের দিন তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠতে হবে। ইসলামকে বর্জন করে হিন্দু বৌদ্ধদের অনুকরণ করলে কেয়ামতের দিন তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠতে হবে। ইসলামকে বর্জন করে কাফের মুশরিকদের অনুকরণ করলে কেয়ামতের দিন তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠতে হবে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক! আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করেন। কেয়ামতের দিন আমরা যেন মুসলমান হয়ে উঠতে পারি। কেয়ামতের দিন আমরা যেন নবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা, সালিহীন, ওলী-আউলিয়া ও খাঁটি মু'মিনদের সাথে থাকতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহভাবে সবকিছু বোঝার তাওফীক দান করুন, সঠিক পন্থা অনুকরণ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করা চাই–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সঠিক পথে পরিচালিত করুন। সেইসব লোকদের পথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন যাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ রয়েছে। অর্থাৎ, নবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীনদের পথ। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মানুষের চলাফেরা, উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া ও আচার-আচরণ কেমন হবে বা কেমন হবে না এগুলি হল কৃষ্টি কালচারের বিশেষ বিশেষ দিক। বিবাহ-শাদী, আত্মীয়তা, আতিথেয়তা, আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদি সমাজ-সমাজিকতার রীতি নীতি কেমন হবে বা কেমন হবে না এগুলি হল কৃষ্টি কালচারের বিশেষ দিক। লেবাস-পোশাক, দাড়ি, মোচ কেমন হবে বা কেমন হবে না এগুলি হল কৃষ্টি কালচারের বিশেষ দিক। এই সবগুলির ক্ষেত্রে ইসলামের যে নিজস্ব রীতিনীতি রয়েছে সেটাই হল ইসলামের কৃষ্টিকালচার, সেটাই হল ইসলামের নিজস্ব সংস্কৃতি, সেটাই হল ইসলামের নিজস্ব তাহযীব-তামাদ্দুন। এবিষয়গুলি মধ্য থেকে আজ কুরআন হাদীছের দৃষ্টিতে মুসলমানদের লেবাস-পোশাক কেমন হওয়া চাই সে সম্বন্ধে আলোচনা করার ইরাদা রাখি।

ইসলামী লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিষয় হল– বিজাতীয় লেবাস-পোশাক বর্জন করতে হবে, বুযুর্গানে দ্বীনের লেবাস-পোশাক গ্রহণ করতে হবে। বিজাতির অনুকরণে কোন লেবাস-পোশাক চলবে না। এ ব্যাপারে পূর্বে যে হাদীছ বয়ান করা হয়েছে, সেটাই দলীল। বিশেষ করে যদি বিজাতির ধর্মীয় লেবাস পোশাক পরিধান করা হয়, তাহলে তা হবে হারাম। যেমন হিন্দুদের মত পৈতা গলায় পরলে তা হবে হারাম, বৌদ্ধদের মত গেরুয়া পোশাক পরলে তা হবে হারাম, খৃষ্টানদের মত ক্রুশ বা ক্রুশের বিকল্প কিছু পরিধান করলে তা হবে হারাম। এমনিভাবে ইসলাম ব্যতীত অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় লেবাস-পোশাক পরিধান করা হারাম।

বিধর্মীদের লেবাস-পোশাক নয় বরং ইসলাম ধর্মের বুযুর্গানে দ্বীনের যে লেবাস-পোশাক সেটাই অনুসরণ যোগ্য। এটাকে বলা হয় "লিবাসুস-সালিহীন" অর্থাৎ, সালিহীন তথা নেককার পরহেযগার ও বুযুর্গানে দ্বীনের লেবাস-পোশাক। মুসলমানদের নেককার পরহেযগার মানুষেরা, বুযুর্গানে দ্বীনরা যে রকম লেবাস-পোশাক পরিধান করেন, সেটাই ইসলামী লেবাস-পোশাক, সেটাই উত্তম। বুযুর্গানে দ্বীন পায়জামা পাঞ্জাবী পরিধান করেন, তারা প্যান্ট কোট শার্ট পরিধান করেন না। অতএব প্যান্ট কোট শার্ট ইসলামী লেবাস নয়। যদিও বর্তমান যুগে কোট, প্যান্ট, শার্ট পরিধান করা নাজায়েয তা আমরা ফতুয়া দেই না। বর্তমান যুগে কোট, প্যান্ট, শার্ট মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সর্বস্তরের কর্মজীবি ও শ্রমজীবি মানুষের পোশাকে পরিণত হয়েছে, তাই এগুলো এখন বিশেষ কোন ভিন্ন ধর্মের লোকদের পোশাক থাকেনি, এগুলি এখন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে অবশিষ্ট থাকেনি, তাই এখন এগুলো ব্যবহার করা না জায়েয হবে না। তবে এগুলো নেককার পরহেযগার লোকদের পোশাক নয়, তাই এগুলো ব্যবহার করা অনুত্তম। নেককার পরহেযগার লোকদের মত পোশাক পরিধান করাই উত্তম, বুযুর্গানে দ্বীনের মত পোশাক পরিধান করাই উত্তম।

দুনিয়াতে বুযুর্গানে দ্বীনের লেবাস অবলম্বন করলে আশা করা যায় কেয়ামতের দিনও তাদের সাথে থাকা যাবে। কারণ যার সাথে যার মহব্বত, তার সাথে তার হাশর হবে। বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে মহব্বত রাখলে সেই মহব্বতের ওছীলায় বুযুর্গী ও পরহেযগারী নসীব হতে পারে। তাই বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে মহব্বত রাখা চাই। এক কবী বলেছিলেন,

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ + لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

অর্থাৎ, আমি বুযুর্গ পরহেযগার না হলেও তাদের সাথে মহব্বত রাখি। আশা করি এর ওছীলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে বুযুর্গী পরহেযগারী নসীব করবেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অএতব ফাসেক ফাজেরদের সাথে মহব্বত রেখে তাদের মত কোট, প্যান্ট, শার্ট পরিধান করা নয় বরং বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে মহব্বত রাখা চাই, বুযুর্গানে দ্বীনের মত পায়জামা, পাঞ্জাবী ও টুপি পরিধান করা চাই। অনেকে বুযুর্গ নেককার পরহেযগার মানুষদের লেবাস-পোশাক পরিধান করতে শরম বোধ করেন। মনে করেন এতে আবার বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে হুজুর বলে টিটকারী দিবে! আসলে এটা শরম নয় এটা হল ধর্মীয় বিষয়ে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ। এ রকম হীনমন্যতাবোধ পরিত্যাগ করা চাই। নতুবা অনেক ক্ষেত্রেই দ্বীনের উপর চলা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। কে টিটকারী দিল বা কে অপছন্দ করল এসব চিন্তায় রাখতে গেলে ধর্মের অনেক কিছুই করা যাবে না। তাহলে বিবিকে পর্দায় রাখা যাবে না, তাহলে নিজেও পর্দার বিধান মেনে চলা যাবেনা, তাহলে ঘর থেকে গান-বাদ্য দূর করা যাবে না, তাহলে দাড়ি রাখা যাবে না, তাহলে টুপি মাথায় দিয়ে চলা যাবেনা, এভাবে ধর্মের অনেক কিছুই করা যাবে না। ধর্মের উপর চলতে গিয়ে কারও নিন্দা সমালোচনার কোন পরওয়া করা যাবে না, কারও অপছন্দের কোন পরওয়া করা যাবে না। আর একটা কথা হল তারা যেটাকে শরম মনে করার কারণে করতে পারছে না, করতে শুরু করলে এ শরম ভেঙ্গে যাবে। করতে শুরু না করলে কোনদিনই এ শরম ভাঙ্গবে না। তাই করতে শুরু করুন। আক্ষেপের বিষয় মুসলমানরা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তার উপর চলতে শরম বোধ করে, অথচ মুসলমানদের ধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম। হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় পোশাক পরে চলতে শরম বোধ করে না, তারা ধুতি পরতে শরম বোধ করে না, তারা গলায় পৈতা লাগিয়ে চলতে শরম বোধ করে না, তারা কপালে তিলক আঁকতে শরম বোধ করে না, তারা কপালে সিদুর, চন্দন লাগাতে শরম বোধ করে না। শিখরা তাদের গোপ দাড়ি নিয়ে চলতে শরম বোধ করে না, বৌদ্ধরা তাদের গেরুয়া পোশাক পরতে শরম বোধ করে না। এভাবে অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় স্বকীয়তার উপর চলতে শরম বোধ করে না, কিন্তু মুসলমানরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় স্বকীয়তার উপর চলতে শরম বোধ করে। বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

ইসলামী লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ বিষয় হল– কুরআন হাদীছে পোশাকের কাট-ছাঁটের ব্যাপারে যতটুকু বিধিবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে। কুরআন হাদীছে পোশাকের কাট-ছাঁটের ব্যাপারে খুব বেশী বিধিবদ্ধতা বা বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়নি। এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা রয়েছে। যে অঞ্চলের পোশাকের কাট-ছাঁট যেমন তা চলতে পারে, তবে অবশ্যই নেককার পরহেযগারদের পোশাকের কাট-ছাঁটের বাইরে না যাওয়া চাই। এ থেকেই বলা হয়েছে, পাঞ্জাবী সাইড ফাড়াও হতে পারে, আবার গোলও হতে পারে, এ ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যেও দুই ধরনের পাঞ্জাবীর প্রচলন দেখা যায়। কাজেই এটা নিয়ে বিতর্কে না জড়ানো চাই। এমনিভাবে টুপি গোল হবে না লম্বা হবে না পাঁচকল্লী হবে এ ব্যাপারেও কুরআন হাদীছে স্পষ্ট কোন কোন বাধ্য-বাধকতা বর্ণিত নেই। বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে সব ধরনের টুপিরই প্রচলন দেখা যায়। কাজেই এটা নিয়েও বিতর্কে না জড়ানো চাই। তবে পোশাকের কাট-ছাঁটের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপারে বিধিবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বাধীন ইচ্ছা অবলম্বন না করা চাই। যেমন পাঞ্জাবী অন্তত নেছফে ছাক্ব অর্থাৎ, পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া চাই। পাঞ্জাবী পায়জামা নেছফে ছাক্ব পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত অর্থাৎ, পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত। হাদীছে এসেছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا كَانَ اَسْفَلَ مِنْ ذَالِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه مالك في المؤطا برقم ١٦٣١ وأحمد في مسنده برقم ١١٠٢٣ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم)

অর্থাৎ, মুমিনের-এর লুঙ্গি (পায়জামা) হবে নেছফে ছাক্ব পর্যন্ত। তার নিচে টাখনু গিরা পর্যন্ত হলে ক্ষতি নেই। টাখনুর গিরার নিচে গেলে সেটা জাহান্নামে যাবে।

অন্য এক হাদীছে এসেছে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন,

مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاِزَارِ فَهُوَ فِى الْقَمِيْصِ. (رواه ابو داود في سننه برقم ٤٠٩٧ وإسناده صحيح ورواه أحمد في مسنده برقم ٦٢٢٠ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح)

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি পায়জামার ব্যাপারে যা বলেছেন, জামার ব্যাপারেও সেই একই কথা। অর্থাৎ, জামাও নেছফে ছাক্ব পর্যন্ত হতে হবে।

অতএব পাঞ্জাবী পায়জামা নেছফে ছাক্ব পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জামার হাতা হাতের কবজি পর্যন্ত ছিল। অতএব পাঞ্জাবী, জুব্বা, শেরওয়ানী ইত্যাদির হাতা কবজি পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত। আজকাল এক শ্রেণীর জুব্বা বের হয়েছে, যার হাতা কনুইয়ের উপরে থাকে, অর্থাৎ, হাফ হাতা। এটা সুন্নাতের খেলাফ। হাতা কবজি পর্যন্ত না হলে সুন্নাত আদায় হবে না। হাফ হাতা জামা নিয়ে নামায পড়াও মোস্তাহাবের খেলাফ। আর হাতা যদি ফুল থাকে কিন্তু গুটিয়ে কনুইর উপরে নিয়ে রেখে সেই অবস্থায় নামায পড়া হয়, তাহলে মাকরূহ হবে।

যাহোক– বলা হচ্ছিল পাঞ্জাবী জুব্বা উপর দিকে থাকবে পায়ের নলার মধ্য পর্যন্ত, তার চেয়ে উপরে উঠতে পারবে না, তার চেয়ে উপরে উঠলে সুন্নাতের খেলাফ হবে। আর নিচের দিকে সর্ব নিম্ন টাখনু গিরার উপর পর্যন্ত যেতে পারবে, টাখনু গিরার নিচে গেলে গোনাহ হবে। আজকাল অনেকে আরবদের স্টাইলে জুব্বা বানায়। অনেকের এই আরবী জুব্বা টাখনু গিরার নিচেয় নেমে যায়। এতে গোনাহ হবে। পুরুষদের জন্য পায়জামা হোক, পাঞ্জাবী হোক, লুঙ্গি হোক, জুব্বা হোক, প্যান্ট কোট যাই হোক কোনটাই টাখনু গিরার নিচে যেতে পারবে না, তাহলে কবীরা গোনাহ হবে। এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব শক্ত কথা বলেছেন। এক হাদীছে এসেছে,

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٣٠٦)

অর্থাৎ, তিন শ্রেণীর লোক এমন আছে, কেয়ামতের দিন যাদের দিকে আল্লাহ তা'আলা রহমতের নজর দিবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হল– এক. যারা টাখনু গিরার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে। দুই. যারা কাউকে কোন উপকার পরে সেটার খোটা দেয়। তিন. যারা মিথ্যা কছম করে মাল কাটতি করে।

ইসলামী লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ বিষয় হল– নারী ও পুরুষের লেবাস-পোশাকের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, সেই পার্থক্যগুলো মেনে চলতে হবে। পুরুষ ও নারীর লেবাস-পোশাকের মধ্যে বিশেষ তিনটা পার্থক্য রয়েছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

পুরুষ ও নারীর লেবাস-পোশাকের মধ্যে একটা পার্থক্য হল– উভয়ের লেবাস-পোশাকের কাট-ছাঁট ভিন্ন থাকতে হবে। পুরুষের জন্য মহিলাদের কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করা এবং মহিলাদের বেশ ধারণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ। তদ্রূপ মহিলাদের জন্য পুরুষের কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করা এবং তাদের বেশ ধারণ করাও হারাম ও নিষিদ্ধ। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. (رواه الترمذي برقم ٢٧٨٤ وقال : حسن صحيح)

অর্থাৎ, পুরুষদের মধ্যে যারা নারীদের বেশ-ভুষা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করেন। তদ্রূপ নারীদের মধ্যে যারা পুরুষদের বেশ-ভুষা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করেন।

অতএব পুরুষগণ নারীদের মত কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করতে পারবে না, নারীগণও পুরুষদের মত কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করতে পারবে না। ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, নাবালেগ ছেলেমেয়েদের বেলায়ও এ মাসআলা প্রাযোজ্য। নাবালেগ ছেলেদেরকেও মেয়েদের মত কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করানো যাবে না, নাবালেগ মেয়েদেরকেও ছেলেদের মত কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করানো যাবে না। নাবালেগ ছেলে মেয়েদের আমলনামায় তো গোনাহ লেখা হবে না, যে গার্জিয়ান অভিভাবকরা এরূপ করবে তারা গোনাহগার হবে।

পুরুষ ও নারীর লেবাস-পোশাকের মধ্যে আর একটা পার্থক্য হল– পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে যে কাপড়ের দৈর্ঘের সুতা রেশম কিন্তু প্রস্থের সুতা রেশম নয়- সেটা ব্যবহার করা জায়েয। আর মহিলাদের জন্য সব ধরনের রেশমের কাপড় বৈধ। বাজারে যেসব সিল্ক কাপড় পাওয়া যায় তা যদি অরিজিনাল তুত পোকার সুতা থেকে তৈরী হয় তাহলে তা পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। আর যদি সেটা আর্টিফিশিয়াল হয়, তাহলে ব্যবহার করা যাবে। আমরা অনেকে যাচাই করা ছাড়াই বাজার থেকে সিল্কের কাপড় কিনে পাঞ্জাবী তৈরি করে নেই, যাচাই করে নেয়া চাই।

পুরুষ ও নারীর লেবাস-পোশাকের মধ্যে আর একটা পার্থক্য হল– পুরুষের জন্য সব রঙ্গের পোশাক পরিধান করার অনুমতি নেই। কিন্তু নারীদের জন্য রসব রঙ্গের পোশাক জায়েয। পুরুষের জন্য কুসুম-লাল, হলুদ, জাফরান এবং গোলাপী রঙ নিষিদ্ধ আর নিরেট লাল হলে তা জায়েয তবে উত্তম নয়। মহিলাদের জন্য সব রং-এর পোশাক জায়েয। পুরুষের জন্য সাদা রংয়ের পোশাকই সর্বোত্তম পোশাক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা রঙ্গের কাপড় বেশী পছন্দ করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল এবং সবুজ রংয়ের কাপড়ও ব্যবহার করেছেন, তাই সর্বদা শুধু সাদাই নয় বরং নিষিদ্ধ রংগুলো ব্যতীত অন্যান্য রঙ্গের কাপড়ও মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

যাহোক নারী ও পুরুষের লেবাস-পোশাকের মধ্যে যে পার্থক্য রাখা হয়েছে, সেই পার্থক্য মেনে চলতে হবে। এটা ইসলামী লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে বিশেষ একটা বিষয়।

ইসলামী লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ বিষয় হল– লেবাস-পোশাকের যে উদ্দেশ্য লেবাস-পোশাক দ্বারা সে উদ্দেশ্য পূরণ হতে হবে। যে পোশাক দ্বারা সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না, সে পোশাক পোশাকের হুকুমে আসবে না। পোশাকের দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا. (সূরা আ'রাফ: ২৬)

অর্থাৎ, হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং যা বেশ-ভূষাও।

এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে, পোশাকের উদ্দেশ্য হল– দুইটা। এক. লজ্জাস্থান আবৃত করা। দুই. সৌন্দর্য আনয়ন করা।

পোশাকের উদ্দেশ্য যেহেতু সতর ঢাকা ও সৌন্দর্য আনয়ন করা, তাই পোশাক পরিধান করার বেলায় নিয়ত থাকবে সতর ঢাকা, শারীরিক দোষ-ত্রুটি ঢাকা ও সৌন্দর্য লাভের নিয়ত। আর আল্লাহর দেয়া সম্পদ দিয়ে এই পোশাক সংগ্রহ করা হয়েছে, তাই আল্লাহর দেয়া সম্পদের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর নিয়তে এবং শোকর আদায়ের নিয়তে পোশাক পরিধান করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন নিয়ত থাকবে না। ভাল পোশাক পরিধান করার সময় সাধারণত অহংকার এসে যেতে পারে। অহংকারের উদ্দেশ্যে পোশাক পরা হারাম। যত উত্তম পোশাকই পরিধান করুক, সে জন্য অহংকার যেন আসতে না পারে। অনেক সময় নিম্নমানের পোশাক বা পুরাতন পোশাক কিংবা ছেঁড়া ফাটা ও তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার পেছনেও অহংকার থাকতে পারে। তা এভাবে যে, চিন্তা করা হল যে, এরূপ পোশাক দেখে লোকেরা আমাকে দরবেশ বা আত্মভোলা বলবে কিংবা বিনয়ী ও দুনিয়াত্যাগী মনে করবে- এরূপ রিয়া বা লোক দেখানোর নিয়ত থাকলে সেটাও এক প্রকার অহংকার। কোনভাবেই অহংকার থাকতে পারবে না বরং তাওয়াযু' বা বিনয় থাকতে হবে। তাওয়াযূ বা বিনয়ের উদ্দেশ্যে নিম্নমানের পোশাক, পুরাতন পোশাক কিংবা ছেঁড়া ফাটা ও তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করা উত্তম। আবার কেউ যদি এই মনোভাব নিয়ে দামী পোশাক পরিধান করে যে, আল্লাহ আমাকে সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদের প্রকাশ ঘটুক, বখীলীর প্রকাশ না ঘটুক, তাহলে এই দৃষ্টিভংগীতে দামী ও উত্তম পোশাক পরিধান করাও উত্তম। অহংকার প্রদর্শন বা বিলাসিতার নিয়তে উচ্চমানের পোশাক পরিধান করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সারকথা– পোশাক কম দামী হবে না বেশী দামী হবে এটা মূল দেখার বিষয় নয়। মূল কথা হল যেমন পোশাকই হোক তার মধ্যে অহংকার থাকতে পারবে না। আর একটা মূল কথা হল কাপড় যেমন মানেরই হোক তা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যাহোক বলা হচ্ছিল যে, পোশাকের উদ্দেশ্য হল সতর ঢাকা ও সৌন্দর্য আনয়ন করা।

পোশাকের উদ্দেশ্য যেহেতু সতর ঢাকা ও সৌন্দর্য আনয়ন করা, তাই নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ রাখা হয়েছে এরকম-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَااُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ. (رواه الترمذي في أحاديث شتى من أبواب الدعوات وقال: حسن غريب)

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি লজ্জাস্থান আবৃত করি এবং তার দ্বারা জীবনকে সৌন্দর্য মন্ডিত করি।

পোশাকের উদ্দেশ্য যেহেতু সতর ঢাকা ও সৌন্দর্য আনয়ন করা, তাই ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কোন পোশাক যদি এতই পাতলা হয় যে, শরীরের লজ্জাস্থান ও সতর দেখা যায় তাহলে তা পোশাক বলে গণ্য হবে না, এমন পাতলা কাপড় পরিধান করা না করারই হুকুম রাখে। কারণ, তাতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

পোশাকের যে উদ্দেশ্য তা পূরণ হয় না। এমন পাতলা কাপড় পরিধান করার পরও সতর ও লজ্জাস্থান প্রকাশের গোনাহ হবে। এরকম পোশাকের ব্যাপারেই এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِى الْاٰخِرَةِ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٦٢١٨)

এ হাদীছের এক ব্যাখ্যা হল– অনেক নারী দুনিয়াতে পোশাক পরিধান করে, কিন্তু পরকালে তারা উলঙ্গ গণ্য হবে। তাদের পোশাক পরিধান করা না করারই হুকুম রাখে।

পোশাকের উদ্দেশ্য যেহেতু সতর ঢাকা ও সৌন্দর্য আনয়ন করা, তাই এত টাইট-ফিট পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ, যাতে শরীরের গোপন অঙ্গ ফুটে ওঠে। কারণ, তাতে পোশাকের যে উদ্দেশ্য তা পূরণ হয় না। আজকাল অনেক মা বোনেরা এমন টাইটফিট পোশাক পরিধান করেন যে, তাদের শরীরের বিভিন্ন অংগের সাইজ পর্যন্ত ভেসে ওঠে, এরকম পোশাক পরা নিষিদ্ধ। অনেক পুরুষও এমন টাইটফিট প্যান্ট পরিধান করেন যে, লজ্জাস্থান পর্যন্ত পোশাকের উপর দিয়ে অনুমান করা যায়। এরকম পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। একে তো পরেন টাইটফিট প্যান্ট তারপর শার্টটাও আবার পরেন ইন করে, যাতে লজ্জাস্থানটা খুব ভাল করেই ভেসে ওঠে! এভাবে লজ্জাস্থান দেখানো তো শরমেরও ব্যাপার। শরম বোধ জাগ্রত হওয়া চাই।

ইসলামী লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ বিষয় হল– লেবাস-পোশাক পরিধান করার যে তরীকা ও নিয়মনীতি রয়েছে, তা মানতে হবে। যেমন কামিজ, জামা, কোর্তা, ছদরিয়া ইত্যাদি পরিধান করতে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ঢুকানো সুন্নাত। এমনিভাবে পায়জামা পরিধান করতে প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ঢুকানো সুন্নাত এবং খোলার সময় এর বিপরীত বাম দিক থেকে খোলা সুন্নাত। অর্থাৎ, প্রথমে বাম হাতেরটা খুলবেন তারপর ডান হাতেরটা খুলবেন, প্রথমে বাম পায়েরটা খুলবেন তারপর ডান পায়েরটা খুলবেন। মোজা, জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদি পরিধান করার ক্ষেত্রেও প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ঢুকানো সুন্নাত এবং খোলার সময় প্রথমে বাম পায়েরটা তারপর ডান পায়েরটা খোলা সুন্নাত।

একই সময়ে জামা ও পায়জামা উভয়টি পরিধান করতে হলে আগে জামা পরে পায়জামা পরিধান করা উত্তম। পায়জামা বসে পরিধান করা ভাল, দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করতে গেলে স্বাস্থ্যগত অসুবিধা হতে পারে। লুঙ্গি মাথার উপর দিক থেকে পরিধান করা নিয়ম।

যারা পাগড়ী পরিধান করবেন, তাদের জানা দরকার পাগড়ীর নীচে টুপি পরা সুন্নাত। টুপি ব্যতীত শুধু পাগড়ী পরিধান করা সুন্নাতের পরিপন্থী। নামাযের সময় মাথার মাঝখান খোলা রাখা মাকরূহ। পাগড়ী গোল করেও বাঁধা যেতে পারে আবার পাগড়ীর শামলা অর্থাৎ, পাগড়ীর বর্ধিত অংশ রেখেও বাঁধা যেতে পারে। উভয় পন্থায়ই সুন্নাত আদায় হবে। শামলা ডান দিকেও ছাড়া যায় পেছনের দিকেও ছাড়া যায় অথবা একই সাথে উভয় দিকেও ছেড়ে দেয়া যায়। শামলা এক বিঘত, এক হাত বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ রাখা যায়। পাগড়ী দাঁড়িয়ে পরিধান করা নিয়ম।

এ পর্যন্ত ইসলামী লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের বিশেষ পাঁচটি মৌলিক দৃষ্টিভংগি নিয়ে আলোচনা করা হল।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ও ইসলামী সংস্কৃতির বিশেষ দিক লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভংগি মেনে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৩০

গোঁফ, দাড়ি ও চুল প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْفُوا اللُّحٰى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ও ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ইসলামে ইবাদত-বন্দেগী যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আচার-আচরণ, সমাজ-সামাজিকতা, উঠা-বসা, চলাফেরা ইত্যাদি তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে ইবাদত-বন্দেগীর যেমন নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে, আচার-আচরণ, সমাজ-সামাজিকতা, উঠা-বসা, চলাফেরা ইত্যাদি তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। এই ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের মধ্যে লেবাস-পোশাক সম্বন্ধে গত জুমুআয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল।

ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের মধ্যে গোঁফ, দাড়ি, চুল নখ কেমন হবে বা কেমন হবেনা এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। গোঁফ, দাড়ি, চুল নখ-এর ক্ষেত্রেও ইসলামের নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। এই নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা অনেকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং এগুলো না করলে গোনাহ হবে বলে বিশ্বাস রাখি, কিন্তু গোঁফ, দাড়ি, চুল নখ-এর নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলাকে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। অথচ নামায রোযা ছাড়লে যেমন গোনাহ হয়, দাড়ি, চুল, গোঁফ, নখ-এর ক্ষেত্রেও এমন কিছু নিয়মনীতি রয়েছে যা না মানলে গোনাহ হয়।

যেমন পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং অন্তত এক মুষ্ঠি লম্বা রাখা ওয়াজিব। অতএব দাড়ি মুণ্ডালে বা এক মুষ্ঠি পরিমাণের চেয়ে কম রেখে ছাটলে ওয়াজেব তরক হওয়ার কারণে হারাম হবে এবং গোনাহে কবীরা হবে। এক মুঠের চেয়ে লম্বা হলে তা ছেঁটে ফেলানো দোরস্ত আছে। ভাল দেখানোর জন্য পাকা দাড়ি উপড়ে ফেলা নাজায়েয। নীচের ঠোঁটের নিচের পশম যেটাকে বাচ্চা দাড়ি বলা হয় এটা কামানোকেও ফকীহগণ বিদআত বলেছেন, অতএব তা কামানো চাই না। দেখা গেল নামায রোযা ছাড়লে যেমন গোনাহ হয়, দাড়ির ক্ষেত্রেও গোনাহ হওয়ার ব্যাপার রয়েছে।

অনেক ভাই দাড়ির ওয়াজ করলে খারাপ বোধ করেন। অনেক ভাই দাড়ি রাখাকে অপছন্দ করেন। অথচ শরীয়তের কোন কথা বললে খারাপ বোধ করা বা শরীয়তের কোন বিধানকে খারাপ বোধ করা অনেক বড় অন্যায়। নিজের মধ্যে কোন আমলের ত্রুটি থাকলে সে বিষয়ে কেউ বললে খারাপ বোধ না করা চাই। বরং নিজের মধ্যে যেন আমল আসে তার জন্য দুআ করা চাই এবং এতদিন যে আমল করতে পারিনি, তার জন্য তওবা করা চাই। আর যিনি এ বিষয়টা বলে আমাকে সতর্ক করছেন তার প্রতি খুশী হওয়া চাই। কারণ, তার এই সতর্ক করার কারণে হয়তো আমার মধ্যে আমল আসবে এবং আমি গোনাহ থেকে রক্ষা পাব। কেউ কোনদিন সতর্ক না করলে, কেউ কোনদিন নসীহত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

না করলে হয়তো কোনদিনই আমার মধ্যে আমল আসবে না। কাজেই তার প্রতি অসন্তুষ্ট নয় বরং সন্তুষ্ট হওয়া চাই।

দাড়ি না রাখার পেছনে বেশ কিছু কারণ কাজ করে থাকে। সেই কারণগুলি সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করা দরকার। তাহলে হয়তো আমাদের ভুল ভাঙ্গবে এবং আমাদের পক্ষে দাড়ি রাখা সহজ হয়ে উঠবে। আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি দাড়ি না রাখার পেছনে ৬ টা কারণ কাজ করে থাকে।

দাড়ি না রাখার একটা কারণ হল– আমাদের অনেক ভাই একটা ভুল ধারণার মধ্যে রয়েছেন যে, দাড়ি রাখা সুন্নাত, না রাখলে এমন কোন মারাত্মক কিছু নয়। তারা মনে করেন হুজুররা অহেতুক কড়াকড়ি করেন, ছোট্ট বিষয়কে বড় করে দেখান, এটা হুজুরদের বাড়িবাড়ি। তাদের এই ধারণা ভুল। দাড়ি রাখা সুন্নাত নয় বরং দাড়ি রাখা ওয়াজেব এবং চারও মযহাবের ইমামগণের নিকট দাড়ি রাখা ওয়াজেব। এটা হুজুরদের বাড়াবাড়ি নয় বরং হাদীছের হুকুম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন,

اَعْفُوا اللُّحٰى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ. (رواه النسائي في سننه برقم ٥٠٤٦ وأحمد في المسند برقم ٥١٣٥ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح)

অর্থাৎ, গোঁফ একেবারে ছোট করে রাখ এবং দাড়ি ছেড়ে দাও।

এ হাদীছের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, দাড়ি ছেড়ে দেয়াই মূল হুকুম। তবে সাহাবীদের আমল থেকে বোঝা যায় এক মুষ্ঠি পরিমাণ রেখে তার চেয়ে বর্ধিত অংশ ছেটে ফেলা যায়। এ হাদীছেরই আলোকে উলামায়ে কেরাম গোঁফের ব্যাপারে বলেছেন, গোঁফ ছেঁটে এত ছোট করে রাখবে যেন মুণ্ডানোর ন্যায় হয়ে যায়, এরূপ করা উত্তম। গোঁফ দুই দিক থেকে লম্বা করা জায়েয আছে কিন্তু যেন ঠোটের উপর না পড়ে– এভাবে ছোট করে রাখা সুন্নাত।

দাড়ি রাখা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ। দাড়ি রাখা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত– এই হিসেবে এটাকে সুন্নাত বলা হয়ে থাকে। নতুবা ফেকাহর হুকুম অনুযায়ী দাড়ি রাখা ওয়াজেব। যা হোক দাড়ি না রাখার একটা কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

দাড়ি না রাখার আর একটা কারণ হল– বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের অপছন্দ করা। অনেকেই দাড়ি রাখেন না এই অজুহাতে যে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন পছন্দ করে না। এই অজুহাত কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন নামায পড়া পছন্দ না করলে কি নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয হয়ে যাবে? বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন বিবিকে পর্দায় রাখা পছন্দ না করলে কি পর্দা ত্যাগ করা জায়েয হয়ে যাবে? বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন পাঞ্জাবী টুপি ইত্যাদি ইসলামী লেবাস পরা পছন্দ না করলে কি তা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে? বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের অপছন্দ করাকে গুরুত্ব দিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে, না কি আল্লাহ আল্লাহর রসূলের অপছন্দ করাকে গুরুত্ব দিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে? মনে রাখতে হবে শরীয়তের কোন হুকুম ছেড়ে দেয়ার কারণে যখন আযাব হবে তখন এই বন্ধু-বান্ধব কোন কাজে আসবে না, তখন এই আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসবে না। দ্বীনের উপর চলতে যেয়ে এই মানসিকতা রাখতে হবে যে, কে অপছন্দ করল তার কোন পরওয়া নেই, আমি কারও পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কা করি না, আমি দেখব আল্লাহ আল্লাহর রসূলের পছন্দ কি।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তারপর আরও একটা বিষয় চিন্তা করে দেখা চাই। তাহল বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছেই যে দাড়ি অপছন্দনীয় তা নয়। বরং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা দ্বীনদার পরহেযগার তাদের কাছে তো দাড়ি রাখাই পছন্দনীয়। এখন মুসলমান হিসেবে দ্বীনদার বন্ধু-বান্ধব ও দ্বীনদার আত্মীয়-স্বজনের পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া উচিত না কি ফাসেক ফাজের ও বদ-দ্বীন বন্ধু-বান্ধব ও ফাসেক ফাজের বদ-দ্বীন আত্মীয়-স্বজনের পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া উচিত তা নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে। যাহোক দাড়ি না রাখার পেছনে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের অপছন্দ করার কারণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

দাড়ি না রাখার আর একটা কারণ হল– বিবির অপছন্দ করা এবং এটা দাড়ি না রাখার বেশ বড় ধরনের কারণ। বিবি পছন্দ করেনা বলে সমাজের অনেকেই দাড়ি রাখতে পারেন না। ঐ সব ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করি বিবি পছন্দ না করলে কি নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয হয়ে যাবে? বিবি পছন্দ না করলে কি শরীয়তের কোন হুকুম ছেড়ে দেয়া জায়েয হয়ে যাবে? শরীয়তের কোন হুকুম ছেড়ে দেয়ার কারণে আযাব হলে কি বিবি সেটা ঠেকাতে আসবে না ঠেকাতে পারবে? কেয়ামতের দিন সকলে ইয়া নফ্সী ইয়া নফ্সী বলে যার যার চিন্তায় পেরেশান থাকবে, সেদিন মাতা-পিতা তাদের আদরের সন্তানকে ভুলে যাবে, ভাই বোন একে অপরকে ভুলে যাবে, স্বামী তার সোহাগের স্ত্রীকে ভুলে যাবে, স্ত্রীও তার সোহাগের স্বামীকে ভুলে যাবে। কাজেই দ্বীনের কোন বিধান মানতে গেলে যদি স্ত্রী অপছন্দ করে তাহলে স্ত্রীকে বোঝাতে হবে, বোঝানোর পরও না মানলে নিজে আমল করেই যেতে হবে। আর তার যেন বুঝ হয়ে যায় সেজন্য দুআ করতে হবে। তারপর একটা বাস্তব কথা হল আমল করতে শুরু করলে এক সময় স্ত্রীও আর তার বিরুদ্ধে থাকে না। এক সময় সেও মেনে যায়।

অনেক ভাই মনে করেন দাড়ি রাখলে স্ত্রীর কাছে আদর কমে যায়। এটা ভুল কথা। যারা দাড়ি রাখে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন তো তারা তাদের স্ত্রীদের কাছে আদর সোহাগ কম পায় কি না? শিখ জাতির সকলেই তো দাড়ি রাখে। তাহলে কি গোটা শিখ জাতি স্ত্রীদের আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত? ইয়াহুদীদেরও অনেকে দাড়ি রাখে, তারা কি তাদের স্ত্রীদের আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত থাকে? এই সব ভুয়া কল্পনার পিছনে না দৌড়ে বাস্তব আমলে এসে দেখুন দ্বীনের সব কিছুর মধ্যে মজা রয়েছে। দ্বীনের সবকিছুর মধ্যে দুনিয়া আখেরাত সব জগতের কামিয়াবী রয়েছে।

দাড়ি না রাখার আর একটা কারণ হল– অনেকে মনে করে দাড়ি রাখলে বয়সী দেখাবে, মানুষে চাচা বলবে, লজ্জা লাগবে ইত্যাদি। আমাদের যার যা বয়স হয়েছে তা প্রকাশ করতে লজ্জা কেন? বরং বয়স বেশী হলে তা প্রকাশই করে দেয়া উচিত। আমার বয়স বেশী, অথচ দেখালাম কম, তাহলে তো মানুষের সাথে প্রতারণা করা হল। এজন্য বয়স গোপন রাখার প্রচেষ্টা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ভাল জিনিস নয়। একমাত্র জেহাদের ময়দানে শত্রুপক্ষের কাছে বিরত্ব প্রকাশ করার জন্য নিজের বয়সকে ঢাকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়। তাই জেহাদের ময়দানে শত্রুর সামনে নিজের সাদা দাড়িতে কাল খেযাব লাগানো যায়, যাতে শত্রুপক্ষ নওজোয়ান শক্তিশালী মনে করে। আমাদের মধ্যে আসল বয়স গোপন রেখে বয়স কম প্রকাশ করার একটা প্রবণতা ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সার্টিফিকেটে বয়স কম লেখা হয়, পাসপোর্টে বয়স কম লেখা হয়, অনেক স্থানেই বয়স কম বলা হয় বা কম লেখা হয়। এটা এক ধরনের জালিয়াতী ও মিথ্যাচার। অবশ্যই এটা গোনাহের কাজ। অতএব সার্টিফিকেটে বয়স কম দেখাতে পারলে হয়তো কয়েক বৎসর সরকারী চাকুরী বেশী করা যাবে কিন্তু মনে রাখতে হবে অবশ্যই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এটা মিথ্যাচার ও জালিয়াতী। আর কোন মিথ্যাচার ও জালিয়াতির মধ্যে কোন সফলতা থাকতে পারে না। কয়েক বৎসর চাকুরী বেশী করতে পারা যাবে এর জন্য এই মিথ্যাচার ও জালিয়াতী কোনক্রমেই বৈধ হয়ে যাবে না। ঐ দুই চার বৎসর চাকুরী বেশী করলেও তাতে কোন সফলতা আসবে না। অতএব বয়স সঠিকটাই প্রকাশ করা চাই। বয়স বেশী হলে নির্দ্বিধায়, অকপটে তা প্রকাশ করে দেয়া চাই।

বয়স বেশী হওয়া কোন অসম্মানের বিষয় নয়, বরং বয়স বেশী হলেই অনেক ক্ষেত্রে মুরব্বী ও গুরুজন হিসেবে সম্মান বেশী পাওয়া যায়। বয়স কম থাকার দাম আছে শুধু এক ক্ষেত্রে। তা হল যদি কোন কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে চান বা কম বয়সী মেয়ের কাছে আকর্ষণীয় হতে চান। তাহলে এখন ভেবে দেখুন কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে চাই– সদা সর্বদা এই মুড নিয়ে চলা কতখানি বালখিল্যতা! আর যদি কোন বয়সী মেয়েকে বিয়েই করতে না চান, তাহলে তার কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলাতে লাভ কি? যাহোক দাড়ি রাখলে বয়স বেশী দেখাবে– এই অজুহাতে দাড়ি রাখার মত একটা ওয়াজেব হুকুমকে বর্জন করার কোনই অবকাশ নেই। এটা দাড়ি না রাখার কোন উল্লেখযোগ্য কারণ নয়।

দাড়ি না রাখার আর একটা কারণ হল– চাকুরীর সমস্যা। অনেক প্রতিষ্ঠানেই দাড়ি ওয়ালা লোকদেরকে চাকুরী দিতে পছন্দ করা হয় না। কিংবা চাকুরী হয়ে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ দাড়ি রাখাতে সম্মতি দিতে রাজি থাকে না। এ কারণে অনেক যুবক চাকুরী পাওয়ার বিষয়টা চিন্তা করে দাড়ি রাখতে ইতস্তত বোধ করেন। আবার চাকুরী পাওয়ার পরও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দাড়ি রাখতে সমস্যা বোধ করেন। এ ধরনের পরিস্থিতির মাসআলা জেনে নিন। যদি জীবন জীবিকা চালানোর মত আর কোন বৈধ আয় রোজগারের ব্যবস্থা না থাকে, আর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী রক্ষা করতে গেলে দাড়ি না রাখতে দেয়া না হয়, তাহলে বিকল্প বৈধ আয়-রোজগারের জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে। যতদিন সেরকম বিকল্প ব্যবস্থা না হয়, ততদিনের জন্য সেই চাকুরী রক্ষার স্বার্থে দাড়ি রাখতে না পারলে আশা করা যায় ওজরের ভিত্তিতে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন। যখন বিকল্প ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন এই চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে।

দাড়ি না রাখার আর একটা কারণ হল– দাড়ি রাখলে ভাল দেখাবে না মনে করা। বিশেষত যাদের চেহারা লম্বাটে হওয়ার কারণে দাড়ি হয় সামান্য নীচের দিকে অল্প কয়েকটা বা আশে পাশে না হয়ে শুধু নীচের দিকে ঝুলন্ত হয়, তারা মনে করে এই দাড়ি ভাল লাগবে না, চাপ দাড়ি হলে রাখতাম। অনেকে এরকম দাড়িকে নাম দিয়ে থাকেন ছাগলে দাড়ি। এরূপ নাম দেয়া ঠিক নয়। এই নামের মধ্যে দাড়ির মত একটা সম্মানিত বিষয়কে হেয় করা হয়। মুসলমানের দাড়ি হেয় করার বিষয় নয় বরং সম্মান করার বিষয়। তাই মাসআলা রাখা হয়েছে কোন দাড়ি ছিড়ে গেলে বা এক মুষ্ঠির অতিরিক্তটা কেটে ফেললে সেই ছেড়া দাড়ি বা কাটা দাড়ি এমন স্থানে ফেলতে হবে যেখানে কারও পা না লাগে। সেই দাড়ি কোন নোংরা স্থানে ও ময়লা আবর্জনার মধ্যে না ফেলা চাই। এটা এ কারণে যে, দাড়ি সম্মানিত জিনিস। শুধু দাড়ি কেন চুল, পশম, নখ ইত্যাদি মানুষের সবকিছুই সম্মানিত। তাই চুল, পশম, নখ কোনটাই কোন নাপাক স্থানে বা ময়লা আবর্জনার স্থানে না ফেলা চাই। অতএব "ছাগলে দাড়ি" কথাটা বর্জন করা উচিত। কারণ, এই কথাটার মধ্যে দাড়ির প্রতি উপহাস বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। যাহোক, আমার চেহারা যেমন দাড়িও তেমন হবে, তা সেই দাড়ি ভাল দেখাল না কেমন দেখাল সেটা বড় বিবেচনার বিষয় নয়, বিবেচনার বিষয় হল দাড়ি রাখা ওয়াজেব, তাই আমাকে দাড়ি রাখতে হবে। যদি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কারও কাছে সেটা খারাপ দেখায়ও, তারপরও যদি আমি রাখি, তাহলে নফসের সাথে আমার মুজাহাদা অন্যদের তুলনায় বেশী হবে, তাহলে এ কারণে আল্লাহর কাছে আমার মর্যাদাও বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আর দড়ি রাখলে ভাল দেখাবে না এই কথাটাও একক সত্য নয়। বরং যারা দ্বীনদার পরহেযগার মানুষ, তাদের কাছে দাড়ি রাখলেই ভাল দেখায়। যারা ফাসেক ফাজের তাদের কাছে দাড়ি ভাল না লাগলেও নেককার পরহেযগার মানুষদের কাছে দাড়ি ভাল লাগে। এখন মনের সাথে বোঝা পড়া করে দেখতে হবে, ভাল মানুষদের কাছে ভাল হওয়া ভাল না খারাপ মানুষদের কাছে ভাল হওয়া ভাল। মনে মনে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেয়া চাই যে, আমি ভাল মানুষদের প্রিয় হব না কি খারাপ মানুষদের প্রিয় হব। ভাল মানুষদের প্রিয় হলে ভাল মানুষদের সাথে আমার ভালবাসা গড়ে উঠবে, আর তাদের সাথেই আমার হাশর নশর হবে। পক্ষান্তরে খারাপ মানুষদের সাথে আমার ভালবাসা গড়ে উঠলে সেই খারাপ মানুষদের সাথেই আমার হাশর নশর হবে। যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ ঘটবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে খারাপ মানুষদের সাথে হাশর নশর হওয়া থেকে হেফাজত করুন। আমীন!

এই হল ৬ টা কারণ, যার ভিত্তিতে অনেক ভাই দাড়ি রাখতে পারছেন না। আসলে শরীয়ত যদি কারও কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে এসব কারণ তার জন্য কোন কারণ থাকবে না। মনের মধ্যে শরীয়তের গুরুত্ব বদ্ধমূল থাকলে এসব কারণ মনের কাছে কোন স্থান পাবে না।

যাহোক, এতক্ষণ দাড়ি সম্পর্কে কিছু কথা বলা হল। চুলের বিষয়টাও শরীয়তে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। চুলের ক্ষেত্রেও এমন কিছু নিয়মনীতি রয়েছে, যা না মানলে গোনাহ হয়। চুলের ক্ষেত্রেও গোনাহের ব্যাপার রয়েছে। যেমন পুরুষরা মহিলাদের ন্যায় চুল রেখে খোপা বাধলে বা বেণী বাধলে হারাম হবে এবং গোনাহে কবীরা হবে। পুরুষদের জন্য মহিলাদের মত চুল রাখা না জায়েয। এমনিভাবে মাথার কিছু অংশ কামানো আর কিছু অংশে চুল রাখাও নাজায়েয। রোগ ব্যাধির কারণে হলেও কিছু অংশের চুল মুণ্ডানো আর কিছু অংশে চুল রাখা জায়েয নয়। মুণ্ডাতে হলে সমস্ত মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলতে হবে। মাথায় টিকি রাখাও না জায়েয। কোন দরগায় মান্নত মেনে জন্মচুল রাখাও নাজায়েয। দেখা গেল নামায রোযা তরক করলে যেমন গোনাহে কবীরা হয়, চুলের ক্ষেত্রেও এমন কিছু বিধান রয়েছে যা না মানলে গোনাহে কবীরা হয়। কাজেই চুলের বিধানও শরীয়তে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

চুল কতটুকু রাখতে হবে কতটুকু ছাঁটতে হবে তার মাসায়েল আমরা অনেকে জানি। পুরুষদের জন্য সমস্ত মাথায় বাবরি রাখা সুন্নাত। বাবরি তিন ভাবে রাখা যায়। এক. চুল বড় হয়ে কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত আসবে। দুই. চুল বড় হয়ে কানের লতি পর্যন্ত আসবে। তিন. চুল বড় হয়ে কাঁধ পর্যন্ত আসবে। এই হল সব সময়ের জন্য চুলের সুন্নাত। অর্থাৎ, বাবরি রাখা সার্বক্ষণিক সুন্নাত। আর হজ্জ ও উমরার সময় সমস্ত মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা সুন্নাত। এছাড়া মাথার সব স্থানে সমান করে চুল ছেঁটে ফেলা জায়েয তবে এতে সুন্নাত আদায় হবে না। এর বাইরে আজকাল অনেক ভাই যে হিপ্পী রাখেন, যা ব্যাপক ভাবে সমাজে চলছে, এটা ফাসেক ফাজেরদের ফ্যাশন। এটা নেককার পরহেযগার মানুষের আমল নয়। এটা বর্জন করা উচিত। মনে রাখতে হবে যারা ফাসেক ফাজেরদের অনুকরণ অনুসরণ করবে, তাদের হাশর নশর হবে ফাসেক ফাজেরদের সাথে। আর যারা নেককার পরহেযগার মানুষের অনুকরণ অনুসরণ করবে তাদের হাশর নশর হবে নেককার পরহেযগার মানুষদের সাথে। হে আল্লাহ! আমাদের যুবক ভাইদের মধ্যে উপলব্ধি দিয়ে দাও যে, নেককার পরহেযগার মানুষদের সাথে হাশর নশর হওয়ার গুরুত্ব কতখানি।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

চুলের ক্ষেত্রে শরীয়তের একটা বড় মূলনীতি হল পুরুষ ও মহিলাদের চুলের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে। তাই পুরুষরা মহিলাদের ন্যায় চুল রাখতে পারবে না। আবার মহিলারাও পুরুষদের ন্যায় চুল ছাটতে বা মুন্ডাতে পারবে না। এজন্যই মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা হারাম। হাদীছ শরীফে এরূপ মহিলাদের প্রতি লা'নত এসেছে। অতএব এখন বুঝে দেখুন যেসব মহিলারা বিউটি পার্লারে সাজতে গিয়ে চুল যেভাবে ছেটে আসে তার দ্বারা তারা লা'নতেরই পাত্র হয়ে আসে। আল্লাহ সকলকে সহীহ বুঝ নসীব করেন।

মাথার চুল ছাড়া শরীরের অন্যান্য স্থানের পশমেরও বিস্তারিত মাসায়েল রয়েছে। যেমন জরূরী কয়েকটা মাসায়েল শুনে নিন।

* নাভির নীচের পশম পুরুষের জন্য কামিয়ে ফেলা উত্তম। কোন রকম লোম নাশকের দ্বারা উপড়ে ফেলাও জায়েয আছে। মেয়েদের জন্য উপড়ে ফেলাই সুন্নাতের মোয়াফেক।

* নাভির নীচের পশম কামানোর সময় নাভির দিক থেকে শুরু করা নিয়ম। অন্ডকোষ, তার নীচে ও মলদ্বারে পশম থাকলে সবই কামিয়ে ফেলবে।

* নাকের মধ্যের পশম না উপড়িয়ে কাঁচির দ্বারা কাটা উত্তম।

* বগলের পশম উপড়ে ফেলাই উত্তম, তবে কামানোও জায়েয। বিনা অপারগতায় অন্যের দ্বারা বগলের পশম সাফ করানো ভাল নয়। অপারগতা থাকলে ভিন্ন কথা। অনেক ভাইকে দেখা যায় অপারগতা ছাড়াই সেলুনে যেয়ে বগলের পশম কামানোর জন্য নাপিতের সামনে বগল খুলে দিয়ে তার দ্বারা পশম ছাফ করান, এটা অনুচিত। এটা এক ধরনের লজ্জাহীনতা। এবং এটা অন্যের মনে ঘৃণা উদ্রেক করার মত একটা কাজ, যা অন্যায়।

* কানের মধ্যে পশম থাকলে তাও কেটে ফেলতে হবে।

* বুক ও পিঠের পশম কামানো জায়েয আছে তবে ভাল নয়।

* পায়ের নলা, রান ও হাত ইত্যাদির পশম রাখা এবং কাটা উভয়ই দোরস্ত আছে।

* বগলের পশম, নাভির নীচের পশম, গোঁফ ইত্যাদি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা মোস্তাহাব। শুক্রবার জুমুআর নামাযের আগেই এসব থেকে পাক সাফ হয়ে মসজিদে যাওয়া উত্তম। দু' সপ্তাহে একবার করলেও জায়েয। একেবারে শেষ সীমা চল্লিশ দিন। এ সব থেকে পাক সাফ না হওয়া অবস্থায় চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গোনাহ হবে।

* জানাবাতের অবস্থায় অর্থাৎ, যখন গোসল ফরয হয়, তখন চুল বা এসব পশম কাটা ছাঁটা মাকরূহ।

* ভ্রু যদি বিশৃংখল থাকে তাও কিছু কিছু কেটে-ছেঁটে সমান করে দেয়া দুরস্ত আছে। তবে মহিলাগণ বর্তমানে যেভাবে ভ্রু তুলে একেবারে সরু করে রাখে, এটা আল্লাহ্‌র দেয়া গঠনে এক ধরনের বিকৃতি। এ থেকে বিরত থাকা চাই।

এ ছাড়াও দাড়ি, চুল ও শরীরের অন্যান্য স্থানে পশমের আরও বিস্তারিত মাসায়েল রয়েছে, সেগুলো জেনে আমল করা চাই।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আজকের বয়ানের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং - ৩১

পর্দা প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ.

মুসল্লিয়ানে কোরাম!

গত কয়েক জুমুআ যাবত ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ও ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। ইসলামী লেবাস-পোশাক, দাড়ি, টুপি ইত্যাদি ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নারীদের পর্দাও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পর্দার বিষয় এমন হালকা কোন বিষয় নয় যে, ইচ্ছা হয় করলাম ইচ্ছা না হয় করলামনা। এরকম হালকা বিষয় নয়, বরং এটা ফরয পর্যায়ের বিষয়। নারীদের জন্য পর্দা করা ফরয। কিন্তু আমরা অনেকেই এটাকে খুব হালকা নজরে দেখি। অনেকে তো অপছন্দই করি, অনেকে তো এ বিধানটাকে মনে প্রাণে মানতেই চাই না। অথচ শরীয়তের কোন বিধানকে অপছন্দ করলে ঈমানের উপর আঁচড় এসে যায়। শরীয়তের কোন বিধানকে মনে প্রাণে না মানলে ঈমান থাকে না।

পর্দার বিষয়ে ওয়াজ করতে গেলে অনেক ভাই অপছন্দ করেন, অনেকে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখা চাই এই অপছন্দ করাটা, এই অস্বস্তি বোধ করাটা আল্লাহর বিধানের উপর গিয়ে পড়ে। এটা তো প্রকারান্তরে আল্লাহর বিধানকেই অপছন্দ করা হচ্ছে, আল্লাহর কথায় অস্বস্তি বোধ করা হচ্ছে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক! আল্লাহর সব বিধানকেই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে। মন পছন্দ করতে না চাইলেও জোর করে পছন্দ করানোর চেষ্টা করতে হবে, এভাবে এক সময় পছন্দ করতে শুরু করবে। দেখুন যদি কোন তীতা খাবার অপছন্দ লাগে, তা সত্ত্বেও উপকার মনে করে সেটা জোর করে খেতে থাকেন, তাহলে এক সময় সেটা আর খারাপ লাগবে না, বরং মজাদারই লাগবে। যেমন করলা একটা তরকারী, খেতে তীতা লাগে, কিন্তু খুব উপকারী, তাই মানুষে খায়। খেতে খেতে অনেকের কাছে এটা মজাদারও লাগে। তদ্রূপ পর্দার বিধানকেও জোর করে পছন্দ লাগানো চাই, অস্বীকার না করা চাই। যদি কোন বিধানের গুরুত্ব স্বীকার করার পরও কোন কারণে তা মানতে না পারি, তাহলে তওবা করে নিলে হয়তো এক সময় ক্ষমা পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন বিধানকে অস্বীকার করলে বা অপছন্দবশত পরিত্যাগ করলে ঈমান থাকবে না, তাহলে পরে কখনও তওবা করলেও তা কবূল হবে না। তাই আল্লাহর কোন বিধানকে অস্বীকার না করা চাই, কোন বিধানকে অপছন্দ না করা চাই। আল্লাহর কোন বিধান সম্পর্কে ওয়াজ বা বয়ান করা হলে তা অপছন্দ না করা চাই। জোর করে হলেও মনকে পছন্দ করানো চাই। কারণ, মনকে পছন্দ করানো জরুরী। ঈমান রক্ষার স্বার্থেই এটা জরুরী। দ্বীন রক্ষার স্বার্থেই এটা জরুরী।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

পর্দার বিধান হুজূরদের বানানো কোন বিধান নয়। পর্দার বিধান কোন মানুষের চাপিয়ে দেয়া বিধান নয়। পর্দার বিধান স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া বিধান, আল্লাহর রসূলের দেয়া বিধান। এটা ফরয পর্যায়ের বিধান। একাধিক আয়াত ও একাধিক হাদীছের ভিত্তিতে পর্দা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের সূরা আহযাবে পর্দার বিধান দিয়ে ইরশাদ করেছেন,

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى. (সূরা আহযাব: ৩৩)

অর্থাৎ, (হে নারীগণ!) তোমরা গৃহের মধ্যে অবস্থান করবে, অজ্ঞ যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।

সূরা আহযাবের আর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ. (সূরা আহযাব: ৫৯)

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে এই চাদর উড়নার উপর পরিধান করা হত এবং চেহারার উপর তা ঝুলিয়ে দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে দেয়া হত। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- এই চাদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হত এবং মাথার উপর দিয়ে ছেড়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে দেয়া হত।

এ আয়াতে পর্দার বিধান ফরয তা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আরও একটা বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করার হল– এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে পর্যন্ত পর্দা করতে বলা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের যেনার গোনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বলতে গেলে ছিলই না, কারণ শ্রেষ্ঠ নবীর স্ত্রী হয়ে যেনায় লিপ্ত হবে সেটা তো কল্পনাও করা যায় না। তাদের মন দেল ও তাকওয়া পরহেযগারী কত উন্নত পর্যায়ের। তারপরও তাদেরকে পর্দা করতে বলা হয়েছে। তাহলে বলুন যারা বলে আমাদের মন ঠিক আছে, মন ঠিক থাকলে পর্দা করা লাগে না, এই কথাগুলো কতটুকু ঠিক?

সূরা মু'মিনূন-এর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ. (সূরা নূর: ৩১)

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং যৌনাঙ্গ হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতার বিধান। অবশ্যই আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। আর মু'মিন নারীদেরকেও বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং যৌনাঙ্গ হেফাজত করে অর্থাৎ, সতীত্ব হেফাজত করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে না বেড়ায়।

এ আয়াতে একটা বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করার হল– এতে যৌনাঙ্গ হেফাজতের সাথে সাথে দৃষ্টি নত রাখা অর্থাৎ, নজর হেফাজতের কথাও বলা হয়েছে। বোঝা গেল যৌনাঙ্গ হেফাজতের সাথে নজর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হেফাজতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। নজর হেফাজত করলে যৌনাঙ্গ হেফাজত হয়। নজর হেফাজত না করলে যৌনাঙ্গ হেফাজত হয় না। নজর হেফাজত করা হল না, বেগানা নারীকে দেখা হল। এই দেখা থেকে আড় ভেঙ্গে যাবে, একটু একটু কথাও শুরু হবে, এই কথা বাড়তে বাড়তে ইটিস পিটিস শুরু হবে, এরপরে আস্তে আস্তে যেনার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। দেখা গেল নজর হেফাজত না করার কারণে যৌনাঙ্গের হেফাজত হল না। তাই নজর হেফাজত না করা হল যেনার দিকে অগ্রসর হওয়া। পর্দা না মানা হল যেনার দিকে অগ্রসর হওয়া। পর্দা রক্ষা না করা হল সতীত্ব নষ্ট করার দিকে অগ্রসর হওয়া। পক্ষান্তরে পর্দা রক্ষা করা হল সতীত্ব রক্ষার গ্যারান্টি। এজন্য শরীয়তে পর্দার রক্ষার প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য শরীয়তে পুরুষ হলে তার জন্য বেগানা নারীর প্রতি নজর করা অর্থাৎ, বেগানা নারীকে দেখা হারাম করা হয়েছে। আর নারী হলে তার জন্য বেগানা পুরুষকে দেখা হারাম করা হয়েছে। কারণ, বেগানা পুরুষকে দেখা এবং বেগানা নারীকে দেখা যেনার দিকে অগ্রসর করে। আর যে কাজ গোনাহের দিকে অগ্রসর করে সেটাও গোনাহের কাজ। তাই পুরুষ হয়ে বেগানা নারীকে দেখা এবং নারী হয়ে বেগানা পুরুষকে দেখাও গোনাহের কাজ। পর্দার বিধান মেনে চলা ফরয, পর্দার বিধান লঙ্ঘন করা গোনাহে কবীরা।

পর্দার এই বিধানকে লঙ্ঘন করে নারী সমাজ আজ সকল অঙ্গনে অবাধে বিচরণ করা শুরু করেছে। এক শ্রেণীর মানুষ নারী সমাজকে সব অঙ্গনে টেনে আনার চেষ্টা করছে। রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সহ সব অঙ্গনেই তাদেরকে টেনে আনছে। অফিস-আদালতের ছোট-খাট পদ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে পর্যন্ত তাদেরকে টেনে আনা হয়েছে এবং হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে চাঙ্গা করার জন্য মডেলিং ও এ্যাডভারটাইজিংয়ের নামে নারীর কমনীয় অভিব্যক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই মডেলিং ও এ্যাডভারটাইজিংয়ে যে নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে, তার পেছনেও যৌনতা কাজ করছে। নারীদেরকে ব্যবহার করে গ্রাহক ও ভোক্তাদের যৌন সুড়সুড়িকে উস্কে দিয়ে ব্যবসায়িক পণ্যের অনুকূলে তাদেরকে মানসিকভাবে দূর্বল করে দিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ছাড়া নারীদেরকে ব্যবহার করার পেছনে আর কি সু-মতলব থাকতে পারে? "নারী স্বাধীনতা", "নারী প্রগতি", "নারী মুক্তি", "নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি নামে যে সব দর্শন ও আন্দোলন চালু করা হয়েছে, তার পেছনেও এমনই মতলব কাজ করছে তা স্পষ্ট। নতুবা এই সব দর্শনের হোতারা নারীদেরকে এই শ্লোগান শিক্ষা দেয় কেন যে, স্বামীর ঘরে থাকব না, স্বামীর কথা মানব না, আমার দেহ আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব? বাহ্যিক ভাবে এবং মুখের ভাষায় তারা নারীদের প্রতি দরদ দেখিয়ে বলে থাকে নারীদের আর্থ সামাজিক উন্নতি ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য। কিন্তু এতটুকুই যদি তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য হয়ে থাকবে, তাহলে ইসলাম নারীদের সতীত্ব রক্ষার প্রধান নিয়ামক হিসেবে যে পর্দা ব্যবস্থার কথা বলেছে, সেটাকে তারা নারী প্রগতির অন্তরায় বলে আখ্যা দেয় কেন? কেন তারা পর্দা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে? এত স্পষ্টতঃই বোঝা যায় এসব দর্শনের হোতাদের কাছে নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির অর্থ হচ্ছে নারীর সতীত্ব হরণের অবাধ সুযোগ ও অধিকার। তাই নারী সমাজকে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে তারা এই সব কুমতলবী লোকদের যৌন লোভ চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহৃত হবে কি না। নারী সমাজকে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে তারা "নারী স্বাধীনতা", "নারী প্রগতি", "নারী মুক্তি" ইত্যাদি দর্শনের ধোকায় পড়ে তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ– সতীত্ব বিসর্জনের পথে পা বাড়াবে কি না। নারীরা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এই পথে অগ্রসর হলে যে তাদের সতীত্ব বিসর্জন দিতে হয়, তা কারও অজানা নয়। যে সব অঙ্গনে নারীদের পর্দাহীন অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তার একটা সিংহভাগ কিভাবে যেনার আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে তা অনেকেই জানে ও বোঝে। এ বিষয়টা কার অজানা আছে যে, চাকুরীরতা নারীদেরকে চাকুরী রক্ষার স্বার্থে উপরস্তদের কাছে অনেক কিছু বিলিয়ে দিতে হয়? প্রাইভেট সার্ভিসগুলোতে এ বিষয়টা এতটাই উলঙ্গ যে, পার্টির মাধ্যমে কোম্পানীর বিভিন্ন এজেন্টকে মনোরঞ্জনের দায়িত্ব দেয়া হয় নারীর উপর। অন্যথায় চাকুরী যাওয়ার হুমকী থাকে।

যখন "নারী প্রগতি", "নারী মুক্তি", "নারী স্বাধীনতা" ইত্যাদি নামে পর্দা লঙ্ঘন করা এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার বিরুদ্ধে বলা হয়, যখন উলঙ্গপনা ও বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে বলা হয়, যখন নারীদের ইসলামী পর্দা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়, তখন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বলে ওঠে, এগুলো প্রগতির পরিপন্থী, এগুলো সেকেলে জিনিস, বিজ্ঞানের যুগে এগুলো অচল। এগুলো দিয়ে উন্নতি করা যাবে না, তারা বলে পর্দার কথা বলে আমাদের সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তারা পাশ্চাত্যের উদাহরণ তুলে ধরে থাকে যে, তারা এই সমস্ত সেকেলে আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তাই তারা উন্নতি করেছে। তারা বলে, নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, নারী পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার ফলেই পাশ্চাত্য সমাজ উন্নতি করেছে। কিন্তু একথা আদৌ ঠিক নয়। উন্নতি হয় অফিস আদালতের অনিয়ম দূর হলে। উন্নতি হয় দূর্নীতি দূর হলে। উন্নতি হয় কর্ম দক্ষতা বাড়লে। উন্নতি হয় কাজের নিষ্ঠা বাড়লে। উন্নতি হয় দায়িত্ব বোধ বাড়লে। কিন্তু নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ও নারী পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার দ্বারা অফিস আদালতের অনিয়ম কিভাবে দূর হবে? এর দ্বার দূর্নীতি কিভাবে দূর হবে? এর দ্বারা কিভাবে কর্ম দক্ষতা বাড়বে? এর দ্বারা কিভাবে কাজের নিষ্ঠা বাড়বে? এর দ্বারা কিভাবে দায়িত্ব বোধ বাড়বে? একজন নারীকে অফিস-আদালতে উলঙ্গ করে রাখলে তাতে কি পুরুষদের কাজের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে না অকাজের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে? একটু বিবেক দিয়ে মুক্তমনে চিন্তা করে দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় আসলে উন্নতি হয় নিষ্ঠা, সততা, দায়িত্ব বোধ এই সমস্ত গুণের কারণে। এসব গুণের দ্বারাই উন্নতি আসে। এগুলোতো ইসলামের শিক্ষা দেয়া নীতি। পশ্চিমারা এই ইসলামী শিক্ষা ও নীতি গ্রহণ করেছে, ফলে তারা উন্নতি করেছে। অথচ আমরা ভাবছি তারা উন্নত হয়েছে উলঙ্গপনা ও বেহায়া বেলেল্লাপনার কারণে। কিন্তু আদৌ উলঙ্গপনার কারণে, বেহায়া, বেশরম হয়ে যাওয়ার কারণে তারা উন্নত হয়নি। ইসলামের শিক্ষা দেয়া উন্নতির মূলনীতিগুলো অবলম্বন করার ফলেই তারা উন্নতি করেছে। আমরা মুসলমানরা সেসব অবলম্বন করছিনা তাই উন্নতি করতে পারছি না। অথচ আমরা মনে করছি তারা উন্নত হয়েছে ইসলাম বর্জন করার ফলে। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তা-ই সমাজকে গলাধকরণ করানোর চেষ্টা করছে। মানুষকে ইসলাম থেকে সরানোর জন্যই পরিকল্পিতভাবে এরূপ করা হচ্ছে। ইসলামী আদর্শের প্রতি মানুষকে বিতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্যই এরূপ বলা হচ্ছে। ইসলামী আদর্শে মানুষ উন্নতি করতে পারে না, এগুলো মানুষকে পিছনের দিকে নিয়ে যায়। এসমস্ত কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। অথচ খাঁটি ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, খাঁটি ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উন্নতি হয় ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ করলে। যে ক্ষেত্রে ইসলামের যে নীতি মালা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে উন্নতি চাইলে ইসলামের সেই নীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে। অথচ মানুষকে বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে বোঝানো হয় যে, ইসলাম বর্জন করার মধ্যেই উন্নতি। আর কিছু মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে তাদের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সূরে সুর মিলায়। অবলা মুসলিম নারী সমাজ তাদের কথায় সরল বিশ্বাসে নিজেদের অমূল্য সম্পদ সতীত্ব বিসর্জনের পথে পা বাড়ায়।

নারী সমাজকে সুস্থ মস্তিষ্কে বুঝতে হবে যে, ইসলাম তাদেরকে কোণঠাসা করার জন্য বহিরাঙ্গন থেকে দুরে রাখতে চায় না। বরং তাদের জন্য পর্দার অন্তরালে কর্মক্ষেত্র রাখা হয়েছে এ কারণে যে, বহিরাঙ্গন তাদের সহজাত বৃত্তির অনুকূল নয়। দৈহিক, মানসিক কোনভাবেই বহিরাঙ্গন নারীত্বের অনুকূল নয়। জাতির ভবিষ্যত আজকের শিশুকে দৈহিক ও মানসিক সব দিক থেকে গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের কর্মক্ষেত্র রাখা হয়েছে গৃহের অভ্যন্তরে।

নারী সমাজকে সুস্থ মস্তিষ্কে বুঝতে হবে যে, নারীদের সতীত্ব ও চরিত্র রক্ষার স্বার্থেই তাদের কর্মক্ষেত্র পুরুষদের থেকে ভিন্ন রাখা হয়েছে। আর জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই নারীদের সতীত্ব ও চরিত্র রক্ষা করা প্রয়োজন। কেননা সন্তানের চরিত্রে মায়ের চরিত্রের বিরাট ভূমিকা থাকে। মায়ের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা যেমন হয়, সন্তানের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনাও তেমনই গড়ে ওঠে।

নারী সমাজকে আরও মনে রাখতে হবে মানবতার মুক্তিই হল প্রকৃত মুক্তি, সর্বোপরি পরকালের মুক্তিই হল প্রকৃত মুক্তি। তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা থাকলে সে সমস্যা থেকে মুক্তির প্রয়োজনীয়তাও উপেক্ষার নয়, তার জন্যেও সুষ্ঠু পন্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তাই বলে কোনক্রমেই যেন নারী সমাজ তাদের আসল মুক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার পথে অগ্রসর না হয়।

অনেক মা বোন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধান পালন করাকে জরুরী মনে করেন, কিন্তু পর্দা মানাকে জরুরী মনে করেন না। অথচ পর্দার বিধান ফরয। পর্দা লঙ্ঘন করা হারাম। পর্দা লঙ্ঘন করলে কবীরা গোনাহ হয়।

অনেক মা বোন ভাবেন পর্দা মেনে চলতে গেলে দম আঁটকে মরে যাব। অথচ তারা কি ভেবে দেখেন না যেসব মা বোন পর্দা মেনে চলছেন তারা কি দম আঁটকে মরে যাচ্ছেন? আসলে নিজেকে যেভাবে অভ্যস্ত করানো যাবে, তাই ভাল লাগবে।

অনেক মা বোন পর্দাকে খুব কঠিন মনে করেন। তারা ভাবেন পর্দা মেনে চলা সম্ভব নয়। অথচ তারা ভেবে দেখেন না যারা পর্দা মেনে চলছেন তাদের পক্ষে কি করে সম্ভব হচ্ছে? বরং যারা মেনে চলছেন তাদের পক্ষে পর্দা লঙ্ঘন করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পর্দা মেনে চলতেই তাদের ভাল লাগে, পর্দা লঙ্ঘন করতে তাদের খারাপ লাগে। বোঝা গেল অভ্যাস করলে পর্দা মানা আর কষ্টকর থাকে না। তাই হিম্মত করে পর্দা শুরু করে দেয়া চাই।

অনেক মা বোন মনে করেন পর্দা মেনে চলতে গেলে আত্মীয়-স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, আত্মীয়-স্বজনরা মনে করে সে বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে কোন আনন্দ নেই। কারণ সকলের সাথে দেখা সাক্ষাত করা যায় না। কিন্তু ভেবে দেখা উচিত কোন আত্মীয়-স্বজনকে খুশী করা বড় না কি আল্লাহকে খুশী করা বড়? আল্লাহর হুকুম মানার কারণে যদি কোন আত্মীয়-স্বজন অখুশী হয়, তাহলে সেই অখুশীর কোন পরওয়া করা চাই না।

অনেক মা বোন মনে করেন পর্দা মেনে চলতে গেলে ইচ্ছামত এখানে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইচ্ছামত সকলের সাথে মেলামেশা করা যাবে না। ফলে জীবনের আনন্দ ফূর্তি সব শেষ হয়ে যাবে। অথচ তারা ভেবে দেখেন না যারা পর্দা মেনে চলছেন তাদের জীবন কি আনন্দহীন?

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

পর্দা মেনে চললে অনেক ফায়দা হয়। তার মধ্যে কয়েকটা ফায়দার কথা বলছি।

পর্দা মেনে চলার একটা ফায়দা হল– পর্দা মেনে চললে যেনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পর্দাহীন ভাবে পর পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, হাসি তামাশা ও অবাধ মেলামেশার ফলে অবৈধ মেলামেশা পর্যন্ত হয়ে যায়। গায়র মাহরাম মহিলাকে দেখলেই মনের মধ্যে এই চিন্তা আসে যে, আহা একে যদি বিবাহ করতে পারতাম, এর সাথে যদি ইয়ে করতে পারতাম। নাউযু বিল্লাহ! এভাবে পর্দার বিধান না মেনে বদ নজর করা থেকেই গোনাহের চেতনা জাগ্রত হয়, গায়র মাহরাম মহিলার প্রতি বদ নজর এবং তাদের সাথে কথাবার্তা থেকেই আস্তে আস্তে মানুষ যেনার দিকে ধাবিত হয়। পর্দার বিধান মেনে চললে এ সমস্ত অঘটন হতে পারে না। পর্দা হল তাই যেনা থেকে রক্ষা পাওয়ার বড় উপায়, পর্দা হল নারীর সতীত্ব রক্ষার সবচেয়ে বড় পন্থা। পর্দাহীনতা থেকে যেনা আসে, পর্দাহীনতা থেকে সতীত্বহীনতা আসে।

পর্দা ব্যবস্থা নারীর সতীত্ব রক্ষার সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। যারা বিবিকে পর্দা করান না, তাদের অনেকের অবস্থা খুব অবর্ণনীয়। আমাদের কাছে অনেক ভাই পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আসেন। বিভিন্ন জনের সাথে সম্পর্কের কারণে স্ত্রীর বেলাইন হয়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে আসেন। যখনই জিজ্ঞাসা করি বিবিকে পর্দা করান কি? তখন আর জওয়াব দিতে পারে না। একবার আমাদের দেশের একজন বড় নেতা –যার নাম বললে সকলেই চিনবেন– তিনি একদিন তার পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসলেন। তার স্ত্রীর সাথে তার ছোট ভাইয়ের অবৈধ সম্পর্কের কথা বললেন। বললেন এখন তার এমন অবস্থা যে, ঐ বিবিকে সহ্যও করতে পারছেন না, আবার বিবিকে ত্যাগ করতে বা মারধর করে মনের ক্ষোভ মিটাতেও পারছেন না। কারণ, এর যে কোনটা করতে গেলে সমাজে জানা-জানি হয়ে যাবে, পত্রিকায় হৈ চৈ শুরু করে দেয়া হবে, তখন তিনি সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে। আত্মহত্যা করলেও তো জানা-জানি হয়ে যাবে, তার ছেলে মেয়েরা সমাজে মুখ দেখাবে কি করে? তিনি জানতে চাইলেন এখন তার উপায় কি? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিবিকে পর্দা করান কি? তিনি অকপটেই স্বীকার করলেন যে, না। এই সতীত্বহীনতা পর্দাহীনতা থেকেই এসেছে। হুজুররা পর্দা ব্যবস্থার কথা বললে আপনারা তো অপছন্দ করেন। এখন বুঝুন পর্দা ব্যবস্থা লঙ্ঘন করলে কীভাবে সতীত্ব নষ্ট হয়, কীভাবে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হয়। যাহোক বেশ কিছু কথা বলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে অবস্থা থেকে উৎরানোর কিছু পন্থা বলে দিয়েছিলাম।

পর্দা মেনে চলার আর একটা ফায়দা হল– পর্দা মেনে চললে স্বামী স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে সন্দেহ দেখা দেয় না। স্ত্রী পর্দা রক্ষা না করে পর পুরুষদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও মেলামেশা করলে অনেক সময় স্বামীর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। আবার স্বামীও পর্দার বিধান রক্ষা না করে বেগানা নারীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও মেলামেশা করলে অনেক সময় স্ত্রীর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। এবং এই সব সন্দেহ থেকেই স্বামী স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে অশান্তি আসে। তাই স্বামী স্ত্রী উভয়ে পর্দার বিধান মেনে চললে পারিবারিক জীবনে সন্দেহ সৃষ্টির পথ বন্ধ থাকে এবং এটাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক জীবনে অশান্তি আসতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর জীবনে সন্দেহ প্রবেশ করার সব পথই বন্ধ করে দেয়া চাই। নতুবা পরিবারে যে আশান্তি আসে তা দূর করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

পর্দা মেনে চলার আর একটা ফায়দা হল– পর্দা মেনে চললে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা অটুট থাকে। পর্দা রক্ষা করলে স্বামী স্ত্রীর মন একে অপরের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, অন্য দিকে মন যেতে পারে না। স্ত্রীর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মন অন্য কোন পুরুষের দিকে যেতে পারে না, স্বামীর দিকেই তার সব দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। স্বামীও শরীয়ত সম্মত পর্দার বিধান মেনে চললে এবং পরনারীর প্রতি দৃষ্টি না দিলে তার মনও অন্য নারীর দিকে ঝুকতে পারে না বরং স্ত্রীর দিকেই তার দৃষ্টি সম্পর্ণ নিবদ্ধ থাকে। এভাবে পর্দার বিধান রক্ষা করলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের দৃষ্টি নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং তাদের ভালবাসা অটুট থাকে, তাদের পারিবারিক জীবন শান্তিময় থাকে।

পর্দা মেনে চলার আর একটা ফায়দা হল– পর্দা মেনে চললে দিলের মধ্যে নূরানী অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। পর্দার বিধানে রক্ষা করার জন্য নারী পুরুষ যখন বদ নজর থেকে বেঁচে থাকে, তখন দিলের মধ্যে নূর পয়দা হয়। বদ নজর করতে মনে চাওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার নজরকে হেফাজত করবে, তার অন্তরে ঈমানের নূর পয়দা হবে। এই নূরের কারণে সে ঈমানের উপরে থাকার স্বাদ, আমলের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। প্রত্যেকেই আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি যখন আমরা বদ নজর থেকে বিরত থাকব, তো কলবের ভিতরে নূর পয়দা হচ্ছে। আর যত বদ নজর করব, যত গায়র মাহরাম মহিলার সাথে কথা বলব, তত কলবের ভিতরে অন্ধকার আসতে থাকবে, তত পাপের চেতনা আসতে থাকবে, তত যেনার চেতনা জাগতে থাকবে।

গায়র মাহরাম মহিলার প্রতি নজর করলে মানুষ যেনার দিকে ধাবিত হয়। তাই গায়র মাহরাম মহিলার প্রতি নজর দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)কে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. (رواه الترمذي برقم ٢٧٧٧ وقال حسن غريب وفي المستدرك برقم ٢٧٨٨ وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, হে আলী! এক দৃষ্টির পর আর এক দৃষ্টি করতে পারবেনা। প্রথম দৃষ্টি তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, পরবর্তীটা নয়।

এখানে বোঝানো হয়েছে– পথে ঘাটে চলার সময় গায়ের মাহরাম মহিলার দিকে নজর চলে যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে অনিচ্ছা কৃত প্রথম যে দৃষ্টিটা চলে গেল সেটা মাফ, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি আর দিতে পারবে না। একথা বোঝানো হয়নি যে, প্রথম দৃষ্টিটা যখন মাফ, তখন প্রথম দৃষ্টিটাকে খুব লম্বা করে যতক্ষণ দেখতে পারি দেখে নেই। প্রথম নজরকে দীর্ঘায়িত করলেও বারবার দেখার গোনাহই হতে থাকবে।

গায়র মাহরাম মহিলার প্রতি নজর করলে মানুষ যেমন যেনার দিকে ধাবিত হয়, তাই গায়র মাহরাম মহিলার প্রতি নজর দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তদ্রূপ গায়র মাহরাম মহিলার সাথে কথাবার্তা বললেও মানুষ ধীরে ধীরে যেনার দিকে ধাবিত হয়। তাই নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া গায়র মাহরাম মহিলার সাথে কথাবার্তা বলাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহিলারাও নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া গায়র মাহরাম পুরুষদের সাথে কথা বলবে না। মহিলাদের আওয়াজের মধ্যেও পর্দা আছে। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত পুরুষরা গায়র মাহরাম মহিলার আওয়াজও যেন শুনতে না পায়। নিতান্ত প্রয়োজন হলে মহিলারা গায়র মাহরাম পুরুষদের সাথে এভাবে কথা বলবে যেন পুরুষদের মনে তার আওয়াজ শুনে আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। তাই সুরেলা কণ্ঠে কথা বলবে না, আওয়াজ মিষ্টি করে কথা বলবে না, এমন ভঙ্গিতে কথা বলবে না যাতে পুরুষের মনে সুপ্ত কামনা জাগ্রত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে নারীদেরকে সম্বোধন করে হুকুম দেয়া হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ. (সূরা আহযাব : ৩২)

অর্থাৎ, তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলবে না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হবে।

যাহোক, যেনার দিকে যেন অগ্রসর না হয় সেই খাতিরেই নারীদের আওয়াজকেও পর্দার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। চেহারাও পর্দার অন্তর্ভুক্ত, আওয়াজও পর্দার অন্তভুক্ত। আজকাল অনেক মা বোনকে দেখা যায় সারা শরীর বোরকা দিয়ে ঢেকে চেহারাটা খোলা রাখেন। এতে পর্দার হুকুম আদায় হবে না। চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। পর্দার যে আসল উদ্দেশ্য– পর পুরুষ যেন প্রলুব্ধ না হয়, চেহারা খোলা রাখলে তো সেই আসল উদ্দেশ্যই পূরণ হবে না, চেহারাই তো সব আকর্ষণের মূল। তাই চেহারা খোলা রাখলে তো পর পুরুষদেরকে প্রলুব্ধ করার পথই খোলা রাখা হয়। তাহলে কিভাবে পর্দার হুকুম আদায় হবে? আজকাল আবার অনেক মা বোন বিভিন্ন রং বেরংয়ের বিভিন্ন আকর্ষণীয় ডিজাইনের বোরকা পরে বের হন, এটাও পর্দা ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। যা দেখে পর পুরুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে তা দ্বারা বোরকার উদ্দেশ্য পূরণ হবে কীভাবে?

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সহীহ সমঝ দান করুন, সহীহ ভাবে বোঝার তাওফীক নছীব করুন এবং আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৩২

ছওয়াব অর্জন করার সহজ উপায়

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهٗ، لَايَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা বিগত কয়েক জুমুআ ধরে ইসলামী লেবাস-পোশাক, দাড়ি, টুপি, ইসলামী তরীকায় নখ, চুল রাখা শরয়ী পর্দা করা, নজর হেফাজত করা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। কারও কাছে মনে হতে পারে এতসব মানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এতকিছু মেনে চলা কঠিন। যদি কেউ এরকম মনে করেন তাহলে তার সেই মনে করাটা ভুল। দ্বীনের উপর চলা কঠিন নয়, বরং সহজ। আল্লাহ তাআলা মানুষের সাধ্যের বাইরে কোন বিধান দেননি। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. (সূরা বাকারা: ২৮৬)

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সাধ্যের বাইরে চাপ দেন না।

এক হাদীছে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ. الحديث. (البخاري برقم ٣٩)

অর্থাৎ, অবশ্যই দ্বীন সহজ।

এই আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, সাধ্যের বাইরে আল্লাহ কোন বিধান দেননি। যা কিছুই বিধান দেয়া হয়েছে সবই মানুষের সাধ্যের ভেতরের জিনিস। এমন কোন বিধান দেয়া হয়নি যা মানা সম্ভব নয়, সবটাই মানা সম্ভব, সবটাই সহজ। অতএব দেখা গেল কুরআন ও হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী দ্বীনের উপর চলা কঠিন নয়, সহজ।

শুধু ইসলামী লেবাস-পোশাক, দাড়ি, টুপি, পর্দা– এগুলিই নয় বরং সব নেক আমল করাই সহজ। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়া সহজ, রোযা রাখা সহজ, হজ্জ করা সহজ, যাকাত দেয়া সহজ, রাতের আরামের ঘুমকে হারাম করে তাহাজ্জুদ পড়া সহজ, যিকির আযকার করা সহজ, সবই সহজ। আমরা যদি সহজ বিষয়গুলোকে অযথা কঠিন মনে করে বসে থাকি, তাহলে সেটা হবে আমাদের ভিত্তিহীন ধারণা। ভিত্তিহীন ধারণার কোন চিকিৎসা নেই।

তবে হাঁ কয়েকটা কারণে দ্বীনের উপর চলা কঠিন মনে হয়ে থাকে, সেই কারণগুলো দূর করতে হবে, তাহলে দ্বীনের উপর চলা সহজ বোধ হবে, কঠিন বোধ থাকবে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

দ্বীনের উপর চলা কঠিন বোধ হওয়ার একটা কারণ হল– শয়তানের ধোঁকা। শয়তানই আমলকে কঠিন করে দেখায় যে, ওরে বাপরে এটা করা সম্ভব নয়! ওটা করা সম্ভব নয়!! প্যান্ট, শার্ট, টাই ছেড়ে দিয়ে হুজুরদের মত লেবাস ধরা সম্ভব নয়, দাড়ি টুপি ধরে হুজুর সাজা সম্ভব নয়, মানুষে বলবে কী ! পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া কী কষ্ট, এত কষ্ট করা সম্ভব নয়, পুরো একমাস না খেয়ে থেকে রোযা রাখা কী কঠিন ব্যাপার, এটা করা সম্ভব নয়, নারীদের দেখতে কী মজা লাগে এটা ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়, ইত্যাদি। এভাবে শয়তানের ধোকার কারণে প্রথমে এসব আমল কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু শয়তানের ধোকাকে উপেক্ষা করে করতে শুরু করুন, দেখবেন আসলে কঠিন নয়, বরং সহজ। শুধু সহজই নয় বরং মজাদার। যারা দ্বীনের উপর চলতে শুরু করে তাদের কাছে এগুলো কঠিন বোধ হয় না, সহজ বোধ হয় বরং মজাদার বোধ হয়। কঠিন বোধ হলে তারা নিয়মিত এগুলো করতে পারতেন না, মজাদার বোধ না হলে তারা এ আমলগুলো এত নিষ্ঠার সাথে এগুলো করতে পারতেন না।

তবে হাঁ কিছু কিছু আমল এমনও আছে যা করতে গেলে বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে বাধা আসতে পারে, আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে বাধা আসতে পারে, পরিবেশের কারণে বাধা মনে হতে পারে, সমাজের কারণে বাধা মনে হতে পারে। এসব বাধার কারণে মনে হতে পারে দ্বীনের উপর চলা বেশ কঠিন। যেমন নামায পড়া শুরু করলে, দাড়ি টুপির আমল শুরু করলে, বিবিকে পর্দার করানো শুরু করলে বন্ধু-বান্ধব বা পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা থেকে কিছু টিটকারী, টিকা-পিপ্পনী আসতে পারে, আত্মীয়-স্বজন অপছন্দ করতে পারে। এভাবে কিছু বাধা মনে হতে পারে, কিছু কঠিন বোধ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সব বাধাকে উপেক্ষা করে আমল করতে শুরু করুন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নুসরত বা সাহায্য হবে, সব বাধা দূর হয়ে যাবে, কোন বাধাই আর বাধা থাকবে না। করতে থাকলে ঐ সব বন্ধু-বান্ধবদের মুখও এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে, ঐসব আত্মীয়-স্বজনদের অপছন্দ করাও এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রথম দিকে এই সব বাধাকে উপেক্ষা করতে নফসের সাথে এবং পরিবেশের সাথে মুজাহাদা বা সংগ্রাম করার প্রয়োজন হয়। আর যখন কেউ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মুজাহাদা বা সংগ্রাম করতে শুরু করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে গন্তব্যে পৌঁছার পথ করে দেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. (সূরা আনকাবূত: ৬৯)

অর্থাৎ, যারা আমাকে পাওয়ার জন্য মুজাহাদা করে, সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছে দেই।

দ্বীনের উপর চলা কঠিন বোধ হওয়ার আর একটা কারণ হল– অভ্যাস না থাকা। অনেক সময়ই অভ্যাস না থাকার কারণে অনেক আমল কঠিন মনে হয়। করতে থাকুন, অভ্যাসে পরিণত করুন, দেখবেন সহজ মনে হবে, তখন আর কঠিন মনে হবে না। নামায পড়ার অভ্যাস না থাকলে কঠিন মনে হবে, পড়তে পড়তে অভ্যাসে পরিণত করুন, সহজ লাগবে। যারা নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাদের কাছে নামায পড়া কঠিন বোধ হয়না বরং নামায ছেড়ে দেয়াই কঠিন বোধ হয়, নামায ছাড়লে তাদের অস্বস্তি বোধ হয়। এভাবে প্রত্যেকটা আমল করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে কঠিন বোধ হওয়াটা দূর হয়ে যায়। রোযা রাখতে অভ্যাস করুন কঠিন বোধ হবে না, সহজ বোধ হবে। তাহাজ্জুদ পড়তে কঠিন লাগে, পড়তে পড়তে অভ্যাসে পরিণত করুন, সহজ বোধ হবে, কঠিন থাকবে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দ্বীনের উপর চলা কঠিন বোধ হওয়ার আর একটা কারণ হল– সহীহভাবে মাসআলা-মাসায়েল জানা না থাকা। যারা সহীহভাবে মাসআলা-মাসায়েল জানে না, তাদের কাছে অনেক আমল কঠিন মনে হয়। যেমন অনেক মা বোনেরা বলে থাকেন, তারাবীহ পড়া খুব কঠিন। কারণ, তারাবীহ-র নিয়ত জানি না, চার রাকআত পর পর কী দুআ পড়তে হয় তা জানি না, তারাবীহর মুনাজাত জানি না ইত্যাদি। অথচ তারা যদি সহীহভাবে এ মাসআলাগুলো জানতেন যে, তারাবীহর জন্য প্রচলিত লম্বা চওড়া আরবী নিয়ত পড়া জরুরী নয়, বরং "দুই রাকআত তারাবীহর নিয়ত করছি"– এতটুকু কথা বললেই চলে, বরং এতটুকু নিয়ত মুখে বলাও জরুরী নয়, মনের মধ্যে এতটুকু ভাব থাকলেই চলে। যদি তারা এটা জানতেন, তাহলে তাদের কাছে বিষয়টা সহজ মনে হত। যদি তারা জানতেন যে, চার রাকআত পর পর যে দুআ পড়া হয়, তা পড়াই জরুরী নয়, বরং সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার এগুলো বললেও হয়, এমনকি কিছু না বললেও চলে। যদি তারা এটা জানতেন, তাহলে তাদের কাছে বিষয়টা সহজ মনে হত। যদি তারা জানতেন যে, তারাবীহর জন্য বিশেষ কোন মুনাজাত নেই, নিজের ভাষায় যে কোন মুনাজাত করলেই চলে, এমনকি কোন মুনাজাত না করলেও তারাবীহ হয়ে যায়। যদি তারা এটা জানতেন, তাহলে তাদের কাছে বিষয়টা সহজ মনে হত। দেখা গেল মাসআলা-মাসায়েল সহীহভাবে না জানার কারণে অনেক কিছু কঠিন মনে হয়, সহীহভাবে জানলে সহজ মনে হবে।

অনেক ভাই আছেন তারা উলামায়ে কেরামের কাছে আসতে ভয় পান। তারা মনে করেন যে, হুজুরদের কাছে গেলে এতসব মাসআলা-মাসায়েল নিয়ম-কানূন বলবে, যা আমরা মেনে উঠতে পারব না, দূরে আছি তা-ই ভাল। অথচ ব্যাপারটা এরকম নয়, সব মাসআলা-মাসায়েল কঠিন করার জন্য নয়, বরং অনেক মাসআলা-মাসায়েল সহজ করার জন্যও হয়ে থাকে। একজন বিবিকে তালাক দিয়ে বসে আছে, মনে করছে হুজুরদের কাছে গেলে তো বলে দিবে এই বিবি হারাম হয়ে গেছে, একে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ এই বিবি ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। এই ভেবে হুজুরদের কাছে গেল না, বিবির সাথে মেলামেশা চলতে থাকল, তাতে যেনার গোনাহ হতে থাকল। অথচ সে যদি হুজুরদের কাছে এসে সঠিক অবস্থা তুলে ধরত, তাহলে হতে পারে তালাকের ধরন বিবেচনা করে ঐ বিবিকে রাখার সহজ ব্যবস্থাই হুজুররা বলে দিতেন, তাহলে সে যেনার গোনাহ থেকে বেঁচে যেত, বিবিকেও রাখতে পারত।

হুজুরদের কাছে না আসলে যে অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হয়, হুজুরদের কাছে আসলে যে অনেক ক্ষেত্রেই সহজ হয়, তার একটা উদাহরণ শুনুন। একজন ব্যক্তি সারা জীবন চাকুরী করেছে, এখন চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছে। প্রতিষ্ঠান থেকে তার পেনশন গ্রাচ্যুয়িটির টাকা পাশ করাতে পারছে না, ঘুষ চাচ্ছে। সে মনে করছে, কক্ষণই ঘুষ দিব না। এভাবে ঘুষ না দেয়ার ফলে সে তার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করতে না পেরে চুপচাপ ঘরে বসে থাকল। বিষয়টা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সে মনে করল দ্বীনের উপর চলা কত কঠিন! অথচ বিজ্ঞ আলেমের কাছে গেলে বিজ্ঞ আলেম তাকে বলে দিতেন যে, এটা আপনার ন্যায্য পাওনা, এটা আপনার প্রতিষ্ঠিত হক। আর নিজের ন্যায্য পাওনা এবং নিজের প্রতিষ্ঠিত হক আদায় করার জন্য কেউ যদি ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, তাহলে সেই ঘুষ প্রদান করাতে তার কোন গোনাহ হয় না। অবশ্য যে ঘুষ নিবে তার গোনাহ অবশ্যই হবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে ঐ ঘুষদাতার কোন গোনাহ হবে না। এভাবে মাসআলাটা জেনে নিলে তার জন্য বিষয়টা সহজ হয়ে যেত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অফিস-আদালত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঘুষ দিতে বাধ্য হলে কখন কীভাবে পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে আবার কাজও উদ্ধার হবে, তা বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে জেনে নেয়ার চেষ্টা করুন, দেখবেন, অনেক ক্ষেত্রেই আপনার জন্য আছান হবে, কঠিন হবে না। শুধু অফিস-আদালত বিষয়েই নয়, সব বিষয়েই হক্কানী বিজ্ঞ পরহেযগার আলেম থেকে জেনে নেয়ার অভ্যাস করে দেখুন আছানী বোধ হবে, কঠিন বোধ হবেনা। তাই বলছিলাম, সহীহ মাসআলা– মাসায়েল জানা না থাকলে অনেক সময় দ্বীনের উপর চলা কঠিন মনে হয়। সহীহ মাসআলা-মাসায়েল জানলে অনেক সময়ই কঠিন হয়না বরং আছান হয়, উলামায়ে কেরামের কাছে গেলে শুধু জটিলতাই হয়না সহজও হয়।

যাহোক এতক্ষণ আলোচনা করা হল যে, দ্বীনের উপর চলা সহজ, কঠিন নয়। নেকীর কাজ করা সহজ, কঠিন নয়। ছওয়াব অর্জন করা সহজ, কঠিন নয়। আল্লাহ তা'আলা নেকী অর্জন করাকে অনেক ভাবে সহজ করে দিয়েছেন। নেকীর আমল করেও নেকী অর্জন করা যায়, আবার নেকীর আমল না করেও অনেকভাবে নেকী লাভ করা যায়। এর চেয়ে আর কী সহজ ব্যবস্থা হতে পারে যে, নেকীর আমল না করেও নেকী পাওয়া যায়? তাই বলছিলাম যে, আল্লাহ পাক আমাদের জন্য নেকী অর্জন করাকে খুব সহজ করে দিয়েছেন।

নেকী অর্জন করার একটা সহজ ব্যবস্থা হল– আমল করার আগে শুধু আমলের নিয়ত করেই ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (متفق عليه)

এ হাদীছের এক ব্যাখ্যা হল– নিয়তের ভিত্তিতে আমলের ছওয়াব হয়ে থাকে।

অন্য এক হাদীছে এসেছে,

إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً. فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِأَةِ ضِعْفٍ (رواه مسلم برقم ٣٥٠)

অর্থাৎ, যখন বান্দা কোন নেক আমলের এরাদা করে, আমল করে পারে না, তাহলে এই এরাদার কারণেই তার জন্য একটি নেকী লিখে দেই। আর আমল করলে দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত নেকী লিখে দেই।

এখন কেউ যদি বলে যে, তাহলে তো সুবিধেই হল, নেক আমলের কষ্ট করার কোন দরকার নেই, শুধু নিয়ত করে নিব। এরকম মনে করলে হবে না। কারণ, যখন মনের মধ্যে থাকল যে, আমল করব না, শুধু নিয়ত করলাম, তাহলে তো নিয়তই হল না। কেননা, নিয়ত বলাই হল ইচ্ছাকে। যদি আমল করার ইচ্ছাই না থাকে, তাহলে তো নিয়তই হবে না, কাজেই তখন ছওয়াবও হবে না। এখানো বোঝানো হয়েছে শুধু নিয়তের কারণেই একটা ছওয়াব পাওয়া যাবে, তারপর আমল সম্পন্ন করলে আরও বেশী ছওয়াব লিখে দেয়া হবে। হাঁ যদি কেউ কোন আমলের নিয়ত করার পর কোন কারণ বশত সে আমল করতে পারল না, তাহলে ভিন্ন কথা, সেক্ষেত্রেও তার জন্য পূর্বে শুধু নিয়তের কারণেই যে একটা ছওয়াব লিখে দেয়া হয়েছিল সেটা কেটে দেয়া হবে না। যেমন কেউ হজ্জের এরাদা করেছে, কিন্তু কোন শরীয়তসম্মত কারণবশত সে হজ্জে যেতে পারল না বা রওয়ানা দিয়েও কোন অপরাগতায় তাকে ফিরে আসতে হল কিংবা হজ্জের কাজ শেষ করার পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তাহলে তার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

জন্য একটা হজ্জের ছওয়াব লিখে দেয়া হবে। কেউ মসজিদে যেয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়ার এরাদায় রওয়ানা দিয়েছে, কিন্তু কোন শরীয়তসম্মত কারণবশত সে মসজিদে যেতে পারল না, তাহলেও মসজিদে যেয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়ার ছওয়াব তার জন্য লিখে দেয়া হবে। এমনিভাবে যে কোন নেক আমলের ইরাদা করলে যদি সে সেই নেক করতে নাও পারে, তবুও শুধু নিয়তের কারণে তাকে সেই আমলের ছওয়াব দান করা হবে।

যাহোক দেখা গেল আল্লাহ তাআলা নেকী অর্জন করাকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে, নেকীর আমল করার আগেই শুধু তার নিয়ত করা দ্বারাই নেকী পাওয়া যায়।

নেকী অর্জন করার আর একটা সহজ ব্যবস্থা হল– আমল না করে শুধু অন্যকে আমলের কথা বলেও ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ. (رواه مسلم برقم ٥٠٠٧)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের পথ দেখায়, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ঐ ভাল কাজ করে। (মুসলিম)

এ দুই হাদীছে বোঝানো হয়েছে, কাউকে নেক আমলের কথা বললেও সেই নেক আমলের ছওয়াব পাওয়া যায়। বোঝা গেল দাওয়াত ও তাবলীগের ফযীলত কত বেশী। আমি কাউকে নেক আমলের দিকে দাওয়াত দিব, তাহলে আমার ঐ নেক আমলের ছওয়াব হবে। আর যদি সে ঐ নেক আমল করে তাহলে তার তো সেই আমলের ছওয়াব হবেই, তার সমপরিমাণ ছওয়াব আমাকেও দেয়া হবে, এটা আল্লাহ পাক তাঁর ভাণ্ডার থেকে আমাকে দিবেন, ঐ ব্যক্তির ছওয়াব থেকে কেটে দেয়া হবে না।

দেখা গেল আল্লাহ তাআলা নেকী অর্জন করাকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে, নেকীর আমল নিজে করতে পারল না শুধু অন্যকে বলল তাতেও নেকী পাওয়া গেল।

নেকী অর্জন করার আর একটা সহজ ব্যবস্থা হল– কোন নেক আমলের সূচনা করলেও তার অনুসরণে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সেই নেক আমল করবে তাদের সম পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ. الحديث. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٩٧٥)

অর্থাৎ, একজন মানুষ যে একটা নেক আমল জারি করল, অতঃপর (তার দেখা-দেখি) পরবর্তীতে তদনুযায়ী আমল করা হবে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য সকলের সমপরিমাণ ছওয়াব লিখে দিবেন। এতে অন্য কারও ছওয়াব কমবে না।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ دَعَا اِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. الحديث. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٩٨٠)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, কেউ হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দিলে যত মানুষ তার অনুসরণ করবে, তাদের সমপরিমাণ ছওয়াব তার হবে। এতে অনুসরণকারী ঐ সব মানুষের ছওয়াব কিছুই কমবে না। (মুসলিম ও আবূ দাউদ)

কেউ হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াতে যত মানুষের হেদায়েত হবে, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের হেদায়েত অর্থাৎ, ঈমান আমল পয়দা হবে, ঐ সমস্ত মানুষের ঈমান আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব দাওয়াত দেনেওয়ালারও লাভ হবে। কিন্তু এতে ঐ সব অনুসরণকারী লোকদের ঈমান আমলের ছওয়াব কমবে না। তাদের প্রত্যেকের ঈমান আমলের ছওয়াব তাদেরই থাকবে। এর সাথে সাথে যে দাওয়াত দিল অর্থাৎ, যে ঈমান আমলের সূত্র ঘটালো তারও ঐ সমপরিমাণ ছওয়াব হয়ে যাবে। আল্লাহর বিশাল ভান্ডার থেকে তাকে এটা দেয়া হবে।

দেখা গেল আল্লাহ তাআলা নেকী অর্জন করাকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে, কোন নেক আমলের সূচনা করা দ্বারাও নেকী পাওয়া যায়। এবং সেই ধারায় কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সেই নেক আমল করবে তাদের সকলের আমলের সমপরিমাণ নেকী তাকে দেয়া হবে। কত সহজে আল্লাহ পাক কত বেশী নেকী দেয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন।

নেকী অর্জন করার আর একটা সহজ ব্যবস্থা হল– নেক আমল একটা করলে আল্লাহ পাক কমপক্ষে দশটা নেকী দান করে থাকেন। এখানেও দেখা গেল আল্লাহ তাআলা নেকী অর্জন করাকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন যে, নেকী করা হচ্ছে একটা ছওয়াব পাওয়া যাচ্ছে দশটা। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يُكْتَبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

(رواه مسلم في صحيحه برقم ٣٥٠)

অর্থাৎ, যখন বান্দা কোন নেক আমলের এরাদা করে, এই এরাদার কারণেই তার জন্য একটা নেকী লিখে দেয়া হয়। তারপর যখন সে সেই নেক আমল সম্পন্ন করে, তখন তার জন্য দশটা নেকী লিখে দেয়া হয়। আর যদি বান্দা কোন গোনাহের এরাদা করে তাহলে গোনাহ লেখা হয় না, হাঁ করার পর একটা গোনাহ লেখা হয়।

আল্লাহ তাআলার কত বড় অনুগ্রহ যে, নেক আমলের এরাদা করার কারণেই ছওয়াব লিখে দেয়া হয়। অথচ গোনাহর এরাদা করলেই গোনাহ লেখা হয় না, যতক্ষণ গোনাহ না করা হয়। যদি গোনাহর এরাদা কররেই গোনাহ লিখে দেয়া হত, তাহলে আমাদের জন্য বড়ই কঠিন বিষয় হত। আমাদের মনের মধ্যে কত গোনাহের এরাদা এসে যায়। পথে ঘাটে চলতে গিয়ে বেগানা নারীর দিকে নজর পড়ে গেলে মনের মধ্যে কত রকম কু-কল্পনা জাগে, নাচ-গান শুনলে দেখলে মনের মধ্যে কত খারাপ কু-কল্পনা জাগে, মনের মধ্যে অন্যের প্রতি হিংসা ও রাগ বশত কত কু-কল্পনা জাগে। যদি এসব গোনাহের কু-কল্পনার কারণেও আমাদেরকে পাকড়াও করা হত, তাহলে আমাদের জন্য বড়ই কঠিন হত। একবার সাহাবায়ে কেরাম মনের বিষয় নিয়ে পাকড়াও হলে কী অবস্থা হবে তা চিন্তা করে পেরেশান হয়েছিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ বিষয়ে পেরেশানী জাহের করেছিলেন। তখন আল্লাহ পাক নাযেল করেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا. (সূরা বাকারা : ২৮৬)

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সাধ্যের বাইরে কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না। মানুষ স্বেচ্ছায় যা নেকী উপার্জন করে, তাই সে পাবে; আর স্বেচ্ছায় যা পাপ উপার্জন করে, তাই তার উপর চাপবে। তোমরা বল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধর-পাকড় করো না, যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করে বসি।

এ আয়াতে বোঝানো হয় যে, অনিচ্ছাবশত মনের মধ্যে যেসব গোনাহের চিন্তা এসে যায়, তার কারণে আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন না, কারণ সেটা তাদের সাধ্যের বাইরের জিনিস। এমনিভাবে ভুলে মানুষ যা করে বসে তার কারণেও আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন না। এ আয়াত নাযেল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের পেরেশানী দূর হয়।

আল্লাহ পাক আমাদের জন্য দ্বীনকে আছান করে দিয়েছেন, নেকী অর্জন করা সহজ করে দিয়েছেন, তাই আমরা যেন দ্বীনকে কঠিন মনে করে দ্বীন থেকে দূরে সরে না থাকি, বরং দ্বীনকে সহজ মনে করে বেশী বেশী আমল করতে থাকি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং – ৩৩

জান্নাত অর্জন করার সহজ উপায়

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَّهُ الْجَنَّةَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যত আমলের কথা বলেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত আমলের কথা বলে গেছেন কামেল মুসলমান তথা পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য সেই সমস্ত বিষয়ের আমল করা জরুরী। তার মধ্যে ফরয ওয়াজিব আমলগুলির জন্য আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে, ফরয ওয়াজিব আমলগুলির হিসাব দিতে হবে। ফরয ওয়াজিবের হিসাবে আঁটকে গেলে নাজাত আঁটকে যাবে। অথচ ফরয ওয়াজিবের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিয়ে পার পাওয়া কঠিন হবে। ফরয ওয়াজিবের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিয়ে কেউ পার হতে পারবে না। যেমন এক হাদীছে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ. (متفق عليه– البخاري ١٠٣ مسلم ٧٤٠٨)

অর্থাৎ, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে তার শাস্তি অনিবার্য।

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল– ফরয ওয়াজিবের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিয়ে পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে আল্লাহ তা'আলা অনেককে কোন কোন ওছীলায় ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে আঁটকানোর জন্য অজুহাত খুঁজবেন না বরং মুক্তি দেয়ার জন্য ওছীলা খুঁজবেন। এক কবী তাই বলেছেন,

رحمت حق بہانہ می جوید + بہانی جوید

অর্থাৎ, আল্লাহ রহমত মুক্তি দেয়ার জন্য ওছীলা খোঁজে, পাকড়াও করার জন্য অজুহাত খোঁজে না।

দুনিয়ার মানুষের স্বভাব হল কোন অজুহাত দাঁড় করে কাউকে পাকড়াও করা যায় কিনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তেমন নন। তিনি পাকড়াও করার জন্য অজুহাত খুঁজবেন না বরং মুক্তি দেয়ার জন্য ওছীলা খুঁজবেন যে, দেখি বান্দাকে কোন ওছীলায় মুক্তি দেয়া যায় কিনা। তাই তিনি বিভিন্ন আমলের ওছীলায় বিভিন্ন জনকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। তাদেরকে আমলের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিয়ে পার হতে হবে না বরং বিভিন্ন আমলের ওছীলায় সহজেই তারা পার পেয়ে যাবে। সহজেই তারা জান্নাত অর্জন করবে। এটা হল জান্নাত অর্জন করার সহজ পন্থা।

এরকম আমল অনেক রয়েছে, যার ওছীলায় আল্লাহ তাআলা অনেক জনকে নাজাত দিবেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের জন্য চারটা আমল এবং

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পুরুষদের জন্য চারটা আমলের কথা বলে দিয়েছেন, যে আমলগুলোর ওছীলায় আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাত দান করবেন। এগুলি এমন আমল যার ওছীলায় সহজে জান্নাত লাভ হবে।

নারীদের জন্য সহজে জান্নাত লাভ করার সেই চারটা আমল হল– হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে- রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. (رواه أحمد في مسنده برقم ١٦٦١ وقال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره)

অর্থাৎ, যে নারী ঠিকমত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, ঠিকমত রমযানের রোযা রাখবে, সতীত্ব রক্ষা করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর।

এ হাদীছে নারী সমাজের জন্য জান্নাতে যাওয়ার সহজ ব্যবস্থা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নারীগণ যদি চারটা আমল ঠিকমত করে, তাহলে তারা সেই চারটা আমলের ওছীলায় জান্নাত লাভ করতে পারবে। সে চারটা আমল হল–

১. ঠিকমত ফরয নামায আদায় করা।

২. ঠিকমত রমযানের ফরয রোযা রাখা।

৩. সতীত্ব রক্ষা করা।

৪. স্বামীর আনুগত্য করা। অর্থাৎ, স্বামীর কথা মেনে চলা এবং স্বামীর খেদমত করা।

নারী সমাজকে সহজে জান্নাত পাওয়ার জন্য এই চারটা আমলের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। অনেক মা বোন নামায পড়েন, কিন্তু যত্নের সাথে পড়েন না, পড়ব পড়ব করে হয়তো মাকরূহ ওয়াক্তে গিয়ে পড়েন, অনেকে কাপড় চোপড় পাক রাখার ব্যাপারে যত্ন নেন কম। এরকম নয় বরং যত্নের সাথে নামায পড়া চাই। অনেক মা বোন নামায, রোযা, ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীতে ত্রুটি করেন না, কিন্তু স্বামীর আনুগত্যে ত্রুটি করেন। অথচ স্বামীর আনুগত্যও নামায, রোযার ন্যায় ফরয পর্যায়ের বিষয়। তাছাড়া সহজে জান্নাত লাভ করার জন্যও এটা একটা বিশেষ পন্থা। আমরা মা বোনদেরকে এই চারটা বিষয় শিখিয়ে দেই। আমরা যা কিছুই শিখব মা বোনদেরকে শেখানোও জরুরী। যাহোক নারী সমাজের জন্য সহজে জান্নাতে যাওয়ার উপায় হল এই চারটা আমল করা।

আর পুরুষদের জন্য সহজে জান্নাত লাভের সেই চারটা আমল দুইটা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. (صحيح البخاري برقم ٦٤٧٤)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের যবান ও যৌনাঙ্গকে হেফাযত করার দায়িত্ব নিবে, আমি তাকে জান্নাতে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়ে নিব। সুবহানাল্লাহ!

এ হাদীছে পুরুষদের জন্য সহজে জান্নাত লাভের দুইটা আমল বলে দেয়া হয়েছে। একটা হল যবান হেফাজত করা, আর একটা হল যৌনাঙ্গ হেফাজত করা।

যবান হেফাজত করার অর্থ হল– যবান দ্বারা যেসব গোনাহ হতে পারে এরকম কোন গোনাহ হবে না, যেমন যবান দ্বারা কুফর শিরকের কথা বলা হবে না, মিথ্যা বলা হবে না, কারও

www.maktabatulabrar.com

গীবত-শেকায়েত করা হবে না, কাউকে গালি-গালাজ করা হবে না, কাউকে কটু কথা বলা হবে না, কারও প্রতি টিকা-টিপ্পনী কাটা হবে না এভাবে যবান দ্বারা যত প্রকার গোনাহ হতে পারে তা হবে না।

আর যৌনাঙ্গকে হেফাজত করার অর্থ হল– যৌনাঙ্গ দ্বারা যে গোনাহ হতে পারে সে গোনাহ হবে না। অর্থাৎ, সতীত্ব রক্ষা করতে হবে। এই যৌনাঙ্গকে হেফাজত তথা সতীত্বকে হেফাজত করার জন্যই গায়রে মাহরাম নারী পুরুষের মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। এই মেলামেশা থেকেই শেষ পর্যন্ত যেনার চরম গোনাহ সংঘটিত হয় এবং সতীত্ব নষ্ট হয়। যৌনাঙ্গকে হেফাজত করার জন্যই পুরুষ হলে গায়র মাহরাম নারীর প্রতি নজর করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং নারী হলে গায়র মাহরাম পুরুষের প্রতি নজর করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাহোক এ হাদীছে পুরুষদের জন্য জান্নাত লাভের সহজ উপায় হিসেবে দুটো আমলের কথা বলা হয়েছে। তাহল– যবান হেফাজত করা ও যৌনাঙ্গ হেফাজত করা।

অন্য এক হাদীছে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)কে সম্বোধন করে বলেছেন,

اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ. أُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُّمْ، وَأَدُّوْا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٢٢٨٠٩ وإسناده حسن لغيره)

অর্থাৎ, তোমরা আমার জন্য তোমাদের পক্ষ থেকে ছয়টা জিনিসের দায়িত্ব নাও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতে পৌঁছার দায়িত্ব নিয়ে নিব। সেই ছয়টা হল– যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তা পূরণ করবে, যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হবে সেই আমানত আদায় করবে, তোমাদের যৌনাঙ্গ হেফাজত করবে, দৃষ্টি নত রাখবে এবং তোমাদের হাতকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে।

এ হাদীছে মোট ছয়টা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তা হল– ১. কথা সত্য বলা। ২. ওয়াদা পূরণ করা। ৩. আমানত রক্ষা করা। ৪. যৌনাঙ্গ হেফাজত করা। ৫. দৃষ্টি নত রাখা। এবং ৬. জুলুম থেকে বিরত থাকা।

এই ছয়টার মধ্যে প্রথম দুটো অর্থাৎ, কথা সত্য বলা ও ওয়াদা পূরণ করা– এ দুটো যবান হেফাজতের মধ্যে এসে গেছে। আর চতুর্থ ও পঞ্চমটা অর্থাৎ, যৌনাঙ্গ হেফাজত করা ও দৃষ্টি নত রাখা– এ দুটো যৌন হেফাজতের মধ্যে এসে গেছে। অর্থাৎ, এই চারটা পূর্বের হাদীছে যে দুটো কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এসে গেল। বাকী রইল আমানত রক্ষা করা ও জুলুম থেকে বিরত থাকা। সারকথা, পুরুষদের জন্যও জান্নাত লাভের সহজ পন্থা হিসেবে মোট চারটা বিষয়ের কথা বলা হল। সেই চারটা হল–

১. যবান হেফাজত করা।

২. যৌনাঙ্গ হেফাজত করা।

৩. আমানত রক্ষা করা।

৪. জুলুম থেকে বিরত থাকা।

মহিলারা উপরোক্ত চারটা আমল করলে তারা সহজে জান্নাত লাভ করতে পারবে। আর পুরুষরা এই চারটা আমল করলে তারা সহজে জান্নাত লাভ করতে পারবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তবে এর অর্থ এই নয় যে, শুধু এই চারটা আমল করলেই জান্নাত পাওয়া নিশ্চিত, অন্যান্য ফরয ওয়াজিব কোন আমল আর করার দরকারই নেই। বরং এর অর্থ হল অন্যান্য ফরয ওয়াজিব তো করতেই হবে, যদি সেই ফরয ওয়াজিবে ত্রুটি থেকে যায় আর তার কারণে নাজাত আঁটকে যায়, তাহলে এই চারটা আমলে যত্ন থাকার ওছীলায় আল্লাহ পাক তাকে নাজাত দিয়ে দিবেন এবং জান্নাত দান করবেন। আর কে এমন আছে যে, বলতে পারে আমার কোন ফরয ওয়াজিব আমলে ত্রুটি নেই, আমার সব ফরয ওয়াজিবই সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হয়। আমরা কয়জন এমন আছি সারা জীবনের এমন একটা নামায দেখাতে পারব, যে নামাযের মধ্যে সব ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও আদাব পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হয়েছে, যে নামায পূর্ণাঙ্গ সুন্দর হয়েছে, যে নামাযের মধ্যে দুনিয়ার কোন চিন্তা করিনি, যে নামায সম্পূর্ণ আল্লাহর মধ্যে ডুবে থেকে আদায় হয়েছে? আমরা অনেকেই এমন একটা নামাযও দেখাতে পারব না। এমনিভাবে অন্যান্য ফরয ওয়াজিবের মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে। তাহলে আমাদের নাজাতের উপায় হবে কি যদি সেই ত্রুটির কারণে আমাদের সেসব আমল প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হয় ? যদি এই চারটা আমল আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে হতে পারে এর ওছীলায় তখন আমাদের নাজাতের ফয়সালা হবে, এর ওছীলায় তখন আমাদের মুক্তির ফয়সালা হবে।

যাহোক চারটা আমলে ওছীলায় নারীদের মুক্তি হবে আর চারটা আমলের ওছীলায় পুরুষদের মুক্তি হবে। এই চারটা আমল থাকলে জান্নাত অর্জন করা সহজ হয়ে দাঁড়াবে। যাদের মধ্যে এই চারটা আমল থাকবে, তাদেরকে আমলের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিয়ে পার হতে হবে না বরং এই আমলের ওছীলায় সহজেই তারা পার পেয়ে যাবে। সহজেই তারা জান্নাত অর্জন করবে। এটা হল জান্নাত অর্জন করার সহজ পন্থা।

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আমলের ওছীলায় বিভিন্ন জনকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। যেমন:–

কাউকে কাউকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এই ওছীলায় যে, সে অন্য মানুষকে ক্ষমা করত। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

وَاغْفِرُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ. (رواه أحمد برقم ٧٠٤١ وإسناده حسن)

অর্থাৎ, তোমরা অন্যকে ক্ষমা কর, তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

কারও কারও প্রতি দয়া করা হবে এই ওছীলায় যে, সে অন্য মানুষের প্রতি দয়া করত। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ. (رواه الترمذي برقم ١٩٢٤ وقال : حسن صحيح)

অর্থাৎ, তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

কারও কারও প্রতি দয়া করা করা হবে এই ওছীলায় যে, সে কোন সৃষ্টির প্রতি দয়া করেছিল। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার প্রচণ্ড পিপাসা পেল। সে একটি কুঁয়ায় নেমে পানি পান করল। কুঁয়া থেকে উঠে দেখে একটি কুকুর পিপাসার কারণে কাদা মাটি চাটছে। তখন লোকটা মনে মনে ভাবল, এর পিপাসায়, সেই রকম কষ্ট হচ্ছে যেমন আমার হয়েছিল। সে আবার কুঁয়ায় নামল। তার চামড়ার মোজায় পানি ভরে দাঁত দিয়ে সেটি কামড়ে ধরে উপরে উঠল। তা থেকে কুকুরটিকে পানি পান করাল। এর ফলে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করলেন– তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল একটা সৃষ্টির প্রতি দয়া করার কারণে আল্লাহ তাকে নাজাত দিয়ে দিলেন। তাই আল্লাহর কোন সৃষ্টির প্রতি জুলুম অবিচার করতে নেই। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে যখন জান্নাত পাওয়া যায়, তখন আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি জুলুম অবিচার করলে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। বোখারী শরীফের এক হাদীছে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক মাহিলাকে একটা বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে বিড়ালটি আঁটকে রেখেছিল। ফলে সে ক্ষুধার্ত হয়ে মারা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাকে বললেন –যদিও তিনি ভাল করেই জানেন– যে, তুমি তাকে আহারও প্রদান করনি, পানিও প্রদান করনি, আবার ছেড়েও দেওনি যে, সে ভূমির পোকা-মাকড় খেয়ে প্রাণে বাঁচতে পারে। যাহোক বলা হচ্ছিল যে, কারও কারও প্রতি দয়া করা করা হবে এই ওছীলায় যে, সে আল্লাহর কোন সৃষ্টির প্রতি দয়া করেছিল।

কারও কারও মুক্তির ফয়সালা হবে এই ওছীলায় যে, সে অন্য মানুষের দোষ জানা সত্ত্বেও তা গোপন করত। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٧٠٢٨)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষকে গোপন রাখবেন। দোষ গোপন রাখার মধ্যে জান্নাত প্রদান করাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, জাহান্নাম দেয়া হলে তো সে দোষী তা প্রকাশ পেয়ে গেল। তাহলে হাদীছের সার এই বের হল যে, কেউ দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখলে এর ওছীলায় তার জান্নাত লাভ হবে।

কাউকে কাউকে ক্ষমা করা হবে এই ওছীলায় যে, সে অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে ছাড় দিয়েছিল। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا. فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٠٧٨)

অর্থাৎ, আগের যুগে একজন ব্যবসায়ী মানুষের কাছে বাকীতে বিক্রয় করত। অতঃপর যদি সে দেখত ক্রেতা অস্বচ্ছল (ফলে পাওনা পরিশোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না) তাহলে তার ব্যবসা পরিচালনা কারী যুবককে বলত, তাকে ছাড় দাও; আশা করা যায় আল্লাহও আমাদেরকে ছাড় দিবেন। ফলত আল্লাহ তাকে ছাড় দিলেন তথা ক্ষমা করে দিলেন।

অস্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়া অর্থাৎ, পূর্ণ ছাড় দেয়া বা পাওনার অংশ বিশেষ ছেড়ে দেয়ার ফযীলত সম্পর্কে আর এক হাদীছে এসেছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٤٠٨٣)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মনে প্রাণে চায় যে, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিনের পেরেশানী থেকে মুক্তি দেন সে যেন অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে পূর্ণ ছাড় দেয় বা কিছু ছাড় দেয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অস্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে ছাড় দিলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে ছাড় দেন। এক হাদীছে এসেছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. (رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٥٠٤٥ قال شعيب الأرنؤوط :حديث صحيح وإسناده حسن)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য আছানী করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে তার জন্য আছানী করবেন।

এভাবে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন আমলের ওছীলায় মুক্তি দিয়ে দিবেন। যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা রহমত তথা দয়ার মুডে এসে যাবেন, তাকে কোন না কোন আমলের ওছীলায় ক্ষমা করে দিবেন। আবার এর বিপরীত কারও ব্যাপারে রাগের মুডে এসে গেলে তার রেহাই পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। তাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপের কারণেও কঠিনভাবে পাকড়াও করা হতে পারে। আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন মুড এসে থাকে। কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে এসেছে,

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ. (সূরা রহমান: ২৯)

অর্থাৎ, তিনি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন শানে থাকেন।

কেয়ামতের দিনও আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন শান থাকবে, কারও প্রতি রহমত বা দয়ার শান থাকবে, ফলে ছোটখাট আমলের ওছীলায়ও তার ক্ষমা হয়ে যাবে। আবার কারও ব্যাপারে রাগের শান থাকবে, ফলে ছোটখাট পাপের কারণেও তার পাকড়াও হয়ে যাবে। তাই কোন ছোট্ট নেক আমলকেও তুচ্ছ জেনে ত্যাগ করতে নেই। কারণ, হতে পারে সেই ছোট্ট আমলটাই নাজাতের ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে। আবার কোন ছোট্ট পাপাকেও তুচ্ছ জেনে অবলিলায় সেটা করে যাওয়ার পরিণতি খুব খারাপ হতে পারে। কেননা, সেই ছোট্ট পাপটার কারণেই যদি পাকড়াও হয়ে যায়!

যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা রাগের মুডে থাকবেন, শাস্তি দেয়ার মুডে থাকবেন, তাদেরকে বিভিন্ন পাপের কারণে কঠিনভাবে পাকড়াও করা হবে। এরকম কঠিন মুডের অবস্থায় কঠিন পাকড়াওয়ের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٢٧٥)

অর্থাৎ, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

এরকম আরও অনেক পাপের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এক হাদীছে বলা হয়েছে, চোগলখোর জান্নাতে যেতে পারবে না। আর এক হাদীছে বলা হয়েছে, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। এ সব হাদীছ থেকে বোঝা যায়, কোন একটা গোনাহের কারণে যদি পাকড়াও হয়ে বসে তাহলে নাজাত পাওয়া দুস্কর হয়ে দাঁড়াবে। তাই সব পাপকেই খুব বেশী ভয় করা চাই, হোক সেটা ছোট পাপ, তবুও সেটাকে ভিষণভাবে ভয় পাওয়া চাই এবং আল্লাহর কাছে তাঁর দুআ করা চাই যে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতের দৃষ্টি কামনা করি, তোমার গযব ও ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। যাহোক একথা গেল তাদের ব্যাপারে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা রাগের মুডে থাকবেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

আবার যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা রহমতের মুডে অর্থাৎ, দয়ার মুডে এসে যাবেন, তাদেরকে বিভিন্ন ছোটখাট নেক আমলের ওছীলাতেও ক্ষমা করে দিবেন। এমনকি কোন আমল না থাকলেও শুধু ঈমান থাকার কারণেই ক্ষমা করে দিবেন। এরকম লোকদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে,

لَا يَدْخُلُ النَّارَ رَجُلٌ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٣٩٤٧ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري)

অর্থাৎ, যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমান আছে, সেও জাহান্নামে যাবে না।

তাই কোন মু'মিন মুসলমান –চাই সে যত বড়ই পাপী হোকনা কেন– তার সম্পর্কে একথা বলতে নেই যে, ওতো জাহান্নামী! কারণ, হতে পারে শুধু ঈমানেই ওছীলাতেই তার নাজাত হয়ে যাবে কিংবা কোন এক আমলের ওছীলায় তার জন্য জান্নাতের ফয়সালা হয়ে যাবে। এ হাদীছ থেকে একথাও বোঝা গেল যে, নিজের জীবনের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা তো করতেই হবে, সেই সাথে সাথে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশাও রাখতে হবে। জীবনের যত পাপই থাকুক না কেন, আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা রাখতে হবে, কেননা, আল্লাহ পাক অনেককেই শুধু ঈমানের ওছীলাতেই ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাত নসীব করবেন।

জীবনের যত পাপই থাকুক না কেন, আল্লাহর রহমত পাওয়া থেকে হতাশ হতে নেই। কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَيْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ. (সূরা ইউসুফ: ৮৭)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না।

তবে এ আয়াত দ্বারা এটা বোঝানো হয়নি যে, আল্লাহর রহমত পাবেই, অতএব যত ইচ্ছা পাপ করে নিতে পার। একথাও বোঝানো হয়নি যে, তওবা করার প্রয়োজন নেই রহমত তো পাবেই। এসব কথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, পাপ থেকে বিরত থাকার কথা অনেকভাবেই বলা হয়েছে। আবার পাপ হয়ে গেলে তওবার কথাও অনেকভাবে বলা হয়েছে। কাজেই এ আয়াতে পাপ করার অনুমতি দেয়াও উদ্দেশ্য নয়, তওবা করতে হবেনা তাও বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যত পাপই থাকুক না কেন আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হওয়া যাবে না বরং আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা রাখতে হবে এবং আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য দুআও করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য জান্নাত লাভ করাকে সহজ করে দিন, সহজে জান্নাত লাভ করার মত আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৩৪

আমাদের আসল পরিচয় ও দুনিয়ার আসল স্বরূপ কি?

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমাদের আসল পরিচয় কি? কোত্থেকে আমরা এসেছি? কোথায় আমরা যাব? এই কথাগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে স্মরণ রাখি, তাহলে দ্বীনের উপর চলার মনোভাব জাগ্রত থাকবে, অনেক রকম পেরেশানী কমে যাবে। এখানে মূলত দুইটি প্রশ্ন। একটি প্রশ্ন হল আমাদের আসল পরিচয় কি? আর একটি প্রশ্ন হল আমরা কোত্থেকে এসেছি এবং কোথায় যাব?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল– আমাদের আসল পরিচয় হচ্ছে আমরা আল্লাহর বান্দা তথা আল্লাহর গোলাম। যে ব্যক্তি অন্য কারও গোলাম বা দাস হয়, তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় চলার কোন অধিকার থাকে না, নিজের মতে চলার কোন অধিকার থাকে না। গোলাম নিজের খেয়াল খুশী মত চলতে পারে না। বরং তার মুনীব যেভাবে বলেন সেভাবেই তাকে চলতে হয়। তদ্রূপ আমাদেরও মনে রাখতে হবে যে, আমরা আল্লাহর গোলাম, আমাদের নিজেদের খেয়াল-খুশী মতে চলার অধিকার নেই। আল্লাহ আমাদের মনিব, তিনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই আমাদেরকে চলতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল– আমরা এসেছি জান্নাত থেকে এবং আবার জান্নাতে ফিরে যাব, আমাদের গন্তব্যস্থান হল জান্নাত। আমরা জান্নাত থেকে এসেছি, আবার ঘুরে ফিরে সেই জান্নাতে যাব। জান্নাত হল আমাদের আসল বাড়ি। যদি আমাদের একথা স্মরণ থাকে যে, আমাদের আসল বাড়ি হল জান্নাত, সেই বাড়িতেই হবে আমার সবকিছু পাওয়া, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যেমন দুনিয়াতে আমার বাড়ি হল না, তাহলে আমার পেরেশানী আসবে না, কারণ এটা আমার আসল বাড়ি নয়। আমার আসল বাড়ি হচ্ছে কি-না সেটাই আমার আসল চিন্তা। দুনিয়াতে আমার রোগ-শোক আছে কষ্ট-ক্লেশ হচ্ছে, তাহলে পেরেশানী হবে না। কারণ, আমার আসল বাড়ী হল জান্নাত, সেই আসল বাড়ি জান্নাতেই হবে আমার সুখ-শান্তি। দুনিয়াতে আমার টাকা-পয়সার অভাব, ভোগ-বিলাস করতে পারছি না, তাহলে পেরেশানী হবেনা। কারণ, আমার ভোগ বিলাস তো হবে আসল বাড়ি জান্নাতে, দুনিয়াতে ভোগ বিলাস নাইবা হল।

আমাদের আসল ঠিকানা হল জান্নাত। আমরা এসেছি জান্নাত থেকে। আল্লাহ পাক প্রথম মানুষ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করার পর বলেছিলেন,

يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. (সূরা বাকারা: ৩৫)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখান থেকে আহার গ্রহণ করতে থাক স্বাচ্ছন্দে পর্যাপ্ত, যেখান থেকে তোমরা চাও। আর এই গাছের নিকটেও যেওনা, তাহলে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন দুনিয়ার জন্য। কিন্তু প্রথম মানুষ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করার পর কিছুদিন জান্নাতে রেখেছেন। তারপর তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। দুনিয়ার জন্যই যখন তাঁদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, শুরুতেই দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া যেত, কিন্তু তা না করে প্রথমে কিছুদিন জান্নাতে রেখে তারপর দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যাতে আমাদের সকলের মনে থাকে যে, আমাদের আসল ঠিকানা তো জান্নাত। আমাদের আদি মাতা পিতা ছিলেন জান্নাতে। জান্নাত থেকে তাঁরা এসেছেন। আমাদের আসল বাড়ী তো হল জান্নাত। দুনিয়া আমাদের আসল বাড়ী নয়। একথা যদি মনের মধ্যে জাগ্রত থাকে, তাহলে ঐ বাড়ীর জন্য মনের মধ্যে প্রস্তুতির চিন্তা-ফিকির আসবে। আমাদের চিন্তা হল দুনিয়াই আমাদের বাড়ী। তাই কীভাবে দুনিয়াতে গাড়ি বাড়ী করা যায়, কীভাবে দুনিয়াতে টাকা-পয়সা করা যায় এই চিন্তা সব সময় মনের মধ্যে থাকে। যদি আসল বাড়ির চিন্তা থাকত, তাহলে সেই বাড়ির চিন্তাই সারাক্ষণ করা হত।

যদি আমাদের একথা স্মরণ থাকে যে, আমাদের আসল বাড়ি হল জান্নাত, আমাদের আসল ঠিকানা হল জান্নাত, তাহলে মনের মধ্যে সব সময় সেই আসল বাড়ি জান্নাতে যাওয়ার প্রস্তুতি থাকবে, মনের মধ্যে সব সময় আসল ঠিকানায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা থাকবে। তখন মনে হবে যে, দুনিয়া আমার আসল ঠিকানা নয়, আমার আসল ঠিকানা হল জান্নাত। দুনিয়া আমার আসল দেশ নয়, আখেরাত হল আমার আসল দেশ। মাঝখানে কিছু দিনের জন্য আয়-রোযগার করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন এক দেশে এসেছি। এই ভিন্ন দেশে কিছু কষ্ট-ক্লেষ হলেও তাতেও কোন দুঃখ নেই, এখানে আরাম-আয়েশ না হলেও তাতে কোন দুঃখ নেই, আরাম আয়েশ সব করব দেশে ফিরে গিয়ে। যেমন কোন মানুষ যখন বিদেশে যায়, তখন তার চিন্তা থাকে কবে বাড়ী ফিরে যাব। সারাক্ষণ সে বাড়ী ফিরে যাওয়ার চিন্তায় থাকে, বাড়িতে ফিরে গিয়ে যেন আরাম আয়েশে থাকতে পারে তার প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেভাবে টাকা-পয়সা রোজগারের কাজে ব্যস্ত থাকে। বেকার বসে থেকে সময় নষ্ট করে না। একথা মনে করে না যে, এটাই আমার আসল জায়গা, এখানে যা আরাম আয়েশ করে নেয়া যায়। বরং মনে করে এখানে আমার যত কষ্ট-ক্লেষ হোক কোন অসুবিধা নেই, এখানে আমি শান্তি করতে আসিনি, এখানে আমি আরাম করতে আসিনি, এখানে আমি কষ্ট করতে এসেছি, বাড়ীতে যেয়ে যেন সুখ-শন্তিতে থাকতে পারি। সে মনে করে বিদেশ আরাম করার জায়গা নয় বরং কষ্ট করার জায়গা। ঠিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন দুনিয়ার ব্যাপারে একথাই বলেছেন যে, দুনিয়া আরাম করার জায়গা নয়, বরং দুনিয়া হল কষ্ট-ক্লেষের জায়গা। এক আয়াতে বলা হয়েছে,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ. (সূরা বালাদ: ৪)

অর্থাৎ, আমি মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যেই সৃষ্টি করেছি।

অতএব দুনিয়াতে কষ্ট-ক্লেশ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কষ্টটাকে স্বাভাবিক মনে করতে হবে। এ আয়াতে দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশকে স্বাভাবিক মনে করে নিতে বলা হয়েছে। দুনিয়ায় সুখ-শান্তি হওয়া স্বাভাবিক নয়, বরং দুনিয়ায় যতটুকু সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ হয় সেটা হল আস্বাভাবিক। এখানে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কষ্ট-ক্লেষ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি মনকে এরকম বোঝানো যায়, তাহলে দুনিয়াতে অনেক পেরেশানী কমে যাবে। আমার অমুক রোগ-ব্যাধি, অমুক টেনশন, অমুক বিপদ-আপদ, অমুক অসুবিধা– এসব চিন্তা করে আমরা পেরেশান হই। এই পেরেশানী কমে যাবে, যখন মনে করা হবে যে, এটাই হল স্বাভাবিক। আল্লাহ পাক এই মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যই বলেছেন যে, দুনিয়াতে আমি মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যেই সৃষ্টি করেছি। এখানে কষ্ট-ক্লেশ থাকাটাই স্বাভাবিক। আরাম ও শান্তি হবে আসল বাড়িতে গিয়ে।

দুনিয়াতে মু'মিন মুসলমানদের কষ্ট-ক্লেশ হওয়াটা স্বাভাবিক। এর বিপরীত অমুসিলম কাফেরদের জন্য দুনিয়াতে আরাম আয়েম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, পরকালে তাদের জন্য আরাম আয়েশের কোন ব্যবস্থা নেই। মুমিন মুসলমানদের জন্য পরকালে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা আছে। তাই পরকালের আরাম আয়েশের সামান সংগ্রহের জন্য দুনিয়াতে তাকে কিছু কষ্ট-ক্লেষ করতেই হবে। অতএব দুনিয়াতে তাদের কষ্ট-ক্লেষ থাকাটাই স্বাভাবিক। যাহোক মু'মিনদের জন্য **দুনিয়াতে থাকা হল বিদেশে থাকার মত**। এই হল আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার একটা উদাহরণ যে, দুনিয়া হচ্ছে বিদেশের মত। দুনিয়ায় থাকা হল কিছু দিনের জন্য আয় উপার্জন করার উদ্দেশ্যে বিদেশে থাকার মত।

দুনিয়ার আর একটা উদাহরণ হল– দুনিয়া হচ্ছে কারাগারের মত। এজন্যই এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٧٦٠٦)

অর্থাৎ, দুনিয়া মু'মিনদের জন্য হল কারাগার আর কাফেরদের জন্য হল জান্নাত।

দুনিয়া হচ্ছে মু'মিনদের জন্য কারাগার অর্থাৎ, কয়েদখানা বা জেলখানা। যে ব্যক্তি কয়েদখানায় বা জেলখানায় যায়, সে মনে করে যে, এখানে কষ্ট-ক্লেষ হওয়াটাই হচ্ছে স্বাভাবিক। যদি এর ভিতরে কিছু আরাম-আয়েশ পাওয়া যায় সেটা হল অতিরিক্ত, সেটা হল অস্বাভাবিক। কষ্টের ভিতরে থাকটাই স্বাভাবিক। এর বিপরীত যারা কাফের যাদের পরকাল নেই, পরকালে তাদের জন্য আযাব আর আযাব, কষ্ট আর কষ্ট। সেই তুলনায় দুনিয়া তাদের জন্য স্বর্গ। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া মু'মিনদের জন্য হল কারাগার আর কাফেরদের জন্য হল জান্নাত।

দুনিয়ার আর একটা উদাহরণ হল– দুনিয়া হচ্ছে বাজারের মত। আমরা যেমন বাড়ি থেকে বাজারে যাই, বাজার সেরে আবার বাড়িতে ফিরে আসি। তদ্রূপ আমরা জান্নাত থেকে এই দুনিয়ার বাজারে এসেছি, এখান থেকে বাজার সেরে আবার আসল বাড়িতে ফিরে যাব। আমরা কেউ বাজারকে আসল ঠিকানা মনে করি না। বাজারে যেয়ে একথা মনে করি না যে, এখানে বিছানা করে ভাল করে ঘুমিয়ে নেই। এখানে ভাল করে আরাম আয়েশ করে নেই। বরং মনে করি এটা হল আরাম-আয়েশের সামান সংগ্রহ করার স্থান, মূল আরাম আয়েশের স্থান নয়। ঠিক দুনিয়ার অবস্থাও এমনই। আমরা দুনিয়ায় এসেছি আখেরাতের সদায় করতে, আসল বাড়ির জন্য সদায় করতে। এখানে আরাম আয়েশ করতে আসিনি, এখানে ঘুমানোর জন্য আসিনি, এখানে সুখ-শান্তি ভোগ-বিলাস করার জন্য আসিনি। এখান থেকে ভাল ভাল সদায় নিয়ে বাড়ি ফিরব, বাড়ি ফিরে আরাম আয়েশ করব।

দুনিয়ার সাথে বাজারের খুব মিল। বাজারে যেমন কিছু লোক বাইরে থেকে বাজারে প্রবেশ করছে। কিছু লোক বাজারে সওদা করা অবস্থায় আছে, আর কিছু লোক সওদা শেষ করে বাজার থেকে বের হয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

যাচ্ছে। ঠিক দুনিয়াটাও এরকমই। কিছু লোক নতুন জন্মগ্রহণ করছে, তারা দুনিয়ার এই বাজারে ঢুকছে। কিছু লোক যারা বেঁচে আছে, তারা দুনিয়ায় বিভিন্ন আমল করছে, তারা যেন এই বাজারে সওদা করায় লিপ্ত আছে। আর কিছু লোক মৃত্যুবরণ করছে, তারা এই বাজার থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

যারা বাজার থেকে বের হয়ে গেল তাদের দেখার হল তারা আদৌ কিছু সওদা করে নিয়ে বের হতে পারল না কি কোন সদায় ছাড়াই বের হয়ে গেল। কেউ যদি বাজারে যেয়ে শুধু ঘোরা ফেরাই করে, সওদা কিছুই না করে খালি থলেটা নিয়ে বাজার থেকে বের হয়ে যায় কিংবা সওদা করলেও ভাল কোন জিনিস সওদা করে না বরং বাজে জিনিস সওদা করে, তাহলে বাড়ীতে ফেরার পর তাকে গুরুজনের কাছে বকা খেতে হবে বা শাস্তি পেতে হবে। তদ্রূপ দুনিয়ার বাজারে এসে আমরা যদি ভাল কিছু সওদা করে নিয়ে না যাই, তাহলে আখেরাতে যেয়ে তিরস্কার পেতে হবে বা শাস্তি পেতে হবে।

দুনিয়ার বাজারে যে যত বেশী পণ্য বিক্রি করতে পারে, সে তত বেশী টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতে পারে। আখেরাতের এই বাজারে পণ্য হল আমাদের জান ও মাল, এই জান ও মাল দিয়ে আমরা বিনিময়ে পাব জান্নাত। আমরা যত বেশী জান ও মাল আল্লাহর কাজে ব্যয় করতে পারব, তত বেশী জান্নাত অর্জন করার যোগ্যতা হাসেল হতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. (সূরা তাওবা: ১১১)

অর্থাৎ, আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, বিনিময়ে তাদের জন্য থাকবে জান্নাত।

দুনিয়ার আর একটা উদাহরণ হল– দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের ক্ষেত। এজন্যই বলা হয়,

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ, দুনিয়া হল আখেরাতের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত।

এখানে ফসল উৎপন্ন করে যে যত ফসল ঘরের জন্য তুলে নিয়ে যেতে পারে। দুনিয়া হল আখেরাতের ক্ষেত। এই খেতে ফসল উৎপন্ন করে আমরা আসল বাড়ীর জন্য যে যত নিয়ে যেতে পারি। ক্ষেতকে কেউ আসল বাড়ী মনে করেনা, ক্ষেতকে কেউ আরাম-আয়েশের জায়গা মনে করেনা। কৃষক ক্ষেতে যেয়ে মনে করে না যে, আমার আসল জায়গায় এসে গেছি, এবার লেপ তোশক বিছিয়ে নাক ডেকে ঘুম দেই। বরং কৃষক মনে করে ক্ষেতে এসেছি ফসল উৎপাদন করার জন্য। কী করে বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারি সেই তৎপরতাই আমাকে চালাতে হবে। এখানে ফসল উৎপাদন করে সেই ফসল আমি ঘরে নিয়ে যাব। আমার ঘরই হল আমার আসল ঠিকানা। ক্ষেত আমার আরাম আয়েশ করার জায়গা নয়, আরাম-আয়েশ করার জায়গা হল বাড়ি। তদ্রূপ দুনিয়া হল আখেরাতের ফসল উৎপাদনের স্থান, এই দুনিয়া আমার আসল ঠিকানা নয়। এই দুনিয়া আরাম-আয়েশ করার জায়গা নয়, আরাম-আয়েশ করার জায়গা হল আসল বাড়ি। আর আসল বাড়ি হল জান্নাত।

এই হল দুনিয়ার আসল পরিচয়, এই হল দুনিয়ার আসল স্বরূপ যে, দুনিয়া আসল ঠিকানা নয়, দুনিয়া আসল দেশ বাড়ি নয়, দুনিয়া হল বিদেশের মত, এখান থেকে আসল দেশ বাড়ির জন্য আয়-উপার্জন করে নিতে হবে। দুনিয়া হল কারাগারের মত, এটা আরাম আয়েশের স্থান নয়, এখানে আরাম-আয়েশের চিন্তা বর্জন করতে হবে। দুনিয়া হল বাজারের মত, এখান থেকে আসল বাড়ির জন্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বাজার সওদা করে নিয়ে ফিরে যেতে হবে। দুনিয়া হল আখেরাতের ক্ষেত, এখান থেকে আখেরাতের জন্য ফসল উৎপাদন করে নিতে হবে। আমরা দুনিয়ার এই পরিচয় ভুলে গিয়ে কেউ দুনিয়াকেই আসল বাড়ি মনে বসেছি, সেভাবে এখানেই সব ভোগ-বিলাসের চিন্তায় মগ্ন আছি। দুনিয়াকেই আরাম-আয়েশের স্থান মনে করে বসেছি, সেভাবে এখানের আরাম-আয়েশের ফিকিরে মত্ত হয়ে পড়েছি। দুনিয়াকে সুখ-শান্তির স্থান মনে করে বসেছি, সেভাবে দুনিয়ার সুখ-শান্তির চিন্তায় আখেরাতকে ভুলে বসেছি।

দুনিয়া যদি সুখ-শান্তির স্থান হত, তাহলে দুনিয়াতে নির্ভেজাল সুখ-শান্তি পাওয়া যেত। কিন্তু দুনিয়ার সুখ-শান্তি নির্ভেজাল নয়। দুনিয়ায় মানুষের কিছু শান্তি হলেও অশান্তিও থাকেই। দুনিয়াতে এমন একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, তার কোনই অশান্তি নেই। এর অর্থই হল দুনিয়ায় শান্তিটা নির্ভেজাল শান্তি নয়। নির্ভেজাল শান্তির স্থান হল জান্নাত।

দুনিয়া যদি চাওয়া পাওয়া পূর্ণ হওয়ার স্থান হত, তাহলে দুনিয়াতে কারও চাওয়া পাওয়া অপূর্ণ থাকত না। অথচ দুনিয়াতে এমন একজন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না যার সব চাওয়া পাওয়া পূর্ণ হয়ে যায়। শত কোটি হোক, হাজার কোটি হোক, লক্ষ কোটি হোক তবুও তার চাওয়া অপূর্ণ থেকে যাবে। এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, যিনি বলবেন যে, আমার আর কোন চাওয়া পাওয়া নেই, আমার সব চাওয়া পাওয়া পূর্ণ হয়ে গেছে। মুখে বলতে পারে কিন্তু তার দিলের ভিতরে আরও চাহিদা আছে। দিলের ভিতরে চাহিদা থাকবে না এটা হতে পারে না। কিন্তু আখেরাত একমাত্র এমন জায়গা, যেখানে চাওয়া পাওয়ায় কোন অপূর্ণতা থাকবে না, সেখানে সব চাওয়া পাওয়া পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ. (সূরা হা মীম সাজদা: ৩১)

অর্থাৎ, সেখানে তোমাদের মন যা চাইবে সব পাবে। সেখানে তোমরা যা দাবী করবে তা-ই পাবে।

যাহোক দুনিয়া মানুষের চাওয়া পাওয়ার আসল জায়গা নয়, চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ হওয়ার আসল জায়গা হল জান্নাত।

দুনিয়া যদি ভোগ বিলাসের আসল জায়গা হত, তাহলে দুনিয়াতে মানুষের যা কিছু ভোগ বিলাস হত তার ভিতরে মানুষের তৃপ্তি আসত, কখনই কোন ত্যাক্ততা আসত না। কিন্তু তা হয় না। দেখা যায় দুনিয়ার কোন ভোগ বিলাসেই তৃপ্তি আসে না, অতৃপ্তি থেকেই যায়, একই জিনিস ভোগ করতে করতে ত্যক্ততা এসে যায়। বিরানী খেতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু কতক্ষণ, কতবার? কয়েকবারের পরই ত্যাক্ততা এসে যায়। এমনিভাবে দুনিয়ায় যত ভাল খাবার হোক, যত ভোগ-বিলাসের জিনিস হোক তার মাঝে ত্যাক্ততা এসে যায়, কিন্তু জান্নাতের কোন কিছুতে কোন ত্যাক্ততা আসবে না। জান্নাতে মানুষ ফল খাবে, প্রতিবারে নতুন স্বাদ পাবে, ফলে কখনই কোন ত্যাক্ততা আসবে না। সূরা বাকারার এক আয়াতে বলা হয়েছে,

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا. (সূরা বাকারা: ২৫)

এ আয়াতের সারকথা হল– যখনই কোন জান্নাতীকে একটা ফল দ্বিতীয়বার খেতে দেয়া হবে, তার কাছে দেখতে মনে হবে আগেরটাই, কিন্তু আসলে তার স্বাদ ভিন্ন। একই ফলে প্রতিবার সে ভিন্ন

www.maktabatulabrar.com

ভিন্ন স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। ফলে কখনই কোন খাবারের প্রতি তার মনে কোন ত্যাক্ততা বোধ আসবে না। যতবার খাবে ততবার নতুন স্বাদ, ত্যাক্ততা বলে কোন জিনিস নেই।

এর বিপরীত দুনিয়ার জিনিস যত খাওয়া হবে তত ত্যাক্ততা আসতে থাকবে। বরং দুনিয়ার জিনিসের তো স্বাদই নেই। যেমন মরা পঁচা জিনিসের কোন স্বাদ নেই বরং বিস্বাদ আছে। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াকে মরা পঁচা জিনিসের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ. (قال الصغانى الحديث موضوع. وقال العجلونى : ومعناه صحيح)

অর্থাৎ, দুনিয়া হল মরা জানোয়ার, আর এই দুনিয়া সন্ধানকারী হল কুকুরের মত।

এখানে বোঝানো হয়েছে– যাদের রুচি দোরস্ত হয়ে যাবে, তারা আর দুনিয়াকে তালাশ করবে না, দুনিয়া তাদের কাছে মজার মনে হবে না। তাদের অবস্থা তো হবে এরকম যে, এক বুযুর্গ বলেছেন,

نہ کھانے میں لذت ہے نہ پینے میں نہ سونے میں + مزہ جو کچھ آتا ہے اخیررات کو رونے میں

অর্থাৎ, না খাওয়ায় কোন মজা আছে, না পান করায় কোন মজা আছে, আর না নিদ্রার মধ্যে কোন মজা আছে। মজা যা আছে তা তো শেষ রাতে উঠে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটির মধ্যে আছে। সুবহানাল্লাহ মনের কত উন্নত হালাত!

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে কি দুনিয়ার কোন কিছুই আমরা গ্রহণ করব না? দুনিয়ার কিছু মাল আসবাব ছাড়া তো চলাও সম্ভব নয়। এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী (রহ.) বলেছেন,

اب اندرزیر کشتی پشتی ست + اب در کشتی ہلاک کشتی ست

অর্থাৎ, নদী পার হতে নৌকার প্রয়োজন। আর নৌকা চলার জন্য পানির প্রয়োজন। পানি ছাড়া নৌকা চলতে পারবে না, কিন্তু পানিকে নৌকার বাইরে রাখতে হবে ভিতরে ঢুকতে দেয়া যাবে না। পানি যদি নৌকার ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে নৌকা ডুববে, আরোহীদেরকে সহ ডুববে। ঠিক দুনিয়াটর অবস্থাও এরকম। এই জীবন তরী চালানোর জন্য দুনিয়া প্রয়োজন। দুনিয়ার মাল-সামান ব্যতীত জীবন তরী চলবে না। কিন্তু এই মাল-সামান জীবনের মধ্যে অর্থাৎ, মনের মধ্যে ঢুকতে দেয়া যাবেনা, তাহলে জীবন তরী ডুববে, আরোহীসহ ডুববে। নৌকা চলতে চলতে যদি নৌকার মধ্যে কিছু পানি ঢুকে পড়ে, তাহলে সেচ করে সেই পানি নৌকার বাইরে ফেলে দিতে হয়। তদ্রূপ দুনিয়ার মধ্য দিয়ে চলার সময় যদি কিছুটা দুনিয়ার মহব্বত মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাহলে যিকির-আযকার করে মনের মধ্য থেকে দুনিয়ার সেই মহব্বত বের করে দিতে হবে। যিকির আযকার হল সেচ-এর মত। যিকির আযকার দ্বারা দিলের মধ্য থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের হয়ে যায়। দুনিয়া কিছুটা দরকার, দুনিয়া ছাড়া আখেরাতের পথ পাড়ি দিতে পারব না, দুনিয়ার উপর দিয়েই পাড়ি দিয়ে যেতে হবে, তবে দুনিয়া ভিতরে ঢুকতে দেয়া যাবে না। দুনিয়ার সাথে ততটুকু সম্পর্ক রাখব, যতটুকু না হলে নয়। ঠিক পানির সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক না রাখলে নৌকা চলতে পারে না ততটুকু, তার চেয়ে বেশী নয়। তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক রাখলে দুনিয়া আমার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়ার স্বরূপ বোঝার তাওফীক দান করুন, সহীহ্ ভাবে সবকিছু আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৩৫

অভাব বোধ ও মনের পেরেশানী দূর করার উপায়

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا. وَفِى الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ : تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَا تَفَرَّغْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

দুনিয়ার যে কোন দেশের মানুষ হোক, যে কোন স্তরের মানুষ হোক– ধনী হোক, গরীব হোক, মুসলমান হোক অমুসলমান হোক সকলেরই একটা পেরেশানী আছে, সেই পেরেশানী থেকে কেউই মুক্ত নয়। সেই পেরেশানী হল মানুষের অভাব বোধ। যার যা আছে তা নিয়ে মানুষ তৃপ্ত নয়। একজন মানুষ যার গাড়ী বাড়ি নেই তার এই অভাব বোধ থাকে যে, আমার গাড়ী বাড়ি নেই, গাড়ি বাড়ি দরকার। যার একটা গাড়ি একটা বাড়ি আছে, তারও অভাব বোধ থাকে যে, আমার আরও দুটো দরকার। দুটো হলেও অভাব বোধ কাটে না, তখন মনে হয় আরও বেশী দরকার, প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য একটা গাড়ি দরকার, বিবির জন্য একটা গাড়ি দরকার, প্রত্যেক বাচ্চার জন্য আলাদা আলাদা বাড়ি করা দরকার। এভাবে যারা উচ্চবিত্ত তাদের অভাব বোধ কাটে না, তাদের পেরেশানী যায় না। যারা নিম্ন বিত্ত– যারা রোজ আনে রোজ খায়, রোজ ১০০ টাকা ২০০ টাকা ইনকাম করে তারা মনে করে যে, আমার যদি প্রতিদিন পাঁচশত টাকা ইনকাম থাকত তাহলে আমার আর কোন অভাব থাকতো না। কিন্তু পাঁচশত নয় প্রতিদিন হাজার টাকা ইনকাম করলেও তার অভাব বোধ যাবে না, মনে হবে আরও ইনকাম হওয়ার দরকার ছিল। কেউ এ কথা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে না যে, আমার এই পরিমাণ সম্পত্তি থাকলে আমার আর পেরেশানী থাকত না। দেখা যাবে সেই পরিমাণ হওয়ার পরেও তার পেরেশানী থাকবে, অভাব বোধ থাকবে– মনে হবে আরও দরকার, আরও দরকার।

এই যে অভাব বোধ, এই যে পেরেশানী, এ থেকে মুক্তির কোন উপায় দুনিয়ার কেউ বলে দিতে পারবে না। কেউ বলে দিতে পারবে না যে, আপনার এত পরিমাণ সম্পদ হলে আপনার আর কোন চাহিদা থাকবে না, আপনার এত পরিমাণ সম্পদ হলে আপনার আর কোন পেরেশানী থাকবে না, আপনার মনের মধ্যে সম্পূর্ণ তৃপ্তি বোধ এসে যাবে। কেউ এটা বলে দিতে পারবে না। নতুবা কোটি কোটি নয়, হাজার কোটি টাকার মালিকও একথা বলছে না যে, আমার আর দরকার নেই, যা হয়েছে অনেক হয়েছে। আমাদের সকলেরই অবস্থা হল যত হোক আরও চাই, যত হোক আরও চাই। এই চাওয়ার যেন কোন শেষ নেই। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সুন্দর করে একথাটা বলেছেন। বুখারী শরীফের এক হাদীছে এসেছে–

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ.

(صحيح البخاري ٦٤٣٩)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, বনী আদমের যদি এক উপত্যকা ভরা স্বর্ণ হয়ে যায়, তবুও তার তৃপ্তি হবে না, মনে হবে আরও এত পরিমাণ যদি হত। ঐ পরিমাণ হলেও তৃপ্তি হবে না, মনে হবে আরও এত পরিমাণ যদি হত। যত পাবে ততই তার গাল হা-হতে থাকবে। এই হা কখনও ভরবে না। কবরের মাটি যখন গালের ভিতরে যাবে তখন ঐ হা ভরবে, এর আগে আর ভরবে না।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। যত পাই তত চাই– এই হল মানুষের স্বভাব। কাজেই সম্পদ পেয়ে যাওয়া অভাব বোধের পেরেশানী থেকে মুক্তির পথ নয়। তাহলে এই অভাব বোধ থেকে মুক্তির পথ কি? নেই নেই পেরেশানী থেকে মুক্তির পথ কি? এর থেকে মুক্তির একটা পথ আছে। হাদীছে কুদছীর ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدَّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ.

(رواه الترمذي برقم ٢٤٦٦ وقال : حسن غريب)

অর্থাৎ, হে বান্দা! আমার ইবাদতের জন্য ফারেগ হয়ে যাও। আমি তোমার মনকে স্বচ্ছল করে দেব অর্থাৎ, মনের অভাব বোধকে দূর করে দিব এবং প্রকৃত পক্ষেও অভাব দূর করে দিব। আর যদি আমার ইবাদতের জন্য ফারেগ না হও, তাহলে কাজ দিয়ে তোমার হাত ভরে দিব এবং তোমার অভাব বোধ দূর করব না।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– যদি কেই সত্যিকারভাবে ইবাদতের উপরে উঠে আসে, তাহলে তার মনের অভাব বোধ দূর হয়ে যাবে, নেই নেই পেরেশানী দূর হয়ে যাবে, যা আছে তাই নিয়ে তার তৃপ্তি এসে যাবে। মনের মধ্যে ঐ তৃপ্তি এসে যাওয়ার নাম-ই হল মনের শান্তি। কোটি টাকা হয়ে যাওয়ার নাম শান্তি নয়, শত কোটি টাকা হয়ে যাওয়ার নাম শান্তি নয়, হাজার কোটি টাকা হয়ে যাওয়ার নাম শান্তি নয়। কোটি কোটি টাকা, শত কোটি টাকা, হাজার কোটি টাকা থাকলেও অভাব বোধ যায় না, পেরেশানী যায় না, তাহলে বোঝা গেল টাক-পয়সা মনের পেরেশানী দূর করতে পারে না, টাকা-পয়সা মনের মধ্যে শান্তি আনতে পারে না। মনের মধ্যে শান্তি আনার পথ হল যা আল্লাহ পাক বলেছেন যে, আমার ইবাদতের জন্য ফারেগ হয়ে যাও, তোমার মনের অভাব বোধকে আমি দূর করে দেব। শুধু মনের অভাব দূর হবে না সত্যিকার অভাবও আমি দূর করে দেব। এর বিপরীত যদি আমার ইবাদতের জন্য ফারেগ না হও, তাহলে কাজ দিয়ে তোমার হাত ভরে দিব এবং তোমার অভাব বোধ দূর করব না।

আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হলে তার মনের পেরেশানী কোন দিন দূর হবে না। একথা কুরআনে কারীমের একটা আয়াতেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا. (সূরা তাহা: ১২৪)

অর্থাৎ, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ।

অর্থাৎ, তার জীবন থেকে সংকীর্ণতা কখনও যাবে না। সংকীর্ণতাদুই ধরনের। এক ধরনের সংকীর্ণতা হল মনের দিক থেকে সংকীর্ণতা অর্থাৎ, মনের অভাব বোধ দূর না হওয়া, পেরেশানী বোধ দূর না হওয়া। আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হলে মনের মধ্যে এই ধরনের সংকীর্ণতা থাকবে। আর এক ধরনের সংকীর্ণতা হল কর্ম জীবনের সংকীর্ণতা অর্থাৎ, কাজকর্মে বিপদ ও পেরেশানী লেগে থাকা।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

একটা বিপদ দূর হতে না হতে আরও দশটা বিপদ এসে পড়ে, একটা সমস্যা দূর হতে না হতে আরও পাঞ্চাশটা সমস্যা এসে পড়ে। এভাবে জীবন সংকট থেকে সে উদ্ধারই হতে পারে না। আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হলে এই সংকীর্ণতাও থাকবে। আল্লাহ পাক বলেছেন, এই উভয় ধরনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমার স্মরণের উপর উঠে আসতে হবে অর্থাৎ, ঈমান আমলের উপর উঠে আসতে হবে।

কত সুন্দর করে সমস্যার সমাধান বলে দেয়া হয়েছে। গোটা দুনিয়ার মানুষ যে সমস্যায় ভুগছে, কারও অভাব বোধ যাচ্ছে না, কারও পেরেশানী দূর হচ্ছে না, কারও টেনশান কাটছে না। সকলের এই সমস্যার সমাধান কত পরিস্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান আমলের জন্য ফারেগ হয়ে যাও, ঈমান আমলের উপর উঠে আস, তাহলে তোমাদের এই সমস্যার সমাধান এসে যাবে।

এই বয়ান শোনার পর আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগবে। সেটা হল– মুসলমান তো ঈমান আমলের উপরে আছেই, তা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে এই পেরেশানী দেখা যায় কেন, তারা মনে শান্তি পায়না কেন ? তাহলে কি নাউযুবিল্লাহ কুরআন-হাদীছের কথা ঠিক নয়? আসলে আমাদের ভিতরে অনেক সময়ই উল্টো প্রশ্ন জাগে। যেমন কুরআন শরীফের এই আয়াত শুনলেও উল্টো প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ পাক বলেছেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ. (সূরা আনকাবূতঃ ৪৫)

অর্থাৎ, অবশ্যই নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

এই আয়াত শুনলেও আমাদের ভিতরে উল্টো প্রশ্ন জাগে যে, কই কত লোক দেখি নামায পড়ে আবার অশ্লীল কাজও করে খারাপ কাজও করে? তাহলে নামায তাকে অশ্লীল কাজ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখল কই? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এরকম প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি এই প্রশ্নের যে জওয়াব দিয়েছিলেন তার সারকথা হল– নামায পড়া সত্ত্বেও যে অশ্লীল কাজ ও পাপ কাজ থেকে বিরত হচ্ছে না তাহলে বুঝতে হবে তার নামায সঠিক হচ্ছে না। নামায সঠিকভাবে হলে অবশ্যই সেই নামায তার ভিতরে এমন আছর করত যে, সে অশ্লীল কাজ ও পাপ কাজের ধারে কাছেও যেত না। তার ভিতরে চেতনা এভাবে গড়ে উঠত যে, সে অশ্লীল কাজ ও পাপ কাজের ধারে কাছেও যেত না। যখন দেখা যাচ্ছে নামায পড়া সত্ত্বেও সে খারাপ কাজ করছে, বুঝতে হবে তার নামায সঠিক হচ্ছে না। এখানেও ঐ একই কথা যে, ঈমান আমলের উপরে থাকার পরেও মুসলমানদের পেরেশানী যাচ্ছে না তাহলে ঈমান আসল যথার্থ হচ্ছে না।

কয়জন মুসলমান নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে, আমার ঈমানে কোন ত্রুটি নেই, আমার আমলে কোন ত্রুটি নেই। পদে পদে আমাদের ভিতরে ঈমান বিরোধী চেতনা কাজ করছে। পদে পদে আমাদের দ্বারা শরীয়তের আমল তরক হচ্ছে। যাকিছু আমল করছি তাও ত্রুটিহীন হচ্ছে না। তাই আমাদের মনের অভাব বোধ যাচ্ছে না, মনের পেরেশানী যাচ্ছেনা, বুঝতে হবে আমাদের ঈমান আমলে ত্রুটি রয়ে গেছে, আমরা আল্লাহর ইবাদতের জন্য যথাযথভাবে ফারেগ হতে পারিনি।

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যে অভাব অভাব বোধ করি, আসলে আমাদের সত্যিকার অভাব কতটুকু তা আমরা অনেকেই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি না। আমরা যেটাকে অভাব মনে করছি আসলে সেটা আদৌ অভাব কিনা তা-ও ভাল করে বুঝতে হবে। আমার দুই তিন বেলা ডাল ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, পরণে কাপড় আছে, মাথা গোজার মত একটু ঠাই আছে,

www.maktabatulabrar.com

তাহলে আমার অভাব নেই। এরপরও যদি অভাব অভাব বোধ করি তাহলে সেটা হবে ভিত্তিহীন অভাব বোধ। বিশাল অট্টালিকা হতে হবে, মিল ফ্যাক্টরী হতে হবে, ব্যাংক ব্যালেন্স হতে হবে, নতুবা নিজেকে অভাবী মনে করব এটা আসলে প্রকৃত অভাব নয়। এটা হল বিলাসিতার অভাব। আল্লাহর ইবাদতের জন্য ফারেগ হলে, ঈমান আমলের উপর উঠে আসলে আল্লাহ পাক অভাব দূর করে দিবেন– এর অর্থ আদৌ এটা নয় যে, বিশাল বিশাল অট্টালিকা হবে, মিল ফ্যাক্টরী হবে, ব্যাংক ব্যালেন্স হবে, বিলাসিতার ব্যবস্থা হবে। বরং তার অর্থ হল আল্লাহর ইবাদতের জন্য ফারেগ হলে, ঈমান আমলের উপর উঠে আসলে সত্যিকার অভাব বলতে যা বোঝায় তা আল্লাহ পাক দূর করে দিবেন। তাই দেখা যায় সত্যিকার দ্বীনদার মানুষকে আল্লাহ পাক না খাইয়ে রাখেন না, তাদেরকে সামান্য অন্ন বস্ত্রের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোরান না। তাদের মনে কোন অভাব বোধ থাকে না, তাদের সত্যিকার প্রয়োজন পূরণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অভাব থাকেনা, যা থাকে তা দ্বারাই তাদের ন্যুনতম প্রয়োজন সুন্দরভাবে পূরণ হয়ে যায়। হাদীছের বক্তব্য সত্য যে, আমার ইবাদতের জন্য ফারেগ হয়ে যাও, আমি তোমার মনকে স্বচ্ছল করে দিব অর্থাৎ, মনের অভাব বোধকে দূর করে দিব এবং প্রকৃত পক্ষে যেটা অভাব সেটাও দূর করে দিব। আর যদি আমার ইবাদতের জন্য ফারেগ না হও, তাহলে অভাব বোধ লেগেই থাকবে, যতই হোক তবুও অভাব বোধ থেকে তুমি মুক্তি পাবে না। কাজ দিয়ে তোমার হাত ভরে দেব। তুমি কখনই কাজের থেকে অবসর লাভ করতে পারবে না, কাজের পর কাজ লেগে থাকবে, কাজ করতে করতে জীবন শেষ হয়ে যাবে, কাজ আর ফুরাবে না।

এ হাদীছে একটা বিষয় খুব লক্ষ্য করার রয়েছে। তা হল– ইবাদতের জন্য ফারেগ না হলে কাজের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কাজের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে হলে আল্লাহর ইবাদতের জন্য ফারেগ হতে হবে। আমরা মনে করি কাজের ঝামেলা থেকে ফারেগ হই, তারপর ইবাদতের দিক মনোযোগ দিব। অথচ হাদীছে বলা হচ্ছে, ইবাদতের দিকে মনোযোগ দাও তাহলেই কাজের ঝামেলা থেকে ফারেগ হতে পারবে। কত বাস্তব সত্য কথা এটা। বাস্তবেই দেখা যায় যারা কাজের ব্যস্ততা এবং কাজের ঝামেলার অজুহাত দিয়ে ইবাদতের জন্য সময় বের করে না, তারা কখনই কাজের ব্যস্ততা এবং কাজের ঝামেলা থেকে ফারেগ হতে পারে না। এর বিপরীত যারা আল্লাহর ইবাদতের জন্য ফারেগ হয়ে যান, আল্লাহর রহমতে তাদের সব ঝামেলা মিটে যায়, তাদের দুনিয়াবী ব্যস্ততা কমে যায়। ফলে আরও এতমিনানের সাথে তারা ইবাদত ও ধর্ম কর্মের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন। যখন কেউ আল্লাহর ইবাদতের জন্য ফারেগ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ পাক তার কাজের মধ্যে এমন বরকত দান করেন যে, অল্প সময়েই তার অনেক কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। একটা ঘটনা শুনুন। দুজন কাঠুরিয়া কুড়াল দিয়ে জ্বালানী কাঠ ফাড়ছিল। ইতিমধ্যে নামাযের আযান হয়ে গেল। একজন কাঠ ফাড়া বন্ধ রেখে নামাযের জন্য গেল। সে অপরজনকে বলল, ভাই চলুন নামায পড়ে আসি। সে উত্তর দিল কাঠ ফেড়েই সময় পাইনা আবার নামায পড়ব কখন? সে নামায পড়তে গেল না। কিন্তু ব্যাপার এই ঘটল যে, সে কাঠ ফাড়ার জন্য যতই কুড়াল মারে কাঠ আর ফাড়ে না, বরং কাঠের সাথে কুড়াল লেগে যায়। ফলে কাঠ আর বের হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে অপর জন নামায পড়ে আসল। সে কুড়াল মারতে থাকল আর সাথে সাথে কাঠ বের হতে থাকল। অবশেষে দিনের শেষে দেখা গেল নামাযী ব্যাক্তির ফাড়া কাষ্ঠের পরিমাণ ঐ বেনামাযীর চেয়ে বেশী। এভাবে আল্লাহর ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়ার ওছীলায় আল্লাহ তার কাজে বরকত দান করলেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যাহোক আলোচনা করা হচ্ছিল যে, সত্যিকার ভাবে ঈমান আমলের উপর উঠে আসলে, সত্যিকারভাবে ইবাদতের উপরে উঠে আসলে মনের অভাব বোধ দূর হয়ে যাবে, নেই নেই পেরেশানী দূর হয়ে যাবে, যা আছে তাই নিয়ে তার তৃপ্তি এসে যাবে। মনের মধ্যে শান্তি এসে যাবে। শুধু তা-ই নয়, ঈমান আমলের উপর উঠে আসলে ইহকাল পরকাল সব জগতের কামিয়াবী অর্জন হবে। সূরা বাকারার শুরুতে যারা খাঁটি মুমিন পরহেযগার মানুষ তাদের পরিচয় তুলে ধরার পর আল্লাহ পাক বলেছেন,

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (সূরা বাকারা: ৫)

অর্থাৎ, তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত এবং তারাই কামিয়াব তথা সফলকাম।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় ঈমান আমলের দ্বারা দুনিয়া আখেরাত সব জগতের শান্তি এবং কামিয়াবী অর্জিত হয়। ঈমান আমলের দ্বারা দুনিয়াতেও সফলতা আসে, আখেরাতেও সফলতা আসে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, তাহলে মুমিন মুসলমানদের উপর এত বিপদ মুসীবত আসে কেন, দেশে দেশে মুমিন মুসলমানরা কাফের বে-দ্বীনদের হাতে মার খায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হল এই সব বিপ-মুসীবত এসে থাকে বিভিন্ন কারণে। এবং যেভাবে যে কারণেই আসুক না কেন তার মধ্যে মুসলমানদের কল্যাণ থাকে। বিপদ মুসীবত কি কি কারণে আসে তার একটু ব্যাখ্যা দিলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে।

কখনও কখনও বিপদ-মুসীবত আসে আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য। বিপদ মুসীবত দিয়ে আল্লাহর পাক আমাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, সাবধান তোমাদের মধ্যে ত্রুটি আছে তোমরা সাবধান হও, সাবধান হও। এই বিপদ আসে যেন আমরা সতর্ক হয়ে যাই এবং সামনে আমাদের দ্বারা আর পাপ না হয়। এ বিষয়টা বর্ণনা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَ لَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. (সূরা সাজদা: ২১)

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তাদেরকে ছোট খাট কিছু শাস্তি দিব যাতে তারা ফিরে আসে।

কখনও কখনও বিপদ-মুসীবত আসে আমাদের পাপ মোচন করার জন্য। আল্লাহ্ পাক চান মুসলমান কেউ জাহান্নামে না যাক। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের জন্যই জান্নাত তৈরী করেছেন। জান্নাত আল্লাহ্ খালি রাখবেন না, মুসলমান দিয়েই ভরবেন। কিন্তু মুসলমানদের আমলে ত্রুটি থাকে, তাদের ঈমানে ত্রুটি থাকে, তাদের বিভিন্ন পাপ থাকে। সেই পাপ ও ত্রুটি জান্নাতের যাওয়ার জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে বিপদ আপদ দিয়ে সেই পাপ মোচন করে এবং ত্রুটি পূর্ণ করে দিয়ে জান্নাতের যাওয়ার পথ সুগম করে তোলেন। তাই বিপদ আসা মুসলমানদের জন্য অকল্যাণকর নয়, বরং কল্যাণকর।

বিপদ-আপদ, রোগ-শোক ইত্যাদি দ্বারা মানুষের পাপ মোচন হয়। এমনকি হাদীছে এসেছে,

حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا. (البخاري برقم ٥٦٤٠ و مسلم برقم ٦٧٣٠)

অর্থাৎ, এমনকি একটা কাঁটা বিধলেও তার বিনিময়ে গোনাহ মোচন হয় এবং ছওয়াব লেখা হয়।

কখনও কখনও বিপদ-মুসীবত আসে মানুষের মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য। এজন্যই নবীদের উপর এবং ওলী আউলিয়াদের উপর বিপদ আপদ এসে থাকে। নতুবা নবীগণ পাপী নন যে, তাদের পাপ মোচন করার জন্য তাদের উপর বিপদ দিতে হবে। তাঁদের মর্যাদা বুলন্দ করার জন্যই তাঁদের উপর

www.maktabatulabrar.com

বিপদ আপদ এসে থাকে। এ কারণেই যারা আল্লাহর যত বেশী প্রিয় তাদের উপর বিপদ তত বেশী আসে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় হলেন নবীগণ, তাই নবীগণের উপর বিপদ আপদ ও পরীক্ষা সবচেয়ে বেশী এসে থাকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ. (رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٢٩٠٠)

অর্থাৎ, সবচেয়ে কঠিন বিপদ এসে থাকে নবীগণের উপর তারপর পর্যায়ক্রমে যে যত আল্লাহর নিকটতম তার উপর সে হারে বিপদ এসে থাকে।

কখনও কখনও বিপদ-মুসীবত আসে এ উদ্দেশ্যে যে, কিছু লোককে আল্লাহ পাক শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করতে চান। অমুসলিম শত্রুরা মুসলমানদেরকে প্রাণে মারে। আল্লাহ চান যে, এভাবে কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা নসীব করবেন। এভাবে প্রাণ দিয়ে তারা ব্যর্থ হন না, বরং কামিয়াব হন। বহু সাহাবীর জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেছে যে, যখন তাঁরা কাফেরদের হাতে শহীদ হয়েছেন, তখন একটা বাক্য বলেছেন,

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (صحيح البخاري ٢٨٠١وصحيح مسلم ٥٠٢٦)

অর্থাৎ, কা'বার রবের কসম! আমিতো কামিয়াব হয়ে গেলাম, আমি তো সফলকাম হয়ে গেলাম!

কাফের তাঁকে হত্যা করে দিচ্ছে, আর সে বলছে আমি কামিয়াব হয়ে গেছি। কিভাবে কামিয়াব হল? তার নজর তো পরকালের দিকে। সে দেখছে আমি শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলাম, এর ওছীলায় আমার যত পাপ আছে তা সব মোচন হয়ে গেল, আমার ক্ষমা হয়ে গেল আর আমি জান্নাতে চলে যাব। এভাবে পরকালের দিকে যখন তার নজর গেল, তখন সে দেখল দুনিয়ার এই বিপদ তার জন্য বিপদ নয় এটা তার জন্য কামিয়াবী। এটা তার জন্য ব্যর্থতা নয় এটা তার জন্য সফলতা।

যাহোক বলা হচ্ছিল– ইবাদতের উপরে উঠে আসলে, ঈমান আমলের উপরে উঠে আসলে সে কামিয়াব হবে, দুনিয়াতেও কামিয়াব হবে, আখেরাতেও কামিয়াব হবে। দুনিয়াতে কমিয়াবী আসার অর্থ তার মনের ভিতরে শান্তি এসে যাবে, অভাব বোধ দূর হয়ে যাবে, টেনশন দূর হয়ে যাবে, পেরেশানী দূর হয়ে যাবে এমনকি যদি বিপদ আসে সেই বিপদেও তার মনের ভিতরে শান্তি থাকবে, বাহ্যিকভাবে চরম বিপদের মুহূর্তে প্রাণ যাচ্ছে, তখনও বলবে, আমি তো কামিয়াব হয়ে গেলাম।

আমাদের অবস্থা হল আমরা অভাব-অনটন আসলে অশান্তি বোধ করি, বিপদ-আপদ আসলে অশান্তি বোধ করি। কিন্তু যারা আল্লাহর খাস মানুষ, তারা অভাব-অনটনের মধ্যেই শান্তি বোধ করেন, বিপদ আপদের ভিতরেই শান্তি বোধ করেন। তাদের অবস্থা হল অভাব-অনটন ও বিপদ-আপদ আসলে তাদের পেরেশানী হয় না বরং অভাব-অনটন ও বিপদ-আপদ না থাকলে তারা এক ধরনের পেরেশানি বোধ করেন। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা দেখুন। প্রথম দিকে সাহাবায়ে কেরামের খুব অভাব ছিল। এরপর ধীরে ধীরে বিজয় বাড়তে থাকে এবং সাহাবাদের হাতে সম্পদ আসতে থাকে। তখন বহু সাহাবী আফসুস করতেন যে, হায়রে এখন তো খুব সম্পদ আসছে, তাহলে কি আমাদের নেক আমলের বদলা আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতেই দিয়ে দিলেন? এভাবে সম্পদ আসার পর তাঁরা পেরেশানী বোধ করতে থাকেন যে, কী হল, এত সুখ-শান্তি কেন? এ সম্পদ কেন?

আল্লাহওয়ালারা অভাবের ভিতর থাকাকে পছন্দ করেন এ কারণে যে, অভাবের মধ্যে থাকলে আল্লাহ্ কে বেশী স্মরণ হয়। তাঁরা বিপদ-আপদের মধ্যে থাকাকে অপছন্দ করেন না এ কারণে যে, বিপদ-আপদের মধ্যে থাকলে আল্লাহকে বেশী স্মরণ হয়। যখন অভাব-অনটন না থাকে, সম্পদ বেশী

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হয়, কোন কষ্ট-ক্লেষ ও বিপদ আপদ না থাকে তখন আল্লাহকে স্মরণ হয় কম, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি ও রোনাজারী করার মনোভাব হয় কম। তাই সম্পদ আসার পর সাহাবায়ে কেরাম পেরেশান হয়েছেন যে, তাহলে কি কাফেরদের মত সব নেক আমলের বদলা আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হল!

কাফেররাও দুনিয়াতে যেসব ভাল কাজ করে, তার বদলা তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়। পরকালে তাদেরকে কোন পুরষ্কার দেয়া হবে না, যা দেয়ার দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়। অতএব কাফেরদের যে সুখ-শান্তি দেখা যায় তা এজন্য নয় যে, তারা আল্লাহর কাছে প্রিয়, এ জন্য নয় যে, তারা সঠিক পথে আছে। কাফেরদের সুখ-শান্তি এজন্য যে, তারা দুনিয়াতে যাকিছু ভাল কাজ করে যেমন মানুষের সেবা করে, পররোকার করে, ঐ সব ভাল কাজের বদলা তাদেরকে পরকালে দেয়া হবে না। তাই সাহাবায়ে কেরাম পেরেশানী বোধ করতেন যে, এত সম্পদ, এত রাষ্ট্র বিজয়, এত প্রভাব প্রতিপত্তি, তাহলে কি নেক কাজের বদলা সব দুনিয়াতেই পেয়ে গেলাম? এই ভেবে তারা পেরেশানী বোধ করতেন।

দেখা গেল সাহাবায়ে কেরাম অভাব-অনটনের মধ্যেই শান্তি বোধ করতেন, বিপদ আপদ থাকলেও অশান্তি বোধ করতেন না। বুযুর্গানে দ্বীনের হালাতও এরকম। তারা বিপদ-আপদ আসলে অশান্তি বোধ করেন না। অন্তত এতটুকু অবশ্যই হয় যে, তারা মুখে কোন শেকায়েত বা অভিযোগ উচ্চারণ করেন না। আল্লাহ্ আমাদের মালিক, আমরা তার গোলাম। মালিক গোলামের ব্যাপারে যা কিছু করবেন তাতে গোলামের কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই, কোন অভিযোগ উত্থাপন করার অবকাশ নেই। আর অভিযোগ উত্থাপন করার জায়গাই বা কোথায়? হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) একটা ঘটনা বয়ান করেছেন যে, এক বুযুর্গ ৩০ বছর আল্লাহর ইবাদত করেছেন। খুব ইবাদত করেছেন। তার অনেক মুরীদও আছে। একদিন ঐ বুযুর্গ ইবাদত করছিলেন। আশেপাশে মুরীদরাও ছিলেন। এমন সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসল যে, তোমার কোন ইবাদত কবূল হয়নি। বুযুর্গ ঐ আওয়াজ শুনতে পেলেন। কিন্তু তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসল না। তিনি একই ভাবে ইবাদত করেই যেতে লাগলেন। আসে পাশের মুরীদরাও ঐ আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। তারা ছুটে এসে দেখলেন যে, হুজুর ঐ আগের মতই ইবাদত করে যাচ্ছেন, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে যাচ্ছেন। কয়েকদিন পর কয়েক জন মুরীদ মিলে জিজ্ঞাসা করল যে, হুজুর! এত বছর ইবাদত করেছেন, কিছুই কবূল হয়নি, তাহলে ইবাদত করে লাভ কি? বুযুর্গ উত্তরে বললেন। ইবাদত করাতো আমার দায়িত্ব, আমি আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ্ যদি কবূল না করেন আমি তাঁর উপর প্রশ্ন তোলার অধিকার রাখি না। তিনি তো আমার মালিক, তিনি আমার মুনীব, তাঁর উপরে অভিযোগ তোলার অধিকার আমার নেই। কবূল করা না করা এটা তো তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাকে তো আমি পরিবর্তন করতে পারবনা, আমি আমার যেটা করা দায়িত্ব সেটা করেই যাব। এই হল বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থা।

যাহোক আজকের বয়ানের সারকথা হল– সত্যিকারভাবে ইবাদতের উপরে উঠে আসলে মনের অভাব বোধ দূর হয়ে যাবে, নেই নেই পেরেশানী দূর হয়ে যাবে, যা আছে তা নিয়েই তার তৃপ্তি এসে যাবে। মনের মধ্যে শান্তি থাকবে। বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেষ থাকলেও তার মধ্যে মনের শান্তি বহাল থাকবে। দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের কামিয়াবী ও সফলতা লাভ হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সহীহ বুঝ নসীব করেন এবং আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং -৩৬

মুসলমান জাতির বিপদ-আপদের কারণ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ، وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ. قَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল যে, মানুষ সত্যিকারভাবে ইবাদতের উপরে উঠে আসলে তাদের মন থেকে অভাব বোধ দূর হয়ে যাবে, নেই নেই পেরেশানী দূর হয়ে যাবে, যা আছে তাই নিয়েই মনে তৃপ্তি এসে যাবে। মনের মধ্যে শান্তি থাকবে। বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ থাকলেও তার মধ্যে মনের শান্তি বহাল থাকবে। দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের কামিয়াবী ও সফলতা লাভ হবে। এ আলোচনার পর প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তাহলে ইবাদতকারী মুসলমান ব্যক্তির জীবনে বিপদ-আপদ দেখা দেয় কেন, তাদের জীবনে পেরেশানী থাকে কেন? এ প্রশ্নের জবাব সম্পর্কেও গত জুমুআয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটা হল ব্যক্তিগত ভাবে কোন মুসলমানের জীবনে বিপদ-আপদ ও পেরেশানী দেখা দিলে সে বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। আর জাতিগত ভাবে যখন মুসলমানদের জীবনে বিপদ ও দুর্দিন নেমে আসে, তখন আমাদের মনে ঐ প্রশ্নটা আরও শক্তভাবে দেখা দেয়। বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যখন মুসলমানরা বিজাতির হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হতে থাকে, মুসলমানদের জান মাল ইজ্জত আব্রু অমুসিলদের হাতে তছনছ হতে থাকে, তখন একদিকে কিছু মুসলমানদের জান মাল ইজ্জত আব্রু যেতে থাকে, আর এক দিকে কিছু মুসলমানের ঈমান যেতে থাকে যে, কৈ আল্লাহ্ কি নেই? মুসলমানদেরকে এভাবে মারা হচ্ছে আল্লাহ্ কি দেখেন না? এত হুজুররা দুআ করছে, এত কান্নাকাটি হচ্ছে, আল্লাহ্ কি ডাক শোনেন না? তাহলে কি দুআ কবূল-ই হয় না? না কি নাউযুবিল্লাহ আল্লাহই নেই! এভাবে নানা রকম ওয়াছওয়াছা এসে অনেকের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

এরকম পরিস্থিতি শুধু আমাদের সামনে আসে তা নয়। আম্বিয়ায়ে কেরামের সামনে, সাহাবায়ে কেরামের সামনেও এরকম পরিস্থিতি এসেছিল। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে এরকম পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বর্ণনা এসেছে,

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا. (সূরা ইউসুফ: ১১০)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এ আয়াতের ভাবার্থ হল– যুগে যুগে হকপন্থীদের উপরে, মুসলমানদের উপরে এমন বিপদ মুসীবতের পরিস্থিতি এসেছে যে, তখন তাদের অবিশ্বাস করার উপক্রম হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে সাহায্য করার যে ওয়াদা করেছিলেন আসলে কি তা সত্য? তাহলে ওয়াদা পূরণ হচ্ছে কই? সাহায্য কোথায়? সেই পরিস্থিতিতে তারা মনে করে বসেছে যে, এতদিন আমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস শোনানো হয়েছে, মিথ্যা কাহিনী শোনানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক সাহায্য করবেন, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসবে।

দেখা গেল বিপদ-মুসীবতের সময় এরকম ওয়াছওয়াছা এসে থাকে, যুগে যুগে এটা চলে আসছে। মানুষের স্বভাব, তার সাথে সাথে শয়তানের ওয়াছওয়াছা, এই সবটা মিলিয়ে এরকম হয়ে থাকে। মানুষ তো ত্বরাপ্রবণ। মানুষের স্বভাব হল সাথে সাথে চাই, কোন সবর নেই, বিলম্ব সহ্য করা নেই। ফলে কোন বিপদে পড়লে সাথে সাথে সেই মুহূর্তেই তার সাহায্য চাই। অথচ সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহর নীতি আছে। সেই নীতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা সাহায্য দিয়ে থাকেন। সেই নীতি অনুসারে কখনও সাহায্য একটু বিলম্বে আসাও সংগত হতে পারে। কিন্তু ত্বরাপ্রবণ মানুষের দেরী সয় না। ফলে সাহায্য আসতে বিলম্ব দেখে সে আল্লাহর সাহায্য আসা নিয়েই সন্দেহে পড়ে ঈমান হারিয়ে বসার উপক্রম হয়। কিংবা আল্লাহর সাহায্য আসার জন্য যে শর্ত আছে নিজেদের দ্বারা সেই শর্ত পূরণে কোন ত্রুটি আছে কি না তা না দেখেই অযথা আল্লাহর উপর অভিযোগ তোলা হয় যে, তিনি সাহায্য করেন না কেন?

মুসলমানদেরকে সাহায্য করার নীতি কি তাও আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন। কখন কোন্ অবস্থায় কতটুকু সাহায্য দিবেন, আবার কখন তাঁর সাহায্য আসা বন্ধ থাকবে বা সাহায্য এসেও আবার সেই সাহায্য উঠে যাবে, তা সব আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন। সেই সব কথার সারকথা হল– আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নির্দেশ মান্য করলে আল্লাহর সাহায্য আসবে, আর আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নির্দেশ অমান্য করলে বিপদ আসবে। শুরুতে নির্দেশ মান্য করার পর আবার অমান্য করলে সাহায্য আসার পরও আবার সেই সাহায্য উঠে যাবে। এ বিষয়টা বোঝার জন্য ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা শুনুন।

ওহুদ যুদ্ধ হয়েছিল ওহুদ পাহাড়ের উত্তর পাশের ময়দানে। এই ওহুদ পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা সুড়ঙ্গের মত পথ আছে, যে পথ দিয়ে পাহাড়টা পার হয়ে উত্তর দিকে ময়দানে যাওয়া যায়। ওহুদ যুদ্ধের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুড়ঙ্গ পথের দক্ষিণ পাশে কিছু সাহাবীকে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। তাদেরকে বলে রেখেছিলেন, ওপাশে আমরা যুদ্ধ করব, যুদ্ধে আমাদের যে পরিস্থিতিই হোক না কেন কোন অবস্থাতেই তোমরা এই পথ ছেড়ে যাবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছিলেন এ জন্য যে, এখান দিয়ে সুযোগ পেলে কাফেররা প্রবেশ করে মুসলমানদের উপর পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ চালাতে পারে। তাই এ পথ কখনই মুক্ত রাখা যাবেনা। যাহোক ওপাশে যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হয়েছেন। কাফেররা ভাগতে শুরু করেছে। মুসলমানরা গনীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় ঐ সুড়ঙ্গ পথে নিযুক্ত সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন যে, যুদ্ধেতো মুসলমানদের জয় হয়েই গেছে, এখন আর এখানে থাকার প্রয়োজন কী? চলো আমরাও যাই, যেয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহ করি। আবার কেউ কেউ বাঁধা দিলেন যে, না, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এখানে থাকতে বলে গেছেন, আমরা কোন অবস্থাতেই এই ঘটি ছাড়তে পারি না। যারা ঘাটি ছাড়ার পক্ষে ছিলেন তারা বললেন,

www.maktabatulabrar.com

এখন তো মুসলমানদের জয় হয়েই গেছে, এখন আর বসে থেকে কী লাভ? তারা এ ঘাটি ছেড়ে ময়দানে চলে গেলেন। এদিকে কাফেররা যখন ভেগে যায়, তখন দেখল যে, এই দিক থেকে সুড়ঙ্গ পথ খালি, মুসলমানরা গনীমতের মাল সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। তারা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঐ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ঢুকে পিছন দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমন করে বসল। মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন। একবার জয় লাভ করেও আবার তারা পরাজিত হলেন অর্থাৎ, একবার আল্লাহর সাহায্য আসার পরও আবার সেই সাহায্য উঠে গেল। ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। তখন মুনাফেকরা এই কথা ছড়ানো শুরু করল যে, কৈ আল্লাহর রসূল থাকতে আবার পরাজয় হয় কী করে? রসূল যে বলেছিলেন আল্লাহর সাহায্য হবে, কৈ আল্লাহর সাহায্য? আল্লাহর রসূল উপস্থিত থাকতেই যদি আমরা পরাজিত হই তাহলে এই ইসলামের কী মূল্য আছে? আল্লাহ সাহায্য করার ওয়াদা করলেন সেই ওয়াদা গেল কোথায়? ইত্যাদি। তাদের এই সব কথায় অনেকের মধ্যে ওয়াছওয়াছা আসল যে, তাই তো আল্লাহ যে সাহায্য করবেন ওয়াদা করেছিলেন সে ওয়াদার কী হল? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আয়াত নাযেল করলেন–

وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ. (সূরা আলে ইমরান: ১৫২)

এ আয়াতের সারকথা হল– আল্লাহ্ তো তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, আল্লাহ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, তোমরা তো আল্লাহর অনুগ্রহেই কাফেরদেরকে হত্যা করেছ ও পরাজিত করেছ। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য করার ওয়াদা সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, তোমরা জয়ী হয়েছ। এরপর যখন তোমরা রসূলের কথা নিয়ে মত বিরোধে লিপ্ত হয়েছ, রসূলের কথা আমান্য করেছ তারপর তোমাদের এই পরাজয় এসেছে।

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহর সাহায্য আসার নীতি এবং সাহায্য এসেও আবার তা উঠে যাওয়ার কারণ কি তা সব বলে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে, তোমরা যতক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহর রসূলের কথার উপর অটল ছিলে, আল্লাহর সাহায্য ততক্ষণ তোমাদের সাথে ছিল। যেই তোমরা আল্লাহ্ আল্লাহর রসূলের হুকুম থেকে সরে গেছ অর্থাৎ, রসূলের নির্দেশ অমান্য করে সুড়ঙ্গ পথ ছেড়ে দিয়েছ, তখন তোমাদের থেকে আল্লাহর সাহায্য উঠে গেছে এবং তোমাদের উপর বিপদ এসেছে। বোঝা গেল– আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নির্দেশ মান্য করলে আল্লাহর সাহায্য আসে, অমান্য করলে বিপদ আসে। একবার মান্য করার পর পরে অমান্য করলে সাহায্য এসেও আবার সেই সাহায্য উঠে যায়।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, দুই একজন না হয় রসূলের কথাকে অমান্য করেছেন, সেকারণে সকলের উপর শাস্তি আসল কেন? বাকিরা যে বিপদ গ্রস্থ হল, তাদের যে প্রাণ গেল, তাদের কী অপরাধ? যেমন এই যুগেও এরকম প্রশ্ন হতে পারে যে, অপরাধ তো সবাই করে না, কিন্তু বিপদ আসলে দেখা যায় যারা অপরাধ করেনি তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমন শিশু, কিশোরদের কী অপরাধ? বৃদ্ধদের কী অপরাধ, মা বোনদের কী অপরাধ? তারা কেন বিজাতির দ্বারা দেশ আক্রান্ত হলে হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়? তাদের উপর এই বিপদ কেন আসে? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় আল্লাহ তাআলার পরবর্তী বক্তব্যে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ. (প্রাগুক্ত)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, বিজয় দান করার পর আবার পরাজয় ঘটিয়ে আল্লাহ্ পাক কিছু লোকের ঈমান পরীক্ষা করতে চান। আর এক আয়াতে আছে,

وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ. (সূরা আলে ইমরান: ১৪০)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কতক লোককে শহীদ বানাতে চান অর্থাৎ, শাহাদাতের মর্যাদা দান করতে চান।

এ দুই আয়াত মিলালে বোঝা যায় কোন অন্যায় অপরাধ ছাড়াও অনেকে বিপদের সন্মুখীন হয়ে থাকে, কেউ হয়ে থাকে পরীক্ষার জন্য, কেউ হয়ে থাকে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করার জন্য। শহীদের মর্যাদা অনেক। কেউ যখন শহীদ হওয়ার পর শাহাদাতের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে, তখন আল্লাহর কাছে আবেদন করে যে, হে আল্লাহ্! আবার আমাকে দুনিয়ায় পাঠাও, আবার যেন আমি শহীদ হয়ে আসতে পারি। আবার আমাকে পাঠাও, আবার যেন শহীদ হয়ে আসতে পারি। আবার পাঠাও আবার যেন শহীদ হয়ে আসতে পারি। আল্লাহর কাছে শাহাদতের মর্যাদা পেয়ে মানুষ এরকম আবেগ উৎফুল্ল হয়ে যাবে। নিজের আমল দ্বারা এই মর্যাদা অর্জন করা খুবই কঠিন। তাই আল্লাহ্ পাক কিছু লোককে এই মর্যাদা দান করার জন্য শহীদ হওয়ার একটা সুযোগ ঘটিয়ে দেন। আমরা মনে করি নিরাপরাধ এই লোকটি কেন মারা গেল, অথচ তার প্রতি আল্লাহর একটা বড় এহছান হয়েছে।

যাহোক এতক্ষণ মুসলমানদের উপর বিপদ-আপদ কেন আসে তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছিল। **মুসলমানদের উপর বিপদ-আপদ আসার একটা কারণ হল–** আল্লাহ্ আল্লাহর রসূলের হুকুম অমান্য করা।

মুসলমানদের উপর বিপদ-আপদ আসার আর একটা কারণ হল– মুসলমানদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ পাক কতগুলো নীতি দিয়ে দিয়েছেন, সেই নীতি লঙ্ঘন কর। সেই নীতিগুলো লঙ্ঘন করলেও বিপদ আসতে পারে। যেমন একটা নীতি দেয়া হয়েছে সাধ্য অনুযায়ী শত্রুকে ঠেকানোর মত অস্ত্র-শস্ত্র ও সমর প্রস্তুতি রাখতে হবে। যাতে সেই প্রস্তুতি দেখে শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার সাহস না পায়। তারা মনে করে যে, মুসলমানদের এত শক্তি! ওদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করা যাবে না। কুরআনে কারীমে এরকম প্রস্তুতি রাখার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ.

(সূরা আনফাল: ৬০)

এ আয়াতের সারকথা হল– তোমরা এতটুকু শক্তি সঞ্চয় করে রাখবে যা দেখলে তোমাদের শত্রু ও আল্লাহর শত্রুরা অর্থাৎ, বিধর্মীরা ভয় পায়।

এ আয়াতের আলোকে অবস্থা তো এরকম হওয়ার কথা ছিল যে, মুসলমানদের প্রস্তুতি দেখে অমুসলিমরা ভয় পাবে, কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে উল্টো– এখন অমুসলিমদের প্রস্তুতি দেখে মুসলমানরা ভয় পায়। এই প্রস্তুতি নেয়ার জন্য যে সম্পদ দরকার ছিল, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে তা দিয়ে রেখেছিলেন। আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকেই দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু তারা সেই সম্পদ দ্বারা এই প্রস্তুতি নেয়নি, ফলে বিধর্মীরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার দুঃসাহস পায় এবং মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হয়। আল্লাহর দেয়া সম্পদ মুসলমানরা সেই প্রস্তুতির কাজে ব্যয় না করে অন্য জায়গায় ব্যায় করেছে, বিলাসিতার কাজে ব্যয় করেছে, আর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

যাদেরকে বিশ্বাস করার নয়, যাদেরকে বন্ধু ভাববার নয়, তাদেরকে বন্ধু মনে করে পরম বিশ্বাসে তাদের কাছে সেই সব সম্পদ আমানত রেখেছে। আল্লাহ্ পাক তো পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে, অমুসলিমরা বন্ধু বানাবার মত নয়, তারা বিশ্বাসের পাত্র নয়। ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَ مَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ . (সূরা আলে ইমরান: ১১৮)

অর্থাৎ, কীভাবে ওদেরকে বন্ধু বানাবে? কীভাবে ওদেরকে বিশ্বাস করবে? ওদের মুখ থেকেও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ হয়ে পড়ে, আর ওদের মনে যা আছে তা তো আরও মারাত্মক!

অন্য এক আয়াতে আছে,

وَ اِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ اِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. (সূরা আলে ইমরান: ১১৯)

এ আয়াতের ভাবার্থ হল– ওরা তোমাদের সামনে এসে তোমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে, বন্ধুত্ব দেখায়, কিন্তু পিছনে যেয়ে ভিতরে ভিতরে রাগে দাঁত কাঁটতে থাকে যে, এই মুসলমানদের যদি শেষ করে দিতে পারতাম! এই তো তাদের অবস্থা। কাজেই কীভাবে তাদের সাথে তোমাদের সখ্যতা হতে পারে? কত পরিস্কার ভাবে আল্লাহ পাক বিষয়টা বর্ণনা করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহ্ পাক বলেছেন,

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. (সূরা আলে ইমরান: ১১৮)

অর্থাৎ, সব কথা পরিস্কার করে বলে দিলাম, কোন অস্পষ্টতা রাখলাম না। আশা করা যায় তোমরা বুঝবে।

আল্লাহ্ পাক তো একথা ১৪শত বছর আগে বলে দিয়েছেন। কাজেই মুসলমানরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করার কারণে যদি বিপদগ্রস্ত হয়, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে বিপদ আসার পর এই অভিযোগ তুলে লাভ কী যে, মুসলমানদেরকে এভাবে মারা হচ্ছে আল্লাহ্ কি দেখেন না? এত হুজুররা দুআ করছে, এত কান্নাকাটি হচ্ছে, আল্লাহ্ কি ডাক শোনেন না? তাহলে কি দুআ কবূল-ই হয় না? এসব অভিযোগ তুলে কোন লাভ নেই। অন্যায় আমাদের। আল্লাহ্ তো বলেই দিয়েছেন আমার কথা অমান্য করলে শাস্তি হবে। এখন যদি আল্লাহ্ শাস্তি না দেন, তাহলে তো আল্লাহর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। নিয়মনীতি লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি মুসলমানদেরকে ভোগ করতেই হবে।

কেউ যদি মনে করে যে, যখন শাস্তি স্বরূপ মুসলমানদের উপর বিপদ আসছে, তাদের কর্মের প্রায়শ্চিত হচ্ছে তখন সেই বিপদ দূর হওয়ার দুআ করা হবে কেন? একথা মনে করা ঠিক নয়। কারণ, যারা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে তারা তো মুসলমান। মুসলমানের জন্য মুসলমানের মনে সমবেদনা থাকতে হবে। মুসলমানদের বিপদ দেখলে দুআও করতে হবে, এটাও শরীয়তের নিয়ম। একথা মনে করা যাবে না যে, আমরা অপরাধী, তাই কোন মুখ নিয়ে দুআ করব? কিংবা একথাও মনে করা যাবে না যে, আল্লাহ্ যখন দুআ কবূল করছেন না তখন আর দুআ করে লাভ কি? এরকম মনে করা ঠিক নয়। কারণ, আমাদের তো অপরাধ হবে, অপরাধ হওয়ার পরেও আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব। আল্লাহ্ পাকতো অপরাধ করার পরে দুআ করলেও পছন্দ করেন যে, সে যদিও অপরাধ করেছে অপরাধ করার পরেও তো আমার কাছে ফিরে এসেছে, অপরাধ করেও তো আমাকেই ডাকে, আর কাউকে তো ডাকে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না। অপরাধও করলাম, আবার আল্লাহকে ডাকলামও না, তাহলে তো আল্লাহর কাছ থেকে একদম সরে গেলাম। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে দুআ করতেই হবে। আর দুআ কবুল করা আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ্ পাক যখন মোনাসেব মনে করবেন, তখন দুআ কবুল করবেন। আল্লাহ আমাদের জন্য যেটা ভাল মনে করবেন, সেটাই করবেন। আমার বেঁচে থাকাই যদি ভাল হয়, তাহলে তাই করবেন। আর আমার মরে যাওয়াই যদি ভাল হয় তাহলে তাই করবেন। কোন্‌টা ভাল তাতো আল্লাহ্ পাকই ভাল জনেন। যেটা ভাল সেটা আল্লাহ করবেন। কিন্তু আমরা মরতে চাই না, বাঁচতেই চাই। তাই বাঁচার জন্য দুআ করতে হবে। ইসলামে মরার জন্য দুআ করতে শিক্ষা দেয়া হয়নি, বরং বেঁচে থাকার থাকার জন্য দুআ করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাই বিপদ আপদ আসলে আল্লাহর কাছে মুসলমানদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য দুআও করা চাই।

মুসলমানদের উপর বিপদ-আপদ আসার আর একটা কারণ হল– মুসলমানদের মধ্যে একতা না থাকা। এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন,

يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ، وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ. قَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. (رواه ابو داود في سننه برقم ٤٢٩٩ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, অচিরেই অন্যান্য জাতি তোমাদেরকে গ্রাস করার জন্য একে অপরকে ডাকতে থাকবে, যেমন দস্তরখানা বিছিয়ে একে অপরকে ডাকতে থাকে। তখন একজন জিজ্ঞাসা করল ইয়া রসূলাল্লাহ! তখন আমাদের জনসংখ্যা কম থাকার কারণে এমন হবে কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না; তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে, তবে তোমরা ভেসে যাবে যেমন খড়কুটা স্রোতে ভেসে যায়। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর ভয় ঢেলে দিবেন।

এ হাদীছে বলা হয়েছে এমন একযুগ আসবে, যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমস্ত কাফের শক্তি এক হয়ে যাবে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একজন আরেকজনকে ডাকতে থাকবে, যেমন দস্তরখান বিছিয়ে একজন আরেকজনকে ডাকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথার সাথে বর্তমান পরিস্থিতির বড় অদ্ভুত মিল দেখা যায়। আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমস্ত কাফের শক্তি একসাথে মিলে পিকনিক করতে চায়। সেই পিকনিকের দস্তরখানে একজন আরেকজনকে ডাকছে মুসলমানদেরকে খাওয়ার জন্য অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে মারার জন্য। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের সংখ্যা কম থাকার কারণে এই অবস্থা হবে কি যে, মুসলমানরা সংখ্যায় কম তাই সকলে মিলে তাদেরকে মারবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তোমাদের সংখ্যা তো অনেক থাকবে, কিন্তু সব খড়কুটার মত ভেসে যেতে থাকবে, স্রোতের উপরে যেমন খড়কুটা ভেসে যায়।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– স্রোতের উপর দিয়ে যেসব খড়কুটা ভেসে যায়, সেগুলোর মধ্যে কারও সাথে কারও মিল থাকে না, কারও সাথে কারও একতা থাকে না, সেগুলোর মধ্যে কোন স্থিতি

www.maktabatulabrar.com

থাকে না। তদ্রূপ মুসলমানদের অবস্থাও সেরকম হবে, তারা ছিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়ে যাবে, কারও সাথে কারও মিল জোড় থাকবেনা। ফলে বিজাতিরা এই অনৈক্যের সুযোগে তাদের উপর আক্রমণ করার সাহস পাবে এবং একসাথে মিলে তাদেরকে ধ্বংস করার সুযোগ পাবে। এ বিষয়টা আরও পরিষ্কার ভাবে একটা আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ. (সূরা আনফাল: ৪৬)

অর্থাৎ, তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না, তাহলে তোমাদের সাহস হারিয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে।

অতএব আল্লাহর সাহায্য পেতে গেলে, মুসলমান জাতির সামগ্রিক পরাজয় ও বিপদ-আপদ ঠেকাতে হলে, সম্মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ পাক আমাদের নেতৃবৃন্দকে, আমাদের পরিচালকদেরকে এপথে আসার তাওফীক দান করেন।

মুসলমানদের উপর বিপদ-আপদ আসার আর একটা কারণ হল– মুসলমানদের খাঁটি মুসলমান না হওয়া। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

অর্থাৎ, তোমরা হীনবল হয়ো না, দুঃখ করো না, যদি তোমরা খাঁটি মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।

কাজেই খাঁটি ঈমানদার হতে হবে, খাঁটি মুসলমান হতে হবে। তবেই মুসলমান জাতি বিজয়ী হবে, তবেই কাফের শক্তি এবং বিজাতি তাদের সামনে পদানত থাকবে। আমরা আল্লাহকে পূরোপূরি মেনে চললে আল্লাহ্ আমাদেরকে কেন সাহায্য করবেন না। আমাদের অবস্থা যদি এরকম হয় যে, আমরা আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে বুঝি না আর কাউকে পছন্দ করি না তাহলে কেন তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন না। আমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরি, তাই আল্লাহও আমাদেরকে আমাদের উপর ছেড়ে দেন দেখি অন্যের দুয়ারে ঘুরে তোমরা কতটুকু কি করতে পার।

যাহোক– আল্লাহ পাক আমাদের মুসলমান জাতির বিপদ-আপদ দূর করার এবং তাঁর সাহায্য লাভ করার যে নীতি দিয়েছেন, তা যেন আমরা সঠিকভাবে বুঝতে ও আমল করতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন, দুনিয়া আখেরাত সব জায়গায় আমাদেরকে কামিয়াব করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৩৭

আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়া চাই

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা মু'মিন মুসলমান। আর মু'মিন মুসলমানদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত সব জগতের কামিয়াবী ও সফলতা রয়েছে। যারা মু'মিন মুসলমান, তারা দুনিয়াতেও কামিয়াব হবে আখেরাতেও কামিয়াব হবে, দুনিয়াতেও সফল হবে আখেরাতেও সফল হবে। তবে তার জন্য নামকাওয়াস্তে মু'মিন মুসলমান নয় খাঁটি মু'মিন মুসলমান হতে হবে, আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে হবে। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য বেশ কিছু গুণাবলীর অধিকারী হতে হয়। কুরআনে কারীমের সূরা ফুরকানে ৬৩ নং আয়াত থেকে ৭৪ নং আয়াত পর্যন্ত ১৩ টা আয়াতের মধ্যে আল্লাহর তাআলা তাঁর খাঁটি বান্দাদের ১০টি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য এ ছাড়াও আরও গুণাবলীর প্রয়োজন রয়েছে। তবে বিশেষভাবে উক্ত ১০টি গুণ অর্জন করা চাই। আজ উক্ত ১০টি গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে সকলকে উক্ত ১০টি গুণ অর্জন করার করার মাধ্যমে তাঁর খাস বান্দা হওয়ার তাওফীক নসীব করেন। উক্ত ১০টি গুণের মধ্যে

১ নং গুণ হল– কথাবার্তা ও আচার-আচরণে নম্রতা থাকা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا.

অর্থাৎ, দয়াময় আল্লাহর খাঁটি বান্দা হল তারা যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলে। তারা কখনও উগ্রতার পরিচয় দেয় না। এমনকি যদি অজ্ঞদের সাথে কথা বলতে গিয়েও এরকম পরিস্থিতির সন্মুখীন হয় যে, নরম কথায় ও সোজা কথায় তারা মানছে না, তবুও তারা উগ্রতার পরিচয় দেয় না বরং তখন চুপচাপ সেখান থেকে সরে যায়।

নম্রতা গুণ আল্লাহর কাছে বিশেষ পছন্দনীয় গুণ। এই গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক খুব পছন্দ করেন। এর বিপরীত যাদের মধ্যে নম্রতার বিপরীত অহংকার ও ঔদ্ধত্য থাকে, আল্লাহ পাক তাদেরকে খুব বেশী অপছন্দ করেন। তাই আল্লাহর খাঁটি ও প্রিয় বান্দা হতে হলে নম্রতা গুণ অর্জন করা চাই।

এই হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের এক নং গুণ যে, তাদের মধ্যে নম্রতা থাকে, তাদের মধ্যে অহংকার বা উগ্রতা থাকে না।

২ নং গুণ হল– তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং সাজদা অবস্থায় রাত কাটায়।

এ আয়াতে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের যে বিশেষ গুণটির কথা বলা হয়েছে, তা হল– আল্লাহর খাঁটি বান্দারা তাহাজ্জুদের নামায তরক করেন না। তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার খাস সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সব নফল নামায দ্বারাই আল্লাহর সাথে বান্দার নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তবে তার মধ্যে বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার খাস নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ, সব নফলের মধ্যে তাহাজ্জুদের ফযীলত সবচেয়ে বেশী। এক হাদীছে এসেছে–

اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ. الحديث. (رواه احمد ومسلم)

অর্থাৎ, ফরয নামাযের পর সমস্ত নফল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার নামায হল তাহাজ্জুদের নামায।

নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদের ফযীলত সবচেয়ে বেশী হওয়ার কারণে এবং তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার নৈকট্যের সম্পর্ক বেশী গড়ে বলে তাহাজ্জুদের নামায পড়া বুযুর্গানে দ্বীনের খাস আমল। এক হাদীছে এসেছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهٗ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاَةٌ عَنِ الْاِثْمِ. (رواه الحاكم فى المستدرك حديث رقم ١١٥٦ وقال : صحيح على شرط البخاري)

অর্থাৎ, তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পড়। কেননা তাহাজ্জুদের নামায হল তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের তরীকা এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের নৈকট্য লাভের উপায় আর তোমাদের গোনাহ মোচনকারী ও পাপ থেকে বাঁধা দানকারী।

এছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাযের আরও অনেক ফযীলত রয়েছে। এক হাদীছে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَفْشَى السَّلَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. (رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ٥٠٩ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي)

অর্থাৎ, জান্নাতে এমন কিছু (সুন্দর) কক্ষ আছে, যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় আর বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ সেগুলো ঐসব লোকদের জন্য তৈরী করেছেন যারা মেহমানদারী করে, বেশী বেশী সালাম করে এবং রাতের বেলায় নামায পড়ে যখন অন্য মানুষেরা নিদ্রিত থাকে।

এই হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের দুই নং গুণ যে, তারা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন, তাদের তাহাজ্জুদের নামায তরক হয় না।

৩ নং গুণ হল– জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য দুআ করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিকে হটান।

এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর খাস বান্দাদের মধ্যে জাহান্নামের ভয় বিদ্যমান থাকে, জাহান্নামের ভয়ে তাদের অন্তর কম্পমান থাকে, তাদের অন্তরে সদা সর্বদা জাহান্নাম থেকে বাঁচার চিন্তা বিদ্যমান থাকে। তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যেমন গোনাহ থেকে বিরত থাকেন, প্রয়োজনীয় আমল করতে থাকেন, তেমনি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি এবং রোনাযারীও করতে থাকেন।

জাহান্নামের ভয় এমন একটা গুণ, যার মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ, যার অন্তরে জাহান্নামের ভয় থাকে, সে খাঁটি মানুষে পরিণত হয়। কারণ, জাহান্নামের ভয় মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে এবং আমল তরক করা থেকে বিরত রাখে। আর গোনাহ থেকে বিরত থাকলে এবং আমল করলেই মানুষ খাঁটি মানুষে পরিণত হয়। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ফিকির করেন এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকেন।

জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সকাল সন্ধা ৭ বার একটা দুআ পড়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ. (رواه ابو داود في سننه برقم ٥٠٨١ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধা ৭ বার করে এই দুআটি পড়া সুন্নাত।

যাহোক– এই হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের তিন নং গুণ যে, জাহান্নামের ভয়ে তাদের অন্তর কম্পমান থাকে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য তারা গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং আমল করার সাথে সাথে দুআও করতে থাকেন।

৪ নং গুণ হল– আল্লাহর দেয়া সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

অর্থাৎ, ঐ সব লোক যারা সম্পদ ব্যয় করার সময় বেশীও করে না কমও করে না। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।

যেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত সম্পদ ব্যয় করতে অনুমতি দিয়েছে সেখানেও ব্যয় করতে কমও করা যাবেনা বেশীও করা যাবে না। প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যয় করলে সেটা হবে বখীলী। আর বখীলী করা গোনাহ। আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ব্যয় করলে সেটা হবে অমিতব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয়। আর অমিতব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয় করাও গোনাহ। অতএব ব্যয়ের ক্ষেত্রে গোনাহ থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজনের তুলনায় কমও করা যাবে না, বেশীও করা যাবে না। বরং মধ্যম পন্থা গ্রহণ করতে হবে। এটাই শরীয়তের নিয়ম, এটাই আল্লাহর খাস বান্দাদের তরীকা। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁর খাস বান্দাদের একটা গুণ এই বললেন যে, তারা সম্পদ ব্যয় করার সময় বেশীও করে না কমও করে না। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। বখীলী করা আল্লাহর খাস বান্দাদের তরীকা নয়, আল্লাহর খাস বান্দারা যেখানে যতটুকু প্রয়োজন সে অনুপাতে ব্যয় করতে কোন বখীলী করেন না। আবার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাও আল্লাহর খাস বান্দাদের তরীকা নয়। আল্লাহর খাস বান্দারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন ব্যয়ও করেন না।

এই হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের চার নং গুণ যে, তারা সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কমীও করেননা বেশীও করেন না অর্থাৎ, বখীলীও করেন না, অতিরিক্তও করেননা বরং মধ্যম পন্থা গ্রহণ করেন।

৫ নং গুণ হল– আল্লাহর সাথে শরীক না করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ.

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত করে না। অর্থাৎ, তারা শির্ক করে না, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না।

শির্ক বলা হয় আল্লাহ্‌র সত্তা, আল্লাহ্‌র গুণাবলী এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক বা অংশীদার বানানো। আল্লাহর কোন রকম শরীক নেই। আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রেও কোন শরীক নেই, তাঁর গুণাবলীর ক্ষেত্রেও কোন শরীক নেই, তার ইবাদতের ক্ষেত্রেও কেউ শরীক নেই, তাঁর ইবাদতেও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবেনা।

আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা যাবে না বলেই কোন মানুষকে কল্যাণ সাধনের মালিক মনে করা যাবেনা কিংবা কোন মানুষ বিপদ মোচন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা যাবে না। মানুষের কল্যাণ ঘটানো এবং বিপদ-আপদ দূর করা হল আল্লাহর গুণ। আর আল্লাহর কোন গুণে কাউকে শরীক মনে করা যাবে না। এসব বিষয়ে কোন সৃষ্টিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করলে সেটা হবে শির্ক। অতএব কোন পীর মুরশিদ বিপদ আপদ হটিয়ে দিতে পারে বলে বিশ্বাস করলে সেটা হবে শির্ক। কোন পীর মুরশিদ ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ এনে দিতে পারে বা আয়-রোজগারে বরকত এনে দিতে পারে বলে বিশ্বাস করলে সেটা হবে শির্ক। কোন পীর মুরশিদ সন্তান দিতে পারে বলে বিশ্বাস করলে সেটা হবে শিরক। আল্লাহর খাস বান্দা হতে গেলে এই সব ধরনের শির্ক থেকে দূরে থাকতে হবে।

আল্লাহর সাথে শরীক করা হল সবচেয়ে বড় গোনাহ। এতবড় গোনাহ যে, আল্লাহ তাআলা অন্য সব গোনাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু শরীক করার গোনাহ ক্ষমা করবেন না। অতএব আল্লাহর খাস বান্দাগণ কোনক্রমেই এতবড় গোনাহ করতে পারে না। শরীক করার গোনাহ যে ক্ষমা হবে না– এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ. (সূরা নিছা: ১১৬)

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে শরীক করা হলে কোনক্রমেই তিনি তা ক্ষমা করবেননা। এছাড়া অন্যান্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।

এই হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের পাঁচ নং গুণ যে, তারা কোনভাবে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না।

৬ নং গুণ হল– অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ.

অর্থাৎ, যারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এ আয়াতে মানুষের হক নষ্ট না করার দিকে ইংগিত রয়েছে। মানুষের সবচেয়ে বড় হক হল তার জীবনের হক। তাই কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মানুষের সবচেয়ে বড় হক নষ্ট করা। এ জন্য অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা মারাত্মক ধরনের কবীরা গোনাহ। যারা আল্লাহর খাস বান্দা তারা মানুষের এই বড় হকও নষ্ট করেনা, মানুষের অন্য কোন হকও নষ্ট করে না। এর আগে বলা হয়েছে তারা আল্লাহর হক নষ্ট করে না, তাই আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না। এ আয়াতে বলা হয়েছে তারা বান্দার হকও নষ্ট করে না। আল্লাহর খাস বান্দা হতে গেলে আল্লাহর হকও নষ্ট করা যাবে না, বান্দার হকও নষ্ট করা যাবে না। মানুষের হক নষ্ট করে শুধু নামায রোযা করে, শুধু হজ্জ উমরা করে, শুধু দান-খয়রাত করে, শুধু লম্বা লম্বা তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর খাস বান্দা হওয়া যাবে না। আল্লাহর খাস বান্দা হতে হলে নামায, রোযা,, হজ্জ, উমরা, দান-খয়রাত, তাহাজ্জুদ, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি আল্লাহর হক আদায় করার সাথে সাথে বান্দার হকও আদায় করতে হবে, বান্দার হক নষ্ট করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

এই হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের ছয় নং গুণ যে, তারা কোনভাবে বান্দার হক নষ্ট করে না।

৭ নং গুণ হল– যেনা না করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ لَا يَزْنُوْنَ.

অর্থাৎ, যারা যেনা করেনা।

যেনা করা মারাত্মক ধরনের পাপ। এই মারাত্মক পাপে জড়িত থেকে কেউ আল্লাহর খাস বান্দা হতে পারবে না। কোন নারীর সাথে অবৈধ মেলামেশা করা হল আসল যেনা। এ ছাড়া কোন গায়র মাহরাম মহিলাকে দেখা হল চোখের যেনা, কোন গায়র মাহরাম মহিলাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা হল হাতের যেনা, পা দিয়ে যেনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া হল পায়ের যেনা। এমনকি কোন মহিলাকে নিয়ে কু-কল্পনা হল মনের যেনা। আল্লাহর খাস বান্দা হতে হলে এই সব ধরনের যেনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এই হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের সাত নং গুণ যে, তারা কোনভাবে যেনা করে না।

৮ নং গুণ হল– মিথ্যা স্বাক্ষ্য না দেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا.

আয়াতের এই অংশটুকুর একটা তর্জমা হল তারা অনর্থক ও অসার কার্যকলাপে যোগ দেয় না। যদি কখনও ঘটনাচক্রে এরূপ অসার কার্যকলাপের কোন মজলিস সামনে পড়ে যায় তাহলে স্ব-সম্মানে সেখান থেকে সরে পড়ে।

এ আয়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে। তাহল অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপে জড়িত না হওয়া। আমাদের জীবনের অনেক সময় অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। যার মধ্যে দ্বীন বা দুনিয়ার কোন ফায়দা নেই, যেটা শরীয়ত সমর্থন করে না এরূপ কথা ও কাজ হল অনর্থক। আল্লাহর খাস বান্দা হতে হলে জীবনের সময়কে এরূপ অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপের মধ্যে নষ্ট করার অবকাশ নেই। জীবনকে সুন্দর বানাতে হলে জীবনের যতটুকু সময় পাওয়া যায় তাকে কাজের কাজে লাগাতে হবে, অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْهِ. (رواه الترمذي برقم ٢٣١٨ والحديث صحيح لغيره)

অর্থাৎ, ইসলামী জীবনের সৌন্দর্য হল অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপ বর্জন করা। এখানে বোঝানো হয়েছে মুসলমান হিসেবে তুমি তোমার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাও, তাহলে অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তাআলাও তাই আয়াতের মধ্যে বললেন, যারা আল্লাহর খাস বান্দা হতে চায় অর্থাৎ, ভাল বান্দা হতে চায় তারা অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপে যোগ দেয় না।

এই হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের আট নং গুণ যে, তারা কোন অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপে যোগ দেয়না। ঘটনাচক্রে কোন অসার ক্রিয়াকলাপের সন্মুখীন হয়ে পড়লেও নিজ মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।

৯ নং গুণ হল– আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা মেনে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا.

অর্থাৎ, যাদেরকে প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করেনা বরং মেনে নেয়।

অন্ধের মত আচরণ করার অর্থ হল দেখেও না দেখার মত থাকা অর্থাৎ, আমলে না আনা। আর বধিরের মত আচরণ করার অর্থ হল শুনেও না শোনার মত থাকা অর্থাৎ, আমলে না আনা। যারা কুরআন হাদীছের কথা শুনে অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে অর্থাৎ, যারা কুরআন হাদীছের কথা শুনে আমলে আনে না, তারা কোনদিন আল্লাহর খাস বান্দা হতে পারবে না। আল্লাহর খাস বান্দা হতে পারবে তারা, যারা কুরআন হাদীছের কথা শুনে আমলে আনবে। অতএব আল্লাহর খাস হতে চাইলে কুরআন হাদীছের কথা শুনে কালবিলম্ব না করে আমলে আনতে হবে। কুরআন হাদীছের কোন বিষয়ের প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করা যাবে না।

এই হল আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের নয় নং গুণ যে, তারা কুরআন হাদীছের কথা শুনে কালবিলম্ব না করে সেটা আমলে আনে। কুরআন হাদীছের কোন কথার প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে না।

১০ নং গুণ হল– পরিবার এবং সন্তানাদিকে ভাল বানানোর ফিকির করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

অর্থাৎ, যারা প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও এমন সন্তান-সন্ততি দান কর যারা আমাদের জন্য শান্তির হবে। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের আদর্শ বানাও।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহর খাস বান্দা হতে হলে শুধু নিজেকে ভাল বানানোর ফিকির করলে চলবে না, বরং নিজের পরিবার এবং সন্তানাদিকেও ভাল বানানোর ফিকির করতে হবে, তাদের ভাল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআও করতে হবে।

এই হল আল্লাহ তাআলার খাস বান্দাদের ১০টি গুণ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ১০টি গুণ অর্জন করে তাঁর খাস বান্দাদের তালিকাভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৩৮

গোনাহ মুক্ত জীবন গড়া চাই

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَخُذُوْهُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের ১০টি বিশেষ গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে চাইলে উক্ত ১০টি গুণ অর্জন করতে হবে। শুধু উক্ত ১০টি গুণ নয়, বরং আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে চাইলে আরও বিশেষ কিছু গুণ অর্জন করতে হবে। তার মধ্যে একটি হল– গোনাহ মুক্ত জীবন গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে চাইলে নেকী যেমন অর্জন করতে হবে, গোনাহ হতেও মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে চাইলে গোনাহ মুক্ত জীবন গড়ে তুলতে হবে।

আমরা নেকী অর্জন করার প্রতি যতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি, নেক আমল করার প্রতি যতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি, গোনাহ থেকে বিরত থাকার প্রতি ততটা গুরুত্ব দেই না। অথচ নেক আমল করার সাথে সাথে গোনাহ থেকে বিরত থাকার প্রতিও গুরুত্ব দেয়া চাই। ইবনে মাজা শরীফে নেক আমল করা ও গোনাহ থেকে বিরত থাকা উভয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া সম্পর্কিত হাদীছটি সর্ব প্রথমে বয়ান করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَخُذُوْهُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. (رواه ابن ماجة في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن.)

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যা কিছু নেক আমল করতে বলেছি সাধ্যমত তা কর আর যা কিছু করতে নিষেধ করেছি তা থেকে বিরত থাক।

ইমাম ইবনে মাজা (রহ.) তাঁর কিতাবে সর্বপ্রথম এই হাদীছটি বয়ান করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম এই হাদীছটি উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই হাদীছটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই একটা হাদীছের উপর আমল করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই একটা হাদীছের উপর আমল করতে পারলেই আমাদের জীবন কামিয়াব।

এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে আমাদের দুইটা দায়িত্বের কথা বলেছেন। একটা হল করণীয় কাজ করা, আর একটা হল বর্জনীয় কাজ বর্জন করা। আমাদের জীবনে কিছু বিষয় রয়েছে করণীয় আর কিছু রয়েছে বর্জনীয়। যা করণীয় তা করতে হবে আর যা বর্জনীয় তা বর্জন করতে হবে। নেক আমল করণীয় তাই নেক আমল করতে হবে, আর গোনাহ বর্জনীয় তাই গোনাহ বর্জন করতে হবে। যদি এই হাদীছের উপর আমরা আমল করতে পারি অর্থাৎ, যা করণীয় তা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

করতে পারি আর যা বর্জনীয় তা বর্জন করতে পারি তাহলেই আমরা কামিয়াব। এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প কথায় আমাদের জীবনের মূল দায়িত্বের কথা বলে দিয়েছেন। সে দায়িত্ব হল দুটি। এক. নেক আমল করা। দুই. গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

এ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী নেক আমল করার ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব প্রদান করা চাই, গোনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারেও সেরকম গুরুত্ব প্রদান করা চাই। অথচ আমরা নেক আমল করার ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব উপলব্ধি করে থাকি, গোনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ততটা গুরুত্ব উপলব্ধি করি না। তাই দেখা যায় একজন মানুষ ঠিকমত নামায আদায় করছেন, ঠিকমত রোযা রাখছেন, ঠিকমত যাকাত আদায় করছেন, ঠিকমত হজ্জ করছেন, এমনিভাবে ঠিকমত অনেক নেক আমল করছেন, কিন্তু তিনি গোনাহ থেকে ঠিকমত বিরত থাকছেন না, অনেক ধরনের গোনাহ অহরহ করে যাচ্ছেন। নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা, তাহাজ্জুদ, তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ইত্যাদিও করছেন, আবার গান-বাদ্য, রঙ-তামাশা, গীবত-শেকায়েত, মিথ্যা, চোগলখুরী, বেপর্দা ইত্যাদি গোনাহও করে চলেছেন। তাহলে দেখা গেল তার মনের মধ্যে নেক আমল করার ব্যাপারে যতটা গুরুত্ববোধ পয়দা হয়েছে, গোনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ততটা গুরুত্ব বোধ পয়দা হয়নি। তাহলে ফলাফল কী দাঁড়াবে? নেক আমল দ্বারা নেকীর পাল্লা ভারী হবে সত্য, কিন্তু গোনাহের দ্বারা গোনাহের পাল্লাও ভারী হবে। যদি গোনাহের পাল্লা বেশী ভারী হয়ে যায়, তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে! যদি গোনাহ না থাকত বা কম থাকত, তাহলে নেক আমল অল্প থাকলেও তাতেই নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে জান্নাতে যাওয়ার ফয়সালা হয়ে যেত। এ হিসেবে চিন্তা করলে নেক আমলের চেয়ে গোনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে বেশী যত্ন নেয়া চাই। যাতে গোনাহের পাল্লা কোনক্রমেই ভারী হতে না পারে। যতটুকু নেক আমল থাকবে তাতেই যেন আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী হয় এবং আমরা জান্নাতে যেতে পারি, জাহান্নামে যেতে না হয়।

এ কথা থেকে আবার কেউ যেন এরকম না বোঝেন যে, তাহলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত করার কষ্ট না করলেও চলবে, শুধু গোনাহ থেকে বিরত থাকলেই হবে। এরকম বুঝলে ভুল হবে। কারণ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত ফরয। আর ফরয ছাড়লেও তো গোনাহ হয়। তাই গোনাহ থেকে বিরত থাকতে চাইলে ফরয, ওয়াজেব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইবাদত করতে হবে, এগুলি বর্জন করা চলবেনা। বর্জন করলে গোনাহ থেকে বিরত থাকা হল না। সব ধরনের গোনাহ থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হবে।

গোনাহ রয়েছে দুই ধরনের। কিছু রয়েছে গোনাহে কাবীরা আর কিছু রয়েছে গোনাহে সগীরা। "গোনাহে কাবীরা" অর্থ বড় গোনাহ আর "গোনাহে সগীরা" অর্থ ছোট গোনাহ। এই সব ধরনের গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি কখনও গোনাহ হয়ে যায়, তাহলে তওবা করে নিতে হবে। যেগুলি গোনাহে সগীরা তা অনেক ধরনের নেক আমল দ্বারাও মাফ হয়ে যায়।

সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার অনেক পন্থা রয়েছে। তার মধ্যে একটা পন্থা হল গোনাহে কাবীরা থেকে বিরত থাকা। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا.
(সূরা নিছা: ৩১)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এ আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হল যদি তোমরা গোনাহে কবীরা থেকে বিরত থাক, আর গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য নেক আমল তো করবেই, তাহলে আমি তোমাদের সগীরা গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব অর্থাৎ, জান্নাতে প্রবেশ করাব।

সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার আর একটা পন্থা হল বিভিন্ন নেক আমল। যেমন এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تَغْشَ الْكَبَائِرَ. (رواه مسلم)

অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং জুমুআর নামায আদায় করলে মধ্যবর্তী সমস্ত সগীরা গোনাহ ক্ষমা করা হয়ে থাকে।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে। তা হল– পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের দ্বারা যখন গোনাহ মাফ হয়ে গেল তখন জুমুআ দ্বারা আর কোন গোনাহ মাফ হবে? এ প্রশ্নের জবাব হল গোনাহ না থাকলে দরজা বুলন্দ হবে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ব্যাপারেও এই একই কথা। এক ওয়াক্ত নামাযের পর আর এক ওয়াক্তের মাঝে যদি কোন গোনাহ না হয়, তাহলে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের দ্বারা মর্যাদা বুলন্দ হবে।

নামায দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, রোযা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, হজ্জ, দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, উমরা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, শবে কদরে ইবাদত করা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, উযূ করা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, দান-সদকা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়। এভাবে অনেক ইবাদত দ্বারা গোনাহ মাফ হয়। তবে মনে রাখতে হবে এই নামায, রোযা, উযূ, দান-সদকা ইত্যাদি দ্বারা যে গোনাহ মাফ হওয়ার কথা বলা হল তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল গোনাহে সগীরা। এসব ইবাদত দ্বারা গোনাহে সগীরা মাফ হবে। আর গোনাহ কাবীরা তওবা ছাড়া মাফ হয়না। এমনকি যে হজ্জ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ١٥٢١)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং হজ্জের প্রাক্কালে অশ্লীল কথা ও কাজ এবং পাপ থেকে বিরত থাকে, সে মায়ের পেট থেকে জন্ম গ্রহণের দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে।

এই হজ্জের ব্যাপারে কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেছেন, গোনাহে কবীরা মাফ হয়না, গোনাহে কবীরা মাফ হওয়ার জন্য তওবা করতে হবে। তবে কেউ কেউ বলেছেন গোনাহে কাবীরাও মাফ হয়ে যাবে, তবে বান্দার হক মাফ হবে না। হজ্জ দ্বারা বান্দার হক মাফ হবে না– এ ব্যাপারে সকলেই একমত। বান্দার হক বড়ই সঙ্গীন। বান্দার হক বান্দা মাফ না করলে মাফ হবে না। বান্দার হক যদি বান্দা মাফ না করে আর আল্লাহ মাফ করে দেন, তাহলে ঐ বান্দার প্রতি জুলুম হবে। একজন মানুষ যদি অন্য মানুষের ধন-সম্পদ মান-ইজ্জত সব আত্মসাৎ করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেয় আর আল্লাহ তা মাফ করে দেন, তাহলে যাদের ধন-সম্পদ মান-ইজ্জত নষ্ট করা হল তাদের প্রতি অবিচার করা হয়ে যাবে। তাই বান্দার হক বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ তা মাফ করেন না।

যাহোক বান্দার হক ছাড়া অন্যান্য গোনাহে কাবীরা মাফ হওয়ার জন্য তওবা করতে হবে। তওবা করলে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। শুধু মাত্র শিরকের গোনাহ মাফ হবে না। শিরকের গোনাহ এবং বান্দার হক ছাড়া অন্যান্য গোনাহ তওবা দ্বারা মাফ হবে, যদি সে তওবা আল্লাহর কাছে কবূল হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ. (সূরা নিছা: ১১৬)

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেননা। এছাড়া অন্যান্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন।

গোনাহমুক্ত জীবনের অনেক ফায়দা রয়েছে। **গোনাহমুক্ত জীবনের একটা ফায়দা হল** এবং এটা সবচেয়ে বড় ফায়দা যে, এর দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। যেমন পূর্বে একটি আয়াত তেলাওয়াত করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা বড় বড় গোনাহে কবীরা থেকে বিরত থাক, তবে তোমাদের সগীরা গোনাহসমূহ আমি ক্ষমা করে দিব, এভাবে তোমরা গোনাহমুক্ত হয়ে যাবে আর তোমাদেরকে আমি সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব অর্থাৎ, জান্নাতে প্রবেশ করাব।

নেক আমল করে জান্নাতে যাওয়া কঠিন। কারণ, জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে নেক আমল রয়েছে। তাই সব নেক আমল করা কঠিন। কিন্তু গোনাহমুক্ত থাকতে অতিরিক্ত কোন পরিশ্রম করতে হয়না। গোনাহমুক্ত থাকতে কিছু করতে হয় না বরং বিরত থাকলেই হয়। আর নেক আমল করতে কিছু করতে হয়, আর কিছু করা কঠিন, কিন্তু কিছু করা লাগবে না, শুধু বিরত থাকব– এটা সহজ। তাই গোনাহ মুক্ত জীবন যাপন করা সব ধরনের নেক আমল করার তুলনায় সহজ। তাই বলা হচ্ছে নেক আমল করে জান্নাতে যাওয়া কঠিন, কিন্ত গোনাহমুক্ত থেকে জান্নাত লাভ করা সহজ।

গোনাহমুক্ত জীবনের আর একটা ফায়দা হল যে, গোনাহ না থাকলে গোনাহের পাল্লা কোনক্রমেই ভারী হতে পারবেনা। ফলে নেক আমল অল্প থাকলেও তাতেই নেকীর পাল্লা ভারী হবে। এর বিপরীত গোনাহ থাকলে তার কারণে বদীর পাল্লা ভারী হবে, নেক আমল দ্বারা সেই ভারের মোকাবেলা করে তারপরে নেকীর পাল্লা ভারী করা খুবই কঠিন হতে পারে।

গোনাহমুক্ত জীবনের আর একটা ফায়দা হল– গোনাহ থাকলে কলব ময়লা হয়ে যায়। আর গোনাহ না থাকলে কলব পরিষ্কার থাকে। আর কলব পরিষ্কার থাকলে সেই কলবে কুরআন হাদীছের কথা ভালভাবে প্রবেশ করতে পারে, ফলে কুরআন হাদীছের কথা ভালভাবে বুঝে আসে, দ্বীনের কথা ভালভাবে বুঝে আসে কোন অস্পষ্টতা থাকে না। পক্ষান্তরে কলব ময়লা থাকলে সেই কলবে কুরআন হাদীছের কথা ভালভাবে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ, কুরআন হাদীছের কথা হল নূর বা আলো। কাঁচের উপর ময়লা থাকলে সেই কাঁচের ভিতর যেমন আলো প্রবেশ করতে পারে না, তদ্রূপ কলবের উপর গোনাহের ময়লা থাকলে সেই কলবে কুরআন হাদীছের কথা ভালভাবে প্রবেশ করতে পারে না। তাই দেখা যায় যারা ফাসেক, ফাজের ও বড় ধরনের পাপী তাদের দ্বীনের কথা ভালভাবে বুঝে আসে না, দ্বীনের কথা তাদের অন্তরে দাগ কাটে না, কুরআন হাদীছের কথা শুনে তাদের মনের অস্পষ্পতা কাটে না। তাই গোনাহমুক্ত জীবন যাপনের এক বড় ফায়দা হল– গোনাহ মুক্ত থাকলে কলব নূরান্বিত থাকে। ফলে কুরআন হাদীছের কথা কলবে ভালভাবে প্রবেশ করে, কুরআন হাদীছের কথা ভালভাবে বুঝে আসে, দ্বীনের কথা ভালভাবে বুঝে আসে, দ্বীন সম্পর্কে মনের সব অস্পষ্টতা কেটে যায়।

গোনাহমুক্ত জীবনের আর একটা ফায়দা হল– গোনাহ মুক্ত থাকলে ইবাদত করতে ভাল লাগে, ইবাদতে মজা পাওয়া যায়, ইবাদতের স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। ফলে ইবাদত করতে কোন ত্যাক্ততা আসেনা, ইবাদত করতে অনিহা আসে না, ইবাদত থেকে ভাগতে মনে চায় না বরং ইবাদতের দিকে ছুটে আসতে ভাল লাগে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাই গোনাহ থেকে বিরত থাকা চাই। সব ধরনের গোনাহ থেকে বিরত থাকা চাই। কবীরা গোনাহ থেকেও বিরত থাকা চাই, সগীরা গোনাহ থেকেও বিরত থাকা চাই। শরীয়তে কি কি গোনাহ গোনাহে কবীরা আর কি কি গোনাহ গোনাহে সগীরা সবটা জেনে সবগুলি থেকেই বিরত থাকার চেষ্টা করা চাই। কোন্ কোন্ গোনাহ গোনাহে কবীরা আর কোন্ কোন্ গোনাহ গোনাহে সগীরা তা জানার জন্য বিভিন্ন কিতাবও লেখা হয়েছে। আল্লামা যাহাবী (রহ.) একটা কিতাব লিখেছেন যার নাম "কিতাবুল কাবায়ের"। কিতাবটির বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে। হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.)ও একটা কিতাব লিখেছেন যার নাম "গোনাহে বে-লাজ্জাত"। এরও অনুবাদ বের হয়েছে। আমার কিতাব "আহকামে যিন্দেগীতে"ও গোনাহে কবীরা ও গোনাহে সগীরার লম্বা তালিকা দিয়ে দেয়া হয়েছে। এগুলো পড়ে এবং জেনে এসব গোনাহ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা চাই। কোনটা গোনাহ তা যদি জানাই না হয়, তাহলে তা থেকে বিরত থাকার চিন্তাও মনে জাগ্রত হবে না। তাই কোনটা কোনটা গোনাহ তা খুব ভাল করে জানা চাই এবং তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা চাই।

আমরা জীবনে এমন অনেক গোনাহ করে থাকি, যেগুলোকে আমরা গোনাহই মনে করি না। গোনাহকে গোনাহ মনে না করলে সেই গোনাহের মাত্রা বেড়ে যায়। যে গোনাহকে গোনাহ মনে করা হয়, তা থেকে তো একদিন না একদিন তওবা নসীব হতে পারে। কিন্তু যে গোনাহকে গোনাহই মনে করি না তা থেকে কোন দিন তওবাও নসীব হবে না। তাই দেখা গেল গোনাহকে গোনাহ মনে না করলে সেই গোনাহ থেকে তওবা করা ছাড়াই মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাই গোনাহকে গোনাহ মনে না করা অনেক মারাত্মক ব্যাপার।

আমাদের অনেকের জীবনে এরকম অনেক গোনাহ রয়েছে যেগুলোকে তারা গোনাহই মনে করে না। যেমন ধরুন, রাজনৈতিক দলের গীবত-শেকায়েত করা, এটাকে অনেকে গোনাহই মনে করে না। মসজিদে এসে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলাকেও অনেকে গোনাহই মনে করে না, মসজিদে এসে সামনের কাতারে যাওয়ার জন্য নামাযীর ঘাড়ের উপর দিয়ে টপকে যাওয়াকেও অনেকে গোনাহই মনে করে না, নামাযীর দিকে ফিরে বসে কথাবার্তা বলে নামাযীর নামাযের মনোযোগ নষ্ট করাকেও অনেকে গোনাহই মনে করে না, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করাকেও অনেকে গোনাহই মনে করে না, জুমুআর নামায ও ঈদের নামাযের খুতবার সময় কথা বলাকেও অনেকে গোনাহই মনে করেনা, পায়জামা, লুঙ্গি ও প্যান্ট টাখনু গিরার নিচে ঝুলিয়ে পরাকেও অনেকে গোনাহই মনে করে না, ফ্যাশন মনে করে করতে থাকে। অথচ এটা খুব শক্ত গোনাহ। আজকাল অনেক ধরনের নকল জিনিস বের হয়েছে, নকল জিনিসকে নকল না বলে ক্রেতাকে দিলে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা হয়, এতে প্রতারণা করার গোনাহ হয় এবং নকল জিনিসের বিনিময়ে আসল জিনিসের মূল্য নিয়ে ক্রেতাকে ঠকানো হয়, এতে ঠকানোর গোনাহও হয়। কিন্তু অনেক বিক্রেতাই এভাবে বিষয়টাকে গোনাহের বিষয় মনে করে না। বাচ্চাকে স্মার্ট দেখানোর জন্য ছেলে বাচ্চাকে মেয়েদের পোশাক পরানো বা মেয়ে বাচ্চাকে ছেলেদের পোশাক পরানো হলে গার্জিয়ানদের গোনাহ হয়, অথচ অনেকেই এটাকে গোনাহই মনে করে না। বাচ্চাদেরকে প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক পরিধান করালেও গার্জিয়ানদের গোনাহ হয়, অথচ এটাকেও অনেকে গোনাহই মনে করে না। পর্দা না করাকে অনেকে গোনাহই মনে করেনা, বদ নজরকে অনেকে গোনাহই মনে করে না। অনুমতি ব্যতীত অন্যের প্রাইভেট ঘরে প্রবেশ করাকেও অনেকে গোনাহই মনে করে না। অথচ নিজের ছেলে মেয়ের প্রাইভেট

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ঘরেও প্রবেশ করতে হলে ইজাযত নেয়া ওয়াজেব। আমরা মনে করি আমার ছেলের ঘরে আমি ঢুকব, আমার মেয়ের ঘরে আমি ঢুকব তাতে আবার অনুমতির প্রয়োজন কি? নিজের বিবির ঘরে কেউ থাকলেও সেখানে ঢুকতে অনুমতির প্রয়োজন। একমাত্র শুধু স্ত্রী থাকলে অনুমতি নেয়া ওয়াজিব নয়, তবে উত্তম।

যাহোক এভাবে জীবনের বহু ক্ষেত্রে আমরা এমন গোনাহ করি যাকে আমরা গোনাহই মনে করি না। তাই কোন্টা কোন্টা গোনাহ তা পরিষ্কারভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে জেনে নেয়া চাই ও সেগুলো থেকে বিরত থাকা চাই।

কেউ মনে করতে পারেন এতসব গোনাহ থেকে বিরত থাকা কি সম্ভব? হাঁ সম্ভব। গোনাহ হতে বিরত থাকা তেমন কঠিন কিছু নয়। যেমন পূর্বে বলা হল যে, গোনাহমুক্ত থাকতে অতিরিক্ত কোন পরিশ্রম করতে হয় না। গোনাহমুক্ত থাকতে কিছু করতে হয়না বরং বিরত থাকলেই হয়। নেক আমল করতে তো কিছু করতে হয়, আর কিছু করা কঠিন, কিন্তু কিছু করা লাগবে না, শুধু বিরত থাকব– এটা তো সহজ। তাই গোনাহ হতে বিরত থাকা কঠিন নয় বরং সহজ। নেক আমল করার তুলনায় গোনাহ হতে বিরত থাকা সহজ। বিশেষত কিছু গোনাহ তো এমন আছে যেগুলোতে কোন লাভ নেই, কোন স্বাদ নেই, অহেতুকই আমরা সেগুলি করে থাকি। সেগুলি ছাড়া তো খুবই সহজ, শুধু ইচ্ছা করলেই হয়। কিছু কিছু গোনাহ অবশ্য এমন আছে যা করতে কিছুটা না হয় মজা লাগে। যেমন গায়র মাহরাম সুন্দরী নারীকে দেখতে একটু মজা লাগে, গান-বাদ্য শুনতে একটু মজা লাগে, নাচ-ড্যান্স দেখতে একটু মজা লাগে, সুদ ঘুষের মাধ্যমে অন্যের মাল নিয়ে নিজে ধনী হতে মজা লাগে। এসব গোনাহ ছাড়তে নফসের সাথে একটু মুজাহাদা করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যেসব গোনাহ করতে কোনই মজা নেই, যেগুলোতে কোন লাভ নেই, কোন স্বাদ নেই, অহেতুকই আমরা সেগুলি করে থাকি, সেগুলি ছাড়া তো খুবই সহজ, শুধু ইচ্ছা করলেই হয়। যেমন রাজনৈতিক গীবত একটা এমন গোনাহ, যাতে নিজের কোন লাভ নেই, কোন ফায়দা নেই, কোন মজা নেই। রাজনৈতিক গীবত বলে বোঝানো হচ্ছে আমরা এক দলের হয়ে আরেক দলের গীবত শেকায়েত করি, অন্য দলের দোষ-বদনাম বলি, অন্য দলের চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করি এগুলি। এসব আলোচনা অনর্থক। এতে কোন লাভ নেই, কোন ফায়দা নেই, এসব অহেতুক কথাবার্তা বলে আমরা অযথা সময় নষ্ট করি। এই গোনাহ ছাড়তে কোন কষ্ট নেই। শুধু ইচ্ছা করলেই হয়। শুধু রাজনৈতিক দলের গীবত-শেকায়েত কেন কোন মানুষের গীবত-শেকায়েত করেই নিজের কোন লাভ নেই, নিজের কোন ফায়দা নেই। আমরা মনে করি অন্যের দোষ বলে নিজের ভাল মানুষী প্রকাশ পাবে, এতে করে আমি ভাল প্রমাণিত হব, আসলে তা হয় না। কেউ অন্যের গীবত-শেকায়েত করলে তাকে ভাল মনে করা হয় না। অতএব এটাও এমন এক গোনাহ, যাতে কোন লাভ নেই, যাতে কোন ফায়দা নেই। এই গোনাহ ছেড়ে দেয়াও এমন কঠিন কিছু নয়, শুধু ইচ্ছা করলেই হয়। এমনিভাবে ঘরে মূর্তি রাখা, ছবি রাখা, চাই মাতা পিতা ও গুরুজনের ছবি হোক বা কোন পীর মুর্শিদের ছবি হোক বা যে কোন প্রাণীর ছবি হোক। এটাও গোনাহ। এটাও এমন এক গোনাহ যাতে কোন লাভ নেই, কোন ফায়দা নেই, অযথা আমরা এই গোনাহ করি। এই গোনাহ ছাড়তেও কোন কষ্ট নেই। শুধু ইচ্ছা করলেই হয়। এমনিভাবে অনেক গোনাহ এমন আছে, যা ছাড়তে তেমন কোন কষ্ট নেই শুধু ইচ্ছা করলেই হয়। শুধু ইচ্ছাটুকুও যদি না করি, তাহলে কীভাবে গোনাহমুক্ত জীবন গড়া সম্ভব হবে?

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

গোনাহ থেকে বিরত হওয়ার জন্য ইচ্ছা এবং নফসের সাথে মুজাহাদার সাথে সাথে আরও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে। তাহল যেসব গোনাহে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সেসব গোনাহের উপকরণ থেকেও দূরে থাকতে হবে বা সেসব উপকরণ নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। কিংবা যাদের সঙ্গ গ্রহণ করার ফলে কোন পাপে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সঙ্গ বর্জন করা। যেমন কেউ টি ভি, ভি সি আর দেখার গোনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে এই গোনাহের অভ্যাস ছাড়া সহজ করার জন্য তার কর্তব্য টি ভি, ভি সি আর-এর কাছে না যাওয়া বা নিজের ঘরে এগুলো থাকলে ঘর থেকে এগুলো বের করে দেয়া। আর যে পরিবেশে থেকে মানুষ কোন গোনাহে অভ্যস্ত হয়, সেই পরিবেশ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। তাহলে সেই গোনাহ থেকে বিরত থাকা তার জন্য সহজ হবে। যেমন একজন মানুষ তার খারাপ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলে কিছু খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাহলে তার কর্তব্য ঐসব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা। তাহলে তাদের কাছে যেয়ে যেসব গোনাহ করত, তা থেকে বিরত থাকা তার জন্য সহজ হবে। একজন মানুষ খেলাধূলা দেখতে ও খেলার খবর পড়তে অভ্যস্ত, তাহলে তার কর্তব্য এ জাতীয় সবংবাদ না শোনা বা পত্র-পত্রিকা পড়ার সময় এসব লেখা অংশ সম্পূর্ণ বর্জন করা। কেউ যদি নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে নেশার উপকরণ থেকেও দূরে থাকতে হবে। যাদের সাথে মিলে নেশা করে তাদের সঙ্গ থেকেও দূরে থাকতে হবে, তাহলে নেশার বদ-অভ্যাস বর্জন করা সহজ হয়ে উঠবে।

ভাল হওয়ার জন্য ভাল লোকদের সাহচর্য গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। কেউ ভাল হতে চাইলে অবশ্যই তাকে ভাল লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করতে হবে, ভাল লোকদের সাথে উঠাবসা বাড়াতে হবে। একটা ঘটনা শুনুন। মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খন্ডে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বের যুগে একজন লোক ৯৯টা খুন করেছিল, তারপর লোকটার মনে হল যে, আমি ভাল হতে চাই তাই সে ঐ যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানীর সন্ধান করছিল। এক পর্যায়ে লোকেরা তাকে এক খৃষ্টান পন্ডিতের সন্ধান দিল। সে উক্ত খৃষ্টান পন্ডিতের কাছে গিয়ে বলল, আমি ভাল হতে চাই, আমার ক্ষমা পাওয়ার কোন সুযোগ আছে কি না? পন্ডিত বলল, সর্বনাশ তুমি ৯৯ টা খুন করেছ! তোমার মত মানুষের ভাল হওয়ার আর কোন পথ নেই, তোমার ক্ষমা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। লোকটা ভাবল যখন ভাল হওয়ার কোনই পথ নেই, তখন খুনের সংখ্যা ১০০ টা পুরো করে ফেলি। এই ভেবে সে পন্ডিতকেও খুন করল। এভাবে তার খুনের সংখ্যা ১০০ টা পুরো হয়ে গেল। এর পর সে লোকজনের কাছে আবার জিজ্ঞেস করল যে, সব চেয়ে বড় জ্ঞানী কে আছে? অবশেষে একজন বড় জ্ঞানীর কাছে সে গেল এবং সব ঘটনা খুলে বলল। জ্ঞানী লোকটি বলল, কে তোমার তওবার পথ বন্ধ করতে পারে ? তুমি যে এলাকায় থেকে, যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে খারাপ হয়েছ, ঐ এলাকা ছেড়ে অমুক এলাকায় চলে যাও যেখানে নেককার পরহেযগার লোকেরা বসবাস করে। লোকটা যাওয়া শুরু করল, মাঝ পথে আজরাঈল(আ.) সামনে এসে গেল, আজরাঈল (আ.)কে দেখে সে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু ভাবল আমি ভাল হওয়ার জন্য যেদিকে যাচ্ছি যতক্ষণ জীবন আছে আমি সে দিকে এগুতে থাকব। তখন বুক ঘষে ঘষে আরও কিছুটা অগ্রসর হল, ইতিমধ্যে তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ভাল লোকের ইন্তেকাল হলে খুব সূরত রহমতের ফেরেশতারা তার রূহ্ নিয়ে যান। আর খারাপ লোকের মৃত্যু হলে বদ সূরত, কুৎসিত ভয়ংকর রূপের আযাবের ফেরেশতারা তার রূহ্ নিয়ে যান। এখন এই লোকটির রূহ্ কারা নিবে এ নিয়ে রহমতের ফেরেশতা আর আযাবের ফেরেশতার মধ্যে ঝগড়া শুরু

www.maktabatulabrar.com

হল। রহমতের ফেরেশতারা বলল, আমরা নিব কারণ সে তওবার উদ্দেশ্যে এসেছিল, অতএব তাকে ভাল বলে গণ্য করতে হবে। আযাবের ফেরেশতারা বলল, সে জীবনে কোন নেক কাজ করেনি, অতএব তাকে খারাপই গণ্য করতে হবে, কাজেই আমরা তার রূহ্ নিব। তখন আল্লাহ্ তাআলা অন্য এক ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। তিনি এসে ফয়সালা দিলেন যে, সে যে এলাকা থেকে এসেছে এবং যে এলাকায় যাচ্ছিল, উভয় এলাকার মধ্যে মাপ দেয়া হোক। লোকটি যে এলাকার নিকটবর্তী তাকে সে এলাকার গণ্য করা হবে। মাপ দেয়া হল এবং দেখা গেল যে দিকে সে যাচ্ছিল, সে দিকে সামান্য একটু অগ্রসর। ফলে রহমতের ফেরেশতারা তার রূহ্ নিয়ে গেলেন। সম্ভবত এই সামান্য পরিমাণ যেটুকু সে অগ্রসর ছিল, সেটা হল ঐ জায়গাটুকু যেটুকু সে বুক ঘষে অগ্রসর হয়েছিল।

এ ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, ভাল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। জানা নেই শেষ মুহূর্তের কোন একটা আমলও আমার নাজাতের ওছীলা হতে পারে। এ ঘটনার সব চেয়ে বড় শিক্ষা হল- ভাল হতে চাইলে ভাল লোকদের কাছে যেতে হবে। ভাল লোকদের কাছে গেলেই মানুষ ভাল হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৩৯

সুদ-ঘুষ মুক্ত জীবন গড়া চাই

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় গোনাহমুক্ত জীবন গড়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে চাইলে গোনাহমুক্ত জীবন গড়ে তুলতে হবে। গোনাহ অনেক রয়েছে, তন্মধ্যে আজ বিশেষ ২টা গোনাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। একটি হল সুদ, আর একটি হল ঘুষ। সুদ একটা কবীরা গোনাহ, এই গোনাহ থেকে জীবনকে মুক্ত রাখা চাই। ঘুষও কবীরা গোনাহ, এই গোনাহ থেকেও জীবনকে মুক্ত রাখা চাই। সুদ-ঘুষমুক্ত জীবন গড়া চাই। শুধু সুদ ঘুষের গোনাহ নয় বরং সব রকম গোনাহ থেকেই জীবনকে মুক্ত রাখা চাই। তবে সুদ ও ঘুষ এমন দুটো গোনাহ যা থেকে মুক্ত থাকা বর্তমান যুগে বেশ কঠিন বলে মনে হয় এবং সমাজের অনেকেই নানা ভাবে এই দুটো গোনাহের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই বিশেষভাবে এ দুটো গোনাহ সম্বন্ধে আজ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শরীয়তে সুদ হারাম। কুরআনে কারীমে স্পষ্টভাবে সুদ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেও না। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আলে ইমরান: ১৩০)

শরীয়তে সুদ হারাম। যে কোন ধরনের সুদ হোক তা হারাম। বিশ্ব ব্যবস্থায় সুদ যত ব্যাপকই হয়ে থাকুক না কেন তবুও সুদ হারাম। সুদ থেকে বিরত থাকা যত কঠিনই হোক না কেন তবুও সুদ হারাম। একথাগুলো এজন্য বলছি যে, আজকাল কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে, কুরআনে যে সুদ নিষেধ করা হয়েছে, তা হল চক্রবৃদ্ধি সুদ। অতএব চক্রবৃদ্ধি হারে যদি না হয় বরং সরল সুদ হয়, তাহলে সে সুদ গ্রহণ করা যেতে পারে। তাদের এই বক্তব্য ঠিক নয়। তখনকার সমাজে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের প্রচলন ছিল বলে কুরআনে সুদ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সময় সেই চক্রবৃদ্ধি হারের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, যদি চক্রবৃদ্ধি হারে না হয় বরং সরল সুদ হয়, তাহলে সে সুদ গ্রহণ করা যেতে পারে। হাদীছে সুদ গ্রহণ করলে যে, আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপের কথা বলা হয়েছে, সেখানে সাধারণভাবেই সুদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে করে বোঝা যায় সব ধরনের সুদই নিষিদ্ধ, চাই তা চক্রবৃদ্ধি হারে হোক বা সরল সুদ হোক। আজ পর্যন্ত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

উম্মতের সর্বস্তরের উলামা ও ফুকাহা এরকমই বুঝে আসছেন। নতুন করে এসব আয়াত ও হাদীছের অপব্যাখ্যা দিয়ে উম্মতকে গোমরাহ করার অবকাশ নেই।

আজকাল অনেকে বলে থাকেন যে, বিশ্ব ব্যবস্থায় সুদ এত ব্যাপক হয়ে গেছে যে, সুদ থেকে মুক্ত থেকে কোন বড় ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যই করা সম্ভব নয়, তাই সুদের ব্যাপারে নরম নীতি হওয়া চাই। তাহলে কি তারা বলতে চান যে, বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থা সুদভিত্তিক হয়ে যাওয়ার কারণে শরীয়তে যে সুদ হারাম ছিল তা এখন হালাল হয়ে গেছে? বিশ্বের কোন ব্যবস্থা গোনাহভিত্তিক হয়ে দাঁড়ালে কি সেই গোনাহ আর গোনাহ থাকবে না? তাহলে তো নাচ, গান, অশ্লীলতা, ছবি ইত্যাদি গোনাহ এত ব্যাপক হয়ে গেছে যে, এসব থেকে বিরত থাকা এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলে কি এগুলোকেও এখন জায়েয বলে দিতে হবে? ঘরে ঘরে রেডিও, টেলিভিশন, ভি সি আর ইত্যাদিতে শত রকম গোনাহের অনুষ্ঠান মানুষ উপভোগ করছে, তাই বলে কি তা জায়েয হয়ে যাবে? কখনই তা হবে না। কোন গোনাহ দুনিয়ার সকলে করলেও তা গোনাহই থাকবে, তার পাপের মাত্রা একটুও কমবে না।

কেউ কেউ বলে থাকেন যখন সুদী লোন ছাড়া আর কোনভাবে লোন পাওয়া যায় না তখন বাধ্য হয়েই সুদী কারবারে জড়িত হয়ে পড়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়েই আমরা সুদী কারবারে জড়িত হয়ে পড়ছি। আমরা অপারগ, আমাদের অন্য কোন উপায় নেই, তাই আমাদের অন্যায় থাকার কথা নয়। তাদের এই বক্তব্য পুরোপুরি ঠিক নয়। আজও যদি কেউ তার নিজের ব্যাপারে মানুষের কাছে এটা প্রমাণিত করতে পারে যে, সে ঋণ নিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ করে দিতে যত্নবান, তাহলে সে বিনা সুদে মানুষের কাছ থেকে ঋণ পাবে। সমাজে বহু লোক এমন আছেন যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন, ব্যাংক থেকে কোন সুদও তারা গ্রহণ করেন না। তারা যদি কারও ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন যে, সে ঋণ নিয়ে ঠিকমত পরিশোধ করে দিবে, তাহলে তাকে ঋণ দিতে তারা কুণ্ঠিত হবেন না। কিংবা যদি কেউ ইসলামী তরীকায় টাকা নিয়ে ব্যবসা করে ঠিকমত লাভ দিবেন বলে মানুষের কাছে আস্থা অর্জন করতে পারেন, তাহলে তাকে ইসলামী তরীকায় লোন দেয়ারও অনেক লোক পাওয়া যাবে। নিজেকে আস্থাভাজন এবং ভাল চরিত্রবান বলে প্রমাণিত করতে পারলে বিনা সুদে এমনকি বিনা লাভ দিয়েও তার ঋণ পেতে অসুবিধা হবে না। সুদী কারবারের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চাইলে নিজেকে আস্থাভাজন বলে প্রমাণিত করুন, নিজেকে বিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করুন, ইনশাআল্লাহ সুদী কারবারের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন।

কেউ হয়তো বলতে পারেন ব্যক্তিগত ঋণ নিয়ে তো আর বড় ধরনের কোন কারবার করা সম্ভব নয়। তাহলে শুনুন– ব্যাংক থেকে বড় অংকের সুদী লোন না পেলে ব্যক্তিগতভাবে করযে হাছানা নিয়ে হয়তো শুরুতে বড় ধরনের কারবার করতে পারবেন না, কিন্তু যতটুকুই করবেন তাতেই আল্লাহ পাক বরকত দান করবেন। এর বিপরীত সুদী লোনে অনেক বড় কারবার জুড়তে পারলেও শেষ নাগাদ তাতে কোন বরকত উপলব্ধি করতে পারবেন না। মনে রাখা উচিত সুদী কারবারে সাময়িক লাভ দেখলেও তাতে বরকত নেই। কোন অবৈধ কারবারেই বরকত নেই। অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করলে সে সম্পদে আল্লাহ পাক বরকত দেন না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ. (সূরা বাকারা : ২৭৬)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, সূদকে আল্লাহ মোচন করে দেন আর দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন।

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করা হলে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হলে –তা ফরয ব্যয় হোক বা নফল ব্যয় হোক, যে পর্যায়ের ব্যয়ই হোক না কেন এই ব্যয় করলে- আল্লাহ পাক সম্পদকে বৃদ্ধি করে দেন। কখনও সম্পদের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে দেন, কখনও সম্পদের বরকতকে বৃদ্ধি করে দেন। যখন যেভাবে বৃদ্ধি করা আল্লাহ পাক মোনাছেব মনে করেন, সেভাবেই বৃদ্ধি করে দেন। এর বিপরীত যারা সূদ বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, তাদের সম্পদকে আল্লাহ বরকতহীন করে দেন, তাদের সম্পদে বরকত হয় না। সম্পদ দ্বারা যে উদ্দেশ্য -একটু সুখ শান্তি অর্জন করা, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। দেখা যায় সব সময় তাদের পেরেশানী লেগে আছে, টেনশনের পর টেনশন লেগে আছে। তাদের সম্পদ কাজের কাজে লাগে না। অতএব দেখা গেল সূদী কারবারে বাহ্যিকভাবে লাভ দেখলেও তাতে লাভ নেই, কারণ, তাতে বরকত নেই।

আর শুধু দুনিয়াবী লাভ দেখলেই শরীয়তের উপর চলা যাবে না। সুদী কারবারে যদি বাহ্যিক লাভ দেখাও যায়, তবুও একজন মু'মিন তা করতে পারে না। কারণ, শরীয়তে সুদ হারাম। শুধু হারাম নয় শক্ত হারাম। সুদ এত শক্ত হারাম যে, যারা সুদের সাথে জড়িত তারা আল্লাহর অভিশপ্ত। শুধু যারা সুদ নেয়, তারাই যে অভিশপ্ত তা নয় বরং সুদের সাথে যে কোনভাবেই যারাই জড়িত, সকলেই আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত। এক হাদীছে এসেছে– ইরশাদ করেছেন,

لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٢٣٨)

অর্থাৎ, যারা উল্কী আঁকে, উল্কী আঁকাতে বলে, যারা সুদ খায় এবং যারা সুদ খাওয়ায় সকলের উপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন।

অন্য এক হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰى وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه الترمذي في سننه برقم ١٢٠٦ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা সুদ নেয়, যারা সুদ দেয়, যার সুদী কারবারে সাক্ষী থাকে এবং যারা সুদী কারবার লেখার কাজে জড়িত হয় তাদের সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন।

সুদের মত এতবড় অভিশপ্ত ব্যবস্থা আমাদের সমাজে কীভাবে চালু হল? আসলে সমাজে সুদ ভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা চালুর জন্য আমরাই দায়ী। এজন্য আমাদের চরিত্র কয়েকভাবে দায়ী। তার মধ্যে একটা হল– আমরা ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য টাকা নিলে পরে ব্যবসার ক্ষতি দেখিয়ে অর্থ বিনিয়োগকারীকে বঞ্চিত করে থাকি। তাই এখন সুদী ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগকারী তার নিজের লাভকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। যেকথা পূর্বে বললাম যে, আমরা আমাদের চরিত্র পাল্টালে এ অবস্থারও পরিবর্তন হতে পারে।

সমাজে সুদ ভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা চালুর জন্য আমাদের চরিত্র এভাবেও দায়ী যে, ইসলাম যে করযে হাছানা তথা সুদমুক্ত ও লাভমুক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছিল এবং একজন যেন আরেকজনকে করযে হাছানা দিতে উদ্বুদ্ধ হয়, তাই করযে হাছানার ছওয়াবও রাখা হয়েছিল অনেক। করযে হাছানা

www.maktabatulabrar.com

তথা লাভমুক্ত ঋণ দিলে দানের দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে, আমরা ঋণ নিলে আর তা পরিশোধ করতে চাই না। ফলে আমাদের মধ্য থেকে করযে হাছানা প্রদানের অভ্যাস প্রায় উঠে গেছে। এখন ব্যক্তিগতভাবে কেউ কাউকে করযে হাছানা বা সুদ ও লাভ মুক্ত ঋণ দিতে চায় না, কারণ একবার দিলে তা আর উসূল করা যায় না। এই সুযোগে লাভ সন্ধানী ব্যক্তিরা যাদের ঋণ উসূল করে নেয়ার মত শক্তি আছে, তারা সুদ ভিত্তিক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছে। আর ক্রমান্বয়ে এই সুদভিত্তিক লোন প্রদানের ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে এবং তা বিশ্বব্যাপী রূপ নিয়েছে। হয়তো আমাদের কর্মদোষেই সুদী ব্যবস্থা আমাদের উপর অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কর্মদোষেই হোক বা ফাসেক ফাজের ও বিধর্মীদের দ্বারা চালু করা হয়ে থাকুক, এ অভিশাপ আমাদের উপর এসে দাঁড় হয়েছে এ থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ খুঁজতে হবে।

সুদী ব্যবস্থা যে একটা অভিশাপ, তা অনেকেই হাড়ে হাড়ে টের পান। যখন একজন লোক ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য সামান্য কিছু অর্থ সুদী লোন নেয়ার পর ব্যবসা-বাণিজ্যে আশানুরূপ লাভ করতে না পেরে বা কোন বিপদ আপদের কারণে ঠিকমত ব্যাংকের সুদ গুণতে পারেননা। আর সেই টাকার সুদ বাড়তে বাড়তে সুদের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হতে হতে এমন বিরাট আকার ধারণ করে যে, তখন ভিটে মাটি বিক্রি করেও সেই সুদের দায় থেকে মুক্তি পান না। গরীব লোক আরও গরীবে পরিণত হয়, বরং নিঃস্ব ফকীরে পরিণত হয়, রাস্তার ভিখারীতে পরিণত হয়। আর সুদী লোন দাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ঠিকই তার সুদ উদ্ধার করে নিয়ে থাকে। ধনী আরও ধনী হতে থাকে, গরীব হয়তো পথের ভিখারী হয়ে যায়। বিশ্বের বহু মানুষ এভাবে সুদী লোনে জড়িত হয়ে ভিটে মাটি পর্যন্ত হারিয়েছে, পথের ভিখারীতে পরিণত হয়েছে, সুদ যে একটা অভিশপ্ত ব্যবস্থা তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

আজকাল অনেকে বাড়ি বানানোর সময় বা কোন কোম্পানী বা মিল ফ্যাক্টরী বানানোর সময় সুদী লোন নিয়ে থাকেন এই বলে যে, লোন না নিলে ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে দফা শেষ হয়ে যাবে! তাদের কথা থেকে মনে হয় তারা এই যুক্তি দিয়ে সুদকে হালাল বানাতে চান। অথচ এই যুক্তি দিয়ে সুদকে হালাল করা যাবে না। ব্যাংক লোন না নিলে ইনকাম ট্যাক্সে কিছু পয়সা হয়তো বেশী যাবে, কিন্তু লোন নিলে সেই বাড়তি ইনকাম ট্যাক্স থেকে বাঁচতে পারলেও আপনাকে তো সুদ গুণতে হবে। তাহলে একদিক থেকে না গেলেও আর এক দিক থেকে তো গেল। সবচেয়ে বড় কথা হল– সুদের মত মহা পাপ থেকে বাঁচতে যদি আপনাকে বেশী ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে একটু ক্ষতিগ্রস্ত হতেও হয়, তবুও তা মেনে নিয়ে চলুন, তবুও সুদের মত মহাপাপে জড়িত হয়ে পড়বেন না।

সুদ সম্পর্কে আরও একটা কথা বলতে চাই। তাহল আজ বিশ্বের সর্বত্রই সুদী কারবার এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, এ থেকে বিরত থাকা যে অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে– একথা একেবারে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। আমরা একথা আমরা বলছি না যে, সুদ থেকে মুক্ত থাকা মোটেই কঠিন নয়। অবশ্যই এটা এখন একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু মানুষ চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পর যে কয়টা টাকা পয়সা পায় তা ইসলামী তরীকায় বিনিয়োগ করার মত আস্থাভাজন লোক পায় না, ব্যাংকে বিনা সুদে ফেলে রাখলে দ্রুত সেটা শেষ হয়ে তার ভবিষ্যত জীবন কি দিয়ে চালাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার সন্মুখীন হতে হয়, সেই টাকার যাকাত দিতে দিতেও সেটা দ্রুত শেষ হওয়ার উপক্রম হয়। এমন অবস্থায় বহু লোক বাধ্য হয়ে ব্যাংকে সেই টাকা রাখে আর তার সুদ দিয়ে জীবিকা চালাতে থাকে। কত দুঃখজনক পরিস্থিতি যে, সারা জীবন হালাল উপায়ে যে টাকাগুলো উপার্জন করল

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এখন শেষ জীবনে এসে সেই টাকার সুদ দিয়ে হারাম পন্থায় তাকে জীবিকা চালাতে হচ্ছে। অনেক সময় মানুষ বড় ধরনের বিপদ আপদ কিংবা রোগ শোকে পড়েও কোনভাবে করযে হাছানা না পেয়ে ব্যাংক থেকে বা কোন মানুষ থেকে সুদী লোন নিতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থাগুলি আসলেই কঠিন। সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইসলামের উপর চলা কঠিন ছিল এভাবে যে, তখন ইসলাম গ্রহণ করলে জীবন যাওয়ার আশংকা ছিল, কিন্তু আজ সেই কঠিন পরিস্থিতি নেই, এখন ধর্ম কর্ম করতে গেলে সেরকম জটিলতার সন্মুখীন হতে হয় না। বর্তমান যুগে দেখা যায় ইসলামের উপর চলতে গেলে শুধু এই সুদ ও ঘুষের জটিলতাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মনে রাখতে হবে ইসলামের উপর চলতে গেলে কিছু জটিলতার সন্মুখীন হতেই হয়, কিছু পরীক্ষার সন্মুখীন হতেই হয়। এই সুদ ঘুষের জটিলতা হয়তো সেই জটিলতা এবং পরীক্ষাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন মূল্যে আমাদেরকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে, অর্থনৈতিক কষ্ট হলেও আমাদেরকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, অভাবে থাকতে হলেও এই পরীক্ষায় আমাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে, জীবিকার সংকটে থাকতে হলেও এই পরীক্ষায় আমাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে। বড় ব্যবসায়ী হতে না পারলেও সুদ থেকে পরিত্রাণের স্বার্থে তা মেনে নিয়ে চলতে হবে। মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হতে না পারলেও সুদ থেকে পরিত্রাণের স্বার্থে তা মেনে নিয়ে চলতে হবে। যে কোন ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে এই জঘন্ন হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার জাযায়ে খায়র দান করবেন। এর দ্বারাই শেষ পর্যন্ত আমাদের কামিয়াবী তথা সফলতা আসবে। সুদ সম্পর্কিত যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তার শেষে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" এ কথার মধ্যে ইংগিত রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে যদি সুদ থেকে বিরত থাক, তাহলে সাময়িক এবং বাহ্যিকভাবে ব্যর্থতা আসছে দেখা গেলেও চূড়ান্তভাবে তাতেই তোমাদের কামিয়াবী আসবে। সুদী কারবার থেকে বিরত থাকলে অসফলতা নয় বরং সফলতা আসবে, এটাই আল্লাহ পাকের কথা।

সুদ সম্পর্কে আরও একটা বলতে চাই। আজকাল গ্রামগঞ্জে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন নামে পুরুষ মহিলাদের সমিতি চালু হয়েছে। এই সব সমিতি থেকে সমিতির সদস্যরা সুদে লোন নিয়ে থাকে। অথচ তারা এটাকে সুদ বা গোনাহই মনে করছে না। এমনিভাবে ব্যাংকের সুদকেও অনেকে সুদ মনে করছে না। তারা বলতে চান, আমরা টাকা নিয়ে তা দিয়ে ব্যবসা করব, তা থেকে সমিতি বা ব্যাংককেও কিছু দিব, তা সুদ হবে কেন? আমরা লাভ করব, সেই লাভ থেকে সমিতি বা ব্যাংকও কিছু পাবে তাতে দোষ কী? কিছু লাভ ছাড়া সমিতি বা ব্যাংক লোন দিবেই বা কেন? এসব লোক সুদের সংজ্ঞা জানে না, সুদ আর মুনাফার পার্থক্য বোঝে না। যার ফলে সুদকেও তারা লাভ বা মুনাফা করে বসছে। অথচ সেটা লাভ বা মুনাফা নয়, সেটা হল সুদ। তাদের উচিত সুদ আর মুনাফার মধ্যে কি পার্থক্য বিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে তা ভাল করে বুঝে নেয়া। মনে রাখতে হবে সুদকে সুদ মনে না করলে সেটা আরও বড় পাপ হয়ে দাঁড়ায়। যে কোন গোনাহকে গোনাহ মনে না করলে সেই গোনাহের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই সুদকে সুদ বলে বিশ্বাস করুন অর্থাৎ, হারামকে হারাম বলে বিশ্বাস করুন, তারপরও যদি এই গোনাহ হয়ে যায় তাহলে তওবা করুন। তাহলে গোনাহ মাফ হবে। আর গোনাহকে গোনাহই মনে না করলে তা থেকে তওবাও নসীব হবে না।

www.maktabatulabrar.com

যেসমস্ত মা বোনেরা বা যেসব ভাই বেরাদাররা এসব সমিতি থেকে লোন নিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করছেন, তারা হয়তো ভাববেন এই সমিতি করে আমরা অনেক কিছু করতে পেরেছি, সমিতির লোন না নিলে এসব করব কি করে? কে আমাদেরকে লোন দিবে? তাদের উদ্দেশ্যে আবারও বলছি, নিজেদেরকে আস্থাভাজন এবং ভাল চরিত্রবান বলে প্রমাণিত করুন। তাহলে বিনা সুদে এমনকি বিনা লাভ দিয়েও আপনাদের ঋণ পেতে অসুবিধা হবে না। সুদী কারবারের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চাইলে নিজেদেরকে আস্থাভাজন বলে প্রমাণিত করুন, নিজেদেরকে বিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করুন, ইনশাআল্লাহ সুদী কারবারের অভিশাপ থেকেও মুক্তি পাবেন, আপনাদের প্রয়োজনও পূরণ হবে। আর যদি কোন প্রয়োজন পূরণ নাও হয়, তবুও গোনাহ থেকে তো বিরত থাকলেন। দুনিয়ার সামান্য কয়দিনের জীবনে আপনাদের প্রয়োজন পূরণ না হলেও জান্নাতের অনন্ত জীবনে সব প্রয়োজন পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। জান্নাত পাওয়ার স্বার্থে, দ্বীনের উপর চলার স্বার্থে কিছু না কিছু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হয়।

যাহোক এতক্ষণ সুদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা পেশ করা হল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুদ থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন। সুদী কারবারে কোন বরকত নেই– এই বুঝ ভাল করে আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিন।

সুদের ন্যায় ঘুষও শরীয়তে স্পষ্টত হারাম। চাই সেটা অফিস খরচের নামে নেয়া হোক বা টেবিল খরচার নামে নেয়া হোক কিংবা বখশিশের নামে নেয়া হোক অথবা যে নামেই নেয়া হোক। অনেকে বলে থাকে লোকটা কিছু পরিশ্রম করছে তাকে কিছু বখশিশ দিলে তা ঘুষ হবে কেন এবং তা হারাম হবে কেন? তাদের মনে রাখতে হবে সে লোকটা যে কাজ করে দিচ্ছে সেটা করে দেয়া তার দায়িত্ব। এবং এই দায়িত্ব পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সে বেতন ভাতা পাচ্ছে। তাই এই কাজের জন্য অতিরিক্ত কিছু দাবী করলে সেটা হবে ঘুষ। হাঁ যদি দাবী না করে বা কিছু দিতে হবে এমন শর্ত না জুড়ে দেয়, এমনিতেই কাজ হয়ে যাওয়ার পর পার্টি খুশী খুশী কিছু দিল, তাহলে সেটা হবে হাদিয়া। সেটা নেয়া ও দেয়া জায়েয হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, শর্ত জুড়ে দিল যে, বখশিশ না দিলে কাজ করে দিবে না তাহলে সেটা বখশিশ বা হাদিয়া নামে দিলেও তা বখশিশ বা হাদিয়া হবেনা বরং সেটা হবে ঘুষ। সেটা দেয়াও গোনাহ নেয়াও গোনাহ। ঘুষকে বখশিশ নাম দিলে তাতে সেটা বখশিশ হয়ে যাবে না। নাম পাল্টালে তাতে হুকুম পাল্টায় না। সুদকে মুনাফা নাম দিলে তাতে সুদের গোনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, উর্দু গানকে গজল নাম দিলে তাতে গানের গোনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, বেগানা নারী পুরুষের ফস্টিনষ্টিকে চিত্তবিনোদন নাম দিলে তাতে ফাহেশা কাজের গোনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। এভাবে কোন কিছুরই নাম পাল্টালে তার হুকুম পাল্টায় না। অতএব ঘুষকে বখশিশ নাম দিলেও তাতে ঘুষের হুকুম পাল্টাবেনা, তাতে ঘুষের গোনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

শরীয়তে সুদের মত ঘুষও এত শক্ত হারাম যে, যারা ঘুষের সাথে জড়িত তারা আল্লাহর অভিশপ্ত। শুধু যারা ঘুষ নেয়, তারাই যে অভিশপ্ত তা নয় বরং ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষের ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী সকলেই আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত। এক হাদীছে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٦٥٣٢ وإسناده قوي)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, আল্লাহ অভিশপ্ত করেন ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষের মধ্যস্থতাকারীকে।

অতএব এই অভিশপ্ত কাজ থেকে সকলেরই বিরত হওয়া চাই। যারা সরকারী বিভিন্ন পদে আছেন, তাদের মনে রাখা উচিত এই পদের সুযোগের অপব্যবহার করে মানুষ থেকে ঘুষ নিয়ে আপনারা খুব বেশী লাভবান হতে পারবেন না। ঘুষের পয়সায় বরকত নেই, ঘুষের পয়সায় শান্তি নেই। দুনিয়াতেও নেই, আখেরাতেও নেই। ঘুষ খেয়ে পেট বড় করবেন না, ঐ পেটে জাহান্নামের আগুণ ভরবে, ঐ পেটে জাহান্নামের বিষাক্ত পোকা-মাকড়, বিচ্ছু ইত্যাদি ভরবে।

অনেক ভাই এমন আছেন যে, তারা ঘুষ প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে চান। কিন্তু ঘুষ দেয়া ছাড়া অফিস আদালত থেকে তারা তাদের কাজ আদায় করে আনতে পারেন না। এমনকি সারা জীবন চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণকালে যে টাকাগুলো পাবেন তাও ঘুষ দেয়া ছাড়া উদ্ধার করতে পারেন না। এজন্য তারা অত্যন্ত পেরেশান হন। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এরকম অপারগ অবস্থা হলে বিজ্ঞ আলেমের কাছে আসবেন। তাদের কাছে আপনাদের অবস্থা তুলে ধরবেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনারা অপারগ হলে বিজ্ঞ আলেমগণ এ রকম অপারগ অবস্থায় আপনাদের উদ্ধার পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা বলে দিবেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত হক আদায় করার জন্য অপারগ অবস্থায় ঘুষ দেয়ার অনুমতি বের করা যেতে পারে। কিন্তু যারা ঘুষ নিবে তাদের জন্য কোন অবস্থাতেই তা বৈধ হবে না। কোন্ অবস্থা অপারগ অবস্থা আর কোন্ অবস্থা অপারগ অবস্থা নয় তা নিজেরা বিচার না করে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কাছে যান, তাদের থেকেই সে ব্যাপারে ফয়সালা জেনে নিন। আলেমদের কাছে গেলে তারা মাসআলা-মাসায়েল বলে শুধু কঠিনই করেন না, অনেক সময় সহজও করেন। মানুষ অনেক সময় ভয় পায় যে, হুজুরদের কাছে গেলে আবার ফতোয়া দিয়ে কি জটিলতাই না সৃষ্টি করে দেয়! তাই তাদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। তাদের এই ধারণা ভুল। উলামায়ে কেরাম মাসআলা-মাসায়েল বলে শুধু কঠিনই করেননা, অনেক সময় সহজও করে থাকেন।

যাহোক ঘুষ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হচ্ছিল। সব ধরনের ঘুষ থেকে বিরত থাকা চাই। স্পষ্ট ঘুষ থেকে যেমন বিরত থাকা চাই, যেখানে ঘুষের সন্দেহ আছে, সেখান থেকেও বিরত থাকা চাই। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করা যেতে পারে। যেমন হাদিয়া উপঢৌকন গ্রহণ করা স্পষ্টত হালাল আর ঘুষ গ্রহণ করা স্পষ্টত হারাম। এখন যদি এরকম হয় যে, আপনার একজন আত্মীয়ের আপনার অফিসে আপনার টেবিলে কোন কাজ রয়েছে। সেই আত্মীয় আপনার বাড়িতে হাদিয়া উপঢৌকনের নামে কিছু নিয়ে এসেছে। এখন বিষয়টা সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল যে, সে লোকটা আত্মীয় হিসেবে প্রকৃতই হাদিয়া নিয়ে এসেছে, নাকি অফিসের কাজ উদ্ধার করার জন্য ঘুষ নিয়ে এসেছে? এরূপ সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে। শুধু স্পষ্ট ঘুষ থেকে বিরত থাকা নয় বরং যেখানে ঘুষের সন্দেহ রয়েছে সেখান থেকেও বিরত থাকতে হবে। এটাই তাকওয়া পরহেযগারী, এটাই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়, এটাই মু'মিন মুত্তাকীদের কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুদ ঘুষ থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন। সুদ ঘুষ মুক্ত জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। সব ধরনের গোনাহ থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন। গোনাহমুক্ত জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং – ৪০

সন্দেহমুক্ত জীবন গড়া চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَايُرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত দুই জুমুআয় গোনাহ হতে মুক্ত থাকার গুরুত্ব ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। বিশেষভাবে সুদ ও ঘুষ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। সুদ ঘুষ সহ সব ধরনের গোনাহ হতে মুক্ত থাকা চাই। শুধু গোনাহ হতে মুক্ত থাকা নয় বরং গোনাহের সন্দেহ আছে এরকম ক্ষেত্র থেকেও বিরত থাকা চাই। শুধু গোনাহ থেকে মুক্ত থাকলে চলবে না, গোনাহের সন্দেহ রয়েছে এমন স্থান থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। গোনাহ মুক্ত জীবন গড়ে তোলা চাই, সন্দেহমুক্ত জীবন গড়ে তোলা চাই। স্পষ্ট গোনাহ থেকে বিরত থাকার যেমন নির্দেশ রয়েছে, গোনাহের সন্দেহ আছে এরকম ক্ষেত্র থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এক হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

دَعْ مَايُرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ. الحديث (رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٧٢٢ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, যেটা সন্দেহপূর্ণ সেটা ছেড়ে দাও, যেটা সন্দেহমুক্ত সেটা গ্রহণ কর।

অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে, যদি সন্দেহপূর্ণটা ছেড়ে না দাও তাহলে দ্বীন রক্ষা হবে না। কারণ, তাতে গোনাহে জড়িত হয়ে পড়তে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ. الحديث. (متفق عليه- البخاري برقم ٥٢ ومسلم برقم ٤١٧٨واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, শরীয়তের এরকম কিছু বিষয় রয়েছে যেটা হালাল হওয়া নিশ্চিত, আর কিছু বিষয় এরকম রয়েছে যেটা হারাম হওয়া নিশ্চিত। এর মাঝামাঝি কিছু বিষয় এরকম রয়েছে যা হালাল না হারাম তা নিশ্চিত নয় বরং তাতে উভয় দিকের সম্ভাবনা রয়েছে। এরকম সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে যে বিরত থাকবে সে তার দ্বীনকে রক্ষা করতে পারবে।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করা যেতে পারে। গত জুমুআয় বলা হয়েছিল যেমন হাদিয়া উপঢৌকন গ্রহণ করা স্পষ্টত হালাল আর ঘুষ গ্রহণ করা স্পষ্টত হারাম। এখন যদি এরকম হয় যে, আপনার একজন আত্মীয়ের আপনার অফিসে আপনার টেবিলে কোন কাজ রয়েছে। সেই আত্মীয় আপনার বাড়িতে হাদিয়া উপঢৌকনের নামে কিছু নিয়ে এসেছে। এখন বিষয়টা সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল যে, সে লোকটা আত্মীয় হিসেবে প্রকৃতই হাদিয়া নিয়ে এসেছে, নাকি অফিসের কাজ উদ্ধার করার জন্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঘুষ নিয়ে এসেছে? এরূপ সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এভাবে যত স্থানে হালাল না হারাম, ঠিক না বেঠিক– এরকম সন্দেহ হবে সেখান থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে শুধু গোনাহ মুক্ত নয় বরং সন্দেহমুক্ত জীবন গড়ে তুলতে হবে। স্পষ্ট গোনাহ থেকেও বিরত থাকতে হবে, গোনাহের সন্দেহ রয়েছে তা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

সন্দেহ মুক্ত থাকা প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে ১৫ পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৬ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে। এই ছোট্ট একটা আয়াতের ভিতরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতে আমাদের একটা জাতীয় রোগের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় রোগ বলতে বোঝানো হচ্ছে– ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নীচের লেবেলের উপর লেবেলের সর্বস্তরের মানুষের ভিতরে যে রোগটা ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। সেই জাতীয় রোগটা কি? সেটা হল ভালভাবে না জেনে বা নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোন কথা বলা, নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কোন মন্তব্য করা, ভালভাবে না জেনে না বুঝে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া। আমাদের প্রায় সকলের মধ্যেই কম বেশ এই রোগটা আছে। আমরা অনেকেই ভালভাবে না জেনেই হুটকরে একটা কথা বলে ফেলি, ভালভাবে না জেনে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে নেই। এরূপ করলে সন্দেহপূর্ণ স্থান থেকে বিরত থাকা হলনা। এরূপ করলে সন্দেহমুক্ত জীবন গড়ে তোলা হল না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের উক্ত আয়াতে এটা করতে নিষেধ করছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ. (সূরা বানী ইসরাঈল: ৩৬)

অর্থাৎ, যে ব্যাপারে তোমার সুস্পষ্টভাবে জানা নেই সে বিষয়ের পিছে পড়বে না।

এখানে যে বলা হয়েছে "পিছে পড়বে না"– এ কথাটা একটু ব্যাপক। অর্থাৎ, সেটা বলবে না। সে ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিবে না, সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দিবে না, সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে যাবে না। যদি বলা হত ভালভাবে না জেনে বলবে না, তাহলে বলার ভিতরে বিষয়টা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত। আল্লাহ্ পাকের বর্ণনা ভঙ্গিও কত সুন্দর ও অল্প কথায় কত ব্যাপক অর্থবোধক। তিনি বলেছেন, যে ব্যাপারে সুস্পষ্ট জানা নেই তার পিছে পড়বে না। অর্থাৎ, সেটা বলবেও না, সে ব্যাপারে কোন মন্তব্যও করবে না, সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তও দিবে না, তার ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপও নিবে না। এর পর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا. (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ, জেনে রাখ কান সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে, দৃষ্টি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে এবং অন্তর সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

অর্থাৎ, শুধু কানে শুনে দলীল প্রমাণ ছাড়াই যে সিদ্ধান্ত নিলে সে সম্পর্কেও জবাবদিহী করতে হবে, শুধু চোখে দেখে দলীল প্রমাণ ছাড়াই যে সিদ্ধান্ত নিলে সেই চোখ সম্পর্কেও জবাবদিহী করতে হবে এবং যে মন দ্বারা এরূপ চিন্তা করলে এবং সিদ্ধান্ত নিলে সে মন সম্পর্কেও তোমাকে জবাবদিহী করতে হবে। তুমি না ভালভাবে না জেনে মনে মনে কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করে ফেললে তোমার এই মন সম্পর্কেও জবাবদিহী করতে হবে।

এখানে সাধারণ ভাবে মানুষের জানার যে মাধ্যমগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানুষ সব চেয়ে বেশী জানে কানের মাধ্যমে শুনে। শুনে শুনে মানুষ অনেক কিছু জানে। তাই প্রথম নম্বরে

www.maktabatulabrar.com

বলা হয়েছে কান সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। মানুষ চোখের দ্বারা দেখেও অনেক কিছু জানে, তাই সে ব্যাপারেও বলা হয়েছে যে, চোখ সম্বন্ধেও জবাবদিহী করতে হবে। আর সর্বশেষে জানার ও বোঝার মূল যে যন্ত্র অর্থাৎ, অন্তর সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, অন্তর সম্বন্ধেও জবাবদিহী করতে হবে।

"জবাবদিহী করতে হবে" কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে শাস্তির ব্যাপারও রয়েছে। যেমন দুনিয়াতেও আমরা জবাবদিহী করতে হবে কথাটা প্রয়োগ করে বলি যে, এ ব্যাপারে তোমাকে জবাবদিহী করতে হবে। অর্থাৎ, বোঝানো হয় যে, এ ব্যাপারে যদি তুমি ন্যায়ের উপরে না থাক, সততার উপরে না থাক, তাহলে তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে। তাই আল্লাহ্ পাক এই আয়াতের ভিতরে বোঝালেন যে, ভালভাবে না শুনে ভালভাবে না দেখে, ভালভাবে না বুঝে কিছু বলে ফেললে বা কোন মন্তব্য করে ফেললে, কিংবা কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলে অথবা কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করে ফেললে তার জন্য তোমাকে জবাবদিহী করতে হবে, যদি ঠিক না হয়, তাহলে তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে।

যে সমস্ত অপরাধের ভিত্তিতে কুরআন হাদীছে শাস্তির কথা বলা হয়, সেখানে বোঝানো হয় যে, ঐ অপরাধটা বড় ধরনের অপরাধ অর্থাৎ, সেটা কবীরা গোনাহ। কারণ, বড় ধরনের অপরাধ না হলে শাস্তির হুমকি দেয়া হয় না। অতএব বোঝা গেল ভালভাবে না জেনে, ভালভাবে না বুঝে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে না জেনে কিংবা নির্ভরযোগ্য বই থেকে না জেনে যদি কোন কথা বলা হয়, কোন মন্তব্য করা হয়, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানো হয়, তাহলে সেটা কবীরা গোনাহ হয়ে যাবে।

এতএব দেখা গেল– ভালভাবে না জেনে, ভালভাবে না বুঝে কিছু বলা বা কোন সিদ্ধান্ত দেয়া এত ছোট কোন বিষয় নয়, অথচ আমরা এটাকে ছোটই মনে করে থাকি, আমরা এটাকে কোন অন্যায়ই মনে করি না, এটাকে কোন গোনাহই মনে করি না। আমরা প্রত্যেকে নিজের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখি যে, অনেক গোনাহের জন্য তো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছি, কিন্তু এজন্য কি কখনও ক্ষমা চেয়েছি যে, হে আল্লাহ! ভাল করে না জেনে কত কথা বলে ফেলেছি, কত মানুষ সম্পর্কে কত মন্তব্য করে বসেছি, ক্ষমা করে দাও। সম্ভবত এর জন্য কোন দিন ক্ষমা চাওয়া হয়নি। তাহলে দেখা গেল এটাকে আমরা গোনাহই মনে করি না। অথচ এটা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

দুনিয়ার ব্যাপারে হোক, দ্বীনের ব্যাপারে হোক, যে কোন ব্যাপারে হোক ভাল করে না জেনে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির থেকে না জেনে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে না জেনে কোন কথা বলা, কোন মন্তব্য করা, কারও সম্পর্কে অভিযোগ দাঁড় করানো জায়েয নয়। যেনতেন একজন থেকে শুনলাম, ব্যস শুনেই যাচাই বাছাই ছাড়াই সেটা বলতে শুরু করে দিলাম, তা জায়েয হবে না। যার থেকে শুনলাম সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কিনা তা দেখতে হবে। নতুবা তা যাচাই করে নিতে হবে। তাহলেই তা আরেকজনের কাছে বলতে পারব, নতুবা বলতে পারব না। আমরা কি বিচার বিবেচনা করে দেখি যে, যার কাছ থেকে আমি কথাটা শুনলাম আসলে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কিনা, কিংবা যে বইতে পড়লাম তার লেখক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কিনা, লেখক ভাল জাননেওয়ালা ব্যক্তি কি না, লেখক হকপন্থী কি-না অথবা যে পত্র-পত্রিকায় পড়ে জানলাম, তার সংবাদটা কতটা নির্ভরযোগ্য? তার সংবাদটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লেখা হয়েছে কিনা। আসলে এসব বিষয় আমরা বিবেচনায় আনি না। বরং একজন থেকে শুনেই যাচাই বাছাই করা ছাড়াই বলা শুরু করে দেই, যে কোন একটা বইতে পড়েই যাচাই বাছাই করা ছাড়াই বলা শুরু করে দেই, যে কোন একটা পত্র-পত্রিকায় একটা সংবাদ দেখেই বিচার বিবেচনা ও তদন্ত ছাড়াই তা প্রচার করতে শুরু করে দেই। অথচ হাদীছে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ. (مقدمہ مسلم)

অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি যা-ই শুনল যাচাই বাছাই ছাড়া সেটা বলে দেয়া তার মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে, যাচাই-বাছাই ও তদন্ত ছাড়া কোন কথা প্রচার করা মিথ্যার শামিল। দ্বীনের ব্যাপারে হোক দুনিয়ার ব্যাপারে হোক, যাচাই-বাছাই ও তদন্ত ছাড়া কোন কথা প্রচার না করা চাই। অন্যথায় মিথ্যা বলার গোনাহ হবে। একজন হুজুর থেকে কোন মাসলা শুনলাম, সাথে সাথে সেটা বলা শুরু করব না। বরং প্রথমে বিবেচনায় আনব তিনি নির্ভবযোগ্য ব্যক্তি কি-না, তিনি ভাল জাননে ওয়ালা কি-না, তিনি হক পন্থী কি-না। এসব বিষয় জানার পর সবকিছু ঠিক মনে হলে সেই হুজুর থেকে শোনা কথা প্রচার করা যাবে, নতুবা তা প্রচার করা যাবে না। কোন বইতে কোন একটা বিষয় পড়লাম, সাথে সাথে সেটা বলা শুরু করব না। বরং প্রথমে বিবেচনায় আনব বইয়ের লেখক নির্ভাবযোগ্য ব্যক্তি কি-না, তিনি ভাল জাননে ওয়ালা কি-না, তিনি হক পন্থী কি-না। এসব বিষয় জানার পর সবকিছু ঠিক মনে হলে সেই বইয়ের কথা প্রচার করা যাবে, নতুবা তা প্রচার করা যাবে না।

দেখা গেল ভালভাবে না জেনে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে না জেনে কথা বলা একটা বড় ধরনের অন্যায়। অথচ আমাদের অভ্যাস হল যেনতেন লোকের মুখেও কোন কথা শুনে যাচাই-বাছাই ছাড়াই তা বলে বেড়ানো। আমাদের অভ্যাস হল নিছক অনুমান করেও কথা বলে বেড়ানো। ধর্মীয় ব্যাপারেও আমাদের এই অভ্যাস, দুনিয়ার ব্যাপারেও আমাদের এই অভ্যাস। একটি মজলিসে একটা মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হোক দেখবেন পাঁচ জনে পাঁচ রকম মাসআলা দিয়ে বসবে। অথচ দেখা যাবে তাদের অনেকেই ভাল করে না জেনে মাসআলা দিয়ে বসেছে। আপনার একটা রোগ-ব্যাধি হয়েছে, একটা মজলিসে সেই রোগের কথা তুলবেন, দেখবেন হুট করে দশজন থেকে দশ রকম সাজেশন এসে পড়েছে। অথচ দেখা যাবে তাদের অনেকেই ভাল করে না জেনে না বুঝে সাজেশন দিয়ে বসেছে।

মজলিসে হুট করে আগে বেড়ে কোন কথা বললে বা মন্তব্য করলে একই সাথে চারটা অন্যায় হয়ে যায়।

১ নং অন্যায় হল– যদি ভাল করে না জেনে না বুঝে বলে থাকে, তাহলে ভাল করে না জেনে না বুঝে বলার অন্যায়, যা মিথ্যার শামিল।

২ নং অন্যায় হল– মজলিসের আদব রক্ষা না করার অন্যায়। কারণ, মজলিসের আদব হল যে কোন কথা বলতে হলে সেই মজলিসে সেই বিষয়টা সবচেয়ে ভাল যিনি জানেন তার উপরে ছেড়ে দেয়া, অন্যদের পক্ষে চুপ থাকা। যেমন দ্বীনী কথা হলে সেই মজলিসে যিনি দ্বীনধর্ম সবচেয়ে ভাল বোঝেন তার উপরে ছেড়ে দেয়া, যারা তার চেয়ে কম জানেন কম বোঝেন তাদের পক্ষে চুপ থাকা। এমনিভাবে চিকিৎসা বিষয়ক কথা হলে সেই মজলিসে যিনি চিকিৎসা বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জানেন, তার উপর বলার ভার ছেড়ে দেয়া, অন্যদের পক্ষে চুপ থাকা। মোট কথা যে বিষয়ে যিনি বেশী অভিজ্ঞ সেই বিষয়ে তার উপরই বলার ভার ছেড়ে দেয়া। সেই বিষয়ে তিনিই কথা বলবেন আর কেউ বলবে না, অন্য সকলে তার কথা শুনবে। কিন্তু আমরা মজলিসের এই আদবের রেয়ায়েত করি না।

৩ নং অন্যায় হল– যে মজলিসে সেই বিষয়টা সবচেয়ে ভাল জানে না, তা সত্ত্বেও আগে বেড়ে মন্তব্য করল, তাহলে সে নিজেকে অধিক জান্তা হিসেবে প্রকাশ করল, এভাবে তার ভিত্তিহীন আত্মপ্রচারের অন্যায় হল।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

৪ নং অন্যায় হল– যে ভালভাবে না জানা সত্ত্বেও আগে বেড়ে মন্তব্য করল, এর দ্বারা অন্যদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হল। কারণ, সে আগে বেড়ে না বললে যিনি ভাল জানতেন তিনি বিষয়টা ভাল করে বলতে পারতেন। তার দ্বারা অন্যরা বিষয়টা ভালভাবে জানতে বুঝতে পারত। এখন ঐ লোকের আগে বেড়ে বলার দ্বারা অন্যরা সেই ভালটা জানা থেকে বঞ্চিত হল।

এই হল কোন মজলিসে হুট করে আগে বেড়ে বলার অন্যায়। আর ভালভাবে যাচাই-বাছাই না করে, ভালভাবে তাহকীক-তদন্ত না করে কোন কথা বললে বা কোন মন্তব্য করলে তার ... ক্ষতি রয়েছে।

১ নং ক্ষতি হল– সেই কথা বা মন্তব্য যদি ভিত্তিহীন হয়, তাহলে সেই কথা বা মন্তব্য শুনে যতজন সেটার উপর আমল করবে, যতজন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের ভুল আমলের জন্য প্রথম বলনেওয়ালা বা প্রথম মন্তব্যকারী দায়ী থাকবে। সকলের ক্ষতির দায় প্রথম জনের উপর বর্তাবে।

২ নং ক্ষতি হল– কোন ভিত্তিহীন কথা বলা হলে সেটা শুনে যতজন সেটা প্রচার করবে সকলের সেই ভিত্তিহীন প্রচারে দায় প্রথম জনের উপরও বর্তাবে।

৩ নং ক্ষতি হল– ভালভাবে যাচাই-বাছাই না করে, ভালকরে তাহকীক-তদন্ত না করে কোন কথা বললে বা কোন মন্তব্য করলে পরে অনুতপ্ত হতে হয়, লজ্জা পেতে হয়। যেমন দেশে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। সরকারী দলের লোকজন তাদের অভ্যাস অনুযায়ী কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই বিরোধীদলের উপরে সেটা চাপাল। বিরোধী দলের লোকজন তাদের অভ্যাস অনুযায়ী কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই সরকারী দলের লোকজনের উপর সেটা চাপাল। আর পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া তাদের অভ্যাস অনুযায়ী নিজ নিজ চ্যানেল ঠিক রেখে মন্তব্য লিখে যেতে থাকল। কিন্তু আসল হত্যাকারী কে তা হয়তো এখনও উদঘাটন-ই হয়নি। পরে দেখা গেল সেটা নিয়ে যাদেরকে জড়িয়ে কেস হয়েছে তারা সবাই বে-কসুর খালাস হয়ে বেরিয়ে গেছে। অথচ ইতিমধ্যে তাদেরকে নিয়ে কত কিছু বলা হয়ে গেছে এবং যারা এরকম বলেছে জতির কাছে তাদেরকে নাকে খত দিতে হচ্ছে এবং বিবেক থাকলে তাদেরকে বিবেকের কাছে লজ্জিত হতে হচ্ছে। অবশ্য যদি বিবেকই না থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

তাই ভাল করে না জেনে না বুঝে কোন কথা বলা থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা চাই। মজলিসে কোন্ বিষয়টা কে ভাল জানে তা না দেখে হুট করে কোন কিছু বলতে যাওয়ার অভ্যাস বর্জন করা চাই। ভালভাবে যাচাই-বাছাই না করে, ভালকরে তাহকীক-তদন্ত না করে কোন কথা বলা বা কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা চাই।

সারকথা– জিহ্বাকে কন্ট্রোল করা চাই। জিহ্বা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اِنَّ اللِّسَانَ جِرْمُهٗ صَغِيْرٌ وَجُرْمُهٗ كَبِيْرٌ.

অর্থাৎ, জিহবা আকারে ছোট্ট একটা মাংস পিণ্ড, কিন্তু এর গোনাহের আকার অনেক বড়।

তাই যবানকে কন্ট্রোল করতে হবে, যবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুসলমানের যিন্দেগীই হবে নিয়ন্ত্রিত যিন্দেগী। যবান, হাত, পা, চিন্তা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পরিচালিত করতে হবে।

মুসলমান যা মনে আসবে অবলিলায় তা বলে বসবে না, যা মনে আসবে অবলিলায় তা মন্তব্য করে বসবে না। অনুমানের ভিত্তিতে কোন কথা বলবে না, অনুমানের ভিত্তিতে কোন মন্তব্য করে বসবে না। যাচাই-বাছাই না করে, তাহকীক-তদন্ত না করে কোন কথা বলবেনা, যাচাই-বাছাই না করে, তাহকীক-তদন্ত না করে কোন মন্তব্য করে বসবে না, শালিস বিচার ও মীমাংসার সময় এক পক্ষের কথা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

শুনে কোন রায় দিবেনা। উভয় পক্ষের কথা না শুনে কোন দিন বিচার করবে না। কারণ, এক পক্ষের কথা শুনে কখনও সঠিক বিষয় উদ্ধার করা যায় না। এক পক্ষের বক্তব্য শুনে কখনও সঠিক ভাবে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয় না। আমাদের অভ্যাস হল আমরা অনেক ব্যাপারে এক পক্ষের কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি। একপক্ষের কথা শুনেই তার সমালোচনা ও দোষ বদনাম গাওয়া শুরু করে দেই, এক পক্ষের কথা শুনেই মামলা-মোকদ্দমা শুরু করে দেই, এক পক্ষের কথা শুনেই মিছিল প্রতিবাদ শুরু করে দেই, পাল্টা মিটিং সিটিং শুরু করে দেই, হৈ চৈ ভাংচুর শুরু করে দেই। অথচ আরেক পক্ষের কথা শুনলে দেখা যেত এতকিছুর প্রয়োজন ছিল না।

যাহোক আজকের আলোচনার সারকথা হল– সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে, দলীল প্রমাণ ছাড়া এবং ভালভাবে যাচাই-বাছাই ও তাহকীক তদন্ত করা ছাড়া কোন কথা বলা, কোন মন্তব্য করা ও কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এর জন্য আমাদেরকে কয়েকটা কাজ করতে হবে।

১ নং কাজ হল– যার থেকে কোন কথা শুনলাম, সে যদি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি না হয়, তাহলে তার কথা শোনার পর সেটা যাচাই-বাছাই ও তাহকীক তদন্ত করা ব্যতীত সে কথা কারও কাছে না বলা।

২ নং কাজ হল– ভালভাবে দলীল-প্রমাণ জানা ছাড়া যেনতেন ভাবে জেনেই কোন কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

৩ নং কাজ হল– কোন বই-পত্র থেকে কোন বিষয় জানলে সে বইয়ের লেখক নির্ভরযোগ্য ও ভাল জাননেওয়ালা না হলে সে বিষয়টা অন্যের কাছে না বলা।

৪ নং কাজ হল– কোন পত্র-পত্রিকা বা কোন মিডিয়ার মাধ্যমে কোন বিষয় জানলে হুট করে তা প্রচার না করা। কারণ, পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া বিভিন্ন চ্যানেলের হয়ে থাকতে পারে বা কোন দল ও পক্ষের লেজুড়বৃত্তি করে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের পরিবেশিত সংবাদ নিরপেক্ষ নাও হতে পারে এবং বর্তমান যুগে সচরাচর এরকম চলছে এটাই বাস্তব সত্য। তাই ভালভাবে যাচাই-বাছাই না করে এবং চূড়ান্ত না দেখে সেসব তথ্য প্রচার না করা।

আমরা ঐ আয়াতের বক্তব্যকে আবার স্মরণ করি যে, তোমার ভালকরে জানা নেই এরকম কোন কিছুর পেছনে পড়বে না। এরকম কোন বিষয় বলতেও পারবে না, এরকম কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তও দিতে পারবে না, এরকম কোন বিষয়ে কোন মন্তব্যও করতে পারবে না। তুমি সঠিক ভাবে দেখেছ কি-না তোমার চোখ সম্পর্কে তোমাকে জবাবদিহী করতে হবে, তুমি সঠিক ভাবে শুনেছ কি না, খেয়াল করে শুনেছ কি না, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শুনেছ কি না তোমার কান সম্পর্কে তোমাকে জবাবদিহী করতে হবে, তুমি ভালভাবে বিষয়টা অন্তর থেকে বুঝে বলেছ কি না তোমার অন্তর সম্পর্কে তোমাকে জবাবদিহী করতে হবে।

যদি আমরা এই একটা আয়াতের উপরে আমল করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের অনেক কথা বন্দ হয়ে গেছে। অনেক ব্যাপারে মুখের উপরে তালা মারা হয়ে যাবে। যিন্দেগীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে যাবে। ভালকরে না জেনে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে না জেনে, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে না জেনে কথা বলা বন্ধ করে দেই। হুট করে মন্তব্য করা বন্ধ করে দেই। হুট করে সিদ্ধান্ত নেয়া বন্ধ করে দেই। সব রকম সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বিরত থাকার যিন্দেগী গড়ে তুলি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং – ৪১

গাফলতমুক্ত জীবন গড়া চাই

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ. وَفِى الْحَدِيْثِ – مَا الْاِحْسَانُ؟ قَالَ: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত কয়েক জুমুআয় গোনাহ মুক্ত জীবন এবং সন্দেহ মুক্ত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গোনাহমুক্ত জীবন গড়ে তোলা চাই, সন্দেহমুক্ত জীবন গড়ে তোলা চাই। এমনিভাবে গাফলতমুক্ত জীবন গড়ে তোলা চাই। গাফিলতি বর্জন করা চাই। আমাদের জীবনের অনেক সময় গাফলতের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। গাফলত অর্থ বে-খেয়ালী, উদাসীনতা ও বে-পরওয়াভাব। আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়গুলো কাজের কাজে লাগছে কি না তা আমরা খেয়াল করি না, এভাবে আমাদের জীবনের অনেক সময় বে-খেয়ালীর মধ্যে কেটে যাচ্ছে, আমাদের দ্বারা আমাদের দায়িত্ব পালন হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে আমরা উদাসীন, সে ব্যাপারে আমাদের কোনও পরওয়া নেই, এভাবে আমাদের জীবনের অনেক সময় উদাসীনতা ও বে-পরওয়াভাবের মধ্যে কেটে যাচ্ছে। এভাবে বে-খেয়ালী, উদাসীনতা ও বে-পরওয়াভাবের মধ্যে সময় কাটতে কাটতে এক সময় আমাদের জীবনের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের মৃত্যু এসে উপস্থিত হচ্ছে, আল্লাহর কাছে হিসাব-নিকাশ দেয়ার সময় এসে যাচ্ছে, তখন বুঝছি হায়রে কী করলাম! জীবনের সময়গুলো কীভাবে কাটালাম! কিছুই তো করা হল না!

এই বে-খেয়ালীপনা, উদাসীনতা ও বে-পরওয়াভাবের মধ্যে যাদের জীবন কাটে, তাদের দ্বারা জীবন গড়া হয়ে ওঠে না, তাদের দ্বারা তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করা হয়ে ওঠে না, তাদের দ্বারা দ্বীন-ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা হয়ে ওঠে না, তারা দ্বীন-ধর্ম ও দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে থাকে। কুরআনে কারীমের ১৭ নং পারার শুরুতে আল্লাহ তাআলা একথাটিই এভাবে বলেছেন,

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ. (সূরা আম্বিয়াঃ ১)

অর্থাৎ, মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন হয়ে এল, অথচ তারা উদাসীনতায় ধর্মকর্ম ও দায়িত্ব কর্তব্য থেকে বিমুখ হয়ে আছে।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, হিসাব-নিকাশের সময় তো অনেক দূরে। আমাদের মৃত্যুর পরও বহু বহু যুগ ও শতাব্দী কেটে যাবে, তারপর কেয়ামত হবে, তখন হিসাব-নিকাশের প্রশ্ন। কাজেই মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন হয়ে এসেছে– একথাটার কী অর্থ? কেউ এরকম প্রশ্ন করলে তাকে বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, কেয়ামত আসবে এটা নিশ্চিত, আর যেটা নিশ্চিত সেটা দূরে নয় বরং সেটা কাছেই। এজন্যই এক হাদীছে বলা হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَلَا اِنَّ مَا هُوَ اٰتٍ قَرِيْبٌ وَاِنَّمَا الْبَعِيْدُ مَا لَيْسَ بِاٰتٍ. (رواه ابن ماجة في سننه برقم ٤٦ وقال السخاوي : الحديث صحيح)

অর্থাৎ, যেটা আসা নিশ্চিত সেটা আসন্ন অর্থাৎ, সেটা কাছে দূরে নয়। দূরে তো হল সেটা, যেটা আসবে না। এ হল এ হাদীছের বক্তব্য।

তদুপরি যার মৃত্যু এসে যায় কবরেই তার থেকে সংক্ষেপে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হয়ে যায়। অতএব কারও মৃত্যুর অর্থই হল যেন তার কেয়ামত শুরু হয়ে গেল। এজন্যই আলেম এভাবে বলেছেন,

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ. (كما في المشكاة باب قرب الساعة وإن من مات فقد قامت قيامته)

অর্থাৎ, যে মৃত্যু বরণ করল, তার কেয়ামত ঘটে গেল।

যাহোক বলা হচ্ছিল কারও মধ্যে উদাসীনতার ভাব থাকলে তার দ্বারা দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করা হয়ে ওঠেনা, তার দ্বারা দ্বীন-ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা হয়ে ওঠে না, সে দ্বীন-ধর্ম ও দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে থাকে। এভাবে তার জীবন শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর কাছে হিসাব-নিকাশ প্রদানের সময় আসন্ন হয়ে পড়ে। তখন আফসূস হয় যে, হায়রে কী করলাম! কিছুই তো করা হল না! অতএব নিজের মধ্যে দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য, নিজের মধ্যে দ্বীন-ধর্ম সঠিকভাবে পালন করার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য এই গাফলত ও উদাসীনতা দূর করতে হবে। গাফলত ও উদাসীনতা দূর করতে হবে, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেতনতা বোধ জাগ্রত করতে হবে।

এখন কথা হল নিজের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেতনতা বোধ জাগ্রত করার জন্য এবং নিজের মধ্য থেকে গাফলত ও উদাসীনতা দূর করার জন্য, তথা গাফলত মুক্ত জীবন গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে কি কি করতে হবে। এজন্য আমাদেরকে বিশেষভাবে পাঁচটা কাজ করতে হবে।

১ নং কাজ হল– বেশী বেশী আখেরাতের ফিকির করতে হবে। অর্থাৎ, কেয়ামত হবে, আল্লাহর কাছে উঠতে হবে, আল্লাহর কাছে জীবনের সবকিছুর জন্য হিসাব দিতে হবে– এই চিন্তা বেশী বেশী করতে হবে। এই চিন্তা করলে নিজের মধ্যে আল্লাহর কাছে হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুতির চিন্তা আসবে, সেই চিন্তা আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। শুধু বিশ্বাস করলাম যে, কেয়ামত হবে, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতির চিন্তা ভিতরে আসল না, তাহলে তা যথেষ্ট নয়। এ জন্যই এক সাহাবী যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেয়ামত কবে হবে? তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উল্টো প্রশ্ন করেছিলেন যে, কেয়ামতের জন্য প্রস্তুতি কতটুকু নিয়েছ? রেওয়ায়েতটি এরকম–

عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ مَا اَعْدَدْتَّ لَهَا؟ قَالَ مَا اَعْدَدْتُّ لَهَا مِنْ كَبِيْرِ صَلٰوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلٰكِنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ. قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ. (متفق عليه — البخاري برقم ٣٦٨٨ ومسلم برقم ٦٨٧٨)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ইয়া রসূলাল্লাহ! কেয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, আমি তার জন্য কিছুই প্রস্তুতি নেইনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এ হাদীছে দেখা গেল কেয়ামত সম্পর্কে একজন প্রশ্ন করায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উল্টো প্রশ্ন করেন যে, কেয়ামতের জন্য প্রস্তুতি কতটুকু নিয়েছ? বোঝা গেল শুধু কেয়ামত সম্পর্কে বিশ্বাস থাকলেই চলবে না, বরং তার জন্য নিজের মধ্যে প্রস্তুতিও থাকতে হবে। যখন এই প্রস্তুতি এসে যাবে, তখন কেয়ামত সম্পর্কে বিশ্বাস কার্যকরী ফল আনয়ন করবে, অর্থাৎ, নিজের মধ্যে আমল আনয়ন করবে।

যাহোক নিজের জীবনের গাফলত ভাংগানোর জন্য এই একটা কাজ করতে হবে যে, বেশী বেশী আখেরাতের ফিকির করতে হবে। এই হল এক নম্বর কাজ।

২ নং কাজ হল– মনের মধ্যে এই চিন্তা সব সময় জাগ্রত রাখতে হবে যে, অন্যায় করলে আল্লাহর কাছ থেকে পার পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না। আমরা আল্লাহর হুকুম থেকে এমনভাবে উদাসীন হয়ে চলছি, আমাদের মতিগতি এবং ভাবখানা হল এমন যেন, আল্লাহ আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারবেন না বা পারলেও আমরা আল্লাহর পাকড়াওকে ডিংগিয়ে চলে যাব কিংবা আমাদের ব্যাপারেও আল্লাহর ভাল সিদ্ধান্ত হবে। এটা আমাদের কত বড় বিভ্রান্তিমূলক মতিগতি। এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ. (সূরা আনকাবূত: ৪)

অর্থাৎ, যারা পাপ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমাকে অতিক্রম করে চলে যাবে? কত মন্দ সিদ্ধান্ত তাদের!

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ. (সূরা জাছিয়া : ২১)

অর্থাৎ, যারা দুষ্কর্ম করে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ঐসব লোকদের মত করব যারা ঈমান আনে ও নেক আমলাদি করে?

যাহোক নিজের জীবনের গাফলত ভাংগানোর জন্য এই আর একটা কাজ করতে হবে যে, অন্যায় করলে আল্লাহর কাছ থেকে পার পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না– এই চিন্তা সব সময় মনের মধ্যে জাগ্রত রাখতে হবে। এই হল দুই নম্বর কাজ।

৩ নং কাজ হল– সর্বদা আল্লাহর যাত তথা আল্লাহর সত্তাকে নিজের চোখের সামনে রাখতে হবে। আমি আল্লাহকে দেখছি, আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন– এই চিন্তা মনের মধ্যে সবসময় জাগ্রত রাখতে হবে। তাহলে গাফলতের যিন্দেগী ছুটবে, তাহলে আমলের কথা চিন্তায় আসবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন পর্যবেক্ষণ করেন, তিনি সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেন, সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের বাইরে কোন কিছু নেই। গাছের একটা পাতা ঝরে পড়বে, তাও তার জানার বাইরে নয়। যদি কোন মানুষের এই বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সবকিছু দেখেন এই এক বিশ্বাসই তার জীবনকে দুরস্ত করে দিতে পারে। মানুষ কোন অপরাধ করতে পারবে না, যদি তার ভিতরে এই বিশ্বাস মজবূত এবং জাগ্রত থাকে যে, আমি যা করছি আল্লাহ পাক তা দেখছেন। মানুষ আইনের চক্ষু ফাকি দিয়ে গোপনে অনেক অন্যায় করে, সে অন্যায় করতে পারে এই ভেবে যে, আইনের লোকজন তাকে দেখছে না। কিন্তু আল্লাহর কাছে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। আল্লাহর কাছে গোপন ও সদর সবই সমান। আমি যদি একশত হাত মাটির তলে যেয়েও কিছু করি,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মঙ্গল গ্রহে যেয়েও কিছু করি আল্লাহ পাক তাও দেখছেন। তাই মু'মিন গোপনেও কোন অপরাধ করতে পারার কথা নয়। কারণ তার বিশ্বাস-আল্লাহ সব অবস্থাতেই সব কিছু দেখেন। যখন মানুষ কোন অপরাধ করে, তখন আল্লাহ তাকে দেখছেন এই ঈমানী বিশ্বাস তার ভিতরে জাগ্রত থাকে না। তার মধ্যে ঈমানী বিশ্বাস জাগ্রত থাকলে সে অপরাধ করতে পারত না। এক হাদীছে বলা হয়েছে,

لَايَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. الحديث. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٢٢١)

সংক্ষেপে হাদীছের অর্থ হল- যার ভিতরে ঈমানী চেতনা জাগ্রত থাকে সে চুরি করতে পারে না, সে যেনা করতে পারে না, সে ডাকাতি করতে পারে না, সে ছিনতাই করতে পারে না, সে শরাব পান করতে পারে না। কারণ তার ভিতরে এই চেতনা জাগ্রত যে, আমার সব কিছু আল্লাহ দেখছেন, আমার সব কিছু আল্লাহর দৃষ্টির সামনে, তাঁর দৃষ্টির অগোচর বলে কিছু নেই, অপরাধ করলে আল্লাহ দেখবেন, শাস্তি দিবেন।

কারও মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত থাকলে কী করে সে অপরাধ করতে পারে? এই বিশ্বাস জাগ্রত থাকলে সে অন্যায় অপরাধ করতে পারবে না, বরং কারও মধ্যে এই বিশ্বাস জাগ্রত থাকলে তার মধ্যে আমলের চিন্তা জাগ্রত হবে, তার গাফলত কাটবে, তার উদাসীনতা ভাংগবে। তাই আল্লাহকে সব সময় নিজের চিন্তা চেতনায় জাগ্রত রাখতে হবে। বুযুর্গানে দ্বীনের হালত এরকম যে, এক বুযুর্গ বলেছেন,

خِيَالُكَ فِيْ عَيْنِيْ وَذِكْرُكَ فِيْ لِسَانِيْ + وَمَثْوَاكَ فِيْ قَلْبِيْ فَاَيْنَ تَغِيْبُ.

অর্থাৎ, তোমার কল্পনা আমার চোখে, তোমার স্মরণ আমার মুখে আর তোমার ঠিকানা আমার অন্তরে, অতএব কীভাবে তুমি আমার থেকে প্রচ্ছন্ন হতে পার?

আল্লাহ পাক আমাকে সব সময় দেখেন– এই চিন্তাকে বলা হয় "মুরাকাবা"। আর আমি সর্বদা আল্লাহকে দেখছি– এই চিন্তাকে বলা হয় "মুশাহাদা"। কুরআন হাদীছের আলোকে বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, নিজের জীবনকে দোরস্ত করার জন্য, নিজের ইবাদত-বন্দেগী সুন্দর করার জন্য নিজের মধ্যে এই মুরাকাবা ও মুশাহাদার হালত পয়দা করতে হবে। বোখারী মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে হযরত জিব্রাঈল (আ.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, ইবাদতকে সুন্দর করার পদ্ধতি কি? তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াবে বললেন যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। তুমি আল্লাহকে দেখতে না পেলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল আমি আল্লাহকে দেখছি এবং তিনি আমাকে দেখছেন এই চিন্তা তথা মুরাকাবা ও মুশাহাদার হালত পয়দা করলে ইবাদত-বন্দেগী সুন্দর হয়। এভাবে গোটা জীবনের সব কাজই সুন্দর হয়।

যাহোক নিজের জীবনের গাফলত ভাংগানোর জন্য এই আর একটা কাজ করতে হবে যে, সর্বদা আল্লাহর যাত তথা আল্লাহর সত্তাকে নিজের সামনে রাখতে হবে। এই হল তিন নম্বর কাজ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

৪ নং কাজ হল– নিজের বয়স বাড়ছে, ধীরে ধীরে আমি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি– এই চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত রাখতে হবে। আমরা নিজেদের বয়স নিয়ে চিন্তা করি না, আমার বয়স বাড়ছে, ধীরে ধীরে আমি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি একথা খুব কার্যকর ভাবে চিন্তা করি না, তাই মনে হয় এখনও অনেক সময় রয়েছে, এখনও আমি অল্প বয়সী একটা মানুষ, এখনও ইবাদত-বন্দেগী করার সময় তেমন হয়নি, ভবিষ্যতে করা যাবে। এভাবে নিজের বয়স নিয়ে চিন্তা না করার কারণে আমলে পিছিয়ে থাকতে হয়। দেখা যায় একজন মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় বা শারীরিকভাবে খুব দূর্বল হয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে বয়স নিয়ে চিন্তা আসে, তখন সে ভাবে ধীরে ধীরে আমি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি, ফলে সে আমল ও ইবাদত-বন্দেগীতে অগ্রসর হতে শুরু করে। বোঝা গেল বয়স নিয়ে চিন্তা বাড়লে এবং মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি এই চিন্তা বাড়লেই আমল বাড়ে এবং উদাসীনতা ভাংগে। বৃদ্ধ হয়ে পড়লে বা শারীরিকভাবে খুব দূর্বল হয়ে পড়লেই যে এই চিন্তা করতে হবে, তার পূর্বে একথা চিন্তা করতে হবে না একথা তো ঠিক নয়। কারণ, একমাত্র বৃদ্ধ হয়ে পড়লে বা শারীরিকভাবে খুব দূর্বল হয়ে পড়লেই যে মানুষ মরে এর পূর্বে মরে না তাতো ঠিক নয়। যে কোন সময় যে কারও মৃত্যু এসে যেতে পারে। তাই প্রত্যেকেরই চিন্তা করা চাই যে, আমার যা বয়স রয়েছে, তার থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বয়স কমে যাচ্ছে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এরূপ চিন্তা করা হয় না বলেই আমাদের মধ্যে আমলের জযবা প্রবল হয় না। এরূপ চিন্তা করা হয় না বলেই আমাদের মধ্য থেকে ছেলেমীপনাও কাটে না, ছেলেমীসুলভ বে-খেয়ালীপনা ও উদাসীনতাও দূর হয় না। সেখ সাদী (রহ.) একথাটিই কত সুন্দর করে বলেছেন,

چہل سال عمرعزیزت گذشت + مزاج تواز حال طفلی نگشت

অর্থাৎ, তোমার প্রিয় জীবনের ৪০ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল, অথচ এখনও তোমার মন মেজাযের ছেলেমীপনা গেল না।

এমন কাজ করা চাই যা দ্বারা বয়স বাড়ার উপলব্ধি হয়। আমরাতো বয়স ঢাকতে চাই। এ জন্য জীবনের শুরু থেকেই বয়স কম বলার মিথ্যায় লিপ্ত হই। আমরা বাচ্চাদেরকেও শিখিয়ে দেই যে, মানুষে জিজ্ঞেস করলে বয়স কম করে বলতে হয়। এর দ্বারা কি মিথ্যা বলার গোনাহ হয় না? যাহোক আমরা যে, বয়স কম বলি তা কেন? বয়স ঢাকা দেয়ার জন্য। এই বয়স ঢাকা দেয়ার জন্যই দাড়ি রাখি না, এই বয়স ঢাকা দেয়ার জন্যই চুল দাড়ি পেকে গেলেও তাতে কলপ লাগাই কিংবা পাকা চুল দাড়িগুলো বেছে বেছে তুলে ফেলি। এই বয়স ঢাকা দেয়ার জন্যই পাশ্চাত্যে অনেকে বৃদ্ধ বয়সে চকচকে রঙ্গের কাপড় পরিধান করে, যাতে তাকে দেখতেও কম বয়সী মনে হয় এবং তার নিজের কাছেও নিজেকে ইয়াং মনে হয়। এই দেখাদেখি আমাদের দেশেও অনেক বুড়া মানুষ এখন চকচকে রঙ্গের কাপড় পরতে শুরু করেছে। অথচ শরীয়তের বিবেচনায় নিজেকে ইয়াং মনে হলে লাভ নেই বরং ক্ষতি। নিজেকে বয়সী মনে হলে মৃত্যুর কথা বেশী স্মরণ হত, পরকালের জন্য প্রস্তুতির কথা বেশী মনে জাগত। নিজেকে বয়সী দেখালে অনেক গোনাহ থেকেও বিরত থাকা যায়। তখন মানুষের সামনে কোন অন্যায় করতে গেলে মনে হয় আমি বয়োজ্যেষ্ট মানুষ, মানুষের সামনে এরকম অন্যায় করা আমার পক্ষে সাজে না, মানুষে কী মনে করবে? এভাবে বয়সী হওয়ার কারণে অনেক গোনাহ থেকেও বিরত থাকা সম্ভব হয়। তাই নিজের বয়স ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা চাই। এতে ফায়দা নেই, বরং ক্ষতি রয়েছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমরা যারা বয়সে বৃদ্ধ হয়েছি, তাদের কি এখনও আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সময় হয়নি? যারা অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তাদেরও কি এখনও আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সময় হয়নি? যারা বৃদ্ধ হইনি কিংবা অসুস্থও নই, কিন্তু যে কোন সময় তাদের মৃত্যু এসে হাজির হতে পারে, তাদেরও কি এখনও আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সময় হয়নি? আমরা কেউ কি এমন আছি, যাদের এখনও আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সময় হয়নি? কুরআনে কারীমে সূরা হাদীদের এক স্থানে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসার সূরে বলেছেন,

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ. (সূরা হাদীদ: ১৬)

এ আয়াতের ভাবার্থ হল– মু'মিনদের কি এখনও সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং কুরআনের কথা মানার জন্য তাদের অন্তর নরম হবে? তারা যেন পূর্ববর্তী কিতাবীদের মত না হয়, যাদের দীর্ঘ বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তর কঠিনই রয়ে গিয়েছিল।

এ আয়াতের বক্তব্য একটু গভীর চিন্তা সহকারে বারবার চিন্তা করে দেখতে হবে। হতে পারে দেলের মধ্যে এর আছর পড়বে। একটা ঘটনা শুনুন। হযরত ফুযায়ল ইবনে ইয়ায (রহ.)-এর নাম আমরা অনেকে শুনেছি। তিনি অতি উঁচু দরজার বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর পীর ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ডাকাতের সর্দার ছিলেন। একবার ডাকাতির উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি এই আয়াত তেলাওয়াত করছে,

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ.

অর্থাৎ, মু'মিনদের কি এখনও সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং কুরআনের কথা মানার জন্য তাদের অন্তর নরম হবে? তাদের অন্তর যেন কঠিন থেকে না যায়! এ আয়াত শোনার সাথে সাথে হযরত ফুযায়ল ইবনে ইয়াজের মধ্যে অদ্ভুত আছর হল। তিনি বলে উঠলেন,

آنَ وَحَانَ وَانَابَ.

অর্থাৎ, হাঁ সময় এসে গেছে, সময় হয়ে গেছে, বান্দা ফিরে এসেছে!

এরপর তিনি ডাকাতী ছেড়ে দিয়ে গভীর ভাবে ইবাদত-বন্দেগী এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হলেন, জগদ্বিখ্যাত এক বযুর্গে পরিণত হলেন। তাই আমাদেরও স্মরণ করা চাই আমাদের কি এখনও সময় আসেনি? এই আয়াতখানার ভাবার্থ নিয়ে আমাদেরও চিন্তা করা চাই। হতে পারে এটা নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের মধ্যেও কারও কারও মনের ভিতর আছর করবে, মনের মধ্যে দাগ কাটবে, যেমন হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহ.)-এর মধ্যে আছর করেছিল, তার মনের মধ্যে দারুণভাবে দাগ কেটেছিল।

হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহ.)-এর ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ একটা শিক্ষণীয় হল– মানুষ যত খারাপই হোক সে ইচ্ছা করলে ভাল হতে পারে। সে ইচ্ছা করলে এবং মেহনত করলে আল্লাহ পাক তাকে উঁচু মর্যাদায় উন্নীত করেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

যাহোক নিজের জীবনের গাফলত ভাংগানোর জন্য এই আর একটা কাজও করতে হবে। নিজের জীবনের সময় নিয়ে চিন্তা করতে হবে, চিন্তা করতে হবে যে, আমার সময় বাড়ছে না বরং কমছে, চিন্তা করতে হবে যে, আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। চিন্তা করতে হবে যে, আমার কি এখনও ভাল হওয়ার সময় হয়নি, আমার কি এখনও আল্লাহর স্মরণের দিকে ফিরে আসার সময় হয়নি? একথাগুলি বেশী বেশী চিন্তা করা চাই। এই হল চার নম্বর কাজ।

৫ নং কাজ হল– নিজের আমলের হিসাব-নিকাশ নিতে হবে যে, আমার আমল বাড়ছে না কমছে, দ্বীনী লাইনে আমার উন্নতি হচ্ছে বা অবনতি হচ্ছে। হিসাব নিকাশ না থাকলে কোন লাইনে কেউ উন্নতি করতে পারে না। কোন হিসাব নিকাশ ছাড়া উন্নতি করতে চাইলে তাকে মানুষ বুদ্ধিমান বলবেনা বরং পাগল বলবে। যেমন কোন ব্যবসায়ী যদি আয়-ব্যয়, উন্নতি অবনতি কোনটার হিসাব না রাখে, এলোমেলো ব্যবসা চালাতে থাকে আর উন্নতি কামনা করতে থাকে, তাহলে মানুষে তাকে বলবে একটা আস্ত পাগল! তদ্রূপ দ্বীনী লাইনেও উন্নতি চাইলে হিসাব-নিকাশ থাকতে হবে যে, আমার আমল বাড়ছে না কমছে, দ্বীনী লাইনে আমার উন্নতি হচ্ছে বা অবনতি হচ্ছে। হিসাব-নিকাশ ছাড়া উন্নতি চাইলে সেটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না। বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, প্রতিদিন একবার নিজের সাথে এরকম হিসাব-নিকাশ করে দেখতে হবে। এটাকে বলা হয় "মুহাছাবা" অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশ নেয়া। এভাবে হিসাব-নিকাশ করলে যিন্দেগীর ভুল-ত্রুটিগুলো সামনে আসবে এবং তা সংশোধন করা সহজ হবে। এভাবে হিসাব-নিকাশ করলে যিন্দেগীর অবনতিগুলো সামনে আসবে এবং তা থেকে উন্নতি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা সহজ হবে।

যাহোক এই পাঁচটা বিষয় বলা হল। এই পাঁচটা বিষয়ের ব্যাপারে যত্নবান হলে ইনশাআল্লাহ জীবনের গাফলত ভাংগবে, উদাসীনতার যিন্দেগী থেকে উঠে আসা সম্ভব হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গাফলত মুক্ত জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন, উদাসীন যিন্দেগী পরিহার করার তাওফীক দান করুন, আখেরাত থেকে বে-পরওয়া যিন্দেগী বর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৪২

পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন গড়া চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মু'মিন মুসলমানের জীবন হতে হবে পবিত্র জীবন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন। মু'মিন মুসলমানের জাহের তথা বাহ্যিক অবস্থাও পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই, তার বাতেন তথা আভ্যন্তরীণ অবস্থা বা অন্তরও পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। মু'মিন মুসলমানের জাহের বাতেন সবই পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই।

জাহের পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার অর্থ হল শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি পাক সাফ রাখা। এজন্যই ইসলামে ইস্তেঞ্জা, উযূ, গোসল, ঘরের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির বিধান দেয়া হয়েছে। আর বাতেন বা অন্তর পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার অর্থ হল মনকে শিরক ও কুফরের চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা, অন্যায় ও পাপের চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ইত্যাদি কলুষতা থেকে পবিত্র রাখা। এভাবে মু'মিন মুসলমানের জীবন হবে পবিত্র জীবন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন। মু'মিন মুসলমানের জীবনে শারীরিক ও আত্মিক সবরকম পবিত্রতা থাকতে হবে। যদি কখনও শরীর অপবিত্র হয়ে যায়, তাহলে শরীরকে পবিত্র করে নিতে হবে। যদি পোশাক-পরিচ্ছদ অপবিত্র হয়ে যায়, তাহলে পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করে নিতে হবে। যদি ঘর-বাড়ি ময়লা ও নোংরা হয়ে যায়, তাহলে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে। ঘর-বাড়ির আশ-পাশ নোংরা হলেও তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে। যদি মন অপবিত্র হয়ে যায়, তাহলে মনকে পবিত্র করে নিতে হবে। এভাবে জাহের বাতেন যেটাই অপবিত্র বা অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, সেটাকে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে।

মু'মিন মুসলমানের জীবনে এই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি হাদীছে এই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে মু'মিন মুসলমানের জীবনের অর্ধেক অংশ বলা হয়েছে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٥٥٦)

অর্থাৎ, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

ইসলামের যত বিধি-বিধান আছে তা দুই ধরনের। কিছু আছে নেক আমল, যা করার বিষয়। আর কিছু আছে গোনাহের কাজ, যা বর্জন করার বিষয়। গোনাহের কাজ করলে মন অপবিত্র হয়ে যায়। অতএব মনকে পবিত্র রাখতে হলে গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এই গোনাহের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

কাজ থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ, গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা হল ইসলামী বিধি-বিধানের অর্ধেক। অতএব পবিত্রতা হল মু'মিন মুসলমানের জীবনের অর্ধেক।

শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঘর-বাড়ি অপবিত্র বা অপরিচ্ছন্ন কিভাবে হয়, তা আমরা সহজে বুঝি এবং তা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পদ্ধতিও আমরা জানি। কিন্তু মন বা অন্তর কিভাবে অপবিত্র বা অপরিচ্ছন্ন হয় তা আমরা সহজে বুঝি না, সেটাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার পদ্ধতিও আমরা সাধারণভাবে জানি না। এ কারণে মনকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার ব্যাপারে আমাদের যত্নও খুব কম। তাই মন বা অন্তর কিভাবে অপবিত্র হয় এবং তা থেকে মনকে পবিত্র করার পদ্ধতি কি এ সম্পর্কে জানাটাও আমাদের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গোনাহ করলে অন্তরের উপর কালো দাড় পড়ে যায়, এভাবে অন্তর অপবিত্র বা অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি গান্ধা চিন্তা দ্বারাও অন্তর গান্ধা বা অপবিত্র হয়ে যায়। তখন তওবা করে নিলে আবার মন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। অতএব গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরের ক্ষতির চিন্তা ইত্যাদি থেকেও মনকে পবিত্র রাখা তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। তাই গোনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি সম্পর্কেও কুরআন হাদীছে বিধান এসেছে, গান্ধা চিন্তা-চেতনার অপবিত্রতা থেকেও মনকে পবিত্র রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। গোনাহ থেকে অন্তরকে পবিত্র করতে হবে তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে, আর হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি অন্তরের নোংরামী থেকে অন্তরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে হবে যিকির-আযকার, তাকওয়া, আখেরাতের ফিকির ইত্যাদির মাধ্যমে।

এ গেল অন্তরকে পবিত্র করার পদ্ধতি। অন্তরকে পবিত্র করার গুরুত্ব বেশী, তবে শুধু অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও ইসলাম অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুন নতুন দামী দামী পোশাক পরিধান করতে হবে– এ নির্দেশ দেয়া হয়নি, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘর-বাড়ি বিল্ডিং হতে হবে, মোজাইক বা টাইলসের হতে হবে তা বলা হয়নি, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বলা হয়েছে হয়েছে। এমনকি ঘর-বাড়ির আশ-পাশকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বলা হয়েছে হয়েছে। হাদীছে এসেছে–

نَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ. (رواه الترمذي برقم ٢٧٩٩ وقال : حديث غريب)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের ঘরের আশ-পাশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ।

অতএব এ হাদীছের আলোকে বোঝা গেল ঘরের আশ-পাশের রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের দায়িত্ব। যদিও আমরা এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি মিউনিসিপলিটির উপর। মিউনিসিপলিটির লোকজন পরিষ্কার করলে করবে নতুবা আমাদের বাড়ির আশ-পাশ নোংড়া হয়ে থাকলেও আমরা তা পরিষ্কার করার কোন উদ্যোগ নেই না। যদিও আমাদের যুক্তি থাকতে পারে যে, আমরা মিউনিসিপলিটিকে ট্যাক্স দেই, অতএব তাদের দায়িত্ব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। কিন্তু মিউনিসিপলিটি না করলে এ হাদীছের আলোকে অন্তত নিজেদের ঘরের আশ-পাশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা তো আমাদের কর্তব্য।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমরা অনেকে নিজেদের বাড়ির ময়লা-আবর্জনা অন্যের বাড়ির সামনে নিয়ে ফেলে রেখে আসি। নির্ধারিত ডাস্টবিন দূরে থাকলে অনেকেই ডাস্টবিন পর্যন্ত যাওয়ার কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এরূপ করে থাকি। এটা অন্যায়। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া মু'মিনের চরিত্র হতে পারে না। হাদীছে বলা হয়েছে প্রতিবেশীর হক বা অধিকার রয়েছে যে, আমি তাকে আমার ময়লা-আবর্জনার দূর্গন্ধ দ্বারা কষ্ট দিব না।

এভাবে মু'মিনের জাহের বাতেন, ভিতর বাহির সব পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুমিনের জাহের বাতেন তথা ভিতর বাহির সব থাকবে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মু'মিনের জীবন হবে জান্নাতী জীবন। জান্নাত হল সব রকম ময়লা ও নোংরামী থেকে পবিত্র। এমনকি জান্নাতের নারী বা জান্নাতের হূরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদের নাকের ময়লা থাকবে না, চোখের ময়লা থাকবে না, তাদের কফ থুতু থাকবে না। জান্নাতে মানুষের মনের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ থাকবে না, কোন রূপ মনের কলুষতা থাকবে না। বোঝা গেল জান্নাত হল সব রকম ময়লা ও নোংরামী থেকে পবিত্র। অতএব জান্নাতী মানুষের তথা মুমিনের যিন্দেগীতেও কোন রূপ নোংরামী, কোনরূপ অপবিত্রতা থাকতে পারে না। তাদের জীবন হবে জান্নাতী জীবন অর্থাৎ, সব রকম ময়লা ও নোংরামী থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন। এর বিপরীত অপবিত্র যিন্দেগী হল জাহান্নামী যিন্দেগী। জাহান্নাম থাকবে সব রকম অপরিচ্ছন্নতায় ভরা। মানুষের পঁচা দূর্গন্ধ রক্ত পূঁজ দিয়ে জাহান্নাম ভরা থাকবে। অতএব অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন থাকা হল জাহান্নামী মানুষের গুণ।

এ কারণেই যারা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালবাসেন। কারণ, তারা জান্নাতী মানুষের গুণ অর্জন করেছে। আর আল্লাহ তাআলা এরূপ লোকদেরকে ভালবাসেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. (সূরা বাকারা: ২২২)

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যারা তওবা করে গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয় এবং উযূ গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যায়। যারা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

যারা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাদেরকে ফেরেশতারাও ভালবাসে। ফেরেশতারা হল পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার অধিকারী। তাই তারা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষকে ভালবাসে। এর বিপরীত শয়তান হল গান্ধা ও নোংরা, তাই অপবিত্র ও নোংরা মানুষকে শয়তান বেশী ভালবাসে। যারা যত বেশী নোংরা ও অপবিত্র থাকে, তাদের সাথে শয়তানের সম্পর্ক তত বেশী হতে থাকে। এর বিপরীত যারা যতবেশী পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাদের সাথে শয়তানের দূরত্ব ততবেশী বাড়তে থাকে, তাদের সাথে ফেরেশতাদের নৈকট্য ততবেশী বাড়তে থাকে।

বোঝা গেল পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার মৌলিক তিনটি ফায়দা রয়েছে। যথা:-

১. এর দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা লাভ হয়।

২. এর দ্বারা ফেরেশতাদের ভালবাসা লাভ হয়।

৩. এর দ্বারা শয়তানের সাথে দূরত্ব বাড়ে, যার ফলে শয়তানের ওয়াছওয়াছা কম হয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

শয়তানরা অপবিত্র ও নোংরা স্থানকে পছন্দ করে বলেই ইস্তেঞ্জাখানা তথা পেশাব-পায়খানার স্থান হল শয়তানদের আড্ডাখানা। কারণ, পেশাব-পায়খানার স্থান সব সময় গান্ধা ও অপবিত্র থাকে। এজন্য পেশাব-পায়খানার স্থান তাদের কাছে প্রিয়। তাই পেশাব-পায়খানার স্থান হল তাদের আড্ডাখানা। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ. الحديث. (رواه ابو داود في سننه برقم ٦ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, এই পশাব-পায়খানার স্থানগুলো হল জিন-শয়তানদের আড্ডাখানা।

তাই ইস্তেঞ্জাখানায় প্রবেশ করার সময় পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ١٤٢)

এই দুআটির অর্থ হল- হে আল্লাহ! আমি খবীছ পুরুষ জিন ও খবীছ নারী জিনদের থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

ইস্তেঞ্জাখানায় প্রবেশ করার সময় যখন এই দুআ পড়া হয়, তখন ইস্তেঞ্জাখানায় অবস্থানকারী শয়তান ও সেই প্রবেশকারীর মধ্যে একটা পর্দা পড়ে যায়; ফলে সে ঐ প্রবেশকারীকে দেখতে পায় না। আর এই দুআটি না পড়লে তারা ঐ প্রবেশকারীকে দেখতে পায়। তার গোপন অঙ্গ, লজ্জার স্থানও তাদের সামনে খুলে যায়। ফলে ঐ প্রবেশকারী তাদের কাছে ক্রিড়নকে পরিণত হয়। খেলনায় পরিণত হয়। ঐ শয়তানদের কাছে তার গাম্ভীর্য ও ওজন কমে যায়। আর যখন তার ওজন ও গাম্ভীর্য কমে যায়, তখন তাকে নিয়ে তারা যেমন ইচ্ছা তেমন খেলতে পারে, যেমন ইচ্ছা তাকে ধোকা দিতে পারে।

শয়তান অপবিত্রতা পছন্দ করে, পবিত্রতাকে পছন্দ করে না। এ জন্যই যারা সর্বদা উযূর সাথে থাকেন অর্থাৎ, পবিত্র থাকেন, তাদের কাছে শয়তান কম আসে, ফলে তাদের মনে শয়তানের ওয়াছওয়াছা কম হয়। যারা পবিত্র থাকে, শয়তানের কাছে তাদের মনের পরিবেশটা পছন্দনীয় লাগে না। উযুর কারণে মানুষের গোনাহ ধুয়ে যায়, উযূর দ্বারা মানুষ গোনাহ থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, আর এ অবস্থায় শয়তান যখন ওয়াছওয়াছা দেয়ার জন্য তাদের ভিতর প্রবেশ করে, প্রবেশ করে দেখে ভিতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তখন সেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তার কাছে ভাল লাগে না। তখন সেখানে থাকতে তার অপছন্দ লাগে। ফলে সেখানে সে ফূর্তির সাথে থাকতে পারে না। এজন্য উযূর সাথে থাকলে শয়তানের ওয়াছওয়াছা কম হয়। শয়তান মানুষের রগ রেশার ভিতর ঢুকতে পারে। হাদীছে এসেছে শয়তান মানুষের রগ রেশা দিয়ে চলাচল করতে পারে। যাহোক উযূ থাকা অবস্থায় মানুষের ভিতর ঢুকলে শয়তানের ভাল লাগেনা। উযূ অবস্থায় থাকলে মানুষ শয়তানের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে ওঠে।

একবার বনী ইরসাঈলের এক ব্যক্তির সাথে শয়তানের দেখা হল। ঐ ব্যক্তি শয়তানকে জিজ্ঞাসা করল কোন্ আমল করলে তোমার কাছে বেশী প্রিয় হওয়া যায়? শয়তান বলল, বেশী অপবিত্র অবস্থায় থাকলে আমার কাছে প্রিয় হওয়া যায়। তখন লোকটা বলল, তাহলে আমি কসম করলাম আর কখনও অপবিত্র থাকবানা। তখন শয়তান বলল, আমিও কসম করলাম বনী আদমকে আর কখনও নসীহত করতে যাব না। শয়তানের কসম তো শয়তানেরই কসম। এই কমসও সে ভঙ্গ করেছে। এর পরও সে বনী আদমের সাথে সাক্ষাত করেছে এবং বনী আদমকে নসীহত করেছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যাহোক বলা হচ্ছিল পবিত্র অবস্থায় থাকলে, উযূ অবস্থায় থাকলে মানুষ শয়তানের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে ওঠে। এর বিপরীত উযূর সাথে থাকলে ফেরেশতাদের কাছে সে পছন্দনীয় থাকে, ফলে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সে দুআ পেতে থাকে। কেউ উযূর সাথে ঘুমালে ঘুমের মধ্যে যতবার সে নড়াচড়া করে ফেরেশতারা তার জন্য দুআ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা উযূর সাথে ঘুমিয়েছে, তাই তার জন্য তুমি কল্যাণের ফয়সালা কর, মঙ্গলের ফয়সালা কর।

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ اِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ فَاِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. (رواه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١٠٣٧)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় রাত্র যাপন করে, তার সাথে একজন ফেরেশতা রাত্র যাপন করে। সে ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই ফেরেশতা তার জন্য দুআ করে বলে হে আল্লাহ! তুমি তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা সে পবিত্র অবস্থায় রাত্র যাপন করেছে।

উযূর সাথে থাকলে ফেরেশতাদের কাছে পছন্দনীয় থাকা যায় বলে উযূর সাথে ঘুমালে ভাল স্বপ্ন দেখা যায়। কারণ ভাল স্বপ্ন ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই পবিত্র অবস্থায় এবং উযূর সাথে ঘুমালে বেশীর ভাগ স্বপ্ন ভাল হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে অপবিত্র অবস্থায় ঘুমালে, বে-উযূর সাথে ঘুমালে বেশীর ভাগ স্বপ্ন খারাপ হয়ে থাকে।

পবিত্র থাকলে এবং উযূর সাথে থাকলে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে দিলের মধ্যে ভাল ভাল চেতনা, নেক কাজের চেতনা আসতে থাকে, আর অপবিত্র অবস্থায় থাকলে, বে-উযূর সাথে থাকলে মনের মধ্যে বেশী বেশী খারাপ কাজের চেতনা, গোনাহের চেতনা আসতে থাকে। আর দিলের মধ্যে ভাল চেতনা, নেক কাজের চেতনা আসলেই মানুষ ভাল হতে পারে, নতুবা ভাল হতে পারে না। অতএব বোঝা গেল সর্বদা পবিত্র থাকা এবং উযূর সাথে থাকা জীবন গড়ার জন্য অনেক উপকারী জিনিস। এটা অনেক বড় ধরনের একটা আমল।

বুযুর্গানে দ্বীন তাই সব সময় উযূর সাথে থাকেন এবং থাকতে বলেন। তাহলে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় থাকার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে দিলের মধ্যে ভাল ভাল চেতনা, নেক কাজের চেতনা আসতে থাকবে, ফেরেশতাদের কাছে পছন্দনীয় থাকার কারণে তাদের পক্ষ থেকেও দিলের মধ্যে ভাল ভাল চেতনা, নেক কাজের চেতনা মনের মধ্যে আসতে থাকবে। পক্ষান্তরে শয়তানের সাথে সম্পর্ক কমবে, ওয়াছওয়াছা কম হবে এবং পাপের চেতনা কম জাগ্রত হবে।

তবে উযূ খুব সুন্দর ভাবে করা চাই। সুন্নাত তরীকা মোতাবেক করা চাই। গোসলও সুন্দরভাবে সুন্নাত তরীকা মোতাবেক হওয়া চাই। শুধু দামী সাবান দিয়ে বেশী বেশী পানি ঢেলে গোসল করলেই সুন্দর গোসল হয় না। গোসল সুন্দর হয় সুন্নাত তরীকা মোতাবেক গোসল করলে।

সুন্নাত তরীকা মোতাবেক উযূ করার মধ্যে মেসওয়াক সহকারে উযূ করাও অন্তর্ভুক্ত। মেসওয়াক সহকারে উযূ হওয়া চাই। মেসওয়াকের ব্যাপারে শরীয়তে অনেক ফযীলত এবং অনেক তাগিদ এসেছে। এক হাদীছে মেসওয়াকের ফযীলত বয়ান করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِيْ لَا يَسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا. (رواه البيهقى فى شعب الايمان فى فضل الوضوء. حديث رقم ٢٧٧٤)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, যে নামাযের জন্য মেসওয়াক করা হয় তার ফযীলত ঐ নামাযের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী, যে নামাযের জন্য মেসওয়াক করা হয় না। অর্থাৎ, মেসওয়াক সহকারে নামায পড়লে সত্তর গুণ ছওয়াব পাওয়া যায়।

আর এক হাদীছে মেসওয়াকের গুরুত্ব বয়ান করে ইরশাদ হয়েছে,

لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلٰوةٍ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, যদি না আমি আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলব মনে করতাম, তাহলে তাদেরকে (ফরয হিসেবে) প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার আদেশ করতাম।

আর এক হাদীছে মেসওয়াকের গুরুত্ব বয়ান করে ইরশাদ হয়েছে,

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالسِّوَاكِ حَتّٰى خِفْتُ عَلٰى اَضْرَاسِيْ. (رواه البيهقي في المعجم الكبير برقم ٥١٠)

অর্থাৎ, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে সর্বদা এত বেশী বেশী মেসওয়াক করতে বলেন যে, আমার দাঁতের মাড়ির ব্যাপারে আশংকা হয় (যে, মেসওয়াক করতে করতে আমার দাঁতের মাড়ি খসে পড়ে কি না)।

রেওয়ায়েতে এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাঁচটা বিষয়ে হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে বেশী বেশী গুরুত্ব সহকারে বলেছেন। সেই পাঁচটা বিষয়ের একটা হল এই মেসওয়াকের বিষয়। আর অবশিষ্ট চারটার মধ্যে একটা হল প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকা। হাদীছে এসেছে–

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. (صحيح البخاري برقم ٦٠١٤)

অর্থাৎ, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে সর্বদা প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে এত বেশী তাগিদ দেন যে, আমার মনে হয় অচিরেই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হবে।

আর একটা হল–

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْمَمْلُوْكِيْنَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيَجْعَلُ لَهُمْ حَدًّا. (رواه في إتحاف الخيرة برقم ٥٠٧٧)

অর্থাৎ, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে সর্বদা গোলাম দাসীদের ব্যাপারে এত বেশী তাগিদ দেন যে, আমার মনে হয় অচিরেই গোলাম বাদীদের আযাদ হওয়ার সময় নির্ধারণ করে দিবেন।

চিন্তা করে দেখুন ইসলাম গোলাম-বাদীদের ব্যাপারে কতটা ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। অনেকে ইসলামের গোলাম প্রথার সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু তারা চিন্তা করে দেখেনা যে, যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে দূর্বল করার জন্য এবং প্রতিপক্ষের শক্তিকে পঙ্গু করার জন্য এই সাময়িক পন্থা হিসেবে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে ধরে রাখা অর্থাৎ, যারা গোলাম বাদী হয়েছে তাদেরকে চিরকাল গোলাম বাদী রাখার মত পাকাপোক্ত ব্যবস্থা ইসলাম রাখেনি। তাইতো তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে বলা হয়েছে যে, ব্যবহারে তারা মুগ্ধ হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়ে যাবে। আবার সাথে সাথে গোলাম আযাদ করার বহু ছওয়াব বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন আমলে গোলাম আযাদ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাতে এভাবে ধীরে ধীরে গোলামরা আর গোলাম থাকবে না বরং আযাদ হয়ে যাবে। যাহোক সেই পাঁচটা বিষয়ের....

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আর একটা হল নারীদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকা। হাদীছে এসেছে–

مَا زَالَ يُوْصِيْنِيْ بِالنِّسَاءِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُحَرِّمَ طَلَاقُهُنَّ. (رواه في إتحاف الخيرة برقم ٥٠٧٧)

অর্থাৎ, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে সর্বদা এত বেশী বেশী নারীদের অধিকারের ব্যাপারে তাগিদ দেন যে, আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত নারীদেরকে তালাক দেয়াও নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। অর্থাৎ, তাদেরকে এতটা অধিকার দেয়া হবে যে, পুরুষ তাদেরকে তালাকও দিতে পারবে না, তাদের ইচ্ছা হয় থাকবে ইচ্ছা হয় না থাকবে, স্বামী চাইলেও স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে না।

আর একটা হল তাহাজ্জুদের যত্ন নেয়া। হাদীছে এসেছে–

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّ خِيَارَ اُمَّتِيْ لَنْ يَنَامُوْا اِلَّا قَلِيْلًا. (رواه الديلمي عن انس. كذا في جامع الأحاديث برقم ٢٠٠٨٦)

অর্থাৎ, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে সর্বদা এত বেশী বেশী তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে তাগিদ দেন যে, আমার মনে হয় এই তাগিদ জানার পর আমার উম্মতের ভাল লোকেরা কেউ আর রাতে ঘুমাবেনা বরং জেগে জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে থাকবে।

যাহোক বলা হচ্ছিল– উযূ মেসওয়াক সহকারে হওয়া চাই, উযূ গোসল সুন্নাত তরীকা মোতাবেক হওয়া চাই। সর্বদা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই। সর্বদা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে অনেক ফায়দা। যেমন:–

* এর দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা লাভ হয়।
* এর দ্বারা ফেরেশতাদের ভালবাসা লাভ হয়।
* এর দ্বারা শয়তানের সাথে দূরত্ব বাড়ে, যার ফলে শয়তানের ওয়াছওয়াছা কম হয়, পাপের চেতনা কম জাগ্রত হয়।
* এর দ্বারা দুঃস্বপ্নের পরিমাণ কমে আসে।
* এর দ্বারা ফেরেশতাদের সাথে নৈকট্য বাড়ে, ফলে তাদের পক্ষ থেকে মনের মধ্যে ভাল ভাল চেতনা উদয় হয়, নেক কাজের চেতনা উদয় হয়।
* এর দ্বারা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা যায়।
* এর দ্বারা ফেরেশতাদের দুআ পাওয়া যায়।

অতএব পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক– এই কথাকে সামনে রেখে এবং পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এই সব ফায়দাকে সামনে রেখে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন গড়ে তোলা চাই। আমরা যেন পবিত্র জীবন গড়ে তুলি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যিন্দেগী গড়ে তুলি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং – ৪৩

জীবনের লেন-দেন দোরস্ত করা চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত কয়েক জুমুআয় আমরা গোনাহমুক্ত জীবন, সুদ-ঘুষমুক্ত জীবন, সন্দেহমুক্ত জীবন, গাফলতমুক্ত জীবন এবং পবিত্র জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। জীবনকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন গড়ে তোলা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন গড়ে তোলার জন্য জীবনের মুআমালা তথা লেন-দেনও দোরস্ত হওয়া চাই। মুআমালা অর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, কায়-কারবার ইত্যাদি। একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ খাঁটি মুসলমান হতে হলে তার ঈমান, আমল যেমন ঠিক হওয়া চাই, তার ইবাদত-বন্দেগী যেমন ঠিক হওয়া চাই, তার মুআশরা তথা আচার-আচরণ যেমন ঠিক হওয়া চাই, তার আখলাক-চরিত্র যেমন ঠিক হওয়া চাই, তেমনিভাবে তার মুআমালা তথা ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, কায়কারবার ইত্যাদিও ঠিক হওয়া চাই।

লেন-দেন অর্থ নেওয়া এবং দেওয়া। যেমন ক্রেতা মাল নেয় এবং মূল্য দেয়। বিক্রেতা মাল দেয় এবং মূল্য নেয়। এই হল লেন-দেন। শ্রমিক ও দিন মজুর কাজ দেয় এবং পারিশ্রমিক নেয়। অফিস-আদালত বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যারা চাকুরী করে, তাদের মধ্যে এবং চাকুরী দাতাদের মধ্যেও লেন-দেন হয়। চাকুরীজীবী তার মেধা ও শ্রম দেয় এবং বেতন/ভাতা নেয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ চাকুরীজীবীর মেধা ও শ্রম নেয় এবং তাকে বেতন/ভাতা দেয়। এভাবে তাদের মধ্যে লেন-দেন হয়। আমরা অনেক সময় পরস্পরে একে অপর থেকে ছুরি, চাকু, দা, বটি, শাবল, কোদাল, টুকরি, কলম, বই-পত্র ইত্যাদি অনেক কিছু পরে ফেরত দেয়ার শর্তে আরিয়াত বা ধার স্বরূপ নিয়ে থাকি, এটাও মুআমালা বা লেন-দেন। এভাবে যত ধরনের লেন-দেন আছে, সব ধরনের লেন-দেনের ক্ষেত্রে ইসলাম সততার সাথে লেন-দেন করাকে ওয়াজিব করেছে। লেন-দেনে যারা ত্রুটি করে তাদের জন্য কুরআন হাদীছে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ.

অর্থাৎ, দুর্ভোগ ঐসব লোকদের জন্য যারা মানুষ থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরোপুরি নেয়, আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (সূরা মুতাফফিফীন)

এখানে সব ধরনের লেন-দেনে ত্রুটিকারীদের জন্য শাস্তির দুঃসংবাদ শোনানো হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ মাপ এবং ওজনে ত্রুটির কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই ত্রুটির কথা উল্লেখ করার পর তাদের শাস্তির হুমকী দিয়ে বলা হয়েছে।

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. (প্রাগুক্ত)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, তারা কি জানে না যে, তাদেরকে এক মহা দিনে পুনরুত্থিত করা হবে যেদিন মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে।

এ আয়াতে লেন-দেনে ত্রুটিকারীদেরকে ভয়াবহ কেয়ামতের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে তাদেরকে শাস্তির ধমকী প্রদান করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

মালে ত্রুটি থাকলে বলে দিতে হবে নতুবা এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তার জন্য প্রযোজ্য হবে। ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত হাদীছে এসেছে,

مَنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُبَيِّنْ عَيْبَهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللهِ اَو قال لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ. (رواه في المعجم الكبير برقم ١٥٧ وسنده ضعيف)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মাল বিক্রি করবে অথচ তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে দিবে না, তাহলে সে সর্বদা আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে থাকবে এবং ফেরেশতারা সর্বদা তাকে লানত করতে থাকবে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যেমন বড় ইমাম ছিলেন, তেমনি বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন। কুফায় তাঁর ব্যবসা ছিল। এই ব্যবসার মধ্যে একটা ব্যবসা ছিল কাপড়ের। একবার তার নিকট কাপড়ের একটা গাট্টি এল, যার মধ্যে একটা কাপড়ে ত্রুটি ছিল। তিনি তার দোকানের কর্মচারীকে বলে রেখেছিলেন, এই কাপড়টায় ত্রুটি আছে, অতএব এটা বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে বলে দিবে যে, এই কাপড়টায় ত্রুটি আছে। এরপর একদিন তিনি দোকানে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই কাপড়টা কি বিক্রি হয়েছে? দোকানের কর্মচারী জানাল জি হুজুর! সেটা বিক্রি হয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ক্রেতাকে কি কাপড়টার দোষ সম্পর্কে অবহিত করেছিলে? সে জবাব দিল, জি না হুজুর! বলতে ভুলে গেছি। তখন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অত্যন্ত রাগ করলেন এবং বললেন, যাও সে কোথায় থাকে খুঁজে বের কর। অনেক তালাশ করার পর তার ঠিকানার সন্ধান পাওয়া গেল। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) নিজে তার কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, আপনি আমার দোকান থেকে একটা কাপড় কিনেছিলেন, কাপড়টায় ত্রুটি ছিল, কিন্তু দোকানী সেটা বলতে ভুলে গেছে। মালটা আপনি যে মূল্যে কিনেছিলেন, আসলে মালটায় ত্রুটি থাকার কারণে তার দাম আরও কম হবে। এখন আপনার ইচ্ছা– হয় আপনি মালটা ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নিতে পারেন বা যেটুকু বেশী মূল্য নেয়া হয়েছে তা আমি ফেরত দিয়ে দেই কিংবা যা আপনার ইচ্ছা। লোকটি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সততা দেখে মুগ্ধ হল এবং বলল, আমি মালও ফেরত দিব না বেশী মূল্যটুকুও ফেরত নিব না।

দেখা গেল সততার কারণে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ক্ষতিগ্রস্ত হলেন না বরং লাভবান হলেন। প্রথম থেকেও যদি কোন বিক্রেতা তার মালের দোষ-ত্রুটি বলে দিয়ে কিছুটা মূল্য কম নেয়, তাতেও বাহ্যিকভাবে তার কিছুটা লাভ কম হয়েছে দেখা গেলেও চূড়ান্তভাবে তার লাভই হয়। কারণ, এরূপ করলে তার প্রতি ক্রেতার আস্থা বেড়ে যায় এবং তার কাছে ঐ ক্রেতা আবারও আসে এবং আপনজন অনেককে সেই দোকানের সন্ধান দেয় যে, অমুক দোকানে যাও, সেই দোকানী খুব সৎ, তার কাছে গেলে ঠকতে হয় না। এভাবে তার পুরনো ক্রেতা রিজার্ভ থাকে, নতুন ক্রেতার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এতে করে সে ভবিষ্যতে আরও লাভবান হয়। পক্ষান্তরে একদিন মালের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে কিছু বেশী লাভ করলেও ভবিষ্যতে ঐ ক্রেতা যখন বুঝতে পারে যে, তাকে ঠকানো হয়েছে, তাকে প্রতারিত করা হয়েছে, তখন সে আর ঐ দোকানে ফিরে আসে না, আপনজনকেও সেখানে যেতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বারণ করে। এভাবে তার ব্যবসার ভবিষ্যত খারাপ হয়ে পড়ে। তাই দেখা গেল বিক্রেতা তার মালের দোষ-ত্রুটি বলে দিলে তার ক্ষতি হয় না বরং লাভ হয়, বরকত হয়। তদ্রূপ ক্রেতাও তার মুদ্রায় কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা বলে দিলে তারও বরকত হয। তাই এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٠٧٩)

অর্থাৎ, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যদি সত্য বলে এবং দোষ-ত্রুটি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মোচন হয়ে যাবে।

অতএব যারা ভেজাল নকল মাল বিক্রি করে এবং মনে করে যে, এতে তারা বেশী লাভবান হচ্ছে, এটা তাদের ভুল ধারণা। এতে তারা বেশী লাভবান হবে না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের ব্যবসার বরকত নষ্ট হয়ে যাবে। সাময়িকভাবে তাদের ব্যবসা বেশী হচ্ছে মনে হলেও চূড়ান্তভাবে দেখা যাবে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আর ভেজাল নকল মাল বিক্রি করা এমন ব্যাপার যে, তখন ক্রেতাকে বলাও সম্ভব নয় যে, এটা ভেজাল বা নকল মাল, তাহলে তো আরও বেশী সমস্যা হবে। তাই সকল ব্যবসায়ীর ভেজাল নকল মাল বিক্রয় করা থেকে বিরত হওয়া উচিত। নকল ভেজাল মাল বিক্রি করার দ্বারা একদিকে ক্রেতারা প্রতারিত হয়, আর এক দিকে ঐ মালের আসল উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। আর কারও সাথে প্রতারণা করা বা কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। অতএব নকল ভেজাল মাল বিক্রি করাও হারাম। কোন হারাম পন্থায় কখনও কোনভাবে বরকত আসতে পারে না।

দোষ-ত্রুটি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে না দিলে, অন্যকে ঠকালে শুধু বরকত মোচন হয়ে যাবে– এই ক্ষতিই নয়, বরং এটা আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার মত অপরাধ। হযরত শুআইব (আ.)-এর সম্প্রদায় মাপে ও ওজনে কম দিত, এভাবে তারা অন্যকে ঠকাত, যার কারণে তাদের উপর কঠিন শাস্তি এসেছিল। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ. (সূরা শুআরা : ১৮৯)

অর্থাৎ, তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি পাকড়াও করেছিল। সে তো ছিল এক ভিষণ দিবসের শাস্তি।

রেওয়ায়েতে এসেছে– সাতদিন একাধারে তাদের উপর প্রচন্ড গরম পড়েছিল। তারপর তাদের উপর মেঘ দেখা দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল এবার ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে, বৃষ্টি হবে। তারা মেঘের নীচে জড় হয়েছিল। তখন সেই মেঘ থেকে তাদের উপর আগুণের স্ফুলিংগ ঝরেছিল, আগুণের হলকা এসেছিল। এভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। মাপ ও ওজনে কম করার অপরাধটা জাতীয়ভাবে তাদের সকলের অপরাধে পরিণত হয়েছিল। তাই তাদের গোটা জাতিকে এভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

বোঝা গেল জাতীয়ভাবে এরূপ দোষ দেখা দিলে জাতীয়ভাবে শাস্তি এসে যাওয়ার কথা। আজ আমাদের সমাজে যেভাবে ভেজাল নকল শুরু হয়েছে, যেভাবে মাপ ও ওজনে ফাকী দেয়ার রকমারী

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টেকনিক চালু হয়েছে, তাতে জাতীয়ভাবে শাস্তি এসে যাওয়ার কথা, গোটা সম্প্রদায় একসাথে শাস্তিতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুআর বরকতে গোটা সম্প্রদায় এক সাথে শাস্তিতে ধ্বংস হচ্ছে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার দুআ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে একসাথে ব্যাপক শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিও না। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই দুআ কবূল করেছিলেন। যার বরকতে আজ গোটা জাতি ধ্বংস হচ্ছে না। নতুবা আমরা এমনও সব অপরাধ করে থাকি, যাতে আমাদের সকলের এক সাথে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। এসব অপরাধের কারণে দুনিয়াতে আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুআর বরকতে, কিন্তু আখেরাতে কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না? দুনিয়াতে লেন-দেনে বরকতহীনতা থেকে বাঁচার জন্য এবং আখেরাতে আযাব থেকে বাঁচার জন্য লেন-দেনে শঠতা ও দুই নম্বরী থেকে বিরত থাকতে হবে, ভেজাল নকলের কারবার থেকে বিরত থাকতে হবে। বোঝা গেল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের বিচারে লেন-দেন ঠিক রাখার বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেন-দেন ঠিক রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে অনেকভাবে অনেক বক্তব্য প্রদান করেছেন। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَلدَّيْنُ مَقْضِيٌّ. (رواه الترمذي برقم ١٢٦٥ وقال حسن غريب)

অর্থাৎ, যদি ঋণ নাও, তাহলে যথা সময়ে তা আদায় করতে হবে।

আজ ইসলামের এই বিধানের উপর আমল নেই, যার কারণে বহু খারাবী দেখা দিচ্ছে। আজ কেউ কাউকে ঋণ অর্থাৎ, কর্জে হাছানা দিতে চায় না। যার ফলে মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যাংকের স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য হয় এবং সুদ ভিত্তিক লোন নিতে বাধ্য হয়। কারণ, কারও কাছে ঋণ পাওয়া যায় না। আমি বাড়ি করব, আমি একটা ব্যবসা করব, আমার টাকা দরকার, কিন্তু কেউ আমাকে ঋণ দিচ্ছে না। অনেকের কাছে টাকা আছে, ব্যাংকে ফেলে রেখেছে, এমনকি ব্যাংক থেকে সুদও নিচ্ছে না, তারপরেও সে ঋণ দিচ্ছে না। কেন ঋণ দিচ্ছেনা? দিচ্ছে না এ কারণে যে, মানুষ ঋণ নিয়ে তা যথা সময়ে আদায় করে না। এজন্যেই ঋণ দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এখনো সমাজে কারও ব্যাপারে যদি মানুষের আস্থা থাকে যে, সে যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করবে, তাহলে তাকে ঋণ দেয়ার মত অনেক লোক এখনো প্রস্তুত আছে। আমরা যথা সময়ে পরিশোধ করি না তাই পাই না। ঋণ নিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ না করলে আরও বহু খারাবী দেখা দেয়। ঋণ নিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ না করলে পরস্পরের মহব্বত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই কথায় বলে, القرض مقراض المحبة অর্থাৎ, ঋণ হল একটা কাঁচির মত, যা ভালবাসার সম্পর্ককে কেটে দেয়।

লেন-দেন ঠিক রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আরও ইরশাদ হয়েছে,

اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ. (رواه الترمذي برقم ١٢٦٥ وقال حسن غريب)

অর্থাৎ, কারও থেকে কোন জিনিস ধার নিলে যথা সময়ে তা ফেরত দিতে হবে।

যেমন কারও কাছ থেকে একটা বই নিলাম, তাহলে যথা সময়ে তা ফেরত দিতে হবে। আমরা যথা সময়ে ফেরত দেই না বা মোটেই ফেরত দেই না, এজন্য কারও থেকে বইও পাই না। কিছু লোক তো মনে করে বই-পত্র নিলে তা আর ফেরত দেয়াই লাগে না। বই-পত্র নিয়ে তা আবার ফেরত দেয়া নাকি কত নম্বর আহাম্মকী। নাউযু বিল্লাহ, কত জঘন্ন শরীয়ত বিরুদ্ধ বক্তব্য! বই-পত্র ধার নিলে তা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ফেরত দিতে হবে এটাই শরীয়তের নিয়ম, অথচ শরীয়তের এই নিয়ম পালন করাকেই বলা হচ্ছে আহাম্মকী। তাহলে এটা শরীয়ত বিরুদ্ধ জঘন্ন বক্তব্য বৈ কি? আর বাস্তবেই যদি কেউ কারও বই-পত্র নিয়ে আর ফেরত না দেয়, তাহলে তো অন্যের হক নষ্ট করার কারণে কবীরা গোনাহ হবে। আর যেহেতু সে এটাকে গোনাহই মনে করছে না, তাই এই অন্যায় থেকে সে কোনদিন তওবাও করবে না। এবঙ যেহেতু সে এটাকে বান্দার হক নষ্ট করার মত অপরাধ মনে করছে না, তাই মালিকের কাছে কোন দিন ক্ষমা চেয়ে তার থেকে মাফ করানোর উদ্যোগও গ্রহণ করবে না। এভাবে "বই নিলে ফেরত দিতে হয় না"– এই ধারণাটা তার জন্য মারাত্মক বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। যাহোক কারও থেকে বই-পত্র হোক কিংবা দা, কুড়াল, শাবল ইত্যাদি যা কিছুই হোক ধার আনলে যথা সময়ে তা ফেরত দেয়া উচিত। যথা সময়ে যত্ন সহকারে ফেরত দেয়া হয় না বলেই মানুষ এগুলি দিতে চায় না। তাই প্রত্যেকেরই এগুলি একটা একটা রাখার প্রয়োজন হচ্ছে। এতে মানুষের ঝামেলা বাড়ছে। লেন-দেনের নিয়ম না মানার কারণেই এই ঝামেলা বাড়ছে। দেখা গেল ইসলামে লেন-দেনের যে নিয়ম রাখা হয়েছে তা না মানলে অনেক খারাবী দেখা দেয়।

কারও থেকে কোন জিনিস চেয়ে আনলে যথা সময়ে আবার ফেরত দেয়া দায়িত্ব। যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায়, ক্ষতিও পূরণ করে দিতে হবে। এটা আমরা করি না, তাই কেউ কাউকে কিছু দিতে চায় না। এভাবে ইসলামের এক একটা আমল ছুটে গেলে তার কারণে বহু খারাবী দেখা দেয়। কারও জিনিস পত্র ধার নিয়ে যথা সময়ে ফেরত না দিলে, কিংবা ক্ষতি হলে সে ক্ষতি পূরণ আদায় না করলে এ নিয়ে মনোমালিন্য দেখা দেয়, পরস্পরের ভালবাসার সম্পর্ক নষ্ট হয়।

যাহোক বলা হচ্ছিল ইসলাম লেন-দেনের বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। শ্রমিকের সাথে মালিকের লেন-দেন হয়। শ্রমিক শ্রম দেয় আর মালিক পারিশ্রমিক দেয়। এই লেন-দেনের ব্যাপারে যত্নবান থাকতে এতটা তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجُفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجة. وفي صحيح ابن ماجة للالباني صحيح برقم ٢٤٣٤. وفي الزوائد : أصله في صحيح البخاري وغيره ، من حديث أبي هريرة . لكن إسناد المصنف ضعيف.)

অর্থাৎ, শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।

ইসলাম লেন-দেনের ব্যাপারে এতটা তাকীদ কেন দিয়েছে? তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। **লেন-দেনের ব্যাপারে এতটা তাকীদ দেয়ার একটা কারণ হল–** লেন-দেন ঠিকমত না করলে বান্দার হক নষ্ট হয়। আর বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহর কাছে যতই মাফ চাওয়া হোক আল্লাহ তা মাফ করেন না, যতক্ষণ বান্দা তা মাফ না করে।

লেন-দেনের ব্যাপারে এতটা তাকীদ দেয়ার আর একটা কারণ হল– লেন-দেন ঠিক না থাকলে সমাজ নষ্ট হয়ে যায়। লেন-দেন ঠিক না করলে মানুষের মাঝে পরস্পরে মনোমালিন্য দেখা দেয়, পরস্পরের ভালবাসার সম্পর্ক নষ্ট হয়। এভাবে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, সমাজের লোকদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজের মানুষ একে অপরের সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়, মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অথচ ইসলাম চায় এমন সমাজ গড়ে উঠুক যে সমাজের লোকদের মাঝে পরস্পরে ভালবাসার সম্পর্ক থাকবে, পারস্পরিক সম্প্রীতি থাকবে, একের প্রতি অন্যের সহানুভূতি ও সহযোগিতা থাকবে। লেন-দেন ঠিক না থাকলে এরকম সমাজ গড়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তোলা যায় না। তাই ইসলামের চাহিদা মোতাবেক সমাজ গড়ে তোলার জন্য লেন-দেনের শরয়ী নিয়ম নীতি মেনে চলার গুরুত্ব অনেক। এসব নিয়ম নীতি মেনে না চললে ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠে না, ভাল সমাজ গড়ে ওঠে না, সমাজ নষ্ট হয়ে যায়।

লেন-দেনের ব্যাপারে এতটা তাকীদ দেয়ার আর একটা কারণ হল– লেন-দেন ঠিক না হলে সঠিক মানুষ ও ভাল মানুষ হওয়া যায় না। সঠিক মানুষ ও ভাল মানুষ হওয়ার জন্য লেন-দেন ঠিক হওয়া চাই। আমরা অনেকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকা ইত্যাদি আমলের ব্যাপারে যত্নবান, কিন্তু সঠিকভাবে লেন-দেনের ব্যাপারে যত্নবান নই। অথচ এটাও শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু নামায, রোযা ঠিকমত করেই মনে করছি আমি ভাল মানুষ হয়ে গেছি, অথচ লেন-দেন ঠিক না হলে শুধু ইবাদত-বন্দেগী ঠিক করেই ভাল মানুষ হওয়া যায় না। যার লেন-দেন ভাল নয় সে ভাল মানুষ নয়। শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ সাইড বাদ দিয়ে ভাল মানুষ হওয়া যায় না, শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ সাইড বাদ দিয়ে খাঁটি মানুষ হওয়া যায় না, শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ সাইড বাদ দিয়ে সঠিক মানুষ হওয়া যায় না।

একটা ঘটনা শুনুন। একবার এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে অন্য একজন লোকের প্রশংসা করল। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে ভাল লোক বলছ, তুমি কি কখনও তার সাথে কোন লেন-দেন করেছ? লোকটা বলল, না তার সাথে কোন দিন কোন লেন-দেন করিনি। তারপর হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কখনও তার সাথে সফর করেছ? লোকটা বলল, না তার সাথে কোন দিন সফর করিনি। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাহলে তুমি কী করে বলতে পার যে, সে ভাল লোক। বোঝা গেল লেন-দেন ঠিক না হলে ভাল মানুষ হওয়া যায় না। চরিত্র ভাল না হলেও ভাল মানুষ হওয়া যায় না। সফরে মানুষের আসল চরিত্র ফুটে ওঠে। যেমন কারও সাথে সফর করলে বোঝা যায় সে ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে কি না, তার মধ্যে অন্যের উপকার করার মানসিকতা আছে কিনা, তার মধ্যে নিজের স্বার্থের উপর অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার মনোভাব আছে কি না, তার মধ্যে ধৈর্য সহ্য আছে কি না, ইত্যাদি। সফরে এসব চরিত্র খুব ফুটে ওঠে। তাই সফরের মাধ্যমে একজন লোকের চরিত্র বোঝা যায়। এজন্যই হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি কখনও তার সাথে সফর করেছ? না করে থাকলে তার আসল চরিত্র কি তা তো বুঝতে পারনি, আর চরিত্র কেমন তা না বুঝে কীকরে মন্তব্য করা যায় যে, সে ভাল? যাহোক এখানে আমাদের দেখানো উদ্দেশ্য এই যে, লেন-দেন ঠিক না হলে ভাল মানুষ হওয়া যায় না।

এই সমস্ত কারণে শরীয়তে লেন-দেন ঠিক করার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শরীয়তে লেন-দেন ঠিক করার গুরুত্ব যেমন অনেক, লেন-দেন ঠিকমত করার ফযীলতও অনেক। উত্তমভাবে লেনদেন করা এক দিকে যেমন জরূরী, আবার তার ফযীলতও অনেক। বোখারী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে উত্তমভাবে লেন-দেন সম্পন্ন করে।" আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– "সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।"

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তম ভাবে লেন-দেন সম্পন্ন করে সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং -৪৪

জীবন গড়ার জন্য হিসাব-নিকাশ থাকা চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. وَفِى الْحَدِيْثِ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মানুষের জীবনে উন্নতি করার জন্য কিছু মূলনীতি রয়েছে, সেই মূলনীতি মেনে না চললে তার জীবনে উন্নতি হয় না। দুনিয়ার লাইনে হোক বা দ্বীনের লাইনে হোক সব লাইনেই উন্নতি করার জন্য কিছু মূলনীতি রয়েছে, সেই মূলনীতি মেনে না চললে উন্নতি হয় না। এরকম মূলনীতিমালার মধ্যে একটা বড় মূলনীতি হল হিসাব-নিকাশ। হিসাব-নিকাশ না থাকলে উন্নতি করা সম্ভব নয়, দুনিয়ার লাইনেও সম্ভব নয়, দ্বীনের লাইনেও সম্ভব নয়। দুনিয়ার লাইনেও যদি কেউ হিসাব-নিকাশ ছাড়া চলে তাহলে তার উন্নতি হয় না। যদি কোন ব্যবসায়ীর হিসাব-নিকাশ না থকে যে, কি আয় হল, কি ব্যয় হল, কি দামে কিনলাম, কি দামে বেচলাম এরকম কোন হিসাব-নিকাশ যদি না থাকে, তাহলে ব্যবসার লাইনে সে উন্নতি করতে পারবে না। ছাত্ররা লেখা-পড়া করে, এখানে তাদের একটা হিসাব-নিকাশ রাখতে হয় যে, কতটুকু পড়া-শোনা করলে আমি পাশ করতে পারব, কতটুকু পড়া-শোনা না করলে আমার ফেল হতে হবে, এরকম হিসাব-নিকাশ না থাকেলে ঐ ছাত্র লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পারবে না, সে ভাল ছাত্র হতে পারবে না, হয়তো পাশও করতে পারবে না। এভাবে দুনিয়ার ব্যপারটা আমরা বুঝি যে, হিসাস-নিকাশ রাখতে হয়, না হলে উন্নতি হয় না। কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে আমরা এ বিষয়টা খেয়াল করি না। দুনিয়ার লাইনেও হিসাব-নিকাশ ছাড়া উন্নতি হয় না, দ্বীনের লাইনেও হিসাব- নিকাশ ছাড়া উন্নতি হয় না।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন দ্বীনের বিষয়কে তথা ঈমান ও আমলকে ব্যবসার সাথে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, ব্যবসায়ীকে যেরকম হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি রেখে চলতে হয়, দ্বীনদার লোকদেরও দ্বীনী বিষয়ে ওরকম হিসাব-নিকাশ রেখে চলতে হবে। ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. (সূরা সাফ্ফ: ১০)

এ আয়াতের সারকথা হল– হে মু'মিনরা! আমি কি তোমাদেরকে একটা ব্যবসার কথা বলে দেব? সেই ব্যবসাটা হল ঈমান, আমলের ব্যবসা।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক ঈমান আমলকে অর্থাৎ, দ্বীনদারীকে ব্যবসার সাথে তুলনা দিয়েছেন। ব্যবসায় উন্নতি করতে গেলে যেমন হিসাব-নিকাশ থাকতে হয়, পরিকল্পনা থাকতে হয়, যত্ন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

থাকতে হয়, তৎপরতা থাকতে হয়, দ্বীনের লাইনেও উন্নতি করতে গেলে তদ্রূপ হিসাব নিকাশ থাকতে হয়, পরিকল্পনা থাকতে হয়, যত্ন থাকতে হয়। তাই এক হাদীছেও বলা হয়েছে,

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. (رواه الترمذي برقم ٢٤٥٩ وقال حديث حسن وقال بعضهم إنساده ضعيف)

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের হিসাব-নিকাশ নেয়, নিজের সাথে বোঝা-পড়া করে এবং সে অনুযায়ী পরকালের জন্য আমল করে।

কেউ হিসাব-নিকাশ ছাড়া ব্যবসা করলে আমরা তাকে বুদ্ধিমান বলব না, বলব পাগল। তদ্রূপ দ্বীনের লাইনেও যদি আমার হিসাব-নিকাশ না থাকে, তাহলে আমি বুদ্ধিমান নই আমি পাগল। আগে আমার দ্বীনী অবস্থান কি ছিল এখন কি আছে, উন্নাতির দিকে যাচ্ছি না অবনতির দিকে যাচ্ছি– এরকম হিসাব-নিকাশ না করে অবলীলায় চলতে থাকলে আমি বুদ্ধিমান নই।

সাধারণত আমাদের জীবনে আমলের কোন হিসাব নেই। বেশীর থেকে বেশী হিসাব-নিকাশ রাখলেও বড় বড় কিছু আমলের হিসাব-নিকাশ থাকে, ছোট-খাটো কোন আমলের কোন হিসাব নেই। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এধরনের বড় বড় আমলের কিছু হিসাব আমরা রাখি। এসব ব্যাপারে কিছু চিন্তা-ভাবনা এবং খেয়াল রাখি যে, এগুলো আদায় হচ্ছে কি না। কিন্তু প্রতিদিন আমাদের জীবনে শত শত নয়, হাজার হাজার ছোট ছোট আমল ছুটে যাচ্ছে, সেগুলোর প্রতি কোন খেয়াল নেই। বড় বড় আমলেরও হিসাব-নিকাশ রাখা চাই, ছোট ছোট আমলেরও হিসাব-নিকাশ রাখা চাই। কেয়ামতের দিন বড় বড় আমলেরও হিসাব দিতে হবে, ছোট ছোট আমলেরও হিসাব দিতে হবে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন যখন মানুষকে আমলনামা হাতে দেয়া হবে, তখন মানুষ আমলনামা দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে, বিস্ময়ের সাথে বলতে থাকবে,

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا.

অর্থাৎ, কি অদ্ভুত আমলনামা– জীবনের ছোট বড় কোন কিছুই তো বাদ যায়নি! মানুষ ছোট বড় যা কিছুই করেছে সবটা উপস্থিত পাবে। (সূরা কাহ্ফ: ৪৯)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. (সূরা হাক্কা: ১৮)

অর্থাৎ, সেদিন তোমাদের সকলকে আল্লাহর কাছে পেশ করা হবে। তোমাদের কোন কিছু আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না।

এখন আমরা অবলিলায় অনেক কাজ করে যাচ্ছি, মনে করছি এগুলি তেমন কিছুই নয়, এগুলিরও কি হিসাব হবে? অথচ ছোট-বড় সবটারই হিসাব হবে। মানুষ তার আমলনামায় ছোট বড় সব আমলই উপস্থিত পাবে।

যদি মানুষ এটা চিন্তায় রাখে যে, আমি যা কিছুই করি, ছোট করি বড় করি সবটারই হিসাব আমাকে দিতে হবে, তাহলে এই একটা চিন্তাই তার যিন্দেগীকে দোরস্ত করে দিতে পারে। আমলনামা সত্যিই এক অদ্ভুত আমলনামা! যার ভিতরে ছোট-বড় কিছুই বাদ যাবে না। যেন আমাদের জীবনের

www.maktabatulabrar.com

সাথে এমন একটা ক্যাসেট বা ভিডিও লাগিয়ে রাখা হয়েছে, যার ভিতরে ছোট বড় কোন কিছুই রেকর্ড হতে বাদ যায় না।

এই আমলনামা কেমন তা আল্লাহ পাকই জানেন। একজন মানুষের জীবনে কোটি কোটি নয় বরং শত শত কোটি হাজার হাজার কোটি বা তার চেয়ে বেশী বিষয় থাকে, সেই সব বিষয় কীভাবে লিপিবদ্ধ রাখা হয়, তা আল্লাহ পাকই জানেন। আগের যুগে অনেক মানুষ বিশ্বাস-ই করত না যে, এমন আমলনামা হওয়া সম্ভব। কাগজ নেই কলম নেই, কিছুই দেখা যায় না, অথচ ছোট-বড় এতকিছু লিখে রাখা যায়। এতসবকিছু লিখে রাখতে তো টনকে টন কাগজ দরকার। এটাকে তারা অসম্ভব মনে করত, অযৌক্তিক মনে করত। কিন্তু এখন বুঝে আসছে যে, লিখে রাখতে কাগজ কলম কিছুই লাগে না। এখন কম্পিউটারে লিখে রাখা হচ্ছে, তাতে কাগজও নেই কলমও নেই। একটা কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে হাজার হাজার নয় বরং লক্ষ লক্ষ বইয়ের সমান ডাটা লিপিবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে, অথচ তার মধ্যে কাগজ-কলম কিছুই নেই। এটা দেখে এখন আমলনামার বিষয়টা বুঝে আসছে। যারা আগে অস্বীকার করেছে, এখন তাদেরকে নাকে খত দিয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে। এভাবে ঈমানের সব বিষয়ই একদিন বুঝে আসবে। দুনিয়াতে না বুঝে আসলেও আখেরাতে তো অবশ্যই বুঝে আসবে। কাজেই না বুঝে আসলে অস্বীকার করতে নেই, অস্বীকার করলে পরবর্তীতে ঠকতে হয়, নিজের অস্বীকৃতির জন্য লজ্জিত হতে হয়, নাকে খত দিতে হয়। আমরা ঈমানের বিষয়গুলি বুঝে আসলেও বিশ্বাস করি, না বুঝে আসলেও বিশ্বাস করি। এটাই ঈমান আনার তরীকা যে, বুঝে আসলেও বিশ্বাস করতে হবে, না বুঝে আসলেও বিশ্বাস করতে হবে। ঈমানের যত বিষয় বলা হয়েছে, এমনিভাবে কুরআন হাদীছে যত বিষয় বলা হয়েছে তা সবই সত্য, আমাদের বুঝে আসলেও সত্য, না বুঝে আসলেও সত্য, আমাদের যুক্তিতে ধরলেও সত্য, যুক্তিতে না ধরলেও সত্য।

যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল যে, আমলনামা এমন এক অদ্ভুত আমলনামা যাতে জীবনের ছেট বড় সব কিছুকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মানুষ দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে যাবে যে, কেমন আমলনামা যার মধ্যে জীবনের ছোট বড় কিছুই লিপিবদ্ধ রাখতে ছাড়া হয়নি। মানুষ আমলনামায় জীবনের ছোট বড় সবকিছু লিপিবদ্ধ দেখে ভয় পাবে যে, এই সবকিছুর জন্য যদি আমাকে ধরা হয়, তাহলে তো আমার কোন উপায় নেই! হাদীছেও এসেছে,

مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ. (متفق عليه – البخاري برقم ١٠٣ ومسلم برقم ٧٤٠٦)

অর্থাৎ, যদি কারও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হয়, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

আমরা জীবনের বহু কাজ হিসাব-নিকাশ ছাড়া অবলীলায় করে যাই, কোন খেয়াল করা ছাড়া করে যাই, চিন্তা করা ছাড়া করে যাই, এগুলির জন্য হিসাবও দিতে হবে তা আমাদের চিন্তায় আসে না, অথচ সবকিছুর জন্য হিসাব দিতে হবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। সেই স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ে যদি সবকিছুর জন্য আমাদেরকে হিসাব দিতেই হয়, তাহলে তো আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

তবে আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে অনেকেরই হিসাব হালকা করবেন। অনেককে কোন কোন ছোট ছোট আমলের ওছীলায়ও মাফ করে দিবেন। ছোট ছোট আমলের ওছীলায় হিসাব-নিকাশের কড়া-কড়ি থেকে অনেককে মুক্তি দিয়ে দিবেন। বহু মানুষ এরকম হবে যাদেরকে আল্লাহ পাক ডেকে আমলনামা দেখাবেন যে বান্দা! এ সব পাপ করেছিলে? সেতো বুঝবে যে, আমি এগুলি করেছি, মনে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মনে ভাববে আমার ধ্বংস অনিবার্য মুখে বলবে যে, হে আল্লাহ! আমি করেছি। আল্লাহ বলবেন যাও, তোমাকে মাফ করে দিলাম, তোমার সব দোষ আজ ঢেকে রাখলাম, সব দোষ গোপন করে ফেললাম। কারণ, তুমি আমার বান্দার অনেক দোষ জানতে কিন্তু মানুষের কাছে প্রকাশ করতে না। তুমি আমার বান্দার দোষ গোপন করতে, তাই আমিও তোমার দোষ গোপন করে দিলাম। তুমি আমার বান্দার সাথে যেমন মুআমালা করেছ আজ তোমার সাথেও আমি তেমনি-ই মুআমালা করলাম। দেখা গেল মানুষের দোষ গোপন করার মত একটা ছোট্ট আমলের কারণে তার সহজে মুক্তি হয়ে যাবে।

কাউকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এই ওছীলায় যে, সে মানুষকে ক্ষমা করত। কারও প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন এই ওছীলায় যে, সে মানুষের প্রতি দয়া করত। বোখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, একজন মানুষ একটা পীপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল, এই ওছীলায় আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত নছীব করবেন। লোকটা ছিল একজন মুসাফির। সে দেখেছিল যে, একটা কূয়ার কাছে দাঁড়িয়ে জিহবা বের করে কুকুরটা হাপাচ্ছে এবং পিপাসা মেটানোর জন্য ভেজা কাদা জিহ্বা দিয়ে চাটছে। কুকুরটার খুব পিপাসা লেগেছে, কিন্তু পানির কোন ব্যবস্থা নেই। লোকটার পায়ে ছিল চামড়ার মোজা। সে চামড়ার মোজাটা খুলে রশি দিয়ে কুয়ার ভিতরে ফেলল। মোজার ভিতরে কিছু পানি ঢুকল। লোকটা মোজা তুলে কুকুরকে সেই পানিটুকু পান করাল। আল্লাহ পাক এই আমলটার ওছীলায় তাকে নাজাত দিয়ে দিলেন এবং জান্নাত দান করলেন।

কুকুর তো একটা বড় প্রাণী। একটি মাছির মত ছোট্ট প্রাণীর প্রতি দয়া করার কারণেও নাজাত হওয়ার ঘটনা রয়েছে। আগের যুগের এক ব্যক্তি ঘটনায় এরকম পাওয়া যায়। তখনকার যুগে এরকম কলম কালি ছিল না, মানুষ কঞ্চির কলম দিয়ে কালির দোয়াতের ভিতরে ভিজিয়ে সেই কঞ্চি দিয়ে লিখতো। সেই ব্যক্তি এইভাবে কঞ্চির কলম দিয়ে কিতাব লিখছিলেন। একবার তিনি কিতাব কলম চুবিয়ে উঠিয়েছেন, এই সময় একটা মাছি ঐ কলমের মাথায় এসে বসল। লোকটা ভাবলেন মাছিটা ঐ কলমের মাথায় কেন বসল? ওর বোধ হয় পিপাসা লেগেছে। নতুবা কালির উপরে তার পড়ার কথা নয়। কলমের আরও কত জায়গা ছিল সেখানে কেন বসেনি। বোধ হয় মাছিটার পিপাসা পেয়েছে। তিনি কিছুক্ষণ ঐ কলম দিয়ে লেখা বন্ধ রাখলেন, যাতে মাছিটা কালি খেয়ে তার পিপাসা মিটিয়ে নিতে পারে। মরার পরে এই ব্যক্তির এক ভক্ত তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল যে, হুজুর! আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি মুআমালা করেছেন? তিনি বললেন যে, ইবাদত-বন্দেগী তো অনেক কিছুই করেছি, কিন্তু আল্লাহ পাক সেগুলোর কোনটার কথাই উল্লেখ করেননি, শুধু একটা বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, ঐ মাছিটার উপরে দয়া করেছিলে, সে জন্য তোমার উপর দয়া করলাম।

তবে ছোট ছোট আমলের ওছীলায় নাজাত হয়ে যাবে এই ভরসায় নিশ্চিন্তে বসে থাকা যাবে না। কেননা, ছোট ছোট আমলের ওছীলায় যেমন নাজাত হয়ে যেতে পারে, তেমনিভাবে ছোট ছোট গোনাহের কারণে পাকড়াও হয়ে যেতে পারে। যেমন বোখারী শরীফের উপরোক্ত রেওয়ায়েতে একথাও এসেছে যে, একজন আবেদা মহিলা অর্থাৎ, অনেক ইবাদত-বন্দেগী করনেওয়ালা মহিলা একবার একটা বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে ছাড়েওনি, খেতেও দেয়নি। এভাবে বিড়ালটা না খেয়ে মারা গেল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই পাপের কারণে তার জন্য আযাবের ফয়সালা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

অতএব ছোট ছোট আমলের ওছীলায় নাজাত হয়ে যাবে এই ভরসায় নিশ্চিন্তে বসে থাকা যাবে না। বরং স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আমাদের কর্তব্য হল প্রত্যেকটা আমল খেয়াল করে করা। কারণ, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রত্যেকটা আমলের জন্য আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে।

কেয়ামতের দিন আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে। সেই হিসাব দেয়া সহজ করার জন্য স্বাভাবিক নিয়ম হল এখনই আমাদেরকে নিজেদের হিসাব নিজেরা করে রাখতে হবে। এখন হিসাব-নিকাশ করে রাখলে পরবর্তীতে হিসাব দেয়া সহজ হবে। এখন হিসাব রেডি করে না রাখলে পরবর্তীতে হিসাব দিতে কঠিন লাগবে। যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা হিসাব-নিকাশের দায়িত্বে থাকে, প্রতিদিন যদি তারা নিজেদের হিসাব ক্লিয়ার রাখে, তাহলে মাস শেষে বা বৎসর শেষে যখন তাদেরকে হিসাব দিতে হয় বা যখন ওডিট হয়, তখন তাদের পক্ষে হিসাব দেয়া খুব সহজ লাগে। কারণ, তারা তো প্রতিদিন হিসাব-নিকাশ ক্লিয়ার রাখে। আর যারা আগের থেকে হিসাব ক্লিয়ার করে রাখে না, তারা হিসাব দিতে গেলে হয়তো ধরা খেয়ে যাতে পারে। তাই আগে থেকেই নিজের আমলের হিসাব-নিকাশ নিয়ে রাখা চাই। আগের থেকে নিজের আমলের হিসাব রাখার অর্থ হল– নিজের আমলের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে সেই ত্রুটি সংশোধন করে রাখা। এ জন্য বলা হয়েছে,

حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا.

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে হিসাব দিতে হবে সেই হিসাব দেয়ার আগে তোমরা নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও।

এ কথা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন তোমার আমলনামা যে ওজন হবে সেই ওজন দেয়ার আগে দুনিয়াতে প্রতিদিন তুমি নিজে নিজের আমলের ওজন দাও যে, কতটুকু নেক আমল আমি করতে পারলাম, কতটা গোনাহ হল, আগের চেয়ে নেকীর পরিমাণ বাড়ছে না কমছে, আগের চেয়ে গোনাহ বাড়ছে না কমছে, প্রতিদিন এগুলোর হিসাব নাও এবং সে অনুযায়ী নিজের উন্নতির ব্যাপারে যত্নবান হও।

বুর্যুগানে দ্বীন বলেছেন, প্রতিদিন নিজের হিসাব-নিকাশ নেয়ার তরীকা হল– প্রতিদিন একটা সময় নির্ধারিত করে নিয়ে সেই সময় সেই দিনের নিজের ভাল-মন্দ সব কাজের হিসাব নিতে হবে। এর জন্য সহজ সময় হল বিছানায় গিয়ে যা শোয়ার আগে হিসাব নেওয়া। অন্য যে কোন একটা সময়েও এটা করা যেতে পারে। হিসাব নিতে গিয়ে চিন্তা করতে হবে যে, আজ সকাল থেকে নিয়ে সন্ধা পর্যন্ত আমার দ্বারা কয়টা গোনাহের কাজ হয়েছে। যে কয়টা গোনাহ হয়েছে তার জন্য তওবা করে নিতে হবে আর আগামীতে সেই গোনাহ না করার ইরাদা করতে হবে। তারপর সারাদিন খেয়াল রাখতে হবে যে, সেই গোনাহ আবার হয়ে যাচ্ছে কি না। এমনিভাবে চিন্তা করতে হবে আজ সকাল থেকে নিয়ে সন্ধা পর্যন্ত আমার দ্বারা কি কি নেক আমল হয়েছে আর কি কি নেক আমল ছুটে গেছে। যেসব নেক আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে আর যেসব নেক আমল ছুটে গেছে আগামীতে সেগুলো করার পরিকল্পনা নিতে হবে। তাহলে এই হিসাব নিতে যেয়ে মৌলিকভাবে মোট তিনটা জিনিস এসে গেল।

(১) হিসাব নেয়া। আরবীতে এটাকে বলা হয় محاسبه (মুহাছাবা)

(২) পরিকল্পনা করা। আরবীতে এটাকে বলা হয় مشارطه (মুশারতা)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে খেয়াল রাখা। আরবীতে এটাকে বলা হয় مراقبه (মুরাকাবা)

পূর্বে একটা আয়াত পেশ করা হয়েছিল যে আয়াতে আল্লাহ পাক দ্বীনদারীর বিষয়কে ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন। ব্যবসায়ীরাও মৌলিকভাবে এই তিনটা কাজ করে থাকে। তারা পরিকল্পনা করে যে, কি কি ব্যবসা করব! তারপর সারাদিন ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ চালায়। তারপর দিন শেষে হিসাব-নিকাশ নেয় যে, উন্নতি হল বা অবনতি হল, পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করা হয়েছে কি না। লাভ-লোকশান কতটুকু হল। কোন ব্যবসায়ী তার ব্যবসার লাইনে উন্নতি করতে চাইলে তাকে মৌলিকভাবে এই তিনটি কাজ করতেই হয়, তদ্রূপ দ্বীনের লাইনেও কেউ উন্নতি করতে চাইলে অবশ্যই তাকে এই তিনটা কাজ করতে হবে। প্রতিদিন এই পরিকল্পনা করতে হবে যে, আমি এ পর্যন্ত যে নেক কাজগুলো করতে পারিনি আজ থেকে তা করব আর যে নেক কাজ শুরু করেছি তা কোনদিন বর্জন করব না, এ পর্যন্ত যে গোনাহ আমার দ্বারা হয়ে আসছে তা আর হতে দিব না। এভাবে পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা মোতাবেক সারাদিন চলতে হবে। আর দিনের শেষে হিসাব-নিকাশ নিতে হবে।

সারকথা দ্বীনের লাইনে উন্নতি করতে গেলে তিনটা কাজ করতে হবে। পরিকল্পনা, সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, আর হিসাব নিকাশ নেয়া।

সহীহ তরীকার খাঁটি বুযুর্গানে দ্বীন মুরীদদেরকে জীবন গড়ার জন্য যেসব ছবক দেন, তার মধ্যে একটা বড় ছবক এই থাকে যে, প্রতিদিন মুহাছাবা, মুশারাতা ও মুরাকাবার আমল জারী রাখতে হবে। এভাবে প্রতিদিন হিসাব-নিকাশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজের জীবনের অবনতি রোধ করতে হবে এবং উন্নতির চেষ্টা জারী রাখতে হবে। হিসাব-নিকাশের জীবন গড়ে তুলতে হবে।

সুফিয়ায়ে কেরাম একথাও বলেছেন যে, হিসাব-নিকাশ নেওয়ার সময় এভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে যে, আমার যেন মৃত্যু হয়ে গেছে, আমি আল্লাহর কাছে দণ্ডায়মান আছি, আল্লাহ পাক আমার সব আমলের হিসাব-নিকাশ নিচ্ছেন, একটা একটা করে আমলের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, আমি গোনাহের বিষয়ে প্রশ্নে আঁটকে যাচ্ছি। আল্লাহ পাক কি আমার জন্য আযাবের ফয়সালা করবেন? তাহলে আমার কী উপায় হবে? ইত্যাদি। সুফিয়ায়ে কেরাম এভাবে মরার আগেই মরার চিন্তা করতে বলেন। সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন,

مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا.

একথার একটা অর্থ এই যে, তোমরা মরার আগেই মর। অর্থাৎ, মরার আগেই মরার এবং মরার পর সম্ভাব্য কি অবস্থা হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা কর। একথার আর একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, মরার পরে যেমন দুনিয়ার সাথে কোন সংশ্রব থাকে না, এখনই দুনিয়ার সাথে এরকম সংশ্রবহীন হয়ে থাক। মরা মানুষের সামনে যেমন আখেরাত ছাড়া আর কিছু থাকে না, এখনই এরকম হয়ে যাও যে, তোমার সামনে আখেরাত ছাড়া আর কিছু থাকবে না, আখেরাত ছাড়া আর কিছুর চিন্তা থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করেন, আমাদেরকে হিসাব-নিকাশের জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করেন। আমীন!

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং – ৪৫

আল্লাহর দেয়া সকল নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا. وقال تعالى : اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনেক ধরনের নেয়ামত দান করেছেন। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, গাড়ি-বাড়ি, মান-ইজ্জত, পদ, মর্যাদা, শাস্থ্য, সুস্থতা, চেহারা সৌন্দর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি শত শত নয় বরং হাজার হাজার লাখো লাখো রকমের নেয়ামত দান করেছেন। এত নেয়ামত দান করেছেন যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا. (সূরা ইবরাহীম: ৩৪)

অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও, তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না, তা গণনা করে শেষ পারবে না।

আমরা শুধু টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ও গাড়ি-বাড়িকেই নেয়ামত মনে করি। তাই কারও টাকা-পয়সা কম থাকলে বা গাড়ি-বাড়ি না থাকলে তার কাছে মনে হয় যে, আমাকে আল্লাহ কোন নেয়ামত দেননি। অথচ শুধু টাকা-পয়সা ও গাড়ি-বাড়িই নেয়ামত নয়। মান-ইজ্জত, শাস্থ্য, সুস্থতা, বিদ্যা, বুদ্ধি এগুলি কি আল্লাহ নেয়ামত নয়? আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন– এই অঙ্গগুলির এক একটা কি কম বড় নেয়ামত? একটা চোখ কত বড় নেয়ামত তা সেই ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে যার চোখ নেই। একটা কান কত বড় নেয়ামত তা সেই ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে যে কানে শুনতে পায় না। একটা হাত কত বড় নেয়ামত তা সেই ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে যার হাত নেই। একটা পা কত বড় নেয়ামত তা সেই ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে যার পা নেই। চলার শক্তি কত বড় নেয়ামত তা সেই ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে যার চলার শক্তি নেই, ঘরে পঙ্গু হয়ে বা প্যারালাইজড হয়ে পড়ে আছে। যার শরীরের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়ে যায় সে তখন বুঝতে পারে তার সেই অঙ্গের কত মূল্য। কিডনী অচল হয়ে পড়লে তখন বুঝে আসে এই একটা অঙ্গের কত মূল্য। হার্টের একটা বাল্ব নষ্ট হয়ে গেলে তখন বুঝে আসে ছোট্ট এই একটা পার্সের কত মূল্য। যার আকল-বুদ্ধি নেই পাগল বা বোকা, তার দিকে তাকালে বুঝে আসে আকল-বুদ্ধির কত মূল্য। এভাবে শুধু আমাদের শরীরের মধ্যে কত নেয়ামত আছে তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহর দেয়া আলো বাতাস যা আমরা ভোগ করি তা যদি মূল্য দিয়ে ব্যবহার করতে হত তাহলে বুঝে আসত এগুলি কত বড় বড় নেয়ামত। এক একটা শ্বাস-প্রশ্বাস যদি মূল্য দিয়ে নিতে ছাড়তে হত, তাহলে বুঝে আসত আমরা বিনা মূল্যে অবাধে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি ছাড়ছি এর কত মূল্য। এভাবে নিজের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে অসংখ্য অগণিত নেয়ামত যা আমরা ভোগ করি সেগুলিও যে নেয়ামত তা আমরা চিন্তা করে দেখি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না। এগুলিকে আল্লাহর নেয়ামত গণ্য করলে আল্লাহর নেয়ামত গণনা করে শেষ করা যাবে না। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا. (সূরা কাহ্‌ফ: ১০৯)

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়, তবুও আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে অনুরূপ সমুদ্র হলেও।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ لَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (সূরা লুকমান: ২৭)

অর্থাৎ, পৃথিবীর সমস্ত গাছপালা যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র তার সাথে আরও সাত সমুদ্র যোগ হয়ে কালি হয় আর তা দিয়ে আল্লাহর কথা লিখতে চাওয়া হয়, তবুও তা দ্বারা আল্লাহর কথা লেখা শেষ করা যাবে না।

এই যে আমরা আল্লাহ পাকের অসংখ্য অগণিত নেয়ামত ব্যবহার করি, আমাদের উপর এর শোকর আদায় করা ওয়াজিব। তিনভাবে শোকর আদায় করতে হবে। জবানের দ্বারাও শোকর আদায় করতে হবে, মনের দ্বারাও শোকর আদায় করতে হবে, আমলের মাধ্যমেও শোকর আদায় করতে হবে।

জবানের দ্বারা শোকর আদায় করার অর্থ হল– মুখে কখনও আল্লাহর না-শোকরী করা যাবে না বরং স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর অসংখ্য অগণিত নেয়ামত ভোগ করে চলছি, আল্লাহ পাক এই সব নেয়ামত দিয়ে আমাদের প্রতি এহছান করেছেন। কখনও মুখে এরূপ বলা যাবে না যে, আল্লাহ আমাকে কী দিয়েছেন– আমার এই নেই ওই নেই ইত্যাদি।

মনের দ্বারা শোকর আদায় করার অর্থ হল– মনে মনে আল্লাহর প্রতি মুগ্ধ থাকতে হবে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার মনোভাব পোষণ করতে হবে। আল্লাহ আমাকে এটা দেননি, ওটা দেননি– মনের মধ্যে এরকম না-শোকরী বা অকৃজ্ঞতা থাকতে পারবে না।

আর আমলের মাধ্যমে শোকর আদায় করার অর্থ হল– আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ব্যবহার করা। আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে আল্লাহর না-ফরমানির কাজে ব্যবহার না করা।

মুখের দ্বারা না-শোকরী করা যেমন অন্যায়, মনে মনে অকৃতজ্ঞতা পোষণ করাও অন্যায়, আমলের মাধ্যমে শোকর আদায় না করাও অন্যায়। দুনিয়াতেও কেউ যদি দাতার হুকুম মত জিনিস ব্যবহার না করে বরং নিজের খেয়াল-খুশী মত ব্যবহার করে তাহলে দাতা অসন্তুষ্ট হয়। আর দাতা যা পছন্দ করে না– এরকম কাজে ব্যবহার করলে দাতা আরও বেশী অসন্তুষ্ট হয় এবং এত বেশী অসন্তুষ্ট হয় যে, ভবিষ্যতে তাকে দেয়া বন্দ করে দেয় এবং পারলে তাকে শাস্তি দিয়ে ছাড়ে। যেমন একজন দাতা কাউকে পাঁচ হাজার, দশ হাজার টাকা দিয়ে বলল, তুমি এই টাকা দিয়ে ব্যবসা করে তা দিয়ে পরিবার চালাবে। এখন সেই ব্যক্তি টাকা পেয়ে যদি খেয়ে ফেলে বা ব্যবসা না করে অন্য কাজে লাগায়, তাহলে দাতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। কিংবা কোন দাতা কাউকে দুই এক হাজার টাকা দিয়ে বলল,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এই টাকা দিয়ে তোমার বাল-বাচ্চাদেরকে ঈদের কাপড়-চোপড় কিনে দিও, খবরদার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দিয়ে যেন টাকাগুলো শেষ কর না। কিন্তু সে টাকা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিয়ে টাকাগুলো উড়িয়ে দিল। তাহলে ঐ দাতা এত অসন্তুষ্ট হবে যে, তাকে আর কোন দিন টাকা দিবে না বা পারলে তাকে শাস্তি দিয়ে ছাড়বে। বোঝা গেল দাতার ইচ্ছামত জিনিস ব্যবহার না করলে দাতা অসন্তুষ্ট হয় এবং দাতা যা পছন্দ করে না– এ রকম কাজে ব্যবহার করলে দাতা আরও বেশী অসন্তুষ্ট হয়, এত বেশী অসন্তুষ্ট হয় যে, পারলে তাকে শাস্তি দিয়ে ছাড়ে। তদ্রূপ আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামত আল্লাহ পাকের ইচ্ছামত ব্যবহার না করলে এবং আল্লাহ পাক যা পছন্দ করেন না– এ রকম কাজে ব্যবহার করলে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন এবং সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব আল্লাহ তাআলার দেয়া নেয়ামতকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে হবে, তিনি অপছন্দ করেন– এরকম কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। করলে অন্যায় হবে এবং শাস্তির পাত্র হতে হবে। যেমন:–

টাকা-পয়সা আল্লাহ তাআলার দেয়া একটা নেয়ামত। অতএব আল্লাহ তাআলার দেয়া টাকা-পয়সা আল্লাহ তাআলার হুকুম ও মর্জী মত ব্যবহার করতে হবে, আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন– এরকম কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা টাকা-পয়সার যাকাত দিতে বলেছেন দিতে হবে, আল্লাহ তাআলা টাকা-পয়সা থাকলে হজ্জ করতে বলেছেন করতে হবে, আল্লাহ তাআলা টাকা-পয়সা থাকলে কুরবানী করতে বলেছেন করতে হবে, আল্লাহ তাআলা টাকা-পয়সা থাকলে গরীব আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করতে বলেছেন করতে হবে, আল্লাহ তাআলা টাকা-পয়সা থাকলে দ্বীনের কাজে ব্যয় করা পছন্দ করেন করতে হবে। আল্লাহর দেয়া টাকা-পয়সা গান-বাদ্যের পিছনে ব্যয় করা যাবে না কারণ, তিনি এটা অপছন্দ করেন, আল্লাহর দেয়া টাকা-পয়সা কোন গোনাহেরর পিছনে ব্যয় করা যাবে না কারণ, তিনি এটা অপছন্দ করেন। মোটকথা আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন, তিনি অপছন্দ করেন– এমন কোন কাজে টাকা-পয়সা ব্যয় করা যাবেনা। তাহলে এই নেয়ামতের না-শোকরী হবে, আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হতে হবে।

বিদ্যা-বুদ্ধিও আল্লাহ তাআলার দেয়া একটা নেয়ামত। অতএব আল্লাহ তাআলার দেয়া বিদ্যা-বুদ্ধি আল্লাহ তাআলার হুকুম ও মর্জী মত ব্যবহার করতে হবে, আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন– এরকম কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ তাআলার দেয়া বিদ্যা-বুদ্ধিকে দ্বীনের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে, কেননা আল্লাহ তাআলা সেটাই পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলার দেয়া বিদ্যা-বুদ্ধিকে মানুষের উপকারের কাজে ব্যবহার করতে হবে, কেননা আল্লাহ তাআলা সেটাই পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলার দেয়া বিদ্যা-বুদ্ধিকে দেশ ও দশের উপকারে বিষয়ে ব্যবহার করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা সেটাই পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলার দেয়া বিদ্যা-বুদ্ধিকে কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে বা কারও ক্ষতির কাজে ব্যবহার করা যাবে না, কেননা আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলার দেয়া বিদ্যা-বুদ্ধিকে, আল্লাহ তাআলার দেয়া মেধাকে দ্বীন-ধর্মের বিরুদ্ধে বা আলেম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবেনা, দেশ ও দশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। কারও বিরুদ্ধে কুট-বুদ্ধি প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। কাউকে কুট বুদ্ধি দেয়া যাবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। মোটকথা আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন, তিনি অপছন্দ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করেন এমন কোন বিষয়ে বিদ্যা-বুদ্ধি প্রয়োগ করা যাবে না। তাহলে এই নেয়ামতের না-শোকরী হবে, আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হতে হবে।

বক্তৃতা ও লেখার শক্তিও আল্লাহ তাআলার দেয়া একটা নেয়ামত। অতএব আল্লাহ তাআলার দেয়া এই শক্তি ও যোগ্যতাকে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও মর্জী মত ব্যবহার করতে হবে, আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন– এরকম কোন কাজে তা ব্যবহার করা যাবে না। এই শক্তিকে দেশ ও দশের উপকারের বক্তব্যে ব্যবহার করতে হবে, কেননা আল্লাহ তাআলা সেটাই পছন্দ করেন। এই শক্তিকে কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে বা কারও ক্ষতির বক্তব্যে ব্যবহার করা যাবে না, কেননা আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। এই শক্তিকে দ্বীন-ধর্মের বিরুদ্ধে বা আলেম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদানে ব্যবহার করা যাবে না, কেননা আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। মোটকথা আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন, তিনি অপছন্দ করেন এমন কোন বক্তব্য বিবৃতিতে এই শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তাহলে এই নেয়ামতের না-শোকরী হবে, আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হতে হবে।

আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাআলার দেয়া এক একটা বড় নেয়ামত। অতএব আল্লাহ তাআলার দেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও মর্জী মত ব্যবহার করতে হবে, আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন– এরকম কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। চোখ আল্লাহ তাআলার দেয়া এক বড় নেয়ামত। এই চোখকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন এমন কোন স্থানে ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন এমন কোন কিছু দেখা যাবে না। আল্লাহ তাআলা অপছন্দ এমন কোন কিছু দেখা যাবেনা। চোখ দিয়ে কোন গায়র মাহরাম মহিলাকে দেখা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। চোখ দিয়ে কোন সিনেমা বাইস্কোপ দেখা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। চোখ দিয়ে মাত্র দুইটা জিনিসই দেখা নিষেধ। এক হল গায়র মাহরাম মহিলাকে দেখা। আর এক হল সিনেমা বাইস্কোফ বা কোন হারাম দৃশ্য দেখা। আল্লাহর এত বড় নেয়ামত চোখ দিয়ে আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখতে অনুমতি দিয়েছেন। মাত্র দুই ধরনের জিনিস দেখতে বারণ করেছেন, তবুও আমরা তা করছি না। যদি কোন বুযুর্গ কোন অন্ধকে বলত আমি দুআ করে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব, শর্ত এই যে, তুমি শুধু দুইটা জিনিস দেখতে পারবেনা। এক হল কোন গায়র মাহরাম মহিলাকে দেখতে পারবেনা, আর এক হল সিনেমা বাইস্কোপ ইত্যাদি হারাম দৃশ্য দেখতে পাররে না। তাহলে সেই অন্ধ বলত, হুজূর দুইটা কেন যদি হাজারটা জিনিসও দেখতে নিষেধ করেন তাও মানতে রাজি, তবুও আমার জন্য দুআ করুন যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। এই চোখের জন্য সে হাজারটা জিনিস দেখা থেকে বিরত থাকতেও রাজি হত, আর যা কিছু দেখতে পেত সেটাই তার কাছে অনেক বড় নেয়ামত মনে হত কারণ, তার চোখ নেই, চোখ কী নেয়ামত তা সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে। অথচ আল্লাহ আমাদেরকে দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন। তিনি মাত্র এই দুটো জিনিস দেখতে নিষেধ করেছেন, তবুও আমরা তা মানছি না। কারণ, চোখ আছে বলে আমরা উপলব্ধি করি না যে, এটা কত বড় নেয়ামত ভোগ করছি। এই নেয়ামত না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে সামান্য দুই ধরনের জিনিস দেখা থেকে বিরত থাকা কতই না সহজ। এভাবে চিন্তা করলে চোখকে এই সব গোনাহের জিনিস দেখা থেকে বিরত রাখা সহজ বোধ হবে।

কানও আল্লাহ তাআলার দেয়া এক বড় নেয়ামত। এই কানকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন এমন কোন স্থানে ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন এমন কোন কিছু শোনা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

যাবে না। গান্য-বাদ্য শোনা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। কেউ গীবত-শেকায়েত করতে থাকলে তা শোনা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। কারও চোগলখুরী শোনা যাবেনা। কারণ, আল্লাহ তাআলা সেটা অপছন্দ করেন। এমনিভাবে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তিনি অপছন্দ করেন এমন কোন কিছু শোনা যাবে না। চোখের বিষয়ের মত এই কানের বিষয়টাও যদি চিন্তা করি যে, যদি কোন বুযুর্গ কোন বধিরকে বলত আমি দুআ করে তোমার শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব, শর্ত এই যে, তুমি শুধু গান-বাদ্য, কারও গীবত-শেকায়েত, চোগলখুরী ইত্যাদি কয়েক ধরনের কথা শুনতে পারবে না যেগুলো শোনা গোনাহ, আর সবকিছু শুনতে পারবে। তাহলে সেই অন্ধ বলত, হুজূর এই কয়েক ধরনের কথা কেন যদি শত ধরনের কথাও শুনতে নিষেধ করেন তাও মানতে রাজি, তবুও আমার জন্য দুআ করুন যেন আমি শ্রবণশক্তি ফিরে পাই। সে বোঝে এই নেয়ামত না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে সামান্য কয়েক ধরনের কথা শোনা থেকে বিরত থাকা কতই না সহজ। এভাবে চিন্তা করলে কানকে এই সব গোনাহের জিনিস দেখা থেকে বিরত রাখা সহজ বোধ হবে।

হাটা-চলার শক্তিও আল্লাহ তাআআর এক বড় নেয়ামত। এই শক্তিকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন এমন কোন স্থানে ব্যবহার করা যাবেনা। আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন, তিনি অপছন্দ করেন– এমন কোন স্থানে এই শক্তিকে ব্যবহার করা যাবেনা, এমন কোন দিকে যাওয়া যাবে না। চোখ কানের মত এখানেও আমরা চিন্তা করে দেখি যে, একজন পঙ্গু যে চলাফেরা করতে পারে না বা কোন অথর্ব কিংবা প্যারালাইজড ব্যক্তি যদি জানতে পারে যে, আমি কোন গোনাহের কাজে আমার চলাফেরার শক্তি ব্যবহার করবনা এই শর্তে আমার চলার শক্তি ফিরে আসতে পারে, তাহলে সে কি খুশী মনে সেই শর্ত মেনে নিয়ে চলার শক্তি ফিরে পাওয়ার কামনা করবে না? শত বার করবে, হাজার বার করবে? তাহলে আমরা আল্লাহর এই নেয়ামত পেয়ে কেন গোনাহের দিকে যাওয়া থেকে বিরত হতে পারছি না? এভাবে চিন্তা করলে চলার শক্তিকে গোনাহের কাজের দিকে যাওয়া থেকে বিরত রাখা সহজ বোধ হবে।

আল্লাহর দেয়া এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে কেয়ামতের দিন এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখন আমাদের আপন থাকবেনা বরং আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কেয়ামতের দিন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জবান খুলে দেয়া হবে। তখন এই হাত, এই পা, এই জবান, এই চোখ, এই কান, এই অন্তর সব আমাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে আমরা কি কি পাপ কাজে তাদেরকে ব্যবহার করেছি। সূরা ইয়াছীনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

অর্থাৎ, আজ আমি তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দিব, তাদের হাত পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাক্ষী দিবে তারা এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে কি উপার্জন করেছিল অর্থাৎ, কি কাজে তাদেরকে ব্যবহার করেছিল। (সূরা ইয়াছীন: ৬৫)

বোঝা গেল এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের নিজস্ব নয়, যদি নিজস্বই হত, তাহলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিত না। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের নিজস্ব নয়, আমরা এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক নই। আমরা শুধু এগুলির পরিচালক মাত্র। আল্লাহ তাআলাই এগুলোর আসল মালিক। তাই আসল মালিক যেভাবে তার দেয়া এই অঙ্গগুলিকে ব্যবহার করতে বলেছেন, সেভাবেই সেগুলো ব্যবহার করতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সাবধান থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, কোন অঙ্গকে আমরা কোন গোনাহের কাজে ব্যবহার করলে সেই অঙ্গই আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ সাবধান থাকলে এবং এভাবে চিন্তা জাগ্রত রাখলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজে ব্যবহার করতে ভিতর থেকে বাধা আসবে। যেমন কেউ যদি জানে যে, আমি যাকে আমার বন্ধু বলে বিশ্বাস করি বা আমি যাকে আমার খাস খাদেম বলে মনে করি, সে আসলে আমার আপন নয়, এক সময় সে আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে, তাহলে সেই বন্ধু বা সেই খাস খাদেমকে সে কোন অন্যায় কাজে লাগাবে না বা সেই বন্ধু কিংবা সেই খাস খাদেমের সামনে সে কোন অন্যায় করবে না। করতে গেলে তার চিন্তা আসবে যে, এরূপ করলে তো ভবিষ্যতে যে আমার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এই চিন্তা তাকে উক্ত পাপ করা থেকে বিরত রাখবে। তদ্রূপ এই অঙ্গ-প্রতঙ্গও আমার আপন নয়, এগুলিকে কোন গোনাহের কাজে ব্যবহার না করা চাই। করলে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে।

শুধু অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেন এই আদরের স্ত্রী, এই আদরের সন্তান এরাও আমাদের আপন নয়, এরাও আমাদেরকে পাপ কাজে, দ্বীন বিরোধী কাজে লাগাতে পারে। তাদের কারণে আমরা দ্বীন থেকে সরে যেতে পারি। এরূপ করলে তারা আমাদের আপন নয় বরং তারা আমাদের শত্রু। তাই তাদের ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হবে, যেন কোনক্রমেই তারা আমাদেরকে দ্বীন থেকে সরাতে না পারে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ. (সূরা তাগাবুন: ১৪)

অর্থাৎ, হে মু'মিরা! তোমাদের কতক স্ত্রী ও কতক সন্তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে।

এখন কতক স্ত্রী ও কতক সন্তান বলা হয়েছে এ কারণে যে, সব স্ত্রী এবং সব সন্তানই শত্রু নয় বরং যে স্ত্রী এবং যে সন্তান দ্বীন থেকে আমাদেরকে সরিয়ে দেয়, পাপ কাজের জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তারাই শত্রু, অন্যরা শত্রু নয়। মানুষ অনেক সময় স্ত্রী ও সন্তানদের মন রক্ষা করতে যেয়ে পাপ কাজ করে বসে, স্ত্রী ও সন্তানদের দাবী-দাওয়া পূরণ করতে যেয়ে বেশী আয়-ইনকামের চিন্তায় হারাম উপার্জনের দিকে অগ্রসর হয়। তাই আল্লাহ পাক পূর্বের আয়াতের একটু পরেই বলেছেন,

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. (সূরা তাগাবুন: ১৫)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের জন্য পরীক্ষা।

অতএব তাদের কারণে যদি তোমরা পাপের দিকে অগ্রসর হও, হারাম উপার্জনের দিকে অগ্রসর হও, তাহলে তোমরা পরীক্ষায় ফেল। তাই সাবধান থাক যেন কোনভাবেই পরীক্ষায় ফেল না কর। সাবধান থাক তারা তোমাদের নিশ্চিত আপন নয়।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, স্ত্রী সন্তানাদিকে এভাবে শত্রু চিহ্নিত করলে স্ত্রী সন্তানাদির প্রতি মানুষের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে। তাহলে মানুষ স্ত্রী সন্তানাদির জন্য এত চেষ্টা চরিত্র করে আয়-উপার্জন করবে কেন? এ প্রশ্নের জওয়াব হল– সব স্ত্রী সন্তান শত্রু নয় বরং যারা দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয় তাদের কথা বলা হয়েছে। তারপর যারা দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়, তাদের জন্যও কষ্ট মেহনত করে খাওয়াবে এ নিয়তে যে, তাদেরকে ভরণ-পোষণ দিলে ছওয়াব হবে। তাদেরকে এই নিয়তে ভরণ-পোষণ দিবে যে, এর জন্য আল্লাহর কাছে ছওয়াব বা পুরষ্কার পাওয়া যাবে। এজন্যই আল্লাহ পাক পরে বলেছেন,

www.maktabatulabrar.com

وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. (সূরা তাগাবুন: ১৫)

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরষ্কার। বোঝানো হয়েছে যে, স্ত্রী সন্তানাদি পরীক্ষা, এই পরীক্ষায় পাস করতে পারলে আল্লাহর নিকট পুরষ্কার পাওয়া যাবে। তাছাড়া স্ত্রী সন্তানাদি তোমাদের নিশ্চিত আপন না হওয়া সত্ত্বেও যে তাদের ভরণ-পোষণ দিবে এজন্য তোমরা ছওয়াব পাবে।

যাহোক স্ত্রী সন্তানাদি আমাদের নিশ্চিত আপন নয়। যে ভক্ত অনুসারীরা নেতৃবৃন্দের জন্য জীবটা পর্যন্ত দিয়ে দেয়, যে অধীনস্তরা উপরস্তদের জন্য কী না করে থাকে, সেই ভক্তরাও নেতৃবৃন্দের জন্য আপন নয়, সেই অধীনস্তরাও উপরস্তদের জন্য আপন নয়। কুরআনে কারীমে এসেছে,

وَ قَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا. (সূরা আহযাব: ৬৭)

অর্থাৎ, তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম, তারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শস্তি দাও, তাদেরকে ভীষণভাবে অভিশপ্ত কর।

এর বিপরীত নেতৃবৃন্দও অনুসারীদের আপন নয়, কেয়ামতের দিন তারাও অনুসারীদের কোন রকম দায়-দায়িত্ব নিবে না, বরং অনুসারীদের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে– নেতৃবৃন্দরা বলবে,

اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ. (সূরা সাবা: ৩২)

অর্থাৎ, আমরা কি তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই অপরাধী।

দেখা গেল আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিজনও আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের অধীনস্ত অনুসারীরাও আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের নেতৃবৃন্দও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। এই দুনিয়ার সবকিছুই আমাদের অপরাধের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। অতএব কারও খাতিরে কোন গোনাহ করা না চাই। শত্রুর খাতির করতে যেয়ে কেউ নিজের ক্ষতি করে না। তাই চোখকে মজা দিতে গিয়ে গায়র মাহরাম মহিলার দিকে নজর করা না চাই। কানকে মজা দিতে গিয়ে গান-বাদ্য শোনা না চাই। পেটকে মজা দিতে গিয়ে হারাম খাবার খাওয়া না চাই। স্ত্রী পুত্র পরিজনকে মজা দিতে গিয়ে হারাম উপার্জন করা না চাই। ভক্ত অনুসারীদের খাতির করতে যেয়ে তাদের অন্যায়কে চোখ কান বুঝে সহ্য করে যাওয়া না চাই। নেতাদের খুশী করতে যেয়ে তাদের অন্যায়কে অবলীলায় সমর্থন করে যাওয়া না চাই। এক কথায় কারও খাতির করতে যেয়ে কোন পাপ করা না চাই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমরা যেন কারও খাতিরে কোন গোনাহ না করি। আমরা যেন আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করতে পারি। আমরা যেন আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৪৬

কছম ও মান্নত প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْذُرُوْا فَاِنَّ النَّذْرَ لَايُغْنِيْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْـًٔا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আজ আপনাদের সামনে এমন দুটো বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই, আমাদের মধ্যে যে দুটো বিষয়ের খুব প্রচলন আছে, কিন্তু আমরা সে দুটো বিষয়ের আগাগোড়া বা সে সম্বন্ধে মাসায়েল ভাল করে জানিনা। বিষয় দুটো হল কছম ও মান্নত। আমরা অনেকে অনেক ধরনের কছম করি, কিন্তু কোন্ ধরনের কছম করা যায়, কোন্ ধরনের কছম করা যায়না তা ভাল করে জানা দরকার। কারণ, এমনও কছম আছে যে কছম কঠিনভাবে নিষেধ, যে কছম দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাই সব ধরনের কছম খাওয়া যায় না। এ জন্য কছম সম্পর্কে ভালভাবে মাসায়েল জানা দরকার। মান্নতের বিষয়টাও ভাল করে জানা দরকার। কারণ, আমরা অনেকে এই বিশ্বাসে মান্নত করি যে, মান্নত দ্বারা আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। কিন্তু কুরআন হাদীছের আলোকে কি বিষয়টা সেরকম? সেরকম নয়। মান্নত করা দ্বারা ভাগ্যে যা আছে তার পরিবর্তন ঘটে না। তারপরও মান্নত করলে যদি সে অনুযায়ী উদ্দেশ্য পূরণ হয়, তাহলে তার কাফ্ফারার মাসআলা রয়েছে। আবার কিছু কিছু বিষয় এমন আছে যে বিষয়ের মান্নত মানলে তা পূরণ করতে হয় না। কিছু কিছু বিষয় এমনও আছে যার মান্নত করলে তা তো পূরণ করতেই হয়না বরং তার বিপরীতটা করা জরূরী। তাই মান্নত সম্পর্কেও ভালভাবে মাসায়েল জানা চাই, কোন্ ধরনের মান্নতের কি হুকুম তা বোঝা চাই। আজ ইনশাআল্লাহ এই দুটো বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

প্রথমে কছম সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কছম অর্থ শপথ করা, গ্রাম্য ভাষায় বলে কিরা কাটা। এই কছম সম্পর্কে সর্ব প্রথম কথা হল– বিনা প্রয়োজনে কথায় কথায় কছম খাওয়া ঠিক নয়। বিনা প্রয়োজনে কথায় কথায় কছম খাওয়া অন্যায় কাজ। একান্তই যদি কোন বিষয়কে জোরালো করার প্রয়োজনে কছম খেতেই হয়, তবে আল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার কোন নামের কছম করা নিয়ম। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কছম করা তথা গায়রুল্লাহর কছম খাওয়া নিষেধ। যেমন কেউ কেউ কা'বা শরীফের কছম খায়, কেউ কেউ রসূলের কছম খায়, কেউ কেউ ফেরেশতাদের কছম খায়, কেউ কেউ আত্মার কছম খায়, কেউ কেউ পিতা-মাতার কছম খায়, কেউ কেউ সন্তানের কছম খায়। এধরনের কছম খাওয়া নিষেধ। হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ اَوْ لِيَصْمُتْ. (البخاري ٦١٠٨ ومسلم ٤٣٤٦)

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন যে, তোমরা তোমরা পিতাদের নামে কছম খাবে। কেউ কছম খেতে হলে যেন আল্লাহর কছম খায় কিংবা কছম করা থেকে বিরত থাকে, চুপ থাকে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে,

لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلَا بِاُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْاَنْدَادِ. الحديث. (رواه أبو داود ٣٢٥٠ والنسائي ٣٧٦٩)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পিতাদের নামে কছম করনা, মাতাদের নামেও না, মূর্তির নামেও না।

এই দুই রেওয়ায়েতে শুধু পিতা-মাতার কথা বলা হলেও পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নামে বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কছম খাওয়া এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে পিতা-মাতার উল্লেখের পাশাপাশি মূর্তির কথা উল্লেখ করেও এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, পিতা-মাতা প্রমুখের কছম করা গায়রুল্লাহরই কছমের নামান্তর। অতএব আল্লাহ বা আল্লাহর নামের কছম ব্যতীত অন্য কোন কছম করা নিষেধ। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কছম খেলে কছম হয় না। যেমন রসূলের কছম, কা'বা শরীফের কছম বা মাতা-পিতার কছম বা সন্তানের কছম বা যে কোন মানুষের কছম।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কছম খাওয়া যায় না। কারণ, মানুষ কছম করে থাকে কোন বিষয়কে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জোরালো করার জন্য। আর আল্লাহ তাআলাই হলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের সত্তা। তাই তার নাম নিয়ে কছম করে বক্তব্যকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জোরালো করা হয়ে থাকে। এখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর কছম করলে তার অর্থ হবে যে ব্যক্তি বা যে বস্তুর কছম করল সেই ব্যক্তি বা সেই বস্তুই তার কাছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তাহলে সেই অন্য ব্যক্তি বা বস্তুকেই যেন আল্লাহর স্থলে রাখা হল। এটা তো শির্ক পর্যায়ের হয়ে যায়। তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কছম খাওয়া শেরেকী পর্যায়ের শক্ত গোনাহ। এক হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ اَشْرَكَ. (رواه الترمذي برقم ١٥٣٥ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর কছম করল, সে তো শির্ক করল।

অনেকে অন্য ধর্মের কছম করে থাকে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলে যে, আমি অমুক কাজ করলে বা অমুক কথা বললে আমি ইয়াহুদী বা আমি হিন্দু বা আমি খৃষ্টান। এধরনের কছম করাও শেরেকী পর্যায়ের শক্ত গোনাহ। এক হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٦٠٤٧)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের কছম করল, আর সে ব্যাপারে সে মিথ্যুক, তাহলে সে যেরকম বলেছে, সেরকমই হয়ে গেল।

বাহ্যিকভাবে এ হাদীছ থেকে বোঝা যায় অতীতের কোন ব্যাপারে মিথ্যা কছম করে যদি এ ধরনের কথা বলে যে, আমি অমুক কাজ করিনি, করে থাকলে আমি ইয়াহুদী বা আমি হিন্দু বা আমি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

খৃষ্টান, কিংবা বলল, আমি অমুক কথা বলিনি, বলে থাকলে আমি ইয়াহুদী বা আমি হিন্দু বা আমি খৃষ্টান, আর বাস্তবে সে মিথ্যা বলেছে, তাহলে আসলেই সে মুসলমান থাকবে না। বাহ্যিকভাবে হাদীছ থেকে এটাই বুঝে আসে। তবে প্রকৃত পক্ষে তার দিলে সে রকম অমুসলমান হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য থাকে না, বরং কথাটাকে জোরালো করার জন্যই সে এরকম বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যেহেতু তার অন্তরে ইসলাম থাকে, তাই এরকম মিথ্যা কছম করলেও তাকে পরিষ্কার কাফের বলা যাবে না। তবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা থেকে অন্তত এতটুকু অবশ্যই বোঝা যায় যে, এধরনের কছম করা শেরেকী পর্যায়ের শক্ত গোনাহ। কোন মুসলমান এ ধরনে কছম করতে পারে না। তাই এধরনের কছম থেকে অবশ্যই বিরত থাকা চাই।

এরই কাছাকাছি আর এক ধরনের কছম রয়েছে। কেউ কেউ বলে, আমি যদি অমুক কাজ করি, তাহলে যেন বেঈমান হয়ে যাই বা মৃত্যুর সময় যেন ঈমান নছীব না হয় বা অমুক কাজ করলে আমি মুসলমান নই, এ ধরনের কছম করাও ঠিক নয়। এ ধরনের কছমের ব্যাপারে পূর্বের মত শাসানো হয়েছে যে, কেউ এটা করলে সে তেমনই হয়ে যাবে। এক হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْئٌ مِنَ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الْاِسْلَامِ سَالِمًا. (رواه ابو داود في سننه برقم ٣٢٦٠ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বলল যে, অমুকটা করে থাকলে বা বলে থাকলে ইসলামের সাথে আমার সম্পর্ক নেই, তাহলে সে মিথ্যা বলে থাকলে সেরকমই হয়ে যাবে। আর সত্য হলেও ইসলামের দিকে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে না। এ হাদীছে এ ধরনের কছমের ব্যাপারে শাসানী প্রদান করা হয়েছে। অতএব এ ধরনের কছম থেকেও বিরত থাকা চাই।

কছম করলে তার হুকুম কি শুনুন। অতীত বা বর্তমানের কোন বিষয়ে কোন মিথ্যা তথ্য দিলে বা মিথ্যা বললে কঠিন পাপ হয়; তবে তাতে কোন কাফ্ফারা দিতে হয় না। ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে কছম সহকারে কিছু বললে যদি তার খেলাফ করে বা খেলাফ হয় তাহলে কাফ্ফারা দিতে হয়।

তবে কিছু কিছু কছম রয়েছে, যা দ্বারা কছম করা উদ্দেশ্য থাকে না। তার জন্য কাফ্ফারা দিতে হয় না। যেমন কিছু লোকের অভ্যাস আছে কথায় কথায় কছম করে। তারা এমনিতেই কছম করে, তাদের এরকম উদ্দেশ্য থাকে না যে, এটা নিয়মতান্ত্রিক কছম যা ভঙ্গ হলে কাফ্ফারা দিতে হবে। এধরনের কছমকে বলা হয় "অনর্থক কছম"। এধরনের কছমের জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হয় না। তবে কছম করা উদ্দেশ্য, এরকম ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কছম করা হলে আর তা ভঙ্গ করলে বা ভঙ্গ হলে কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ. (সূরা মায়েদা: ৮৯)

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের অনর্থক কছমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না। তবে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কছম করলে তার জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করেন। এরকম কছম করার পর

www.maktabatulabrar.com

তা ভঙ্গ করলে তার কাফ্ফারা হল– দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য প্রদান করবে যেরকম খাদ্য তোমরা তোমাদের পরিবারকে খেতে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে পোশাক প্রদান করবে কিংবা একজন দাস/দাসী মুক্ত করে দিবে। কেউ এই কাফ্ফারা দিতে সক্ষম না হলে সে তিনদিন রোযা রাখবে। তোমরা নিজেদের কছমসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখ।

এ আয়াতে কোন্ ধরনের কছমের কাফ্ফারা দিতে হবে না এবং কোন্ কোন্ ধরনের কছমের কাফ্ফারা দিতে হবে এবং কছমের কাফ্ফারার পরিমাণ কি ইত্যাদি বিষয়গুলো বলে দেয়া হয়েছে। কছমের কাফ্ফারার পরিমাণ হল– দশজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে অথবা খাওয়াতে যে পরিমাণ খাদ্য লাগে বা যে পরিমাণ খরচ হয় তা দিয়ে দিলেও চলবে। যেমন ফেকাহর কিতাবে লেখা হয়েছে এক সের সাড়ে বার ছটাক আটা বা তার মূল্য দিয়ে দেয়া যেতে পারে। বর্তমান কেজির হিসেবে ১ কেজি ৬৬২ গ্রাম আটা বা তার মূল্য দিয়ে দেয়া যেতে পারে। ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, দুই কেজি দিয়ে দেয়াই উত্তম। ধান বা চাউল দিলে এই পরিমাণ মূল্যের দিতে হবে। কাপড় চোপড় দিতে চাইলে প্রত্যেক মিসকীনকে এই পরিমাণ কাপড় দিবে যার দ্বারা তার শরীরের অধিকাংশ জায়গা ঢাকতে পারে। যেমন, পুরুষকে দিলে জামা দিবে এবং তার সাথে পায়জামা বা লুঙ্গি দিবে। মহিলাকে দিলে এত পরিমাণ দিবে যার দ্বারা সে সমস্ত শরীর ঢেকে নামায পড়তে পারে। যদি কেউ দশ মিসকীনকে খাওয়ানো বা কাপড় দেয়ার মত সঙ্গতি না রাখে, তাহলে তাকে এক সঙ্গে বিরতি না দিয়ে তিনটি রোযা রাখতে হবে। এই হল কছমের কাফ্ফারা।

কছমের আরও কিছু হুকুম শুনুন। কোন কাজ করার কছম খেলে তা করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, না করলে গোনাহ হয় এবং কাফ্ফারা দিতে হবে। এর বিপরীত কোন কাজ না করার কছম খেলে সেটা করা তার জন্য হারাম হয়ে যায়, করলে গোনাহ হয় এবং কাফ্ফারা দিতে হয়। তবে কোন গোনাহের কছম করলে সেই কাজ করা তার উপর ওয়াজিব হয় না বরং সেটা যেহেতু গোনাহ, তাই তা করার কছম করলেও তা করা যাবে না। তাই এরকম কছম করলে তার জন্য কছম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। কছম ভেঙ্গে কাফ্ফারা দিতে হবে, নতুবা গোনাহগার হতে হবে। কোন গোনাহের কাজ করার কছম করলে সেই কাজ করা যাবে না– এটা হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীছে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ছামুরাহ (রা.)কে বলেছিলেন,

اِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٦٧٢٢)

অর্থাৎ, যখন তুমি কোন বিষয়ে কছম কর আর দেখ যে অন্যটা করাই ভাল, তাহলে অন্য যেটা ভাল সেটা কর আর তোমার কছমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করতেন। তিনি কোন বিষয়ে কছম করার পর অন্যটা উত্তম মনে করলে সেটাই করতেন এবং কছম ভঙ্গ হওয়ার কারণে কাফ্ফারা দিয়ে দিতেন। এক হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِنِّيْ وَاللهِ اِنْ شَاءَ اللهُ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا اِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَاَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ. (متفق عليه — البخاري برقم ٦٦٢٣ ومسلم برقم ٤٣٥٤)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, আল্লাহ চাহে তো আমি কোন বিষয় করার কছম করলে পরে যদি দেখি অন্যটা উত্তম, তাহলে সেই উত্তমটাই করি আর কছমের কাফ্ফারা দিয়ে দেই।

অতএব গোনাহ বর্জন করা এবং গোনাহের বিপরীত নেক কাজ করাটা যেহেতু ভাল, বরং জরূরী, তাই কোন গোনাহের কাজ করার কছম করলে সেই গোনাহ করা যাবে না বরং সেই কছম ভঙ্গ করে তার কাফ্ফারা দিয়ে দিতে হবে। তদুপরি কোন গোনাহকে মানুষ জায়েয করে নিতে পারে না। এখন যদি বলা হয় যে, কছম করার কারণে গোনাহটাও তাকে করতে হবে, তাহলে সে নিজে গোনাহকে জায়েয করে নিয়েছে বলতে হবে। তা হতে পারে না। তাই কোন অবস্থাতেই গোনাহের কিছু করার কছম করলে তা করার অবকাশ নেই।

যাহোক, এতক্ষণ কছম সম্পর্কে জরূরী কিছু বিষয় আলোচনা করা হল। কছম সম্পর্কে আরও অনেক জরূরী মাসায়েল রয়েছে। বহু ধরনের কথা রয়েছে, যার কতকটার দ্বারা কছম হয়, আবার কতকটার দ্বারা কছম হয় না। এ সব ধরনের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন। সব মাসায়েলের বিষয় ওয়াজের মজলিসে আলোচনা করা যায় না। এখানে কছম সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ জরূরী কিছু কথা –যা বয়ানের মধ্যে বলা সম্ভব– আলোচনা করা হল। বাকী মাসায়েল উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিবেন বা কিতাব পড়ে বুঝে নিবেন। মাসায়েল মূলত নিজে খুসূসী ভাবে উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিতে হয় বা নির্ভরযোগ্য কিতাব পড়ে বুঝতে হয়। কিতাব পড়ে জানার জন্য আপনারা "আহকামে যিন্দেগী" কিতাবখানাও পড়তে পারেন।

এরপর আমরা মান্নত সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

মান্নতের ব্যাপারে প্রথমত কথা হল– আমরা মনে করি মান্নত করলে উদ্দেশ্য পূরণ হবে বা মান্নত দ্বারা বালা-মুসীবত দূর হবে, বিপদ-আপদ কাটবে। এভাবে মনে করার অর্থ হল– মান্নত দ্বারা ভাগ্যে যা আছে তার পরিবর্তন ঘটে। এরূপ মনে করে মান্নত করা ঠিক নয়। মান্নত দ্বারা তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটেনা। এক হাদীছে একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا تَنْذُرُوْا فَإِنَّ النَّذْرَ لَايُغْنِيْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ. (رواه مسلم برقم ٤٣٢٩)

অর্থাৎ, তোমরা মান্নত কর না। বস্তুত মান্নত তাকদীরের ব্যাপারে কিছু করতে পারে না। মান্নত দ্বারা এতটুকু হয় যে, বখীল ধরনের লোক থেকে কিছু মাল বের হয়।

এ হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়– মান্নত দ্বারা ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না, ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই, মান্নত করা দ্বারা তা ঠেকানো যাবে না। তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, মান্নত দ্বারা যখন তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটে না, যা ঘটার তা ঘটবেই, তাহলে মান্নত করা হয় কেন? তাহলে তো মান্নত তো জায়েয হওয়ার কথা নয়। তাহলে শুনুন, মান্নত দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় কিছু সম্পদ বের হয়, হতে পারে এই ওছীলায় আল্লাহ পাকের রহমত হবে। কিংবা মান্নত করা দ্বারা আল্লাহর প্রতি আশা প্রবল হয় যে, তিনি আমার এই উদ্দেশ্য পূরণ করবেনই। আল্লাহর প্রতি আশা প্রবল করার কারণেও হতে পারে আল্লাহ পাক তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবেন। তাই মান্নত করা না জায়েয নয়। হাদীছে যা বলা হয়েছে তার দ্বারা শুধু এতটুকু বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা এরকম মনে কর না যে, মান্নত করলে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

উদ্দেশ্য পূরণ হবেই। কারণ, মান্নতের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। মান্নত তাকদীরের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। আল্লাহ চাইলে অবশ্যই সবকিছু হতে পারে।

কছমের মত মান্নতের বেলায়ও ঐ একই কথা যে, শরী'আতের খেলাফ মান্নত মানা যাবেনা। মানলে তা পূর্ণ করা যাবে না। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةٍ. الحديث. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٤٣٣٣)

অর্থাৎ, আল্লাহর নাফরমানী হয়, তথা গোনাহ হয়– এমন কোন মান্নত পূরা করা যাবে না।

অন্য এক হাদীছে এসেছে,

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٦٦٩٦)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কোন বিষয়ে মান্নত করবে সে যে যেন সে মান্নত পূরণ করে আল্লাহর আনুগত্য করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানির কোন বিষয়ে মান্নত করে সে যেন সেটা পূরণ করে আল্লাহর নাফরমানী না করে।

অতএব কোন গোনাহের কাজের মান্নত মানলে তা পূরণ করা যাবেনা। যেমন মাযারে কোন কিছু দেয়ার মান্নত করলে তা পূরণ করা যাবে না। কারণ, মাযারে মান্নত মানা গোনাহ। এমনিভাবে কোন নাচ গানের মান্নত করলে তা পূরণ করা যাবে না। কারণ, নাচ গান করা গোনাহ। ফাতাওয়া রহীমিয়্যার চতুর্থ খন্ডে পরিষ্কার বলা হয়েছে, মীলাদের মান্নত মানলে সে মান্নত পুরা করার দরকার নেই। কারণ, প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বেদআত।

এমনিভাবে কোন অনর্থক জিনিসের মান্নত করলেও তা পূরণ করার দরকার নেই। যেমন বোখারী শরীফের এক হাদীছে এসেছে, একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এসময় দেখলেন একটা লোক দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন অন্য লোকেরা বলল, লোকটা মান্নত করেছে যে, সে বসবে না দাঁড়িয়ে থাকবে। সে আরও মান্নত করেছে যে, কোন কিছুর ছায়া গ্রহণ করবে না। সে আরও মান্নত করেছে যে, কারও সাথে কথা বলবেনা। সে আরও মান্নত করেছে যে, রোযা রাখবে। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. (رواه أبو داود برقم ٣٣٠٢ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, তাকে বলে দাও, সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে। আর সে যেন রোযা করে নেয়।

এ হাদীছে দেখা যাচ্ছে লোকটা চারটা বিষয়ের মান্নত মেনেছিল। ১. কথা বলবে না। ২. ছায়া গ্রহণ করবে না। ৩. বসবে না। ৪. রোযা রাখবে। এর মধ্যে প্রথম তিনটা ছিল বেফায়দা জিনিসের মান্নত। কারণ, কোন কথা বলবে না এটা কোন ফায়দার জিনিস নয় বরং প্রয়োজনীয় স্থানে কথা বলাই ফায়দার। এমনিভাবে ছায়া গ্রহণ না করার মধ্যে কোন দ্বীনী দুনিয়াবী ফায়দা নেই বরং ছায়া গ্রহণ করার মধ্যেই ফায়দা। এমনিভাবে না বসার মধ্যেও কোন ফায়দা নেই। কথা বলবেনা, ছায়া গ্রহণ করবে না, বসবে না– এগুলি কোন ফায়দার জিনিস নয়, এগুলি অনর্থক। আর চতুর্থটা তথা রোযা রাখা ছিল বয়ান

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ফায়দার জিনিস। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিও ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথম তিনটা ছাড়তে বলেছেন আর চতুর্থটা করতে বলেছেন। বোঝা গেল কোন অনর্থক জিনিসের মান্নত করলেও তা পূরণ করার দরকার নেই।

হাদীছে এরকম বহু বিষয়ের উল্লেখ এসেছে যে, কেউ কোন অনর্থক জিনিসের কছম করেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পূরণ করার দরকার নেই বলেছেন। এক হাদীছে এসেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তার দুই পুত্রের কাধে ভর করে হজ্জ করছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার? তারা জানাল, লোকটা পায়ে হেঁটে বাইতুল্লা শরীফ গমনের মান্নত করেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই লোকটা এভাবে নিজেকে কষ্ট দিবে আল্লাহর এর কোন ঠেকা নেই, এই মান্নতের আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হুকুম দিলেন যে, সওয়ার হয়ে যাও। এধরনের শক্তির বাইরের কোন বিষয়ের কছম করলে তার ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে মান্নত পূরা করতে হবেনা। তবে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। কছমের যে কাফ্ফারা দিতে হয়, তা দিয়ে দিবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ. (رواه ابو داود برقم ٣٢٢٤)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এমন কোন মান্নত করবে যার সে ক্ষমতা রাখে না, তাকে কছমের ন্যায় কাফ্ফারা দিতে হবে।

অন্য এক হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ. (رواه مسلم برقم ٤٣٤٢)

অর্থাৎ, মান্নতের কাফ্ফারা হল কছমের ন্যায়।

মান্নতের কিছু জরূরী হুকুম শুনে নিন। কোন ইবাদত জাতীয় বিষয়ে মান্নত মানলে যদি যে উদ্দেশ্যে মান্নত করেছে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, তাহলে ঐ মান্নত পূরা করা ওয়াজিব। উদ্দেশ্য পূর্ণ না হলে মান্নত আদায় করা ওয়াজিব হয় না। আর কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিতেই আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোন কিছুর মান্নত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

এ ছাড়াও মান্নতের ব্যাপারে আরও অনেক জরূরী মাসায়েল রয়েছে, কোন্ ধরনের কথায় মান্নত হয়, কোন্ ধরনের কথায় মান্নত হয়না, কোন্ ধরনের মান্নত কিভাবে পূর্ণ করতে হয় ইত্যাদি অনেক মাসায়েল রয়েছে। সেগুলি উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নেয়া চাই বা কিতাব পড়ে জেনে নেয়া চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

নং – ৪৭

নিদ্রা ও স্বপ্ন প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا. الاية. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আজ আপনাদের সামনে এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যেটাকে আপনারা খুব একটা প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে নাও করতে পারেন। তবে আলোচনা শেষ হওয়ার পর হয়তো অনেকে বুঝবেন যে, এ বিষয়টার বিস্তারিত আলোচনা দরকার ছিল। বিষয়টা এমন যে, প্রত্যেকের জীবনে সদা সর্বদা বিষয়টা ঘটছে। কেউ এমন নেই, যার জীবনে বিষয়টা না ঘটে। বিষয়টা হল স্বপ্ন। স্বপ্নের বিষয়টা এদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, এই স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের ভবিষ্যতের অনেক ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের অনেক কিছু আমাদেরকে জানানো হয়। এদিক থেকেও স্বপ্নে বিষয় বোঝা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার কিছু কিছু স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে মানুষকে পেরেশান করার জন্য বা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। তাই সেই পেরেশানী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও স্বপ্নের বিষয়টা বোঝার গুরুত্ব রয়েছে।

মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার জীবাত্মা দেহের মধ্যে থাকে, তবে পরমাত্মা বের হয়ে রূহানী জগতে তথা আত্মার গিয়ে বিচরণ করে। জীবাত্মা দেহের মধ্যে থাকার কারণে দেহ বেঁচে থাকে, কিন্তু পরমাত্মা না থাকার কারণে চেতনা ও বোধ শক্তি থাকেনা। পরমাত্মা আত্মার জগতে গিয়ে যা কিছু দেখে সেটাই হল স্বপ্ন।

মৌলিকভাবে স্বপ্নের তিনটা প্রকার রয়েছে। কিছু কিছু স্বপ্ন হয় মানুষের শারীরিক কারণে বা স্বভাবগত কারণে বা চিন্তা চেতনাগত কারণে কিংবা পরিবেশগত কারণে। কিছু কিছু স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। আর কিছু কিছু স্বপ্ন হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে বা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে।

প্রথম প্রকার স্বপ্নের উদাহরণ হল– যেমন কারও ঠান্ডা বা সর্দী লাগলে সে স্বপ্ন দেখতে পারে, পানির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, নৌকায় বা জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছে নৌকাটা বা জাহাজটা ডুবে গেল বা প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে ইত্যাদি। পেশাবের বেগ থাকলে স্বপ্নে দেখতে পারে যে, সে পানিতে ডুবে যাচ্ছে। এগুলি হল শারীরিক কারণে স্বপ্ন। স্বভাবগতভাবে কেউ রাগী হলে সে স্বপ্ন দেখতে পারে কাউকে মারধর করছে বা রাগারাগি করছে, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে চুরে ফেলছে, সাপে কাটছে, বাঘে আক্রমণ করছে ইত্যাদি। এগুলি হল স্বভাবগত কারণে স্বপ্ন। স্বভাবগতভাবে কারও মধ্যে শুষ্কতা থাকলে বা পেট কষা থাকলে সে স্বপ্নে দেখতে পারে যে, বাতাসে উড়ছে বা আগুন দেখতে পারে ইত্যাদি। এগুলিও স্বভাবগত কারণে স্বপ্ন। বাইরের পরিবেশে ঠান্ডা বাতাস বইছে এ অবস্থায় কেউ স্বপ্নে দেখতে পারে যে, পানির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। এটা হল পরিবেশ গত কারণে স্বপ্ন। যাহোক এ ধরণের স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা নেই। এ জাতীয় স্বপ্নে কিছু যায় আসে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হল শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন। এই স্বপ্নের ব্যাপারে বেশ সাবধান থাকা চাই। শয়তান বিভিন্ন রকম স্বপ্ন দেখিয়ে থাকে। কখনও তার উদ্দেশ্য হয় মানুষকে পেরেশান করানো। কখনও উদ্দেশ্য হয় মানুষকে বিভ্রান্ত করা।

অনেক সময় শয়তান মানুষকে পেরেশান করার জন্য খারাপ স্বপ্ন দেখায়। শয়তানের কাজ হল মানুষের ক্ষতি করা। খারাপ স্বপ্ন দেখিয়ে কাউকে পেরেশান রাখতে পারলে শয়তান তাতে লাভ মনে করে। কারণ, মানুষের মন খারাপ থাকলে ইবাদত-বন্দেগীতেও তার মন বসে না। আর এরকম হলেই শয়তান তাতে লাভ মনে করে। তাই শয়তানই মানুষকে খারাপ স্বপ্ন দেখায়।

অনেক সময় শয়তান খারাপ স্বপ্ন দেখায় মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। অনেক সময় শয়তান কুরআন হাদীছ বিরোধী স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আমার কাছে একবার এক ব্যক্তি এরকম স্বপ্ন বর্ণনা করেছে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে হিন্দুদের মনসা দেবতাকে দুধ কলা দিচ্ছে। তাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে, মনসাকে দুধ কলা না দিলে তার সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমি বলেছি, এটা শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ স্বপ্ন দেখাননি। কারণ, ফেরেশতারা কোন নাফরমানী করে না। মনসাকে দুধ কলা দেয়া আল্লাহর নাফরমানী। ফেরেশতারা এ স্বপ্ন দেখাতে পারেন না। ফেরেশতারা এ নির্দেশ দিতে পারেন না। আমি বললাম, কক্ষনো এটা করা যাবে না। সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে বোঝা যাবে তার মধ্যে শয়তানের কারসাজি রয়েছে। শয়তান কারসাজি করলে এবং আছর করলে কেউ অসুস্থও হয়ে পড়তে পারে। কারণ, শয়তানও জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। আর জিনরা আছর করতে পারে। তাই অসুস্থ হয়ে পড়লে জিন তাড়ানোর তাবীজ দিলে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। চিন্তা করে দেখুন স্বপ্ন দ্বারা মানুষ কতখানি বিভ্রান্ত হতে পারে! স্বপ্ন দ্বারা শয়তান কতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তার কয়েকটা নমুনা শুনুন। একজন স্বপ্নে দেখল যে, সাত আসমানের উপর দিয়ে সায়র করছে বা আরশের কাছে চলে গেছে, ব্যাস সে মনে করল আমি তো বড় বুযুর্গ হয়ে গেছি। এভাবে শয়তানই তাকে বিভ্রান্ত করল। একজন স্বপ্নে দেখল যে, বড় বড় ওলি আউলিয়ারা এসে তাকে পাগড়ী পরিয়ে দিয়ে গেলেন বা তাকে তাদের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। ব্যাস সে মনে করে বসল আমি তো বড় ওলী হয়ে গেছি। এভাবে শয়তানই তাকে বিভ্রান্ত করল। যাহোক এ হল শয়তানী স্বপ্নের বিবরণ।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে বা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে যে স্বপ্ন হয়ে থাকে। এই প্রকার স্বপ্নের গুরুত্ব রয়েছে। অবশিষ্ট দুই ধরনের স্বপ্নের কোন মূল্য নেই। প্রথম প্রকারের স্বপ্নে আল্লাহর পক্ষ মানুষকে ভবিষ্যতের অনেক বিষয়ে অবগত করানো হয়। নবীগণ ব্যতীত আর কারও পক্ষে আল্লাহ তাআলা থেকে কোন কিছু সরাসরি জানার উপায় নেই। একমাত্র এই প্রকারের স্বপ্নই এমন একটা বিষয়, যার মাধ্যমে মানুষকে অনেক কিছু জানানো হয়, অনেক বিষয়ের সু-সংবাদ জানানো হয়, অনেক বিষয়ে সতর্ক করা হয়। এক হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ. (رواه البخاري برقم ٦٩٩٠)

অর্থাৎ, নবুয়তের মাধ্যমে যে অনেক কিছু জানার উপায় ছিল আমার পরে তার কোন কিছু আর জানার সুযোগ অবশিষ্ট নেই, শুধুমাত্র সু-সংবাদ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, সু-সংবাদ বলে কি বোঝানো হচ্ছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্য সঠিক স্বপ্ন।

অর্থাৎ, এই সত্য সঠিক স্বপ্নই এমন একটা বিষয় যার মাধ্যমে মানুষকে ভবিষ্যতের অনেক বিষয়ে সু-সংবাদ জানানো হয়। এমনিভাবে অনেক বিষয়ে সতর্কও করা হয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

যাহোক এই তিন প্রকার স্বপ্নের কথা আলোচনা করা হল। এর মধ্যে শারীরিক ও স্বভাবগত কারণে স্বপ্ন হলে তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করা বা ঘাবড়ানোরও কিছু নেই, কিছু করারও নেই। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন দেখলে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। আর শয়তানের পক্ষ থেকে খারাপ স্বপ্ন দেখলে হাদীছে তিনটা কাজ করার কথা এসেছে। সেই তিনটা কাজ করলে খারাপ স্বপ্নের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا رَأَى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٠٤١)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তখন সে বা দিকে তিনবার থুথু করবে এবং আল্লাহর কাছে তিনবার শয়তান থেকে পানাহ চাইবে আর যে পাশে শয়ন করা ছিল সেই পাশ ফিরে অন্য পাশে শয়ন করবে।

এ হাদীছে খারাপ স্বপ্ন দেখলে তিনটা কাজ করতে বলা হয়েছে।

১. তিনবার বা দিকে থুথু করবে।

২. আল্লাহর কাছে তিনবার শয়তান থেকে পানাহ চাইবে। এভাবে পানাহ চাইবে– اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا অর্থাৎ, আমি আল্লাহর কাছে শয়তানের অনিষ্ট হতে এবং এই স্বপ্নের অনিষ্ট হতে পানাহ চাই।

৩. যে পাশে শয়ন করা ছিল সেই পাশ ফিরে অন্য পাশে শয়ন করবে। যে কোন খারাপ স্বপ্ন দেখার পর এই তিনটা কাজ করলে ইনশাআল্লাহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে।

তাছাড়া অনেক সময় কোন স্বপ্নকে খারাপ মনে হলেও আসলে তা খারাপ নাও হতে পারে। তাই কোন স্বপ্নকে খারাপ মনে হলেই পেরেশান হতে নেই। পেরেশান হয়ে অযথা নিজের ক্ষতি করে কী লাভ? কারণ, হতে পারে সেটা আসলে খারাপ নয়। যেমন আপনি পায়ে ডান্ডা বেড়ি স্বপ্নে দেখলে পেরেশান হতে পারেন যে, হায়রে বন্দী হয়ে যাই কি না? কিন্তু এর ভাল ব্যাখ্যাও হতে পারে। এর ব্যাখ্যা এরকমও হতে পারে যে, আপনি দ্বীনের উপর স্থির থাকতে পারবেন। কিংবা এরকম ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, আপনাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে বেশী ঘোরাফেরা করো না, স্থির হয়ে নিজের কাজ করতে থাক। কেউ যদি কবর স্বপ্নে দেখে তাহলে সে সহসা মরে যাবে চিন্তা করে পেরেশান হতে পারে, কিন্তু এর ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, তাকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যাতে সে আমলের দিকে অগ্রসর হয়। অনেকে মরে যাওয়া স্বপ্নে দেখে পেরেশান হয়, অথচ কারও মরে যাওয়া স্বপ্নে দেখলে সাধারণত তার ব্যাখ্যা এই হয় যে, তার মর্যাদা বুলন্দ হবে। এভাবে অনেক স্বপ্নই এমন আছে বাহ্যিকভাবে তা খারাপ মনে হতে পারে এবং সে কারণে মানুষ পেরেশান হতে পারে, কিন্তু আসলে সেটা ভাল স্বপ্ন, যাতে পেরেশান হওয়ার মত কিছু নেই। তাই কোন স্বপ্ন খারাপ মনে হলেই পেরেশান হতে নেই।

বাহ্যিকভাবে খারাপ মনে হয়, অথচ সেটা ভাল স্বপ্ন– এরকম স্বপ্নে একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা শুনুন। একবার এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, সে পবিত্র কুরআনে শরীফের উপর পেশাব করছে। সে খুব পেরেশান হল যে, হায়রে আমি কি এতই খারাপ হয়ে গেছি! আমার পরিণাম যেন কী হয়! সে দিল্লীর প্রসিদ্ধ আলেম হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর কাছে এসে স্বপ্নটা জানাল। হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) স্বপ্ন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

শুনে বললেন, মাশাআল্লাহ তোমাকে সু-সংবাদ জানানো হয়েছে যে, তোমার পুত্র কুরআনের হাফেজ হবে। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। তাই কোন স্বপ্ন বাহ্যিকভাবে খারাপ মনে হলেই পেরেশান হতে নেই। কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে সে স্বপ্ন সম্বন্ধে জানালে তিনি বুঝবেন আসলে সেটার কি ব্যাখ্যা। যেসব বিজ্ঞ আলেম কুরআন হাদীছের সুক্ষ্ম ইংগিত ও উপমা বিদ্যা এবং মানুষের মনস্তত্ব সম্পর্কে ভাল অবগত, তারা স্বপ্নের ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারেন। সকলের পক্ষে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব নয়।

অনেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য বাজারে স্বপ্নের ব্যাখ্যা মূলক যেসব খাবনামা, ফালনামা, স্বপ্নের তাবীর ইত্যাদি নামের বই পাওয়া যায়, তা দেখে স্বপ্নের ব্যাখ্যা খোঁজা শুরু করেন। এভাবে তার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানা নাও হতে পারে। কারণ, একই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এক এক জনের বেলায় এক এক রকম হতে পারে। ব্যক্তির মন-মেজায, ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, ব্যক্তির বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এমনিভাবে মওসুম ও ঋতুর পার্থক্যেও স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তাই বইয়ের একটা ব্যাখ্যা দেখেই তা সব ঋতুতে এবং সকলের বেলায় প্রয়োগ করা যায়না। একটা ঘটনা শুনুন। এই উম্মতের মধ্যে প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইমাম হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (রহ.) ছিলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। একবার এই হযরত ইবনে সিরীন (রহ.)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হুজুর! স্বপ্নে দেখি আমার ঘরের মেঝে থেকে আগুন উঠছে। তিনি লোকটাকে বললেন, তুমি দ্রুত ঘরে চলে যাও, দ্রুত ঘরের মাল-সামান বের করে ফেল। তোমার ঘর পড়ে যাবে। লোকটা তা-ই করল। কিছুক্ষণ পর সত্যিই তার ঘর ভেঙ্গে পড়ল। আর একবার আর এক ব্যক্তি হযরত ইবনে সিরীন (রহ.)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হুজুর! স্বপ্নে দেখি আমার ঘরের মেঝে থেকে আগুন উঠছে। তখন তিনি তাকে বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! তোমার ঘরের মধ্যে গুপ্ত ধন লুকানো আছে। তুমি খনন করে তা উদ্ধার করতে পার। লোকটা ঘরের মেঝে খনন করে গুপ্ত ধন বের করে নিল। তখন হযরত ইবনে সিরীন (রহ.)-এর এক শাগরেদ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর একই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দুইজনের বেলায় দুই রকম হল কেন? হযরত ইবনে সিরীন (রহ.) বললেন, প্রথম ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছিল গরমের মওসুমে। গরমের মওসুমে আগুন ভাল নয়। তাই তার বেলায় ব্যাখ্যা ওরকম হয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছে শীতের মওসুমে। আর শীতের মওসুমে ঘরের মধ্যে আগুন উপকারী, সেই আগুন দিয়ে তাপ নিয়ে শীত নিবারণ করা যায়। তাই তার বেলায় ভাল ব্যাখ্যা হয়েছে। দেখা গেল একই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এক এক জনের বেলায় এক এক রকম হতে পারে, এক এক মওসুমে এক এক রকম হতে পারে। অতএব বাজারের লেখা বইয়ের গদবাধা ব্যাখ্যা দেখে নিশ্চিত ব্যাখ্যা জানা নাও হতে পারে। আর অনিশ্চিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি ভুল করতে পারেন বা মারাত্মক ধরনের কোন অসুবিধার সন্মুখীনও হতে পারেন। অতএব গদবাধা ব্যাখ্যা দেখে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া আপনার জন্য নিরাপদ নয়। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার নিশ্চিত ও নিরাপদ পন্থা হল এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন আলেমের স্মরণাপন্ন হবেন। কোন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে হলে স্বপ্ন দেখার পর বিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন অভিজ্ঞ আলেমের স্মরণাপন্ন হন, তাহলে তিনি তখনকার পরিবেশ, মওসুম ও আপনার বিদ্যা-শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি সবকিছু বিবেচনা করে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। বিলম্ব করলে হয়তো আপনার স্বপ্ন দেখার সময়, পরিবেশ, মওসুম ইত্যাদি তার কাছে অস্পষ্ট হওয়ায় সঠিক ব্যাখ্যা দিতে ভুলও করতে পারেন। তাই আপনার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা পেতে হলে বিলম্ব না করে ব্যাখ্যা দাতার কাছে যাওয়া ভাল।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

যাহোক স্বপ্ন বলতে হলে অভিজ্ঞ আলেমের কাছে বলুন, তাহলে সঠিক ব্যাখ্যা জানতে পারবেন বা অন্তত বন্ধু মানুষের কাছে বলুন –যে আপনাকে খারাপ কোন ব্যাখ্যা দিবে না–। সকলের কাছে স্বপ্ন বলতে নেই। তাহলে যদি সে খারাপ কোন ব্যাখ্যা দিয়ে বসে তাহলে খারাপ আছর হতে পারে। এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا اِلَّا لَبِيْبًا اَوْ حَبِيْبًا. (رواه الترمذي برقم ٢٢٧٨ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, বন্ধু বা বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত অন্য কারও কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করনা।

স্বপ্নের ব্যাপারে একটা জরুরী কথা মনে রাখতে হবে যে, স্বপ্ন কোন স্বতন্ত্র দলীল নয়, বরং স্বপ্ন হল সহযোগী বিষয়ের মত। অতএব শরীয়ত বিরোধী কোন স্বপ্ন দেখলে সেই স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ করা যাবেনা। আমরা যদি এমন কোন স্বপ্ন দেখি যা শরীয়তে নেই, সেটা করা যাবে না। শরীয়ত সমর্থন করে এমন কিছু স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নকে সহযোগী হিসেবে মনে করে সে কাজ করা যাবে। যেমন কিছু উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে অমুক মাজারে শিরণী দাও বা নজর নেওয়াজ দাও বা গরু ছাগল দাও, বা অমুক পুজা মন্ডপে সাপকে দুধ কলা দাও, তাহলে এসব স্বপ্ন অনুযায়ী আমল করা যাবে না। কারণ, মাজারে শিরণী বা নজর নেওয়াজ দেয়া জায়েয নয়। এমনিভাবে পূজা মন্ডপে কিছু দেয়াও জায়েয নয়। কাজেই এসব স্বপ্ন অনুসারে কাজ করা যাবে না। কারণ, স্বপ্ন শরীয়ত বিরোধী হলে সেই স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ করা যায় না। এর বিপরীত কেউ যদি গরীব-মিসকীনকে দান-খয়রাত করতে স্বপ্ন দেখে, মসজিদ মাদ্রাসা বানাতে স্বপ্ন দেখে, ছেলে মেয়েকে কুরআন শেখাতে স্বপ্ন দেখে, হজ্জ উমরা করতে স্বপ্ন দেখে বা এ জাতীয় এমন কিছু করতে স্বপ্ন দেখে যা শরীয়তে আছে, তাহলে সেই স্বপ্ন অনুসারে কাজ করতে পারবে।

শরীয়ত বিরোধী তথা কুরআন হাদীছ বিরোধী স্বপ্ন অনুসারে কাজ করা যায় না। কারণ, আমাদের স্বপ্ন দলীল নয়। আমাদের দলীল হল কুরআন হাদীছ। অতএব কুরআন হাদীছ বিরোধী স্বপ্ন হলে সে স্বপ্ন গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র নবীদের স্বপ্ন হল দলীল। কারণ, নবীদের স্বপ্ন হয় ওহী। তাই নবীগণ যা স্বপ্ন দেখেন তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। নবীদের জন্য স্বপ্ন হল দলীল।

আমাদের স্বপ্ন দলীল না হওয়ার কারণ হল ঘুমের মধ্যে আমাদের চেতনা ঠিক থাকে না। কি দেখেছি তা হয়ত সঠিকভাবে মনে নেই বা সঠিকভাবে তা বুঝতে পারিনি কিংবা যা দেখেছি তা কি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেখেছি না শয়তানের পক্ষ থেকে তারও গ্যারান্টি নেই। তাই আমাদের স্বপ্ন দলীল হতে পারে না। পক্ষান্তরে নবীগণ ঘুমালেও তাদের চেতনা সজাগ থাকে। হাদীছে এসেছে– নবীদের চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁদের অন্তর জাগ্রত থাকে। ফলে তাঁরা স্বপ্নে কি দেখেছেন তা সঠিকভাবে বুঝতেও পারেন, মনেও রাখতে পারেন, যেহেতু তাদের অন্তর জাগ্রত। আর শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকেও আল্লাহ পাক তাদেরকে হেফাজতে রাখেন। তাই নবীগণের স্বপ দলীল হয়ে থাকে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাই স্বপ্নের আদেশ অনুযায়ী পুত্রকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

আমাদের কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে, বাচ্চাকে বলি দিয়ে দাও, তাহলে সে স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ করা যাবে না। কারণ, আমাদের জন্য স্বপ্ন দলীল নয়। আমাদের জন্য দলীল হল কুরআন হাদীছ। আর কুরআন হাদীছে বাচ্চাকে হত্যা করা নিষেধ। তাই বাচ্চাকে বলি দেয়ার স্বপ্ন দেখলেও তা করা যাবে না। আমরা যদি স্বপ্নে দেখি কোন পীরের মাজারে খাশি দিচ্ছি বা পীরের মাজারে ওরস করতে গেছি, তাহলে তা করা যাবে না। কারণ, কুরআন হাদীছের আলোকে এগুলো নিষিদ্ধ। আমরা যদি স্বপ্নে দেখি সিনেমায় যাচ্ছি বা টেলিভিশন ক্রয় করছি, তাহলে সেই স্বপ্ন অনুযায়ী সিনেমায় রওয়ানা দেয়া যাবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না, সেই স্বপ্নে দোহাই দিয়ে টেলিভিশন ক্রয় করা যাবে না। সারকথা কুরআন হাদীছ বিরোধী কোন স্বপ্ন দেখে কেউ সে অনুযায়ী কাজ করতে পারবে না।

অনেক ভাই স্বপ্ন নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামান। স্বপ্ন দেখলেই তার ব্যাখ্যা জানার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। অথচ স্বপ্ন নিয়ে বেশী মাথা ঘামানোর দরকার নেই। স্বপ্নের পিছনে খুব বেশী পড়া না চাই। স্বপ্ন যেহেতু দলীল নয় তাই স্বপ্ন নিয়ে বেশী ব্যতিব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। স্বপ্নে কি দেখলাম কি না দেখলাম সেটাকে বেশী মূল্য না দেয়া চাই। বরং কুরআন হাদীছে কি এসেছে, শরীয়ত কি বলে– সেটাকেই বেশী মূল্য দিয়ে সেভাবে কাজ করে যাওয়া চাই। কারণ, স্বপ্নে যা কিছু দেখা হয়, তা ভুলও হতে পারে। তাই স্বপ্নের পিছনে বেশী না পড়া চাই।

তবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলে সেটা ভুল নয়। হাদীছে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَتِيْ. (رواه البخاري برقم ٦٩٩٤ ورواه مسلم برقم ٦٠٥٦)

অর্থাৎ, যে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে প্রকৃতপক্ষেই আমাকেই দেখেছে। কারণ, শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না।

অনেক ভাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর আসল রূপে দেখতে পায়না বরং কিছু ব্যতিক্রম অবস্থায় দেখতে পায়। যেমন কেউ দেখল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি নেই, কেউ দেখল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীর্ণশীর্ণ শরীরে আছেন ইত্যাদি। এভাবে বিকৃত অবস্থায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার ফলে সে এই হাদীছ নিয়ে সন্দেহে পড়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষেই যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে থাকি, তাহলে তাঁর আসল রূপে কেন দেখলাম না? এর কারণ হল– স্বপ্নে অনেক সময় নিজের আমলের ত্রুটির আছর পড়ে থাকে। ফলে যার মধ্যে সুন্নাতের ত্রুটি আছে সে দেখতে পারে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি নেই বা তার শরীর জীর্ণশীর্ণ। অনেকে নিজের মুখে দাড়ি না থাকার কারণে স্বপ্নে আল্লাহ তাআলাকে এ অবস্থায় দেখে যে, আল্লাহ তাআলার দাড়ি নেই।

মানুষ বিভিন্ন সময় স্বপ্ন দেখতে পারে। যে কোন সময়ের স্বপ্ন সত্য হতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশী সত্য হয় ভোর রাতের স্বপ্ন। হাদীছে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْاَسْحَارِ. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٨١٨٣ وقال : صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, সবচেয়ে বেশী সত্য হয় ভোর রাতের স্বপ্ন।

কোন শ্রেণীর মানুষের স্বপ্ন বেশী সত্য হয় তা শুনুন। ঐ শ্রেণীর মানুষের স্বপ্ন বেশী সত্য হয় যাদের অন্তর গোনাহের কালিমা থেকে পরিষ্কার। যাদের অন্তর যত বেশী পরিষ্কার হয়, তাদের স্বপ্ন তত বেশী সত্য হয়। কারণ, স্বপ্ন হল আত্মিক জগতের বিষয়। যার আত্মা যত বেশী পরিষ্কার হয়, তার আত্মার সাথে সেই জগতের সু-সম্পর্ক তত বেশী হয়। সে সেই জগতের তত বেশী আপন হয়ে উঠে। ফলে সেই জগতের ভাল ভাল তথ্য তার আত্মা গ্রহণ করতে পারে বেশী। এজন্যই যার অন্তর যত বেশী

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

পরিষ্কার হয়, তার স্বপ্ন তত বেশী সত্য হয়। এর বিপরীত যার অন্তরে গোনাহের কালিমা যত বেশী, তার অন্তরে সেই জগতের সু তথ্যাবলী স্থান পায় কম। ফলে তার সত্য স্বপ্ন হয় কম।

যারা যত বেশী পবিত্র হয়, তাদের স্বপ্ন তত বেশী সত্য সত্য হওয়ার আর একটা কারণ হল– পবিত্র থাকলে ফেরেশতাদের কাছে পছন্দনীয় হওয়া যায়। পবিত্র থাকলে ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক ভাল থাকে। যারা পবিত্র থাকে তাদের কাছে ফেরেশতাদের আগমন বেশী ঘটে। তাই ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তারা স্বপ্ন লাভ করে থাকে। আর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে যে স্বপ্ন হয়, তা সত্য।

যারা বাহ্যিকভাবে পবিত্র থাকে, সেই পবিত্রতাও ভাল স্বপ্ন লাভের ক্ষেত্রে ভাল আছর করে। এজন্যই যারা উযুর সাথে ঘুমায় তাদের স্বপ্ন বেশী সত্য হয়।

আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, যারা বিনা উযুতে ঘুমায় তাদের স্বপ্ন সত্য হয়না বা যারা পাপী তাদের স্বপ্ন সত্য হয় না। বিনা উযুতে ঘুমালেও স্বপ্ন সত্য হতে পারে, পাপীদের স্বপ্নও সত্য হতে পারে, এমনকি কাফেরের স্বপ্নও সত্য হতে পারে। যেমন কুরআনে কারীমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে মিসরের যে বাদশাহর স্বপ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই বাদশাহ স্বপ্ন দেখার সময় কাফের ছিল। আর কাফেরের উযু থাকার তো প্রশ্নই ওঠেনা। তা সত্ত্বেও তার স্বপ্ন সত্য হয়েছিল। অতএব এঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, পাপীর স্বপ্নও সত্য হতে পারে, এমনকি কাফেরের স্বপ্নও সত্য হতে পারে। এ ঘটনা থেকে আরও একটা বড় শিক্ষা এই পাওয়া গেল যে, আমাদের কারও স্বপ্ন সত্যে পরিণত হতে দেখলে আমরা যেন মনে না করি যে, আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি, আমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। এরকম মনে করা ভুল। স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়া কোন বুযুর্গীর প্রমাণ নয়। কাফেরের স্বপ্নও তো সত্যে পরিণত হয়ে থাকে। যাহোক বলা হচ্ছিল যে, আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, গোনাহ থেকে পবিত্র না থাকলে তার স্বপ্ন কখনই সত্য হবেনা। বরং আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হল এই বোঝানো যে, যারা গোনাহ থেকে যত বেশী পবিত্র হয়, তাদের সত্য স্বপ্নের পরিমাণ তত বেশী হয়ে থাকে।

আমরা যদি গোনাহ থেকে পবিত্র থাকি, তাহলে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে, ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সত্য স্বপ্ন লাভ করতে পারব, আল্লাহর পক্ষ থেকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনেক সু-সংবাদ ও ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সতর্কীকরণ লাভ করতে পারব।

সত্য স্বপ্ন লাভের জন্য ঘুমানোর সময় এরকম দুআ করে নেয়া যায়–

اَللّٰهُمَّ اَرِنِيْ رُؤْيًا صَادِقَةً غَيْرَ كَاذِبَةٍ، صَالِحَةً سَارَّةً غَيْرَ مُحْزِنَةٍ نَافِعَةً غَيْرَ ضَارَّةٍ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে সত্য স্বপ্ন দেখান, মিথ্যা স্বপ্ন নয়। আমাকে উপকারী ও আনন্দময় স্বপ্ন দেখান, ক্ষতিকর বা মনোকষ্টের হয়– এমন স্বপ্ন দেখাবেন না।

যারা ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ আদায় করে ঘুমায়, ভাল স্বপ্ন লাভের ক্ষেত্রে সেটা বেশ ভাল আছর ফেলে থাকে। তাই ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ পালন করা চাই। শুধু ভাল স্বপ্ন লাভের আশায় নয় বরং এমনিতেও ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ আদায় করে ঘুমানো কর্তব্য। ঘুম আল্লাহ তাআলার একটা বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলার দেয়া এই বড় নেয়ামত ভোগ করার সময় সেই নেয়ামত ভোগ করার তরীকা হতে গাফেল থাকা বড়ই না-শোকরীর পরিচয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভাল সবকিছু করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৪৮

ওছিয়ত প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ اِمْرَإٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ اَنْ يُّوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আজ আমি আপনাদের সামনে এমন একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই, যে বিষয়টার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেকেই জানি না বা জানলেও অনেকেই তা আমল করি না। বিষয়টা হল "ওছিয়ত"। ওছিয়াত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। সাধারণত স্ত্রী পুত্র পরিজন ও আপনজনদেরকে মৃত্যুর পর যা যা করতে বলে যাওয়া হয়, তাকেই ওছিয়ত বলা হয়। ওছিয়ত মুখেও বলে যাওয়া যায়, লিখেও রেখে যাওয়া যায়। তবে লিখে রেখে যাওয়াই ভাল। কারণ, তাতে ওয়ারিছগণ সকলেই প্রয়োজনে সেটা দেখে নিতে পারে এবং ওছিয়তের বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোন মতবিরোধ হলে বা ওছিয়তের কোন কিছু ভুলে গেলে সকলেই লিখিত ওছিয়তনামা দেখে ওছিয়তকৃত বিষয়াদির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওছিয়ত লিখে রেখে যাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বের সাথে উম্মতকে বলে গেছেন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল আজ উম্মতের মধ্যে অনেকেই তা আমল করছে না। অনেকে জানেও না যে, এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ওছিয়ত সম্পর্কে আজ আপনাদের সামনে কিছু আলোচনা রাখতে চাই। ওছিয়ত-এর গুরুত্ব কতটুকু, ওছিয়ত-এর ফায়দা কি এবং কি কি বিষয়ে ওছিয়ত করে যেতে হবে– এই কয়েকটা দিক নিয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা রাখা হবে।

ওছিয়ত-এর গুরুত্ব কতটুকু, এ ব্যাপারে হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে দেখা যায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا حَقُّ اِمْرَإٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ اَنْ يُّوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

(متفق عليه — البخاري في صحيحه برقم ٢٧٣٨ ومسلم في صحيحه برقم ٤٢٩١)

অর্থাৎ, কোন মুসলমানের জন্য এ অধিকার নেই যে, তার কোন বিষয়ের ওছিয়ত করে যাওয়ার এরাদা থাকা সত্ত্বেও সে দুটি রাত এমনভাবে কাটাবে যখন তার ওছিয়াতনামা তার কাছে লিপিবদ্ধ নেই।

এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওছিয়াতের ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এজন্য প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর অবশ্যই ওছিয়াতনামা লিখে রাখা উচিৎ। এ হাদীছে ওছিয়াতের ব্যাপারে যে তাকীদ ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামও তার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমল করেছেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন যে,

فَمَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ اِلَّا وَصِيَّتِيْ عِنْدِيْ مَوْضُوْعَةٌ. (مسند أحمد برقم ٤٤٦٩ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, আমি কোন একটি রাতও এমনভাবে কাটাইনি যখন আমার কাছে আমার ওছিয়তনামা রাখা থাকত না।

ওছিয়ত করে যাওয়ার গুরুত্ব এ কারণেও যে, আমি ওছিয়ত করে গেলাম– এর অর্থ আমি আমার যিম্মাদারী আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে গেলাম। ওছিয়ত করে গেলাম না– এর অর্থ আমি আমার যিম্মাদারী আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করে গেলাম না, তাহলে নিজের যিম্মাদারী আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করে যাওয়ার কারণে পরকালে আমি পাকড়াও হয়ে যেতে পারি। তাই পরকালের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য ফরয ওয়াজিব ধরনের যিম্মাদারীর বিষয়ে অবশ্যই ওছিয়ত করে যাওয়ার গুরুত্ব রয়েছে।

যদিও ওছিয়ত করে গেলে সেই ওছিয়ত পালন হবেই এমন নিশ্চয়তা নেই, তবে ওছিয়তের মাধ্যমে অন্তত সম্ভাব্য ব্যবস্থা তো গ্রহণ করে যাওয়া হল। ওছিয়ত করে গেলে নিজের যিম্মাদারী আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ, জীবদ্দশায় আমি যেসব জরুরী দায়িত্ব আদায় করতে পারিনি, মৃত্যুর পর আমার দ্বারা তা আদায় হওয়ার কোন ব্যবস্থাও নেই। আমার মৃত্যুর পর একমাত্র আমার ওয়ারিছ বা আপনজনই তা আদায় করলে করতে পারে। তাই তাদেরকে ওছিয়ত করে আমি সম্ভাব্য ব্যবস্থাই গ্রহণ করে গেলাম। এবং ওছিয়ত করে গেলে আশা করা যায়, নিজের ওয়ারিছরা সেই ওছিয়ত পূর্ণও করবে। দেখা যায় এমন হতভাগা সন্তানরাও পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তাদের ওছিয়ত পূর্ণ করাকে নিজেদের জন্য জরুরী মনে করে, যারা সেই পিতা-মাতাই বেঁচে থাকতে তাদের হুকুম নির্দেশের কোন পরওয়াই করত না। তাই আশা করা যায় ওছিয়ত করে গেলে তা আদায় করা হবে। আদায় করা না হলেও অন্তত নিজের পক্ষে যা সম্ভব তা তো করে যাওয়া হল। আমি আমার জীবদ্দশায় যেসব ফরয ওয়াজিব আদায় করে যেতে পারলাম না, মৃত্যুর পূর্বে অন্তত ওছিয়তের মাধ্যমে তা আদায় করার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে গেলাম। আল্লাহ পাক হয়তো জীবদ্দশায় আদায় করতে পারিনি সেই অপারগতা দেখবেন এবং মৃত্যুর পূর্বে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে গেলাম তা দেখবেন এবং এ ওছীলায় আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

ওছিয়ত-এর ফায়দা কি, এ ব্যাপারে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে দেখা যায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ مَاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلٰى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلٰى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُوْرًا لَّهُ.

(ابن ماجة وسنده ضعيف)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ওছিয়ত করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, সে সঠিক পথে এবং সুন্নাতের উপর দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, সে তাক্বওয়া ও শাহাদাতের উপর বা আল্লাহর ধ্যান উপস্থিত রেখে ইন্তেকাল করল এবং সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। এ হাদীছ কিছুটা জয়ীফ হলেও ফাযায়েল অধ্যায়ে আমলের যোগ্য।

এ হাদীছে ওছিয়তের ৪টা ফায়দা বর্ণনা করা হয়েছে।

১. ওছিয়ত করা দ্বারা সুন্নাতের উপর আমল হয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. ওছিয়ত করা দ্বারা তাকওয়া পরহেযগারীর উপর মৃত্যু হয়।

৩. ওছিয়ত করা দ্বারা শাহাদাতের উপর বা আল্লাহর ধ্যানের উপর মৃত্যু হয়।

৪. ওছিয়ত করা দ্বারা ক্ষমা লাভ হয়। কেননা, ওছিয়ত করে গেলে নিজের রয়ে যাওয়া জরুরী যিম্মাদারী আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য আশা করা যায় ওছিয়ত করে গেলে নিজের রয়ে যাওয়া জরুরী যিম্মাদারী আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন।

এছাড়াও চিন্তা করলে ওছিয়াতের আরও অনেক ফায়দা বুঝে আসে। যেমন:

৫. কেউ ওছিয়ত করে গেলে তার ওয়ারিছ ও আপনজন তার মৃত্যুর পর তার মুক্তির জন্য কি করতে পারে সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা পায়।

৬. ওছিয়তের মধ্যে ওয়ারিছ ও আপনজনের দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারেও দিক নির্দেশনা থাকে। তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছ ও আপনজন কি কি নেক কাজ করবে, কি কি গোনাহ থেকে বিরত থাকবে– ওছিয়তের মধ্যে এসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই ওছিয়তের মাধ্যমে ওয়ারিছ ও আপনজনকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করার যে দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্ব আদায় হয়।

৭. কেউ ওছিয়ত লিখে রাখতে অভ্যস্ত হলে প্রতিদিন ওছিয়ত লেখার সময় তার মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার চিন্তা এবং মৃত্যুর চিন্তা জাগ্রত হবে। এই চিন্তা তাকে আখেরাতমুখী করে তুলবে।

এ ছাড়াও চিন্তা করলে ওছিয়ত-এর আরও অনেক ফায়দা বুঝে আসে। যাহোক ওছিয়তের ফায়দা সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করা হল।

কি কি বিষয়ে ওছিয়ত করে যেতে হবে, এ ব্যাপারে কথা হল– সম্ভব হলে জরুরী সব বিষয়েই ওছিয়ত করে যাওয়া চাই। যে বিষয়টা যত জরুরী সে বিষয়টা তত গুরুত্বের সাথে ওছিয়ত করে যেতে হবে।

কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যে ব্যাপারে ওছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। কারও যিম্মায় যদি ফরয বা ওয়াজিব ধরনের কোন দায়িত্ব অনাদায়ী থাকে, যেমন ফরয বা ওয়াজিব নামায কাযা থেকে থাকে, ফরয রোযা অনাদায়ী থেকে থাকে, ফরয হজ্জ অনাদায়ী থেকে থাকে, যাকাত অনাদায়ী থেকে থাকে, তাহলে তার জন্য ওছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে কারও যিম্মায় যদি অন্য কারও কোন ওয়াজিব হক থেকে থাকে, যেমন: কারও কাছে সে ঋণী –যে ঋণ সে আদায় করতে পারেনি– বা কারও আমানত তার নিকট রয়েছে বা এজাতীয় অন্য কোন হক ও ওয়াজিব দায়িত্ব অনাদায়ী থাকে, এরূপ হলে তার জন্যও ওছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব।

যদি এরকম হয় যে, আমাদের যিম্মায় কোন ফরয বা ওয়াজিব দায়িত্ব অনাদায়ী থাকাবস্থায় অবস্থায় আমাদের মৃত্যু এসে গেল, অথচ সে ব্যাপারে ওছিয়াত করে গিয়েও তা আদায়ের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে গেলামনা, তাহলে পরকালে তা আমাদের পাকড়াও-এর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই পরকালের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য ফরয ওয়াজিব ধরনের যিম্মাদারীর বিষয়ে অবশ্যই ওছিয়ত করে যাওয়া চাই। এ ধরনের বিষয়ে ওছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব।

এজন্য বালেগ হওয়ার পর থেকে ওছিয়ত করার দিন বা ওছিয়ত লেখার দিন পর্যন্ত হিসাব করে নিতে হবে যে, প্রকৃত পক্ষে এ পর্যন্ত কত ওয়াক্ত নামায ছুটে গেছে যা একবারেই পড়া হয়নি।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

এনমিভাবে কতটা রোযা ছাড়া হয়েছে যার কাযা করা হয়নি, কি পরিমাণ যাকাত আদায় করা বাকী রয়েছে, কতটা সদকায়ে ফিতির আদায় করা বাকী রয়েছে, কতটা কছমের কাফ্ফারা আদায় করা হয়নি– এগুলি পুরোপুরি হিসাব করে নিতে হবে। সবটার হিসাব পুরোপুরি মনে না থাকলে খুব ভালভাবে আনুমানিক হিসাব করে নিতে হবে, যাতে মন সাক্ষী দেয় যে, এর চেয়ে অধিক আমার দায়িত্বে বাকী নেই।

আর এক ধরনের বিষয় রয়েছে, সে বিষয়েও ওছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। তা হল– আপনার মৃত্যুর পর আপনাকে কেন্দ্র করে যেসব গোনাহ, রছম, বেদআত ও কু-সংস্কার পালন করার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো থেকে বিরত থাকার ওছিয়ত করে যাওয়া। আজকাল সাধারণত কারও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এইসব গোনাহ, রছম বেদআত ও কু-সংস্কার পালন করা হয়ে থাকে–

* জানাযার নামাযের পর আবার হাত উঠিয়ে দোয়া করা।
* জানাযা নামাযের পর জোর আওয়াজে কালেমা পড়তে পড়তে জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়া।
* দাফনের পর কবরের কাছে আযান দেয়া।
* কবরের উপর চাদর দেয়া।
* কবরের উপর ফুল দেয়া।
* কবর পাকা করা।
* কবরের উপর গম্বুজ বানানো।
* আলেম বুযুর্গ ব্যক্তি হলে তার কবরে চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই ইত্যাদি নযরানা দেয়া।
* মরদেহের ফটো তোলা।
* সংবাদ পত্রে মৃতের ছবি প্রকাশ করা।
* অবাস্তব গুণকীর্তন করে মানুষের কাছে মৃতকে বড় করে প্রচার করা।
* মৃতের কুলখানী করা অর্থাৎ, চতুর্থ দিনে ঈছালে ছওয়াব করা।
* চেহলাম বা চল্লিশা করা।
* মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।
* বড় আলেম বা বুযুর্গ ব্যক্তি হলে ওরস করা।

ইত্যাদি। এই সব গোনাহ, রছম, বেদআত ও কু-সংস্কার থেকে বিরত থাকার ওছিয়াত করে যাওয়া ওয়াজিব।

কিছু কিছু বিষয় রয়েছে, যে বিষয়ে ওছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব নয় তবে উত্তম। যেমন, শরীয়ত যাদেরকে আপনার সম্পদের ওয়ারিছ নির্ধারিত করেছে এবং তাদের জন্য সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে এরকম ওয়ারিছ ছাড়া অন্য যেসব আত্মীয়-স্বজন রয়েছে তাদের জন্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে কিছু প্রদান করার ওছিয়ত করে যাওয়া মোস্তাহাব। যে ওয়ারিছদের জন্য মীরাছের অংশ নির্ধারিত রয়েছে, তাদের জন্য ওছিয়ত করা জায়েয নয়। ইসলামের প্রথম দিকে তাদের জন্যও ওছিয়ত করে যাওয়া ফরয ছিল। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে এসেছে,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ. (সূরা বাকারা: ১৮০)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে– তোমাদের কারও যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায় পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায় সংগতভাবে কিছু ওছিয়ত করা। এটা মুত্তাকীদের কর্তব্য।

ইসলামের প্রথম দিকে এই বিধান ছিল। পরবর্তীতে ওয়ারিছদের জন্য অংশ নির্ধারিত হওয়ার পর এ বিধান রহিত হয়ে যায়। তবে যে ওয়ারিছদের জন্য অংশ নির্ধারিত করা হয়নি, তাদের জন্য ওছিয়াত করা এখনও উত্তম। এমনিভাবে কেউ যদি প্রচুর সম্পদ রেখে যায়, তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে বিভিন্ন রকম নেক কাজে কিছু ব্যয় করার ওছিয়াত করে যাওয়াও মোস্তাহাব।

এ সব বিষয়ের বাইরেও আপনার মৃত্যুর পর আপনার ওয়ারিছদের দ্বারা শরীয়তের যেসব বিষয় লঙ্ঘন হওয়ার বেশী সম্ভাবনা মনে করবেন সেসব বিষয়েও ওছিয়ত করে যাওয়া ভাল। জীবদ্দশায় তো এসব ব্যাপারে আপনি বলবেনই, খাস করে এসব বিষয়ে ওছিয়তও করে যাবেন। যেমন কেউ নামাযে গাফিলতী করতে অভ্যস্ত থাকলে তাকে বিশেষভাবে নামাযের ব্যাপারে ওছিয়ত করে যাবেন। কারও মধ্যে শরীয়তসম্মত পর্দা মেনে চলার ব্যাপারে গাফিলতী থাকলে তাকে বিশেষভাবে পর্দার ব্যাপারে ওছিয়ত করে যাবেন। কারও মধ্যে বিশেষ কোন গোনাহের অভ্যাস থাকলে তাকে সেই গোনাহ থেকে বিরত থাকার ওছিয়ত করে যাবেন, ইত্যাদি।

সারকথা মোটামুটি এই সব বিষয়ে ওছিয়ত করে যেতে হবে–

* নামায কাযা থাকলে তার ফেদিয়া আদায় করার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* রোযার কাযা থাকলে তার ফেদিয়া আদায় করার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* ফরয হজ্জ আদায় করে না থাকলে বদলী হজ্জ আদায় করার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* যাকাত অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* কারও ঋণ অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* কারও আমানত ফেরত দেয়া না হয়ে থাকলে তা ফেরত দেয়ার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* সদকায়ে ফিতির আদায় করে না থাকলে তা আদায় করার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* মান্নত অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* কছমের কাফ্ফারা অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* কুরবানী আদায় করে না থাকলে এবং অনাদায়ী প্রতিটা কুরবানীর বিনিময়ে একটা করে বকরীর মূল্য সদকা করে না থাকলে তা করার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* আপনার মৃত্যুর পর আপনাকে কেন্দ্র করে যেসব রছম, বেদআত ও কু-সংস্কার পালন হতে পারে তা থেকে বিরত থাকার ওছিয়ত করে যেতে হবে।
* আপনার মৃত্যুর পর আপনার ওয়ারিশদের দ্বারা শরীয়তের যেসব বিষয় লঙ্ঘন হওয়ার বেশী সম্ভাবনা মনে করবেন সেসব বিষয়েও ওছিয়ত করে যাবেন।
* এমনিভাবে আপনার মৃত্যুর পর আপনার সম্পদ বণ্টনের বেলায় যেসব অনিয়ম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে ব্যাপারেও ওছিয়ত করে যাবেন। যেমন, ভাইয়েরা যেন বোনদেরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত না করে। ছোট ভাই-বোনদেরকে যেন বঞ্চিত করা না হয়, ইত্যাদি। ছোট ভাই-বোন একে তো হকদার, তদুপরি তারা ইয়াতীম। তাই তাদের মীরাছ না দেয়া ডবল অন্যায়। ইয়াতীমদের মাল গ্রাস করা যে কত বড় অন্যায়, এ সম্পর্কে আগামী জুমুআয় ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা

www.maktabatulabrar.com

করা হবে। আপনার স্ত্রীর মোহর দেয়া না হয়ে থাকলে সেই মোহর পরিশোধ করার ব্যাপারেও ওছিয়ত করে যাবেন।

এখানে একটা মাসআলা বলে রাখার প্রয়োজন। তা হল– ওছিয়াতকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথম– তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হবে, তারপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে, তারপর অবশিষ্ট অর্থ থেকে ওছিয়ত পূর্ণ করা হবে। কাফন-দাফনের ব্যয় সম্পন্ন করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর অর্থ অবশিষ্ট না থাকলে ওছিয়ত পূরণ করা ওয়ারিছদের জন্য জরুরী নয়। তবে ওয়ারিছগণ যদি নিজেদের অর্থ থেকে পূরণ করেন করতে পারেন। এভাবে মৃত ব্যক্তির জরূরী যিম্মাদারী আদায় হয়ে গেলেও আশা করা যায় আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

মৃত ব্যক্তি ওছিয়ত না করে গেলে বা সম্পদ রেখে না গেলে তার অনাদায়ী হজ্জ, অনাদায়ী নামায রোযার ফেদিয়া ইত্যাদি আদায় করা ওয়ারিছদের আইনগত দায়িত্ব না হলেও নৈতিক কর্তব্য। ওয়ারিছদের মনে রাখতে হবে তারা তাদের মাতা-পিতার বদলী হজ্জ আদায় না করলে, অনাদায়ী নামায রোযার ফেদিয়া আদায় না করলে তাদের পিতা-মাতার নাজাত নাও হতে পারে, একারণে তারা আযাবের মধ্যে থাকতে পারে। তাই সাধ্য থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতার নাজাতের জন্য কিছু করবে না, সন্তান হয়ে কী করে তারা তা সহ্য করতে পারে? আমাদের চোখের সামনে যদি আমাদের পিতা-মাতাকে আগুনে জ্বালানো হত কিংবা কল্পনাতীত শাস্তি দেয়া হত, তাহলে এমন কোন্ পাষন্ড সন্তান আছে যে তার সব ধন-সম্পদ দিয়ে হলেও পিতা-মাতাকে তা থেকে উদ্ধার না করত? পিতা-মাতা আমাদের জন্য কত কিছু করে গেছেন, তাদের ধন-সম্পদ দিয়েই আমরা ধনী হয়েছি কিংবা তারা আমাদেরকে যে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে গেছেন, তার ওছীলায় আমরা সম্পদশালী হয়েছি, তাই সম্পদ থাকলে তাদের জন্য কিছু করা উচিত। মাতা-পিতা আমাদের জন্য কিছু না কিছু রেখেই গিয়েছেন, তাই তাদের ব্যাপারে গাফেল হওয়া ঠিক নয়। এক কবি বলেছেন,

تو تونگر گشتئی از مال ما + ایں زماں غافل شدی از حال ما

অর্থাৎ, মাতা পিতা কবরে বসে সন্তানকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, তুমি আমার রেখে আসা সব কিছু দিয়েই স্বচ্ছল হয়েছ, অথচ আজ তুমি আমার কথা ভুলে গেছ!

আমাদের আরও মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের পিতা-মাতার জন্য করলে আমাদের সন্তানরাও আমাদের জন্য করবে। আমরা আমাদের পিতা-মাতার জন্য না করলে আমাদের সন্তানদের থেকেও আমরা পাব না।

যাহোক টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় এমন কোন ওয়াজিব বিষয়ের ওছিয়ত করলে আর মৃত ব্যক্তি সম্পত্তি রেখে গেলে ওয়ারিছদের উপর ওয়াজিব সে ওছিয়ত পূর্ণ করা। আর সম্পত্তি রেখে না গেলে ওয়ারিছদের উপর সে ওছিয়ত পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়, তবে ওয়ারিছদের সামর্থ থাকলে তাদের পক্ষে তা পূর্ণ করা নৈতিক কর্তব্য। অতএব তা পূর্ণ করলেই উত্তম।

আর এক ধরনের ওছিয়ত রয়েছে, যা পূর্ণ না করাই উত্তম। যেমন যদি কেউ ওছিয়াত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার জানাযা নামায পড়াবে এটা পূর্ণ করা জরুরী নয়। তবে অন্য কোন শরী'আত সম্মত বাধা না থাকলে পূরণ করাতে কোন অসুবিধাও নেই। এমনিভাবে যদি কেউ ওছিয়াত করে যে, আমাকে অমুক স্থানে দাফন করবে, তাহলে এ ওছিয়াত পূরণ করা জরুরী নয়, জায়েয। যেখানে মৃত্যু হয়েছে সেখানকার নিকটবর্তী সাধারণ কবরস্থানে দাফন করাই উত্তম। আজকাল অনেকেই এ বিষয়টার প্রতি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তেমন একটা গুরুত্ব দেয়না। অনেকেই আপন জান মারা গেলে তাকে দেশে নিয়ে দাফন করব, এই আবেগে এই মাসআলার প্রতি গুরুত্ব দেয়না। অথচ কেউ মারা গেলে তাকে দেশে দাফন করা উত্তম মাসআলা এরকম নয়। বরং যেখানে মারা গেল সেখানকার নিকটবর্তী সাধারণ কবরস্থানে দাফন করাই উত্তম। অনেকে মাতা-পিতার কবরের পাশে কবর দেয়ার জন্য ওছিয়ত করে যায়। এটা একটা আবেগ মাত্র। এতে পরকালে অতিরিক্ত কোন ফায়দা হবে এমন নয়। মাতা-পিতার কবরের পাশে দাফন হলে সেই মাতা-পিতার সাথে দেখা সাক্ষাত হবে এমনও কোন গ্যারান্টি নেই। কবর জগতে একজনের আর একজনের সাক্ষাত হতে পারে একমাত্র রূহানী ভাবে। তাও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেউ চাইলেই নিজের ইচ্ছামত যে কারও সাথে সাক্ষাত করতে পারবে না। তাই মাতা-পিতার কবরের পাশে থাকলেও যা, দূরে থাকলেও তাই। মাতা-পিতার কবরের পাশে দাফন হলে মাতা-পিতা কবরে কোন সহযোগিতা করতে পারবে এমনও কোন বর্ণনা কুরআন হাদীছে কোথাও নেই। তাহলে নিকটবর্তী সাধারণ কবরস্থানে দাফন হওয়ার উত্তম পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে মাতা-পিতার কবরের পাশে দাফন হলে ফায়দা কি? তাই বলছিলাম এটা একটা আবেগ মাত্র, এতে বিশেষ কোন ফায়দা নেই। তবুও এমন আবেগ যদি কেউ করে তাহলে তা নিষেধ নয়, তবে তাতে বিশেষ কোন ফায়দাও নেই। সুতরাং আমাদের সকলেরই এরকম ওছিয়ত করে যাওয়া ভাল যে, আমার মৃত্যুর পর যেখানে আমার মৃত্যু হয়, সেখানকার নিকটবর্তী সাধারণ কবরস্থানে আমাকে দাফন করবে। যদি সাধারণ কবরস্থানে জায়গা না হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

অনেক ভাই সাধারণ কবরস্থানে দাফন হতে চান না, তারা মনে করেন নিজের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা ক্রয় করে সেখানে দাফন হলে আপনজনেরা কবর চিনতে পারবে, কাছে গিয়ে দুআও করতে পারবে। এটাও একটা মনের আবেগ মাত্র। দুআ করার জন্য নির্দিষ্ট করে কবর চেনাও জরূরী নয়। কবরের আশে পাশে থেকে দুআ করলেই চলে। তাছাড়া কবর নির্দিষ্ট থাকলেই যে দুআ বেশী হবে, তাও ততটা বাস্তব নয়। বাস্তবে ঐ সব লোকের জন্যই দুআ বেশী হয়, যারা নেককার পরহেযগার। যারা ওলি আউলিয়া, সারা পৃথিবীর মানুষ নিজ নিজ স্থানে থেকে তাদের জন্য দুআ করে। তাদের কবর কেউ না চিনলেও তাদের জন্য দুআ করে থাকে। আর নেককার পরহেযগার না হলে কবর শানদার করে বানালেও তাদের জন্য দুআ হয় না।

অনেক মহিলা ওছিয়ত করে যান যে, আমার স্বামীর কবরের পাশে আমাকে দাফন করবে। স্বামীর বাম পাশে যেন আমার কবর হয়। এ ব্যাপারেও ঐ একই কথা। স্বামীর কবরের পাশে কবর হলে যে স্বামীর সাথে একসাথে এক বিছানায় শয়ন করে থাকা যাবে তা নয়। আর এক বিছানায় যখন শয়ন হবেনা তখন বাম পাশে থাকলেই বা কি, ডান পাশে থাকলেই বা কি? এটাও একটা আবেগের ওছিয়ত। এতেও কবর জগতে কোন ফায়দার কিছু নেই।

যাহোক ওছিয়তের গুরুত্ব, ওছিয়তের ফায়দা এবং কি কি বিষয়ে ওছিয়ত করতে হবে এসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওছিয়ত বিধানের গুরুত্ব বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

বয়ান নং – ৪৯

মীরাছ প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ تَعَالٰى : اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِيْ فَاَنَا مَوْلَاهُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আজ আপনাদের সামনে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। এটা এমন একটা বিষয়, যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক রকম বিভ্রান্তি এবং অনেক রকম ত্রুটি রয়েছে। বিষয়টা হচ্ছে মীরাছ তথা উত্তরাধিকারের বিষয়। মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিধান সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনে অনেক রকম বিভ্রান্তি রয়েছে। এ বিধানটার উপর আমল করার ক্ষেত্রেও আমাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে। আমাদের মধ্য থেকে এই বিভ্রান্তি এবং ত্রুটিগুলো যাতে দূর হয় সেজন্য এ বিষয়ে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করা দরকার।

মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিধান সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনে বেশ মারাত্মক ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে। এমন বিভ্রান্তি, যা ঈমানের উপর আঘাত নিয়ে আসে। এরকম বিশেষ দুইটা বিভ্রান্তি আপনার সামনে তুলে ধরছি।

মীরাছ বিধান সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তি হল– আমরা অনেকে মনে করি এবং বলেও থাকি যে, ইসলামে মীরাছ বণ্ঠনের বেলায় নারীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কারণ, বোনকে ভাইয়ের অর্ধেক অংশ দেয়া হয়েছে, স্ত্রীকে স্বামীর অর্ধেক অংশ দেয়া হয়েছে। এভাবে নারীদেরকে সম্পদ কম দিয়ে তাদের প্রতি অবিচার ও বৈষম্য করা হয়েছে। সম্প্রতি এক শ্রেণীর ইসলাম বিদ্বেষী বুদ্ধিজীবী ও কিছু ঐ গোছের লেখক একথাটি বেশ ব্যাপকভাবে বলা শুরু করেছে। কিছু নারীবাদী সংঘটনও তাদের কথা শুনে নাচতে শুরু করেছে। অথচ এ কথা যারা বলে এবং তাদের কথায় যারা নাচে, তারা কেউই মীরাছ বিধানের হেকমত বা রহস্য বোঝে না কিংবা বোঝার চেষ্টাও করে না। মীরাছ বিধান নিয়ে এই সমালোচনা প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে দুইটা কথা মনে রাখা চাই।

এক নম্বর কথা হল– আমাদের মনে রাখা চাই ইসলামের যে কোন বিধানকে অযৌক্তিক বা তাতে জুলুম অবিচার হয়েছে বা বৈষম্য হয়েছে– এরূপ মনে করা নিতান্তই বোকামী। আল্লাহ তাআলা আপনার আমার চেয়ে কম বুদ্ধিমান নন। আল্লাহর বুদ্ধিকে আপনার আমার বুদ্ধি দিয়ে মাপলে বোকামী হবে। আপনার আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হলেও এ বিধানটা যার পক্ষ থেকে এসেছে, সেই আল্লাহর কাছে এটার এমন কোন যুক্তি থাকতে পারে যা আমাদের যুক্তির উর্দ্ধে বা যা আমাদের বোধ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ক্ষমতার উর্দ্ধে। আল্লাহ তাআলার কাছে এটার এমন রহস্য রয়েছে যা আমাদের বোধ ক্ষমতার উর্দ্ধে। কুরআনে কারীমে মীরাছ সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করার সময় কার অংশ কম হবে কার বেশী হবে, কার অংশ কি তা বর্ণনা করার পর এদিকে ইংগিত করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

(সূরা নেছা: ১১)

অর্থাৎ, তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের উপকার সাধনে নিকটতর তা তোমরা জানতে পার না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে, মীরাছের অংশ মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। মানুষ জানে না, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন কার দ্বারা কতটুকু উপকার হবে, সেমতে তিনি তার মহা জ্ঞান ও মহা হেকমত অনুসারে মীরাছের পরিমাণে কমবেশী করেছেন। এই পরিমাণে কমবেশী কেন করা হয়েছে, এই কমবেশী করার পেছনে কী রহস্য, তা একমাত্র তিনিই জানেন, অন্য কেউ জানে না। তিনিই হলেন মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী। অতএব, যে বিষয়ের রহস্য মানুষের জানা নেই, সে বিষয় নিয়ে সমালোচনা করা বা নিজের বুদ্ধি বলে সেই বিধানে কোন রকম বিকৃতি বা পরিবর্তন করা বা করতে চাওয়া বোকামী বৈ কি? একমাত্র আল্লাহই হলেন মহাজ্ঞানী, আর কেউ তাঁর মত মহাজ্ঞানী নেই। আল্লাহর জ্ঞানের সমতুল্য বা তার কাছাকাছি জ্ঞানও কারও নেই। অতএব আমাদের এই ক্ষুদ্রস্ব ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, অতি নগন্য, অতি সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে মহাজ্ঞানী, অসীম জ্ঞানী আল্লাহর দেয়া বিধানকে অযৌক্তিক বললে তা বাস্তবে তা কতটা হাস্যকর হয় চিন্তা করে দেখুন।

দুই নম্বর কথা হল– পুরুষদেরকে নারীদের চেয়ে বেশী দেয়ার বাস্তব ভিত্তিও রয়েছে। নিয়ম হল বাস্তবে যার ব্যয় বেশী তাকে সম্পদ দিতেও হয় বেশী। যার ব্যয় কম তাকে সম্পদ কম দিলেও চলে। এখন বাস্তবতা দেখুন। একটা সংসারে পিতা মারা যাওয়ার পর তার ছেলে মেয়ে উভয় রকম সন্তান থাকলে ছেলের উপরই সংসারের দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে। ছেলেই পরিবারের সকলের ভরণ-পোষণ, ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচ, ভাই বোনদের বিবাহ-শাদীর খরচ ইত্যাদি সবকিছু বহন করে চলে। বোন এ দায়িত্ব গ্রহণ করেনা বা পারিবারিক ও সামাজিকভাবেও ভাই থাকতে বোনের উপর কেউ এ দায়িত্ব চাপায় না। তাহলে ভাইয়ের খরচই বেশী, বোনের খরচ শুধু কম নয় বরং একেবারেই না। তাহলে বাস্তব যুক্তিতেও বলে ভাইয়ের খরচ যখন বেশী, তখন ভাইকে সম্পদ দিতেও হবে বেশী। যদি কেউ বলত, বোনের তো খরচ নেই-ই, বোনকে একেবারে না দিলেও তো চলে, তাহলে তার কথাকেও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যেত না। তবে নারীদের প্রতি এহছান করা হয়েছে, তাই তাদেরকে একেবারে না দিয়ে রাখা হয়নি, বরং কিছু দেয়া হয়েছে। সুতরাং মীরাছের পরিমাণে নারীকে কম দিয়ে নারীর প্রতি অবিচার নয় বরং যতটুকু দেয়া হয়েছে, সেটাই তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী, তার প্রতি অনুগ্রহই করা হয়েছে। এখানে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য ও কমবেশী করা হয়েছে নিতান্ত বাস্তবতার ভিত্তিতে। এখানে অবাস্তব কিছু করা হয়নি, অবিচার করা হয়নি, বরং নিতান্ত বাস্তবতার ভিত্তিতেই ফয়সালা করা হয়েছে, ইনসাফ ও সুবিচারই করা হয়েছে। বাস্তবতার ভিত্তিতেই, ইনসাফের দাবী অনুসারেই পুরুষকে বেশী দেওয়া উচিত ছিল, পুরুষকে বেশী না দিলে সেটাই বরং অবিচার ও জুলুম হত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

তাই বলছিলাম, মীরাছ বিধানের পরিমাণে কমবেশী কেন করা হল– যারা এটা নিয়ে সমালোচনা করে এবং যারা তাদের কথায় নাচে, তারা কেউই এই বিধানের রহস্য বোঝে না বা বোঝার চেষ্টাও করে না। কুরআনে কারীমে সুক্ষভাবে এসব কথার দিকে ইংগিত করা হয়েছে, তারা কুরআনের এই কথা নিয়েও কখনও চিন্তা করে দেখে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল– যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমালোচনা করে, তারা কখনই সে ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কি তা তো জানেই না, জানতে চেষ্টাও করে না। ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত পক্ষে তাদের তেমন কোন পড়া-শোনাও নেই। তারা অন্ধ এবং বধিরের মতই চোখ কান বুজে সমালোচনা করে যেতে থাকে।

নারীদের সম্পদের ব্যাপারে আরও কিছু বিষয় ভেবে দেখার রয়েছে। নারী স্বামী থেকে মোহর পায়, স্বামী থেকে মীরাছ পায়। এভাবেও তার সম্পদ আসে। এসব সম্পদই তার জন্য সংরক্ষিত রাখার উপায় রয়েছে। কারণ, বিবাহের আগ পর্যন্ত মেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার উপর। বিবাহ হওয়ার পর স্বামী বেঁচে থাকলে তার ভরণ-পোষণ স্বামী দিবে, আর স্বামী মারা গেলে বা সে তালাকপ্রাপ্তা হলে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পরবর্তী বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত আজীবন তার পিতার উপর এসে পড়বে। অথচ ছেলে বালেগ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আর পিতা-মাতার যিম্মায় থাকে না। এই সবদিক নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় নারীদেরকে পুরুষদের চেয়ে অনেক ধরনের সুযোগ বেশী দেয়া হয়েছে। তবুও নারী সমাজ পেলাম না পেলাম না বলে চিৎকার করছে। কথায় বলে যত পাই, তত চাই। কোন কিছু চাওয়ার আগে এবং কোন কিছু নিয়ে চিৎকার করার আগে সেই বিষয়টার সবদিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখা উচিত।

যাহোক এতক্ষণ মীরাছ বিধান সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করা হল যে, মীরাছের পরিমাণে কমবেশী করার পেছনে আল্লাহর হেকমত ও রহস্য রয়েছে এবং এর পেছনে বাস্তব ভিত্তি ও বাস্তব যুক্তিও রয়েছে, ইনসাফের ভিত্তিতেই এটা করা হয়েছে।

মীরাছ বিধান সম্বন্ধে আর একটা বিভ্রান্তি হল– দাদার পূর্বে পিতা মারা গেলে সেই নাতির মীরাছ না পাওয়ার বিষয়টা। ইসলামে বিধান রাখা হয়েছে দাদার পূর্বে পিতার মৃত্যু হলে দাদার সম্পদের মীরাছ পাওয়া যাবে না। এটা একটা আইনের কথা। দাদার সম্পদ পাওয়া যাবে পিতার সূত্রে। এখন পিতাই যদি না থাকে তাহলে কোন্ সূত্র ধরে সম্পদ পাওয়া যাবে? সূত্রই তো অনুপস্থিত। তাই আইনের কথা হল এ অবস্থায় সম্পত্তির মীরাছ পাওয়া যাবে না। এই বিধানটা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন যে, পিতার মৃত্যুর কারণে সন্তানরা এমনিতেই অসহায় হয়ে পড়ল, তারপর মীরাছ থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করা হল। এটা তো খুবই অমানবিক হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু যারা এরকম মনে করে তারা জানে না যে, এরকম পোতা পুতনীর জন্য কিছু ওছিয়ত করে যাওয়া উত্তম– এই বিধান তো বহাল রয়েছে। এরকম অবস্থায় দাদা তার এই সব পোতা পুতনীর জন্য কিছু প্রদানের ওছিয়ত করে যাবে এবং সেই ওছিয়ত মোতাবেক তাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে। বা জীবদ্দশায়ই দাদা তাদেরকে কিছু দিয়ে যাবে। তাহলে তো আমানবিক হওয়ার দিকটি থাকল না। শুধু আইন না করে দিলেই মানবিকতা রক্ষা হবে না এমন তো নয়। তাদের জন্য কিছু দেয়ার আইন করা হলে তারা যা পেত, ওছিয়তের মাধ্যমে বা জীবদ্দশায় তো তার চেয়ে বেশী দেয়া যেতে পারে। এই সুযোগ তো রাখা আছেই। এই সব দিক নিয়ে চিন্তা করে দেখলে এ বিধানটি নিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশ ছিল না। কিন্তু অনেক মানুষই একটা বিধানের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সব সাইড নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াই তার সমালোচনা শুরু করে দেয়। আমরা মানবতা নিয়ে ভাবি, যে আল্লাহ এই বিধান দিয়েছেন সেই আল্লাহ কি অমানবিক? নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক! ইসলামের কোন বিধান নিয়ে এরকম বিরূপ মনোভাব রাখা বা সমালোচনা করা জঘন্ন ধরনের পাপ। এতে ঈমানও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করেন।

এতক্ষণ মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিষয়ে আমাদের অনেকের মনে যেসব বিভ্রান্তি রয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হল। আল্লাহ পাক শরীয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধানের ব্যাপারে আমাদের ধারণাকে পরিষ্কার করে দেন। আমাদের ঈমানকে রক্ষা করেন। আমীন!

মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রেও আমাদের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। সে সম্বন্ধেও ধারণা পরিষ্কার করা চাই, যাতে আমাদের আমলের ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়।

মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে একটা ত্রুটি হল– মীরাছ বণ্ঠন করার পূর্বে পিতা মাতা বা যার সম্পদ বণ্ঠন করা হচ্ছে তার ঋণ বা জরুরী ওছিয়ত পূর্ণ করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ নিয়ম হল মৃত্যুর পর প্রথমত– তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হবে, তারপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে, তারপর অর্থ অবশিষ্ট থাকলে তা থেকে ওছিয়ত পূর্ণ করা হবে। তারপর ওয়ারিশদের মাঝে অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ বণ্ঠন করা হবে। জরুরী ওছিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে কোনক্রমেই ওয়ারিশদের মাঝে সম্পদ বণ্ঠন করা হবে না। এরকম না করলে জরুরী ওছিয়ত ও ঋণ পরিশোধ না করার গোনাহ ওয়ারিশদের উপর বর্তাবে। দেখা যায় পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের ওছিয়ত ও ঋণের ব্যাপারে আলোচনা তো দূরে থাকুক, তারা মাইয়েত কি রেখে গেছে, কি পরিমাণ ভাগে পাওয়া যাবে এসব চিন্তা ও আলোচনা নিয়েই অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্য লোকদেরও দেখা যায় আলোচনা করতে শুরু করে যে, উনি চলে গেলেন কি রেখে গেলেন? এ কথা খুব কম লোকেই বলে যে, উনি চলে গেলেন, কী সাথে নিয়ে গেলেন? একজন লোকের মৃত্যুর পর প্রথমত– এটাই তো চিন্তার বিষয় ছিল যে, উনি কি নিয়ে গেলেন? উনার জন্য আমরা কি করতে পারি? কিন্তু আমরা তার বিষয়টা নিয়ে চিন্তা না করে নিজেদের বিষয় নিয়ে চিন্তা করি যে, উনি আমাদের জন্য কি রেখে গেলেন? এর দ্বারা এক ধরনের স্বার্থপরতার মনোভাবই প্রকাশ পায়। এভাবে নিজেদেরটা নিয়ে চিন্তায় ব্যাস্ত হয়ে পড়া হয়, মাইয়েতের জন্য করণীয় বিষয় ভুলে যাওয়া হয়, তার ওছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। এটা আমাদের একটা বড় ধরনের ত্রুটি।

মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে আর একটা ত্রুটি হল– ভাইয়েরা বোনদেরকে বঞ্চিত করে। দেখা যায় বাপের মৃত্যুর পর বড় ভাই অন্য সব ভাইদের সাথে মিলে পিতার সব সম্পদ নিজেদের মালিকানায় নিয়ে নেয়। অনেক সময় মাকে ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে মায়ের জমিও নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়ে বোনদেরকে না দেয়ার কৌশল বের করে। এভাবে বোনদেরকে তাদের হক দেয় না। এটা পরিস্কার জুলম। বোনদের অংশ নিজেরা গ্রাস করা হারাম ও না জায়েয।

অনেক সময় বোনরা কিছু বলে না। ভাইয়েরা এটাকেই অনুমতি ধরে নিয়ে তাদেরকে আর দেয় না। অনেক সময় ভাইয়েরা এমন সব কথা বলে থাকে, যা শুনে বোনেরা তাদের অংশ নিবে না বলে দেয়। যেমন ভাই বোনকে বলল, সম্পদ চাও না ভাই চাও? সম্পদ চাইলে আর কখনও ভাইয়ের পরিচয় দিতে পারবে না। এসব কথা শুনে বোনরা মুখে তাদের পাওনা অংশ ছেড়ে দেয়ার কথা বলে,

www.maktabatulabrar.com

কিন্তু অন্তর দিয়ে তা বলে না। এটা অন্তর দিয়ে ছাড়া হয় না। এরকম ছেড়ে দেয়ার কোন ধর্তব্য নেই, এরকম মানসিক চাপের মধ্যে ফেলে তাদের থেকে দাবী ছাড়িয়ে নিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এটা খুশী মনে ছেড়ে দেয়া নয়। আর খুশী মনে না ছাড়লে তার সম্পদ ভোগ করা জায়েয হবে না। এরকম দাবী ছাড়ার ভিত্তিতে তাদেরকে বঞ্চিত করা হলে সে সম্পদ ভাই বা ভাইদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে না। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٢٠٧١٤ وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره)

অর্থাৎ, কেউ যদি অন্তর থেকে খুশী হয়ে না দেয়, তাহলে তার মাল গ্রহণ করা হালাল নয়।

এমনিভাবে কোন বোন বা ভাই না বালেগ তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও তাদের মাফ করে দেয়া বা দাবী ছেড়ে দেয়াও ধর্তব্য নয়।

মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে আর একটা ত্রুটি হল– ছোট ভাই-বোনদেরকে বঞ্চিত করা হয়। অবুঝ তথা নাবালেগ ভাই-বোনদেরকে বঞ্চিত করা ডবল গোনাহ। কারণ, একে তো তারা হকদার, তদুপরি তারা ইয়াতীম। তাই তাদের মীরাছ না দেয়া হলে হকদারের হক নষ্ট করা এবং ইয়াতীমদের মাল খাওয়া– এই ডবল গোনাহ হবে। ইয়াতীমদের মাল খাওয়া এত বড় গোনাহ যে, কুরআনে কারীমের এক আয়াতে এসেছে,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

(সূরা নেছা: ১০)

অর্থাৎ, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খায় তারা তো নিজেদের পেটে আগুন ভরে। অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে অর্থাৎ, জাহান্নামে ঢুকবে।

মৃত ব্যক্তির না বালেগ সন্তানকে বঞ্চিত করা তো দূরের কথা, মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর গর্ভেও যদি কোন সন্তান থাকে, সে সন্তানকেও মীরাছের অংশ দিতে হবে। তার জন্মের পূর্বে যেহেতু নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না যে, সে ছেলে না মেয়ে, তাই মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান থাকলে সেই সন্তানের জন্ম গ্রহণ করা পর্যন্ত মীরাছ বণ্ঠন স্থগিত রাখতে হবে। তার জন্মের পর মীরাছ বণ্ঠন করা হবে এবং তাকেও অংশ দিতে হবে।

মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে আর একটা ত্রুটি হল– অনেক কিছুকে বণ্ঠনের বিষয়ই মনে করা হয় না। অথচ সেগুলিও বণ্ঠনের বিষয়। সেগুলি বণ্ঠন করার পূর্বে ওয়ারিছদের অনুমতি ব্যতীত কেউ যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যয় করতে পারবে না।

যেমন: মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় বা মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস-পত্রকে বণ্ঠনের বস্তু মনে করা হয় না। ফলে সেগুলি ওয়ারিছদের মধ্যে ভাগ করা ছাড়াই এমনিতে দান খয়রাত করে দেয়া হয় বা কাউকে দিয়ে দেয়া হয়। অথচ এগুলি ওয়ারিছদের শরিকানা সম্পত্তি। সকল শরীকের অনুমতি ছাড়া তা দান করে বা কাউকে দিয়ে দেয়া যাবে না। যদি ওয়ারিছদের মধ্যে কেউ নাবালেগ থাকে, তাহলে তার অনুমতির ধর্তব্য নেই। কারণ, নাবালেগের অনুমতি প্রদান শরীয়ত গ্রহণ করে না। সে ক্ষেত্রে সেই নাবালেগ ওয়ারিছের অংশ রেখে দিতে হবে। অবশিষ্ঠ শরীকগণ সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিলে তাদের অংশেরগুলি দান করা যাবে বা কাউকে দিয়ে দেয়া যাবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অনেক স্থানে দেখা যায় কেউ ইন্তিকাল করলে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করার পূর্বেই তা থেকে তার নামে দুআ দুরূদের অনুষ্ঠানে খরচ করা হয় বা ফকীর-মিসকিনকে খাওয়ানো হয় বা আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো হয়। এ ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা যে, সকল শরীকের অনুমতি ছাড়া তা করা যাবে না এবং ওয়ারিছদের মধ্যে কেউ নাবালেগ থাকলে তার অনুমতির ধর্তব্য নেই। সে ক্ষেত্রে সেই নাবালেগ ওয়ারিছের অংশ থেকে ব্যয় করা যাবে না, অবশিষ্ঠ শরীকগণ সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিলে তাদের অংশ থেকে ব্যয় করা যাবে। তবে হাঁ কোন ওয়ারিশ যদি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিজের টাকা-পয়সা থেকে দান-খয়রাত করে বা ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ায় তাহলে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রে ওয়ারিশদের অন্য কারও থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়বে না। কারণ, সে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যয় করছে। যৌথ সম্পত্তি থেকে তা করতে চাইলে অবশ্যই সব শরীকের অনুমতি নেয়ার ব্যাপার রয়ে গেছে। কারণ, মৃত ব্যক্তির ইন্তিকালের সাথে সাথেই তার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদের মালিক হয়ে যায় তার ওয়ারিছগণ। তাই মরার পর থেকে বণ্ঠন করার পূর্বে তার সম্পদ ব্যয় করতে চাইলে সকল শরীকের সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি থাকতে হবে। নাবালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিছের অনুমতি যেহেতু ধর্তব্য নয়, তাই তার বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার প্রাপ্য অংশ তার জন্যই রেখে দিতে হবে বা ক্ষেত্র বিশেষে তার নিজের জন্যও ব্যয় করা যাবে।

মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে আর একটা ত্রুটি হল– অনেক পিতা মাতা জীবদ্দশায় কোন এক সন্তানের প্রতি রাগ বশত তাকে বাদ দিয়ে অন্য সন্তানদেরকে সম্পদ দিয়ে যায়। যার প্রতি রাগ তাকে বঞ্চিত করে যায়। কিংবা সন্তানদের প্রতি রাগ বশত মৃত্যুর পূর্বে সব সম্পদ দান করে দেয়। অনেকে দান-খয়রাতের আবেগেও সব সম্পদ দান-খয়রাত করে যায়। এটাও ভাল নয়। এভাবে সব সন্তানকে বঞ্চিত করে যাওয়া মানবিক দৃষ্টিতেও ভাল নয়, ইসলামের দৃষ্টিতেও ভাল নয়। সন্তানকে এমন অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম যে, তাদেরকে কারও কাছে হাত পাততে না হয়। সম্পদ থাকতে তাদেরকে নিঃস্ব করে রেখে যাওয়া ঠিক নয়। হাদীছে এসেছে, একবার হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) দান করার আবেগে নিজের সব সম্পত্তি দান করে দিতে চেয়েছিলেন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ দান করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন,

إِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ. الحديث. (البخاري ١٢٩٥ ومسلم ٤٢٩٦)

অর্থাৎ, তুমি তোমার ওয়ারিছদেরকে এমনভাবে রেখে যাবে যে, তাদেরকে মানুষের কাছে হাত পাততে হবে, তার চেয়ে তাদেরকে স্বচ্ছল করে রেখে যাওয়া উত্তম।

তাই কোনক্রমেই সম্পদ থাকতে কোন ওয়ারিশ ও সন্তানকে বঞ্চিত করে যাওয়া ভাল নয়।

অনেক ভাই কোন কারণে রাগ হয়ে সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেন। সন্তানকে ত্যাজ্য করলে ত্যাজ্য হয় না। সে অন্য সন্তানদের মতই মীরাছ পায়। মীরাছ বণ্ঠন করার সময় এরকম সন্তানকেও মীরাছ থেকে ন্যায্য অংশ দিতে হবে, তাকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

মীরাছ বা উত্তরাধিকারের বিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে আর একটা ত্রুটি হল– আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাদের অংশ নেই, এরকম দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন মীরাছ বণ্ঠনের সময় উপস্থিত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

থাকলেও তাদেরকে কিছুই দেয়া হয়না। অথচ তাদেরকে দেয়া ফরয ওয়াজিব না হলেও তাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়া উত্তম। সম্পদ না দিতে পারলে অন্তত উত্তম কথা বলে তাদেরকে বিদায় দিবে। এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا. (সূরা নিছা: ৮)

অর্থাৎ, যখন সম্পদ বণ্ঠন করার সময় দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম মিসকীনরা উপস্থিত হয়, তখন তাদেরকে সেই সম্পদ থেকে কিছু দিও এবং উত্তম কথা বলে বিদায় দিও।

সম্পদ বণ্ঠন সম্পর্কে আরও একটা বিষয় আলোচনা করতে চাই। তাহল– অনেক ভাই মনে করেন, আমার মৃত্যুর পর সন্তানরা সম্পদ বণ্ঠন নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করতে পারে বা কারও প্রতি অবিচার হতে পারে। তাই তারা বেঁচে থাকতেই সম্পদ বণ্ঠন করে দিয়ে যান। এ ব্যাপারে মাসআলা হল–

বেঁচে থাকতে আপনার সম্পদ আপনি চাইলে দিয়ে যেতে পারেন। তবে বেঁচে থাকতে সম্পদ দিয়ে যেতে চাইলে সব সন্তানকে সমান দেয়া উত্তম। ছেলেকে মেয়ের ডবল দেয়ার যে বিধান তা আপনার মৃত্যুর পর বণ্ঠন হলে তখনকার নিয়ম। জীবদ্দশায় দিয়ে গেলে সকলকে সমান দেয়া উত্তম। একমাত্র যদি কোন সন্তান আয়-উপার্জনে অক্ষম হওয়ার মত পঙ্গু হয় অথবা কোন সন্তান যদি এরকম হয় যে, সে দ্বীনী কাজে বেশী ভাবে নিয়োজিত থাকার কারণে আয়-উপার্জনে সময় দিতে পারে না, তাহলে এই দুই ধরনের সন্তানকে কিছু বেশী দিয়ে যাওয়া যেতে পারে। অতএব জীবদ্দশায় সম্পদ দিয়ে যেতে চাইলে এই দুই ধরনের সন্তান ছাড়া আর সকলকে সমান করে দিয়ে যাবেন।

যাহোক এতক্ষণ আপনাদের সামনে মীরাছ বিধান সম্পর্কে দুইটা বিভ্রান্তি এবং ছয় ধরনের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা হল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব বিভ্রান্তি ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং – ৫০

ঈমান-আমলের উপর অটল থাকা প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوٰى.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা জীবনে অনেক ওয়াজ-নছীহত শুনেছি, শুনে থাকি। আমরা জীবনে অনেক দ্বীনী কিতাব-পত্র পড়েছি, পড়ে থাকি। এই সব ওয়াজ-নছীহত শুনে ও দ্বীনী কিতাব-পত্র পড়ে আমরা ঈমান-আমলের কথা শিক্ষা করি। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জানা নয় বরং জেনে সেই অনুযায়ী আমল করাই মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা যা কিছুই শিক্ষা করি তা সব আমলে আনতে পারি না। আবার যা কিছুই আমলে আনতে পারি তার অনেকটার উপর অটল থাকতে পারি না। আমল করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, আমলের উপর অটল থাকাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। বরং আমলের উপর অটল থাকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ঈমান আমলের উপর অটল থাকাকে আরবীতে বলা হয় "ইস্তেকামাত"।

যাদের মধ্যে ইস্তেকামাতের গুণ রয়েছে অর্থাৎ, যারা দ্বীন তথা ঈমান আমলের উপর অটল থাকে, তাদেরকেই আল্লাহ্ পছন্দ করেন। এর বিপরীত যারা যারা ঈমান আমল ও দ্বীনের উপর অটল থাকে না তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। যেমন নামায একটা ইবাদত। এই ইবাদতের উপর যারা অটল থাকে না আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন। তারপর যারা অটল থাকে তাদের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ. (সূরা মাআরিজ : ২২-২৩)

অর্থাৎ, ঐসব নামাযী যারা সর্বাবস্থায় নামাযের উপর অটল থাকে তাদের কথা ভিন্ন, তারা এই নিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা প্রশংসার যোগ্য। দ্বীন তথা ঈমান আমলের উপর অটল থাকার গুণ এত বড় যে, বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন,

اَلْاِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ كَرَامَةٍ.

অর্থাৎ, ইস্তেকামাত তথা দ্বীনের উপর অটল থাকা হাজার কারামতের চেয়েও উত্তম।

আমরা সাধারণত বুযুর্গদের কারামত খুঁজে থাকি যে, কোন বুযুর্গ কত কারামত দেখাতে পারেন, কে কত অদ্ভুত জিনিস দেখাতে পারেন। যিনি যত বেশী কারামত দেখাতে পারেন, যিনি যত অদ্ভুত ধরনের কিছু দেখাতে পারেন, আমরা তাকেই তত বড় বুযুর্গ মনে কর। কিন্তু এই সব কারামতের চেয়ে ইস্তেকামাত বা ইবাদতের উপর অটল থাকা অনেক উপরের গুণ। অদ্ভুত ধরনের কিছু দেখানো বুযুর্গী ছাড়াও হতে পারে, কিন্তু ইস্তেকামাত নিশ্চিত বুযুর্গীর লক্ষণ। তাই বলা হয়েছে, ইস্তেকামাত তথা দ্বীনের উপর অটল থাকা হাজার কারামতের চেয়েও উত্তম।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ইস্তেকামাতের গুরুত্ব এত বেশী হওয়ার একটা কারণ হল– ইস্তেকামাত না থাকলে পিছনের দিকে যাওয়া শুরু হয়। আর একবার পিছনের দিকে যাওয়া শুরু হলে পিছন দিকে যেতে যেতে মানুষ কুফ্‌র পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। যেমন একজন মানুষ নিয়মিত নামাযী। এখন যদি তার মধ্যে ইস্তেকামাত না থাকে, তাহলে এরকম হতে পারে যে, একদিন তার মনে হল এখন খুব খারাপ লাগছে, এখন নামায না হয় নাই পড়লাম, পরে কাযা করে নিব। এই মনে করে সে ওয়াক্ত মত নামায পড়ল না। এভাবে নামায ছাড়াটা চলতে থাকল। এরপর প্রথম প্রথম হয়তো সে কাযা করবে, কিন্তু পরে কাযা করাও বন্ধ হবে। তারপর মাঝে মধ্যে এক দুই ওয়াক্ত ছুটবে, তারপর আরও বেশী ছুটবে। এরপর আস্তে আস্তে পুরো নামাযই ছুটতে শুরু করবে। এভাবে আস্তে আস্তে সে বে-নামাযী বরং আরও আগে বাড়তে বাড়তে এক সময় সে সম্পূর্ণ বেদ্বীন হয়ে যাবে। এভাবে পিছন দিকে সরতে সরতে এভাবে মানুষ কুফ্‌র পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। তাহলে দেখা গেল ইস্তেকামাতের গুণ না থাকলে দ্বীনের উপরই থাকা সম্ভব হয় না। তাই বলা হচ্ছে আমল করা যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে যে কোন আমল শুরু করা হলে তার উপর অটল থাকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

নামাযের ব্যাপারে যেমন অটল থাকতে হবে, তেমনি প্রত্যেক আমলের ক্ষেত্রে অটল থাকতে হবে। আমি যদি অটল না থাকি বরং পিছন দিকে যাওয়া শুরু করি, তাহলে বুঝতে হবে আমার পতন অনিবার্য হয়ে গেছে। অতএব আমি যতটুকু নামায পড়ি, তার থেকে একটুও পিছন দিকে সরব না। আমি যতটুকু রোযা রাখি, তার থেকে একটুও পিছন দিকে সরব না। আমি যতটুকু যিকির-আযকার করি, তার থেকে একটুও পিছন দিকে সরব না। আমি যতটুকু দান-সদকা করি, সাধ্য থাকলে তার থেকে একটুও পিছন দিকে সরব না। আমি যতটুকু দ্বীনের জন্য সময় লাগাই, তার থেকে আমি পিছন দিকে সরব না। এমনিভাবে দ্বীনের যে কোন কাজ আমি যতটুকু করি তার থেকে একটুও পিছন দিকে সরব না। তবে হাঁ কখনও শরীয়তসম্মত কোন ওজরের কারণে কোন নেক আমল করতে না পারলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। শরীয়তসম্মত কোন ওজর না থাকলে কোন আমল থেকেই পিছন দিকে সরা যাবে না।

মনে রাখতে হবে পিছন দিকে সরতে শুরু করলে এই সামান্য সরাই নয়, এর শেষ পরিণতিতে আমি একেবারে বদ-দ্বীনও হয়ে যেতে পারি। তাই দ্বীনের উপর অটল থাকতে হবে। যেকোন অবস্থা আমার সামনে আসুক– সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, অভাব-স্বচ্ছলতা যে কোন অবস্থাই আসুক, সর্বাবস্থায় আমি দ্বীনের উপর অটল থাকব। যদি অটল থাকতে পারি, তাহলে আমি দ্বীনের উপর থাকতে পারব। নতুবা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

ইস্তেকামাতের উপর থাকতে হলে কয়েকটা কাজ করতে হবে। **ইস্তেকামাতের উপর থাকতে হলে এক নম্বর কাজ হল–** পাকাপোক্ত নিয়ত তথা মজবূত ইরাদা করতে হবে যে, আমি যে আমল যতটুকু শুরু করেছি, তার থেকে একটুও সরব না, আমি দ্বীনের উপর অটল থাকবই, কোন পরিস্থিতিতেই আমি তা থেকে সরব না। পাকাপোক্ত নিয়ত তথা মজবূত ইরাদা এমন জিনিস যে, মানুষ যে বিষয়ে পাকাপোক্ত নিয়ত তথা মজবূত ইরাদা করবে, সে সেটা করতে পারবে, আল্লাহ পাক তাকে সেটা করার তাওফীক দান করবেন। হাদীছে এসেছে,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوٰى. (متفق عليه)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এই হাদীছের অনেকগুলো ব্যাখ্যা রয়েছে। তার ভিতরে একটা ব্যাখ্যা হল যে, সমস্ত আমল আসে নিয়তের ভিত্তিতে। মানুষ যখন নিয়ত করে তখন আমল করতে পারে। ইরাদা করলে কাজ করতে পারে। যার ইরাদা নেই সে কাজ করতে পারে না।

ইরাদা যখন মজবূত এরাদা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সব বাধা দূর হয়ে যায়। আমাদের সামনে অনেক ধরনের বাধা আসে। এই বাধা কতক্ষণ থাকে? যতক্ষণ আমার ভিতরে ইচ্ছার দূর্বলতা থাকে। আর যদি আমি মজবূত ইচ্ছা করে নেই যে, এটা করবই, তাহলে আর বাধা থাকে না। মজবূত ইরাদা না হলে অনেক বাধা মনে হয়। যেমন অফিসে যাওয়ার পাকাপোক্ত ইচ্ছা নেই, তাহলে অফিসের বসকে বুঝ দেয়া যায় যে, সার! আজকে হরতাল, রিক্স-গাড়ী সব বন্ধ, কী করে আসব? কিন্তু যদি কোর্টে আপনার কেস থাকে, তাহলে যাওয়ার পাকাপোক্ত ইচ্ছা হবে। তখন কোন বাধা থাকবে না। দেখা যাবে হরতালের কারণে বাস চলছে না, রিক্সয় চলে গেছেন কিংবা হেঁটে চলে গেছেন। দেখা গেল মজবূত ইরাদা থাকার কারণে বাধা বাধা থাকল না। তাই মজবূত ইরাদা করতে হবে যে, আমি দ্বীনের উপর চলবই। মজবূত ইরাদা করতে হবে যে, আমি দ্বীনের উপর অটল থাকবই। তাহলে কোন বাধাই বাধা হয়ে থাকবে না। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারি না, পর্দা মানতে পারি না, ইসলামী লেবাস-পোশাক মানতে পারি না, দাড়ি রাখতে পারি না, মাথায় টুপি নিতে পারি না, হাতে তাসবীহ নিতে পারি না, কত কিছু করতে পারি না, আমার সামনে কত বাধা। কিন্তু মন থেকে চাইলে, পাকাপোক্ত ইরাদা করলে সব বাধা দূর হয়ে যাবে। অমি মন থেকে চাই কি-না এটাই হল বড় কথা। আমি সত্যিকার ভাবে চাইলে অর্থাৎ, পাকাপোক্ত ইরাদা করলে অনেক কিছুই সম্ভব মনে হবে– আমল করাও সম্ভব মনে হবে, আমলের উপর অটল থাকাও সম্ভব মনে হবে। আল্লাহ পাকই তাওফীক দান করবেন। এক হাদীছে এসেছে,

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. الحديث. (متفق عليه — البخاري برقم ٦٤٧٠ ومسلم ٢٤٧١)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চায় যে, কারও কাছে হাত পাতবে না, আল্লাহ্ পাক তাকে সেরকম থাকার তাওফীক দিবেন। যে ব্যক্তি চায় যে, পবিত্র জীবন যাপন করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে সেরকম থাকার তাওফীক দিবেন। যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে বিরত থাকতে এবং ইবাদত-বন্দেগীর উপর অটল থাকতে চায়, আল্লাহ্ পাক তাকে সেরকম থাকার তাওফীক দিবেন।

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল– খাঁটি দিলে কোন আমল করতে চাইলে আল্লাহ পাক সে ব্যাপারে তাওফীক দান করেন। তাই দ্বীনের উপর অটল থাকতে চাইলে খাঁটি অন্তরে সেটা চাইতে হবে।

ইস্তেকামাতের উপর থাকতে হলে দুই নম্বর কাজ হল– আল্লাহর যাতকে সামনে রেখে, আখেরাতকে সামনে রেখে আমল করতে হবে। দুনিয়ার কাউকে দেখানোর জন্য নয়, দুনিয়ার কাউকে খুশী করার জন্য নয়, দুনিয়ার কোন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য নয়, বরং আল্লাহকে খুশী করার জন্য এবং আখেরাতের ফায়দার জন্য আমল করতে হবে। যদি কেউ দুনিয়ার কাউকে দেখানোর জন্য আমল করতে অভ্যস্ত হয়, অর্থাৎ, সুনামের জন্য বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য আমল করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে যেখানে সুনাম পাওয়া যায় না, যেখানে প্রশংসা পাওয়া যায় না, সেখানে সে আমল করতে উদ্বুদ্ধ হয় না। যদি কেউ দুনিয়ার স্বার্থের জন্য আমল করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে যেখানে স্বার্থ থাকে না সেখানে

www.maktabatulabrar.com

সে আমল করতে উদ্বুদ্ধ হয় না। এভাবে সে ইস্তেকামাত থেকে সরে যায়। এর বিপরীত যে ব্যক্তি আল্লাহর যাতকে সামনে রেখে আমল করে, আখেরাতকে সামনে রেখে আমল করে, সে সর্বাবস্থায় আমল করতে পারে। মানুষে ভাল না বললেও তার কোন পরওয়া থাকে না, কারণ সে আল্লাহর কাছে ভাল হতে পারাকেই মূল লক্ষ্য বানিয়েছে। কে কি মনে করবে তার কোন পরওয়া তার থাকে না, কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সামনে রেখে সে আমল করে না। দ্বীনের কোন কাজ করতে যেয়ে তার দুনিয়ার কোন স্বার্থ নষ্ট হলেও কোন পরওয়া থাকে না, কারণ সে আখেরাতের স্বার্থকেই মূল লক্ষ্য বানিয়েছে। সুখে থাকুক দুঃখে থাকুক, সুবিধায় থাকুক অসুবিধায় থাকুক, সর্বাবস্থায় সে আমল করে যেতে পারে, কারণ দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, দুনিয়ার সুবিধা-অসুবিধা তার কাছে বড় বিষয় নয় বরং আখেরাতের সুখ পাওয়া এবং আখেরাতের সুবিধা পাওয়াই তার তার কাছে বড়। তাই ঈমান-আমলের উপর ইস্তেকামাতের সাথে থাকতে হলে আল্লাহর যাতকে সামনে রেখে এবং আখেরাতকে সামনে রেখে আমল করতে হবে।

ইস্তেকামাতের উপর থাকতে হলে তিন নম্বর কাজ হল– আল্লাহর কাছে ইস্তেকামাতের জন্য তথা ঈমান আমলের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে, আল্লাহ কাছে দুআ করতে হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক এ মর্মে বিভিন্ন দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। হেদায়েতের উপর অটল থাকার জন্য এই দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

(সূরা আলে ইমরান: ৮)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়েত করার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিওনা। তুমি নিজ সন্নিধান হতে আমাদেরকে রহমত দান কর। তুমি তো বড়ই দানকারী।

যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের বিরুদ্ধে অটল থাকার জন্য কুরআনে কারীমে এই দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে–

وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ. (সূরা আলে ইমরান : ১৪৭)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাদের পদসমূহকে অটল রাখ এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

ইস্তেকামাতের উপর থাকার তথা ঈমান আমলের উপর অটল থাকার অনেক ফায়দা ও ফযীলত রয়েছে। **ইস্তেকামাতের উপর থাকার একটা ফায়দা হল–** ইস্তেকামাতের উপর থাকলে দ্বীন থেকে সরে যাওয়ার আশংকা থাকে না। নতুবা দ্বীন থেকেই সরে যাওয়ার আশংকা থাকে। ঈমান আমলের উপরে অটল না থাকলে ঈমান আমল থেকেই বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। ঈমান আমল থেকে একেবারে বিচ্যুত না হলেও এই লাইনে তার উন্নতি হতে পারে না। আজ মনে চাইলো একটু করলাম, কাল আবার ছেড়ে দিলাম, এতে আবার আগের স্থানেই চলে গেলাম। এ সম্পর্কে একটু পূর্বেই কিছু ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে।

ইস্তেকামাতের উপর থাকার আর একটা ফায়দা হল– যারা ইস্তেকামাতের উপর থাকে, দ্বীনের ব্যাপারে, ঈমান-আমলের ব্যাপারে তাদের অন্তর নরম থাকে, শক্ত হয় না। এর বিপরীত যারা ইস্তেকামাতের উপর থাকে না, দ্বীনের ব্যাপারে, ঈমান-আমলের ব্যাপারে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যায়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারি। যারা এখনো মসজিদে আসা শুরুই করেনি, তাদেরকে মসজিদে আনা এত বেশী কঠিন নয়। কিন্তু কিছুদিন এসে যারা বন্ধ করে দেয় তাদেরকে আবার মসজিদে আনা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একজন বে-নামাযীকে নামাযের জন্য আসতে বললে সে তত ভেগে যায় না, তাকে মসজিদে আনতে বেশী বেগ পেতে হয় না। কিন্তু কিছুদিন নামায পড়েছে এরপরে বন্ধ করে দিয়েছে– এমন লোককে রশী দিয়েও টেনে আনা কঠিন হয়। এরকম হওয়ার কারণ হল কোন আমল শুরু করে ছেড়ে দিলে দিলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। কোন ভাল জিনিস গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হওয়ার পর খারাপ জিনিস গ্রহণ করলে তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু যে লোক ভালটা গ্রহণই করেনি, সে খারাপটা গ্রহণ করে যেতে থাকলে তার অবস্থা ততটা খারাপ হয় না। যেমন একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একব্যক্তি বিশুদ্ধ পানি পান করতে অভ্যস্ত, সে যদি কখনও আ-ফোটানো পানি বা খারাপ পানি পান করে, তাহলে তার পেট খারাপ হবে, সাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়বে। কিন্তু যে ব্যক্তি ওরকম বিশুদ্ধ পানি পান করতে অভ্যস্ত নয় বরং যেনতেন পানি পান করে অভ্যস্ত, সে আ-ফোটানো বা অশুদ্ধ পানি পান করলেও তার পেট তেমন খারাপ হবে না, তার সাস্থ্যে তার কোন খারাপ প্রভাব তেমন একটা ফুটে উঠবে না। তদ্রূপ ঈমান আমলের মত ভাল জিনিস গ্রহণ করতে শুরু করার পর কেউ তা ছেড়ে দিলে তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে।

ইস্তেকামাতের উপর থাকার আর একটা ফায়দা হল– যারা দুনিয়াতে ঈমান আমলের উপর অটল থাকে, তারা মৃত্যুর সময়ও ঈমানের উপর অটল থাকতে পারে, কবরে মুনকার নাকীরের সওয়ালের সময়ও অটল থাকতে পারে এবং সঠিকভাবে তাদের সওয়ালের জওয়াব দিতে পারে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ. (সূরা ইবরাহীম: ২৭)

অর্থাৎ, যারা শাশ্বত বাণীতে তথা কালেমার উপর প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে এবং আখেরাতে তাদেরকে মজবুত রাখবেন, আর যারা জালেম তাদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।

দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে আমি ঈমানের উপরে অটল, আমি ঈমান থেকে বিচ্যুত হতে রাজী নই, যত বাধা আসুক, যত কু-মন্ত্রনা আসুক, যত লোভের হাতছানী আসুক, কোন অবস্থাতেই আমি ঈমান থেকে বিচ্যুত হতে রাজী নই। যে যা বলুক আমি ঈমানের উপর অটল। বুদ্ধিজীবিরা যা বলুক, বিধর্মীরা যা বলুক, ইহুদী নাসারারা যা বলুক কারও কোন কথাতে আমি ঈমান-আমল থেকে সরতে রাজী নই। কেউ বেঁচে থাকতে এভাবে ঈমানের উপর মজবূত থাকলে মৃত্যুর সময়ও আল্লাহ্ তাকে ঈমানের উপর মজবূত রাখেন। কবরে যখন মুনকার নাকীর সওয়াল করবে, তখনও তাকে ঈমানের উপর মজবূত রাখেন। কবরে মুনকার নাকীর সওয়াল করবে مَنْ رَّبُّكَ অর্থাৎ, তোমার রব কে? তখন যারা পাপী বিধর্মী, তারা ঐ মুনকার নাকীরের বিভৎস রূপ দেখে ঘাবড়ে যাবে। তখন বলবে, هَا هَا لَا اَدْرِيْ অর্থাৎ, হায় হায় আমি তো জানি না! এরকম মুহূর্তে দুনিয়াতে যারা ঈমানের উপরে মজবূত থেকেছে তারা ঘাবড়াবে না, তারা সঠিক জওয়াব দিতে পারবে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দৃঢ় রাখবেন।

মৃত্যুর সময় শয়তান অনেক রকম ধোকা নিয়ে আসে। তখন ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ পাক হেফাজত করলে তার ঈমান রক্ষা পায়। একটা ঘটনা বলি। একজন বড়

www.maktabatulabrar.com

আলেমের ঘটনা। তিনি হলেন আল্লামা কুরতুবী। যখন তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। আশে পাশে লোকজন আছে। তারা দেখলেন যে, হুজূরের একেবারে মুমূর্ষ অবস্থা। তারা বললেন, হুজুর! পড়ুন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন আল্লামা কুরতুবী মাথা ঝাড়া দিয়ে বলছেন না না, ঠিক না। মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ল। হুজুর বলেন কী! এত বড় আলেম মৃত্যুর সময় কালেমা পড়বেন না? তারা তো রহস্য বোঝেনি যে, কি জন্য আল্লামা কুরতুবী এরকম করছেন। যাহোক আল্লাহ্ পাক রক্ষা করেছেন তখন আল্লামা কুরতুবীর মৃত্যু হয়নি। লোকজন জিজ্ঞাসা করেছে যে, হুজুর! এই অবস্থায় আমরা আপনাকে কলেমা পড়তে বললাম অথচ আপনি না করলেন, কি কারণ? তিনি বললেন, কেন তোমরা হাদীছ পড়নি? হাদীছে এসেছে– কারও মৃত্যুর সময় আসন্ন বুঝলে দুটো শয়তান তার কাছে আসে। একজন বলে যে, এতদিন তো ধর্ম কর্ম আনেক কিছু করেছ, কিন্তু সত্য ধর্মতো পাওনি। সত্য ধর্ম তো ইহুদীদের ধর্ম। সে এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ পেশ করতে থাকে। তখন যাদের ঈমান দূর্বল তারা বলে হ্যাঁ, এটাই সঠিক। এভাবে কুফরীর উপর তার মৃত্যু হয় অর্থাৎ, সে ঈমান হারা হয়ে মারা যায়। আরেক শয়তান বলে, সত্য ধর্মতো খৃষ্টানদের ধর্ম। সে এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ পেশ করতে থাকে। তখন যাদের ঈমান দূর্বল তারা বলে হ্যাঁ, এটাই সঠিক। এভাবে কুফরীর উপর তার মৃত্যু হয় অর্থাৎ, সে ঈমান হারা হয়ে মারা যায়। তিনি বললেন, আমার কাছেও এরকম দুই শয়তান এসেছিল। একজন বলেছিল ইহুদী হওয়ার জন্য, আমি বলেছি না! আরেকজন বলেছে খৃষ্টান হওয়ার জন্য, আমি বলেছি না। আমি তো ঐ শয়তানদের কথার উপরে না বলেছি, তোমাদের কথার উপরে না বলিনি।

আল্লাহ্ পাক হেফাজত করেছেন, নতুবা যদি এই অবস্থায় আল্লামা কুরতুবীর মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে মানুষে মন্তব্য করত যে, তিনি বে-ঈমান হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু সেটা কত বড় ধরনের মিথ্যা মন্তব্য হত। তাই আলেমদের বিরুদ্ধে, ওলী আউলিয়া ও বুযুর্গদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে নেই, তাদের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করতে নেই। বাহ্যিকভাবে কোন আলেম বুযুর্গের কোন বিষয় বুঝে না আসলেও তার সমালোচনা করতে নেই। যদিও বাহ্যিক কিছু দেখে আমরা মনে করি তিনি ঠিক করছেন না, অন্যায় করছেন, তবুও তার সমালোচনা করতে নেই। মনে করতে হবে– তিনি বড় আলেম, আল্লাহই জানেন তিনি কোন্ হেকমতে, কোন্ রহস্যে কি বলেন কি করেন। হাঁ, বাহ্যিকভাবে কোন আলেম থেকে শরীয়ত বিরোধী কোন কথা বা কাজ প্রকাশ পেলে তাদের সমকক্ষ আলেম উলামা যারা রয়েছেন, তারা সে ব্যাপারে তার সাথে কথা বলতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আলেম বুযুর্গদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করতে যাওয়া বা তাদের সমালোচনায় অবতীর্ণ হওয়া ঠিক নয়।

যাহোক এ ঘটনা থেকে এবং হাদীছ দ্বারাও বোঝা গেল যে, মৃত্যুর সময় সঙ্গীন ঈমানের পরীক্ষার সন্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ পাক হেফাজত না করলে তখন ঈমানের উপর টিকে থাকা সম্ভব হয় না। যারা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল থাকে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তখন ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এটা ইস্তেকামাতের একটা বড় ফায়দা।

ইস্তেকামাতের উপর থাকার আর একটা ফায়দা হল– যারা ইস্তেকামাতের উপর থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত পাওয়ার সু-সংবাদ দান করেছেন। এর চেয়ে বড় ফায়দা আর কী হতে পারে? কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (সূরা আহকাফ: ১৩-১৪)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, যারা বলে আমার রব আল্লাহ্ অর্থাৎ, ঈমাও ও তাওহীদের কথা বলে, তারপর অটল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখীত হবে না। তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে তাদের কৃতকর্মের কারণে।

এ আয়াতে বাহ্যত আল্লাহ আমাদের রব– এ কথার উপর অর্থাৎ, ঈমানের উপর অটল থাকার কথা বলা হয়েছে, তবে ঈমানের কথা বললে আমলের কথাও এসে যায়। কারণ, আল্লাহকে যখন মানি আল্লাহর কথাও তো মানতে হয়, না হলে আল্লাহকেই মানা হয় না। আমি যদি আপনাকে মুরব্বী মানি, কিন্তু আপনার কথা আনুযায়ী চলতে রাজী না হই, আপনার কথা অনুযায়ী না চলি, তাহলে আপনাকে মুরব্বী মানা হল না। তদ্রূপ আল্লাহর উপর ঈমান মানলে তথা আল্লাহকে মানলে তার হুকুম আহকাম-অনুযায়ী আমল করার কথাও অটোমেঠিক এসে যায়। অতএব এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে– যারা ঈমানের উপরে এবং আমলের উপরে অটল থাকবে তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন দুঃখ থাকবে না। তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

সারকথা– ঈমান আমলের উপর অটল থাকা চাই, মজবূত থাকা চাই। যে আমল শুরু করেছি তার থেকে পিছনে সরে যাওয়ার অবকাশ নেই। যে আমল শুরু করেছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না। ফরয নামায শুরু করেছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না।। মসজিদে জামাআতে আসা শুরু করেছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না। পর্দা মানা শুরু করেছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না। দাড়ি টুপি শুরু করেছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না। ইশরাক আওয়াবীন শুরু করেছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না। তাহাজ্জুদ শুরু করেছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না। যিকির-আযকার শুরু করেছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না। দ্বীনের যে কোন আমল করা শুরু করেছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না। দ্বীনের লাইনে যতটুকু অগ্রসর হয়েছি, কোন অবস্থাতেই তা থেকে পিছনে সরে যাব না বরং আরও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করব। যারা এভাবে অটল থাকবে, মৃত্যুর সময়ও তাদের ঈমান হারা হওয়ার ভয় নেই, কবরে মুনকার নাকীরের সওয়ালের সময়ও তাদের কোন ভয় নেই, জাহান্নামেরও তাদের কোন ভয় নেই। তারা জান্নাত লাভ করবে ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ইস্তাকামাতের গুণ অর্জন করার তাওফীক দান করুন, দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন, ঈমান আমলের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

খুতবা সংক্রান্ত মাসায়েল

খুতবার জরুরী বিষয়সমূহ

১. খুতবা নামাযের পূর্বে হতে হবে।
২. খুতবার নিয়ত থাকতে হবে।
৩. খুতবা জোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে।
৪. খুতবা কমপক্ষে এমন তিনজন লোকের সামনে হতে হবে যাদের দ্বারা জুমুআ কায়েম হয়।
৫. খুতবা এবং নামাযের মাঝে কোন আজনবী (অসংশ্লিষ্ট) কাজের ব্যবধান ঘটতে পারবে না।
৬. উভয় খুতবাই আরবী ভাষায় হওয়া জরুরী (অর্থাৎ, সুন্নাতে মুআক্কাদা)। আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুতবা পড়া বা অন্য কোন ভাষায় পদ্য যোগ করা মাকরূহ তাহ্‌রীমী ও বিদআত।

(فتاوى دار العلوم ج/১ ও بهشتى گوهر থেকে গৃহীত।)

খুতবার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. খুতবার মধ্যে আল্লাহ্‌র শোকর বর্ণিত হওয়া সুন্নাত।
২. খুতবার মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণিত হওয়া সুন্নাত।
৩. খুতবার মধ্যে তাওহীদ ও রেছালাতের সাক্ষ্য বর্ণিত হওয়া সুন্নাত।
৪. খুতবার মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ পাঠ করা সুন্নাত।
৫. খুতবার মধ্যে ওয়াজ নছীহাত বয়ান করা সুন্নাত।
৬. খুতবার মধ্যে দুই একটি আয়াত বা সূরা পাঠ করা সুন্নাত।
৭. দুই খুতবা পড়া সুন্নাত। দ্বিতীয় খুতবায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করা সুন্নাত।
৮. দ্বিতীয় খুতবায় সমস্ত মুসলমান নর-নারীর জন্য দুআ ও এস্তেগফার করা সুন্নাত।
৯. খুতবা অত্যন্ত লম্বা না করা সুন্নাত বরং নামাযের চেয়ে কম রাখবে।
১০. ছানী (দ্বিতীয়) খুতবায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আওলাদ, সাহাবীগণ ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবি সাহেবাগণের প্রতি বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত হামযা ও আব্বাস (রা.)-এর জন্য দুআ করা মোস্তাহাব। সমসাময়িক মুসলমান বাদশাহ্‌র জন্য দুআ করা জায়েয কিন্তু তার মিথ্যা প্রশংসা করা মাকরূহ তাহ্‌রীমী।

* রমযান শরীফের শেষ জুমুআর খুতবায় "আল বিদা" জ্ঞাপন কিংবা বিদায় ও বিচ্ছেদমূলক বিষয় পড়া প্রমাণিত নয় বিধায় তা বিদআত।

(فتاوى دار العلوم ج/১ ও بهشتى گوهر থেকে গৃহীত।)

খতীবের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাসায়েল

* খতীবের উযূ গোসলের হাজত থেকে পবিত্র হয়ে নেয়া সুন্নাত।

* খতীব মিম্বরে উঠে কিছুক্ষণ বসবেন, তারপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন। এটাই সুন্নাত।

* খতীবের জন্য প্রথম খুতবার শুরুতে শুধু আউযুবিল্লাহ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم চুপে চুপে (জোরে নয়) বলা সুন্নাত। (احسن الفتاوى ج/٤)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

* উপস্থিত মুসল্লীদের দিকে মুখ করে খুতবা দেয়া সুন্নাত। খুতবার সময় ডানে বামে সীনা ঘুরিয়ে রুখ করা নিষিদ্ধ, তবে শুধু ডানে বামে নজর করা যায়। আর তারগীব-তারহীবের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে আওয়াজ ও আন্দাজের মধ্যে পরিবর্তন জায়েয বরং সুন্নাত। (فتاوی رحیمیہ جـ/١)

* দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া সুন্নাত।

* মিম্বরের উপর খুতবা দেয়া সুন্নাত।

* লাঠি হাতে খুতবা দেয়া সুন্নাত (গায়রে মুআক্কাদা)। মিম্বর থাকলেও এটা সুন্নাত। (فتاوی دار العلوم جـ/٥) তবে মাঝে মধ্যে লাঠি নেয়া পরিত্যাগ করা উচিত, অন্যথায় বিদআত হয়ে যাবে। (احسن الفتاوی جـ/٤)

* খুতবার বই হাতে থাকলে লাঠি বাম হাতে নেয়া উত্তম আর বই হাতে না থাকলে লাঠি ডান হাতে নেয়া উত্তম। (فتاوی رحیمیہ جـ/٣)

* খতীবের জন্য মুখস্ত খুতবা দেয়া বা কিতাব কিংবা অন্য কিছু দেখে খুতবা পড়া সবটাই জায়েয।

* খতীবের জন্য দুই খুতবার মাঝখানে তিন আয়াত পড়া পরিমাণ সময় বসা সুন্নাত।

* লোকে শুনতে পারে এ পরিমাণ আওয়াজের সাথে খুতবা পড়া সুন্নাত। কাছের লোকে শুনতে পারে অন্তত এতটুকু জোরে পড়া জরুরী।

* খতীব খুতবার সময়েও নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করতে বা মাসআলার কথা বলতে পারেন বরং মুনকার (বদকাজ) দেখলে মুখেই নিষেধ করা তার উপর ফরয। (احسن الفتاوی جـ/٤)

* খতীবের জন্য খুতবার পূর্বে মেহরাবের মধ্যে নামায পড়া মাকরূহ। পড়তে হলে মিম্বরের ডান দিকে পড়বে। (الفقه علی المذاهب الاربعة)

* খতীবের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে খুতবা দেয়া জরূরী নয়।

* খতীব খুতবা এবং ইকামতের মাঝখানে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্তভাবে কোন মাসআলা বলতে পারেন। (احسن الفتاوی جـ/٤)

* খতীব খুতবার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে ওয়াজ-নছীহত করতে পারেন, এটা জায়েয বরং মোস্তাহাব, যদি মুসল্লীগণ চান। (فتاوی رحیمیہ جـ/١)

খুতবার সময় শ্রোতাদের করণীয় আমলসমূহ

* জুমুআর দ্বিতীয় আযানের জওয়াব ও তার পরের দুআ জায়েয নেই। (فتاوی دار العلوم جـ/٥)

* যখন খতীব খুতবার জন্য দাঁড়াবেন, তখন থেকে খুতবার শেষ পর্যন্ত নামায পড়া বা কথা-বার্তা বলা মাকরূহ তাহরীমী। অবশ্য যে ব্যক্তি ছাহেবে তারতীব তার জন্য কাযা নামায পড়া জায়েয বরং ওয়াজিব।

* মনোযোগের সাথে খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। দূরত্বের কারণে খুতবার আওয়াজ শুনতে না পেলেও চুপ করে কান লাগিয়ে থাকা ওয়াজিব এবং যে কাজ বা কথা দ্বারা খুতবা শোনার ব্যাঘাত ঘটে তা মাকরূহ তাহরীমী। তখন হাঁটা চলা, সালাম করা, সালামের জওয়াব দেয়া, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি এমনকি মুখে মাসআলা বলাও নিষিদ্ধ। দান বাক্স চালানো নিষিদ্ধ। তবে কোন বদকাজ (মুনকার) দেখলে ইশারায় নিষেধ করা ফরয। (احسن الفتاوی جـ/٤)

www.maktabatulabrar.com

* সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়ার মধ্যে খুতবা শুরু হলে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে থাকলে নামায পূর্ণ করে নিবে আর এর পূর্বে থাকলে দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে। (احسن الفتاوی جـ/٣) এবং এ সুন্নাত পরে পড়ে নিবে।

* খুতবার সময় নামাযের হালতে বসা আদব এবং কেবলামুখী হয়ে বসবে।

* খুতবার মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মোবারক আসলে মুখে নয় বরং মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয।

❖❖❖
❖❖

(খতীব খুতবার পূর্বে যে ওয়াজ-নসীহত করবেন তা আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা দাওয়াত তাবলীগ-এর পর্যায়ভুক্ত। তাই নিম্নে এ সংক্রান্ত কতিপয় জরুরী বিষয়াদি বর্ণনা করা হল।)

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা দাওয়াত, তাবলীগ এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার সুন্নাত, আদব ও শর্তসমূহ

* আমল বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা দাওয়াত প্রদান এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার পূর্বে নিয়ত সহীহ করে নিবে অর্থাৎ, এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহ্র হুকুম আহকাম চালু করার, আল্লাহ্র দ্বীন যিন্দা করার এবং ছওয়াব হাছিল করার নিয়তে করবে।

* আল্লাহ্র কথা এবং হক কথা বলার কারণে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার উপর ধৈর্য ধারণের জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিবে।

* শ্রোতাদেরকে তাদের কাজ থেকে এবং কথা-বার্তা থেকে ফারেগ করে নিবে।

* আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে।

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহ্র হাম্দ ও দুরূদ শরীফ পড়ে নিবে। তবে ওয়াজের মজলিসে সকলের সম্মিলিত ভাবে সমস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা রছমে পরিণত হয়েছে, তাই এটা পরিত্যাজ্য।

* যে বিষয় বিশুদ্ধভাবে জানা আছে একমাত্র সেটাই বলবে। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যেটা জানা হয়নি, তাহকীক ছাড়া সেটা বর্ণনা করা মিথ্যা বয়ান করার শামিল।

* হেকমত, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলা জরুরী।

* নরমীর সাথে কলা বলা কঠোরতা পরিহার করা। মোস্তাহাব পর্যায়ের বিষয় হলে সর্বদাই নরমীর সাথে বলা, আর ওয়াজিব ও ফরয পর্যায়ের বিষয় হলে প্রথমে নরমীর সাথে তারপর কঠোরতার সাথে বলবে।

* অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত ও নছীহত প্রদান করবে, প্রথমে নিজে সেটার উপর আমল শুরু করতে পারলে উত্তম। অন্যথায় মানুষের মনে তার দাওয়াত ও নছীহতের আছর কম হবে।

* এত ঘন ঘন বা এত দীর্ঘ সময় ওয়াজ-নছীহত না করা, যাতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত ঘন ঘন বা এত দীর্ঘ সময় ওয়াজ-নছীহত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করতেন না যাতে করে শ্রোতাগণ ত্যাক্ত হয়ে যেতে পারে।

* শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য রেখে কথা বলা জরুরী। শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা ও তাদের বোধ ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত বিষয় বয়ান করলে তারা সঠিকভাবে মর্ম বুঝতে না পারার কারণে বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে।

* তারগীব (উৎসাহমূলক কথা), তারহীব (ভয় ও সতর্কতামূলক কথা, ফাযায়েল ও আহকাম সব বিষয়ের সমন্বয়ে বয়ান করা। এমনিভাবে ঈমান ও ইবাদতের বিষয়ের সাথে ইসলামের মু'আমালাত, মুআ'শারাত এবং আখলাক-চরিত্র সম্পর্কেও বয়ান রাখা জরুরী।

* শ্রোতাদের মন-মেজায লক্ষ্য রেখে কথা বলা জরূরী।

* যে বিষয় শ্রোতাদের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় সে বিষয়ের বয়ানকে অগ্রাধিকার দেয়া জরূরী।

* দাওয়াত ও ওয়াজ-নছীহতের বিনিময়ে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ না করাই আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের সুন্নাত।

* শ্রোতাদের খায়ের খাহীর জয্বা নিয়ে দাওয়াত দিবে ও বয়ান করবে।

* পরকালমুখী করে বয়ান করা অর্থাৎ, মুখ্যত আল্লাহ্র হুকুম ও দ্বীন মানা না মানার পরকালীন লাভ ক্ষতিকে তুলে ধরেই বয়ান করা। কখনও কখনও পার্থিব লাভ-লোকসানকেও গৌণভাবে উল্লেখ করা যায়।

* দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করা নিয়ম, যেন শ্রোতারা দ্বীনকে কঠিন মনে করে না বসে।

* পর্যায়ক্রমে জরুরী হুকুম-আহকামের চাপ দেয়া তরীকা। একসঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের চাপ দেয়া ঠিক নয়। কারণ, এক সঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের চাপ মনে করে শ্রোতাগণ বিগড়ে যেতে পারে।

* দোষ-ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করা, যেমন বলা যে, আমরা কেন ইবাদত করব না? আমরা এই পাপ পরিত্যাগ করি ইত্যাদি। এরূপ না বলা যে, আপনারা কেন ইবাদত করেন না? আপনারা এই পাপ পরিহার করুন ইত্যাদি।

* দায়ী (দাওয়াত দানকারী) নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখবে। এমন কোন কাজ করবে না যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য বৈধ হলেও বাহ্যিকভাবে সেটা দেখে তার ব্যাপারে কেউ সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে। অন্যায়ভাবে তার উপর কোন অপবাদ আরোপিত হলে সমাজের সামনে সে তার সঠিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে দিবে।

* বয়ান এবং ওয়াজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নছীহত না করা। এতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বক্তার প্রতি মনে মনে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং হিতে বিপরীত হতে পারে।

(اصلاح انقلاب امت، معارف القرآن، شریعۃ السلام، مفاتح الجنان ودینی و دعوت کے قرآنی اصول প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান শ্রবণ করার আদব তরীকা

(যারা খতীবের বয়ান শোনেন, ওয়ায়েজের ওয়াজ শোনেন, তাদেরও কিছু দায়িত্ব কর্তব্য ও আদব রয়েছে। নিম্নে সেগুলি বর্ণনা করা হল।)

* বয়ান এবং ওয়াজ-নছীহতের কথা হলে কথা শোনার পূর্বেই ওয়াজকারী ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য এবং সহীহ মাযহাবের লোক কি-না তা কোন হক্কানী আলেম থেকে জেনে নিয়ে তারপর তার ওয়াজ

www.maktabatulabrar.com

শোনা উচিৎ। এই সতর্কতা অবলম্বনের পরও কোন ওয়ায়েজের কোন কথা অস্পষ্ট বা সন্দেহমূলক মনে হলে কোন বিজ্ঞ হক্কানী আলেম থেকে সে সম্পর্কে ভালভাবে জেনে না নিয়ে তাতে আস্থা স্থাপন করা বা তার উপর আমল করা ঠিক হবে না।

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান তথা দ্বীনী কথা-বার্তা আমলের নিয়তে এবং হেদায়েতের নিয়তে শুনতে হবে। শুধু জানার জন্য জানার নিয়ত রাখলে চলবে না। আমলের নিয়তে শুনতে হবে এবং আমল করতে হবে।

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। কোন কথা বোধগম্য না হলে জিজ্ঞেস করার পরিবেশ থাকলে বক্তার নিকট জিজ্ঞেস করে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। তখন জিজ্ঞেস করার মত পরিবেশ না থাকলে পরবর্তীতে সময় সুযোগে জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতে হবে।

* যার থেকে ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান শোনা হবে তিনি উস্তাদ সমতুল্য। আর আদব হল উস্তাদের কথা বুঝে না আসলে উস্তাদের ত্রুটি নয় বরং নিজের বোধ ক্ষমতা বা মনোযোগের ত্রুটি আছে মনে করতে হয়। সেমতে ওয়ায়েজ ও বয়ানকারীর কোন কথা বুঝে না আসলে নিজের বোধ ক্ষমতা বা মনোযোগের ত্রুটি আছে মনে করতে হবে। তিনি বোঝেন না বা বোঝাতে পারেন না–এরূপ বদ–গোমানী করবে না বরং পরবর্তীতে সময় সুযোগে তাঁর থেকে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করবে।

* উস্তাদের দোষ-ত্রুটি কাউকে বলতে শুনলে যথাসম্ভব সেটা প্রতিহত করতে হয়। আর সম্ভব না হলে সেখান থেকে সরে যেতে হয়।

* উস্তাদের কথা, ওয়ায়েজ ও বয়ানকারীর কথা এমনিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে কেউ কোন কথা বলতে শুরু করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে সরে যাওয়া আদবের খেলাফ। তাই নিতান্ত ওজর না হলে বয়ান ও ওয়াজ-নছীহতের মজলিস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখান থেকে উঠে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে।

* কোন মজলিসে কথা চলতে থাকলে সেদিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে- অন্য কারও সাথে কথা বলা বে-তমীজী।

* মুরব্বী বা উস্তাদ কোন কথা বলার পর বুঝে এসেছে কি না জিজ্ঞেস করলে স্পষ্টভাবে হ্যাঁ বা না বলা উচিৎ, নীরব থাকা ঠিক নয়; এতে উস্তাদ বা মুরব্বীর পেরেশানী হয়। মুরব্বীদের কথার জওয়াব না দেয়া আদবের খেলাফ।

(اصلاح انقلاب امت، آداب المعاشرت প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

❖❖❖
❖❖

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. مَنْ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং

شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ: فَاِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَاَوْثَقَ الْعُرٰى كَلِمَةُ التَّقْوٰى،

নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর– সবচেয়ে সত্য কথা হল আল্লাহর কিতাবের কথা, সবচেয়ে মজবুত হাতল হল তাকওয়ার বাণী,

وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ اِبْرَاهِيْمَ، وَخَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

সবচেয়ে উত্তম মিল্লাত বা ধর্ম হল মিল্লাতে ইবরাহীমী, সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আদর্শ,

وَاَشْرَفَ الْحَدِيْثِ ذِكْرُ اللّٰهِ، وَاَحْسَنَ الْقَصَصِ هٰذَا الْقُرْاٰنُ، وَخَيْرَ الْاُمُوْرِ

সবচেয়ে মর্যাদার কথা হল আল্লাহর যিকির, সবচেয়ে উত্তম কাহিনী হল এই কুরআনে বর্ণিত কাহিনী,

عَوَازِمُهَا، وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَاَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْاَنْبِيَاءِ،

সবচেয়ে উত্তম বিষয় হল ঈমান আমলের সর্বোত্তম স্তর তথা আদর্শ স্তর। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্ট বিষয়াদি তথা বিদ'আতসমূহ,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

وَاَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَآءِ، وَاَعْمَى الضَّلَالَةِ بَعْدَ الْهُدٰى، وَخَيْرُ

সবচেয়ে উত্তম দিক নির্দেশনা হল আম্বিয়ায়ে কেরামের দিক নির্দেশনা আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মৃত্যু হল শহীদগণের মৃত্যু। সবচেয়ে জঘন্ন গোমরাহী হল হেদায়াত লাভ করার পর যে গোমরাহী,

الْاَعْمَالِ مَا نَفَعَ وَخَيْرُ الْهَدْيِ مَا اتُّبِعَ، وَشَرُّ الْعَمٰى عَمَى الْقَلْبِ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا

সবচেয়ে উত্তম আমল হল যা উপকারে আসবে, সবচেয়ে উত্তম দিক নির্দেশনা হল যার অনুসরণ করা হবে আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অন্ধত্ব হল অন্তরের অন্ধত্ব।

خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى، وَمَا قَلَّ كَفٰى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَاَلْهٰى، وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ

উপরের হাত তথা দানের হাত নীচের হাত তথা দান গ্রহণ করার হাতের চেয়ে উত্তম। যে আমল পরিমাণে কম হলেও তা যথেষ্ট হয়, সেটা উত্তম ঐ আমল থেকে যা পরিমাণে বেশী হলেও সেটা বেকার।

حِيْنَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ، وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَّا يَاْتِي

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওজরখাহী হল যেটা মৃত্যুর সময় করা হয়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অনুশোচনা হল যা কেয়ামতের দিন হবে।

الْجُمُعَةَ اِلَّا دُبُرًا. وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يَذْكُرُ اللّٰهَ اِلَّا هَجْرًا. وَمِنْ اَعْظَمِ الْخَطَايَا

কতক মানুষ এমন আছে যারা জুমুআয় উপস্থিত হয় বিলম্বে (এরা নিন্দনীয়)। আর কতক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহকে স্মরণ করে খুব বিলম্বে বিল।

اَللِّسَانُ الْكَذُوْبُ، وَخَيْرُ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ، وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوٰى، وَرَاْسُ

সবচেয়ে বড় অপরাধ ঘটে মিথ্যুক জবান দ্বারা। শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্যতা হল মনের ধনাঢ্যতা। আর শ্রেষ্ঠ পাথেয় হল তাকওয়া।

الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَخَيْرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوْبِ الْيَقِيْنُ، وَالْاِرْتِيَابُ

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ভয় হল সমস্ত তত্ত্বকথার মূল। অন্তরে যেসব বিষয় স্থিতি লাভ করে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষয় হল ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে অন্তরের একীন বিশ্বাস।

مِنَ الْكُفْرِ، وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْغُلُوْلُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ،

আর ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে সন্দেহ করা হল কুফ্‌রী। কারও মৃত্যুতে সুর করে ও বিলাপ করে রোদন করা জাহিলী যুগের কাজ। আমানতে খেয়ানত করা জাহান্নামের সঞ্চয়।

وَالْكَنْزُ كَيٌّ مِّنَ النَّارِ، وَالشِّعْرُ مِنْ مَزَامِيْرِ اِبْلِيْسَ، وَالْخَمْرُ جُمَّاعُ الْاِثْمِ،

(যাকাত ও ওয়াজেব ব্যয় সম্পন্ন না করে) সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা জাহান্নামের চিহ্ন। (শরীয়ত সমর্থন করে না এমন) কবিতা হল ইবলীস শয়তানের গীত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَشَرُّ الْمَاْكِلِ مَأْكَلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُّعِظَ بِغَيْرِهٖ. وَالشَّقِيُّ مَنْ

শরাব হল সব পাপের সমষ্টি। সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাওয়া হল ইয়াতীমের মাল খাওয়া। সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে অন্যকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করে।

شَقِيَ فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ، وَاِنَّمَا يَصِيْرُ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَوْضَعِ اَرْبَعَةِ اَذْرُعٍ وَالْاَمْرُ اِلَى

আর হতভাগা ঐ ব্যক্তি মায়ের পেটে থাকতে যার হতভাগা হওয়ার ফয়সালা হয়। তোমাদের একেক জনের পরিণতি হল চার হাত জায়গা। আর সবকিছু পরকালে প্রত্যানিত হবে। আমলের শেষ অবস্থাই

الْاٰخِرَةِ، وَمِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهٗ، وَشَرُّ الرِّوَايَا رِوَايَا الْكِذْبِ، وَكُلُّ مَا هُوَ اٰتٍ

আশ্রয়। সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনগড়া কথা হল মনগড়া মিথ্যা কথা। যেটার আগমন নিশ্চিত সেটা (দূরবর্তী নয় বরং) নিকটবর্তী। মু'মিন-মুসলমানকে গালী দেয়া ফাসেকী আর মু'মিন-মুসলমানকে হত্যা করা

قَرِيْبٌ. وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهٗ كُفْرٌ، وَاَكْلُ لَحْمِهٖ مِنْ مَّعْصِيَةِ اللّٰهِ،

কুফ্‌রী। মু'মিন-মুসলমানের মাংস খাওয়া তথা মু'মিন-মুসলানের গীবত করা পাপ। মু'মিন-মুসলানের সম্পদ তার রক্তের ন্যায় সম্মানিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য আত্মীয়তার সম্বন্ধ

وَحُرْمَةُ مَالِهٖ كَحُرْمَةِ دَمِهٖ، وَمَنْ يُّتَالِ عَلَى اللّٰهِ يَكْذِبْهُ، وَمَنْ يَّغْفِرْ يُغْفَرْلَهٗ،

সাব্যস্ত করল, সে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল। যে অন্যকে ক্ষমা করে তাকে ক্ষমা করা হবে। যে ব্যক্তি কোন পাপ থেকে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে উক্ত পাপ থেকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি

وَمَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفُّ اللّٰهُ عُنْهُ، وَمَنْ يَّكْظِمِ الْغَيْظَ يَاْجُرْهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَّصْبِرْ

ক্রোধকে হজম করে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন। যে ব্যক্তি কোন মুসীবতে সবর করে আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন। যে ব্যক্তি নেক আমলের বিনিময়ে মানুষ থেকে প্রশংসা শুনতে চায় আল্লাহ

عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللّٰهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ السَّمْعَةَ يُسْمِعِ اللّٰهُ بِهٖ، وَمَنْ يَّصْبِرْ

তাকে সেটা শোনান (কিন্তু আল্লাহর কাছে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়)। যে সবর করে আল্লাহ তার পুরস্কার বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। যে আল্লাহর নাফরমানী করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন। হে

يُضَعِّفُ اللّٰهُ لَهٗ، وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ يُعَذِّبْهُ اللّٰهُ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ،

আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনার কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন হবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনার কাছেই সকলের

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

প্রত্যাবর্তন হবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনার কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন হবে। (খুতবাটি خطبات ما ثورہ، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

www.maktabatulabrar.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

يَدَيِ السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,

لَايَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ:

সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর-

فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْاُمُوْرِ

সবচেয়ে উত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাবের কথা আর সবচেয়ে উত্তম দিক নির্দেশনা হল মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিক নির্দেশনা।

مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্ট বিষয় হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয়। সব নতুন সৃষ্ট বিষয় হল বিদ'আত আর সব বিদ'আত হল গোমরাহী আর সব গোমরাহীর পরিণাম হল জাহান্নাম।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا، وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে তওবা করে নাও মৃত্যু এসে যাওয়ার পূর্বে। আর নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও ঝামেলা ব্যস্ততায় পড়ে যাওয়ার পূর্বে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

الصَّالِحَةِ قَبْلَ اَنْ تَشْغَلُوْا، وَصِلُوا الَّذِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ

বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে দান–সদকা করা দ্বারা আল্লাহর সাথে সু সম্পর্ক স্থাপন করে নাও,

لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ تُرْزَقُوْا وَتُنْصَرُوْا وَتُجْبَرُوْا. وَاعْلَمُوْ آ اَنَّ

তাহলে তোমরা রিযিক প্রাপ্ত হবে, সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং তোমাদের অবস্থায় সংশোধন হবে। আর জেনে রাখ আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর

اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا فِيْ يَوْمِيْ هٰذَا فِيْ شَهْرِيْ

জুমুআর নামাযকে ফরয করেছেন এই স্থানে, এই মাসে এবং এই বৎসরে। আর এটা ফরয থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য।

هٰذَا مِنْ عَامِيْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِيْ حَيَاتِيْ اَوْ بَعْدِيْ وَلَهُ اِمَامٌ

যে ব্যক্তি খলীফা তথা ইমাম থাকা সত্ত্বেও –চাই ইনসাফগার ইমাম হোক বা জালেম– জুমুআর নামাযকে হালকা মনে করে বা অস্বীকারবশত বর্জন করবে

عَادِلٌ اَوْ جَائِرٌ اِسْتِخْفَافًا بِهَا اَوْ جُحُوْدًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ

চাই আমার জীবদ্দশায় বর্জন করুক বা আমার পরবর্তীতে, আল্লাহ যেন তার বিক্ষিপ্ত বিষয়কে সুবিন্যস্ত না করেন, তার বিষয়ে যেন তাকে বরকত দান না করেন।

لَهُ فِيْ اَمْرِهٖ اَلَا وَلَا صَلٰوةَ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتّٰى يَتُوْبَ، فَمَنْ تَابَ

জেনে রাখ না তার নামায হবে, না হজ্জ, না রোযা আর না অন্য কোন নেক কাজ, যতক্ষণ সে তওবা না করবে। অনন্তর কেউ তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।

تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. اَلَا لَاتَؤُمَّنَّ اِمْرَاَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمُّ اَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا،وَلَا يَؤُمُّ فَاجِرٌ

জেনে রাখ কোন নারী কোন পুরুষের খলীফা হবে না, কোন বেদুঈন কোন মুহাজিরের খলীফা হবে না, কোন ফাজের ব্যক্তি কোন খাঁটি মু'মিন ব্যক্তির খলীফা হবে না।

مُؤْمِنًا اِلَّا اَنْ يَّقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَّخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ. لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ

হ্যাঁ কোন বাদশাহ কর্তৃক যদি সে বাধ্য হয় –যার তলোয়ার বা লাঠির ভয় থাকে– তাহলে ভিন্ন কথা। লোকেরা যেন অবশ্যই জুমুআ পরিত্যাগ করা হতে বিরত থাকে।

وَدَعِهِمِ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

নতুবা আল্লাহ তাদের (জুমুআ ত্যাগকারীদের) অন্তরে মহর মেরে দিবেন, তারপর তারা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যারা দ্বীন থেকে গাফেল। (খুতবাটি خطبات ما ثوره، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,

اَمَّا بَعْدُ: اِنَّ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ مَا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِّنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর– আমার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যে বিষয়ের ভয় পাচ্ছি তার মধ্যে একটি অন্যতম হল

وَزِيْنَتِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَوَ يَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

তোমাদের উপর দুনিয়ার যে চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের দুয়ার খুলে যাবে তা। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ইয়া রসূলাল্লাহ! সম্পদকে তো আল্লাহ 'খায়র' তথা কল্যাণ বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাহলে কল্যাণ কেন

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَاَيْنَا اَنَّهٗ يَنْزِلُ عَلَيْهِ جِبْرَئِيْلُ، فَقِيْلَ لَهُ مَا شَاْنُكَ تُكَلِّمُ

অকল্যাণ বয়ে আনবে? (বর্ণনাকারী বলেন,) তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন। আমরা বুঝতে পারলাম তাঁর কাছে এ বিষয়ের সমাধান নিয়ে জিবরাঈল আবতরণ করবেন।

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَايُكَلِّمُكَ؟ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

প্রশ্নকারীকে বলা হল কী ব্যাপার, তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলে আর তিনি কোন জবাব দিলেন না? ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সেই ভাব কেঁটে গেল।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَآءَ، فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ؟ وَكَاَنَّهٗ

তখন তিনি নিজের কপাল থেকে ঘাম মুছতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সেই প্রশ্নকারী কোথায়? (বর্ণনাকারী বলেন,) যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার প্রশ্নে খুশী হয়েছেন বলে)

حَمِدَهٗ. فَقَالَ اِنَّ الْخَيْرَ لَايَأْتِيْ بِالشَّرِّ، وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ

তার প্রশংসা করছেন (এ ভংগিতেই জিজ্ঞাসা করলেন)। অতঃপর তিনি বললেন, শোন, কল্যাণ কখনও অকল্যাণ বয়ে আনে না। (তবে কল্যাণকর জিনিস ব্যবহারের শর্ত রক্ষা করা চাই।) পানির নালার

حَبَطًا، اَلَمْ تَرَ اِلٰى اٰكِلَةِ الْخَضِرَةِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا وَاسْتَقْبَلَتْ

কিনারায় যে ঘাস জন্মে তা (বহু ভাল ঘাস হওয়া সত্ত্বেও বেশী খেলে জানোয়ারের) মৃত্যু ঘটায় বা পেট ফুলে মরার উপক্রম হয়। (তবে যে জানোয়ার সেটা খাওয়ার পর তা হজমের ব্যবস্থা অবলম্বন করে তার

عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَاِنَّ الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَنِعْمَ

এ অবস্থা হয় না।) তুমি কি দেখনি এই সব ঘাস খাওয়ার পর যখন জানোয়ারের দুই পাশের কোল বিস্তৃত হয়ে ওঠে, আর সে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তারপর তার পাতলা পায়খানা হয় এবং পেশাব হয়,

صَاحِبُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ اَعْطٰى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ اَوْ

অনন্তর সে পুনরায় চরে খেতে শুরু করে। তদ্রূপ দুনিয়ার এই সম্পদও মজাদার ও চাক্যচিক্যময়। তবে ঐ মুসলমান ব্যক্তির সম্পদই তার জন্য উত্তম প্রমাণিত হয় যে তা থেকে ইয়াতীম, মিসকীন ও

كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاِنَّ الَّذِيْ اَخَذَهٗ بِغَيْرِ حَقِّهٖ كَمَثَلِ

মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করে। (বর্ণনাকারী বলেন, উপরোক্ত শব্দাবলীতেই) কিংবা যে শব্দে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাগুলো বলেছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সম্পদকে তার হক অনুযায়ী

الَّذِيْ يَاْكُلُ وَلَايَشْبَعُ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ، اَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهٗ

গ্রহণ করবে না সেই ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না। এরূপ ব্যক্তির সম্পদ কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। জেনে রাখ কেউ যদি এমন কোন ইয়াতীমের অভিভাবক হয় যার

مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَاْكُلَهُ الصَّدَقَةُ، اِتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوْا

সম্পদ আছে, তাহলে সে যেন ইয়াতীমের ঐ সম্পদ ব্যবসায় লাগিয়ে রাখে, যাতে যাকাত সেই সম্পদকে গ্রাস করে ফেলতে না পারে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্তের নামায

خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ، وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ.

আদায় কর, রমযান মাসে রোযা রাখ, তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর এবং আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেই তার আনুগত্য কর। (খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা - ৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,

وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ: اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ

সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর– এই দুনিয়া মজাদার ও চাকচিক্যময়।

فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، اَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَآءَ، وَذَكَرَ اَنَّ لِكُلِّ

আল্লাহ এখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানান অতঃপর দেখেন তোমরা কী আমল কর। সাবধান দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক এবং নারীদের থেকে বেঁচে থাক।

غَادِرٍ لِوَآءً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهٖ فِى الدُّنْيَا وَلَا غَدْرَ اَكْبَرُ مِنْ غَدْرِ اَمِيْرِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করলেন যে, কেয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকদের জন্য দুনিয়াতে তার বিশ্বাস ঘাতকতার পরিমাণে ঝান্ডা গাড়া হবে। আর সর্বসাধারণের আমীরের সাথে

الْعَامَّةِ يُغْرَزُ لِوَآءُهٗ عِنْدَ اِسْتِهٖ، وَلَايَمْنَعَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ

বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছু নেই। কেয়ামতের দিন তার পশ্চাদ্বারের নিকট সেই ঝান্ডা গাড়া হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন কিছুকে সত্য বলে জানতে পারবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَنْ يَّقُوْلِ بِحَقٍّ اِذَا عَلِمَهٗ. ثُمَّ قَالَ اِنَّ بَنِيْٓ اٰدَمَ خُلِقُوْا عَلٰى طَبَقَاتٍ شَتّٰى،

তখন যেন মানুষের ভয় তাকে সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বনী আদমকে বিভিন্ন ধরনের করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

فَمِنْهُمْ مَّنْ يُّوْلَدُ مُؤْمِنًا وَّيَحْيٰى مُؤْمِنًا وَّيَمُوْتُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّوْلَدُ كَافِرًا

তাদের মধ্যে কতক আছে মু'মিন অবস্থায় জন্ম হয়, মু'মিন অবস্থায় জীবন কাটায় আর মু'মিন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। আর কতক আছে কাফের অবস্থায় জন্ম হয়,

وَيَحْيٰى كَافِرًا وَّ يَمُوْتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّوْلَدُ مُؤْمِنًا وَّيَحْيٰى مُؤْمِنًا وَّيَمُوْتُ

কাফের অবস্থায় জীবন কাটায় আর কাফের অবস্থায় মৃত্যু হয়। আর কতক আছে মু'মিন অবস্থায় জন্ম হয়, মু'মিন অবস্থায় জীবন কাটায় আর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّوْلَدُ كَافِرًا وَّيَحْيٰى كَافِرًا وَّ يَمُوْتُ مُؤْمِنًا. قَالَ وَذَكَرَ

আর কতক আছে কাফের অবস্থায় জন্ম হয়, কাফের অবস্থায় জীবন কাটায় আর মু'মিন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ প্রসঙ্গে বললেন,

الْغَضَبَ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّكُوْنُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْئِ فَاَحَدُهُمَا بِالْاُخْرٰى،

কতক মানুষ আছে যাদের রাগ আসেও দ্রুত রাগ পড়েও যায় দ্রুত। এখানে (একদিক ভাল আরেক দিক মন্দ হওয়ায়) একটার দ্বারা আরেকটা কাটাকাটি হয়ে গেল। আর কতক

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّكُوْنُ بَطِيْئَ الْغَضَبِ بَطِيْئَ الْفَيْئِ فَاَحَدُهُمَا بِالْاُخْرٰى، وَخِيَارُكُمْ

মানুষ আছে যাদের রাগ আসে দেরীতে রাগ পড়েও দেরীতে। এখানেও একটার দ্বারা আরেকটা কাটাকাটি হয়ে গেল। তবে তোমাদের মধ্যে

مَنْ يَّكُوْنُ بَطِيْئَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْئِ، وَشِرَارُكُمْ مَّنْ يَّكُوْنُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ

যার রাগ আসে দেরীতে পড়ে যায় দ্রুত সেই উত্তম। পক্ষান্তরে যার রাগ আসে দ্রুত পড়ে দেরীতে সে তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট।

بَطِيْئَ الْفَيْئِ. قَالَ اِتَّقُوا الْغَضَبَ فَاِنَّهٗ جَمْرَةٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ، اَلَا تَرَوْنَ اِلٰى

তিনি বললেন, তোমরা ক্রোধ থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ক্রোধ হল বনী আদমের অন্তরে আগুনের একটা অঙ্গার!

انْتِفَاخِ اَوْدَاجِهٖ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ؟ فَمَنْ اَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَالِكَ فَلْيَضْطَجِعْ

তোমরা কি লক্ষ্য করনি যার রাগ এসে যায় তার গলার রগ ফুলে ওঠে, তার দুই চক্ষু লাল বর্ণ ধারণ করে? অতএব কেউ নিজের মধ্যে রাগ টের পেলে সে যেন শুয়ে পড়ে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْاَرْضِ. قَالَ وَذَكَرَ الدَّيْنَ فَقَالَ مِنْكُمْ مَّنْ يَّكُوْنُ حُسْنَ الْقَضَآءِ

এবং মাটির সাথে লেগে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, তোমাদের মধ্যে কতক লোক আছে যারা ঋণী হলে সুন্দরভাবে আদায় করে দেয় আর অন্যের

وَاِذَا كَانَ لَهٗ اَفْحَشَ فِى الطَّلَبِ فَاِحْدٰىهُمَا بِالْاُخْرٰى، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُوْنُ سَيِّئَ

কাছে কিছু পাওনা থাকলে খুব তাগাদা দেয়। এখানে (একদিক ভাল আরেক দিক মন্দ হওয়ায়) একটার দ্বারা আরেকটা কাটাকাটি হয়ে গেল। আর কতক লোক যারা ঋণ আদায়ের বেলায় গড়িমশি করে তবে অন্যের

الْقَضَآءِ وَاِنْ كَانَ لَهٗ اَجْمَلَ فِى الطَّلَبِ فَاِحْدٰيهُمَا بِالْاُخْرٰى، وَخِيَارُكُمْ مَّنْ

থেকে ঋণ তাগাদা করার বেলায় উত্তম পন্থা গ্রহণ করে। এখানে একটার দ্বারা আরেকটা কাটাকাটি হয়ে গেল। বস্তুত তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে ঋণী থাকলে সুন্দরভাবে ঋণ আদায় করে দেয় আর

اِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ اَحْسَنَ الْقَضَآءَ وَاِنْ كَانَ لَهٗ اَجْمَلَ فِى الطَّلَبِ، وَشِرَارُكُمْ

অন্যের থেকে ঋণ তাগাদা করার বেলায় উত্তম পন্থা গ্রহণ করে। আর তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে মন্দ ঐ ব্যক্তি যে ঋণী থাকলে ঋণ

مَّنْ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ اَسَآءَ الْقَضَآءَ وَاِنْ كَانَ لَهٗ اَفْحَشَ فِى الطَّلَبِ.

আদায় করার ব্যাপারে মন্দ, আর অন্যের কাছে কিছু পাওনা থাকলে খুব তাগাদা দেয়।

(খুতবাটি خطبات ما ثورہ، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা - ৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,

وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ: يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ، شَهْرٌ مُّبَارَكٌ

সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর– হে লোকসকল! তোমাদের কাছে এসেছে এক মহান মাস,

شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهٗ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهٖ

এক বরকতময় মাস। এই মাসে এমন এক রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ এই মাসের রোযাকে ফরয করেছেন

تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا

আর তাতে রাত্র জাগরণকে নফল করেছেন। কেউ এই মাসে কোন একটা নফল আমল করলে সে যেন অন্য মাসে একটা ফরয আমল করল।

سِوَاهُ، وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ،

আর কেউ এই মাসে একটা ফরয আদায় করলে সে যেন অন্য মাসে সত্তরটা ফরয আদায় করল।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يُّزَادُ فِيْهِ

এই মাস হল সবরের মাস। আর সবরের পুরস্কার হল জান্নাত। এই মাস সহমর্মিতার মাস। এটা এমন এক মাস, যাতে মু'মিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।

رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهٗ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهٖ وَعِتْقُ رَقَبَتِهٖ مِنَ

কেউ এই মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করালে এটা তার গোনাহ মাফ ও তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির ওছীলা হবে।

النَّارِ، وَكَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْءٌ. قُلْنَا يَا رَسُوْلَ

ঐ ইফতার করানেওয়ালা ঐ রোযাদারের সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে, তবে ঐ রোযাদারের ছওয়াব থেকে কোন কিছুই কমবে না। আমরা বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ!

اللّٰهِ! لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

আমাদের সকলের তো এই সামর্থ নেই যে, রোযাদারকে ইফতার করাব। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَسَلَّمَ يُعْطِي اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ

যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে এক চুমুক দুধ বা একটা খেজুর কিংবা এক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করাবে, তাকেও আল্লাহ এই ছওয়াব দান করবেন।

شَرْبَةٍ مِنْ مَّاءٍ، وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَّايَظْمَأُ حَتّٰى

আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পরিতৃপ্ত করাবে আল্লাহ তাকে আমার হাউযে কাউছার থেকে এমন পানীয় পান করাবেন যে পানি পান করলে জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত আর কখনও পিপাসা লাগবে না।

يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهٗ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ،

এটা হল এমন এক মাস যার প্রথম দশক রহমতের, দ্বিতীয় দশক মাগফেরাতের আর শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির।

وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَّمْلُوْكِهٖ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَاَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তি এই মাসে তার অধীনস্তদের কাজের বোঝা হালকা করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।

(খুতবাটি خطبات ما ثورہ, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা - ৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,

نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ: اَلَآ اِنَّ رَبِّيْ اَمَرَنِيْ اَنْ اُعَلِّمَكُمْ مِّمَّا جَهِلْتُمْ

সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর– জেনে রাখ! আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই যা তোমরা জান না।

مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هٰذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهٗ عَبْدًا حَلَالٌ، وَاِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ

এটা আজই তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, বান্দাকে আমি যা দিয়েছি তা হালাল। আমি আমার সব বান্দাকে সৃষ্টি করেছি

حُنَفَآءَ كُلَّهُمْ، وَاِنَّهُمْ اَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَحَرَّمَتْ

একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থী হিসেবে। তারপর শয়তান তাদের কাছে এসে তাদেরকে ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দেয় এবং আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা তাদের উপর হারাম প্রতিপন্ন করে।

عَلَيْهِمْ مَّآ اَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَاَمَرَتْهُمْ اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِيْ مَا لَمْ اُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا،

আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আমার সাথে এমন কোন কিছুকে শরীক করো না যে ব্যাপারে আমি কোন দলীল প্রেরণ করিনি।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

وَاِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اِلَّا بَقَايَا مِنْ اَهْلِ

আল্লাহ পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন অতঃপর তাদের কতিপয় আহ্লে কিতাব ছাড়া আরবী আজমী সকলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

الْكِتَابِ، وَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِاَبْتَلِيَكَ وَاَبْتَلِيْ بِكَ، وَاَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَّا

তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি উদ্দেশ্য– তোমার পরীক্ষা নিব এবং তোমার দ্বারা অন্যদের পরীক্ষা নিব। আমি তোমার কাছে এই কিতাব প্রেরণ করেছি,

يَغْسِلُهُ الْمَآءُ، تَقْرَؤُهٗ نَآئِمًا وَيَقْظَانَ، وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ

পানি যাকে ধুয়ে ফেলতে পারবে না (আর্থাৎ, এ কিতাব শ্বাশ্বত কিতাব)। জাগ্রত ঘুমন্ত সর্বাবস্থায় তুমি এটা পাঠ করবে। আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন কুরায়শদের জ্বালিয়ে দিতে। আমি বলেছি, হে প্রতিপালক!

رَبِّ اِذًا يَّثْلَغُوْا رَاْسِيْ فَيَدَعُوْهُ خُبْزَةً، قَالَ اِسْتَخْرِجْهُمْ كَمَآ اَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ

তাহলে তো তারা আমার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাকে রুটি বানিয়ে ছাড়বে। আল্লাহ বলেছেন, তাদেরকে বহিস্কার করে দাও, যেমন তারা তোমাকে বহিস্কার করে দিয়েছিল। তাদের সাথে যুদ্ধ কর,

نُعِنْكَ وَاَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِّثْلَهَا، وَقَاتِلْ

আমি তোমাকে সাহায্য করব। ব্যয় কর, আমি তোমাকে দান করব। তুমি বাহিনী প্রেরণ কর, আমি তার পাঁচগুণ বাহিনী প্রেরণ করব।

بِمَنْ اَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، اَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا، فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ

যারা তোমার আনুগত্য করেছে তাদেরকে নিয়ে যারা তোমাকে মানেনি তাদের সাথে যুদ্ধ কর। সাবধান নারীদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনা করবে।

عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَالِكَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ

তারা তোমাদের নিকট অসহায়। এ ছাড়া তোমরা তাদের আর কিছুর অধিকারী নও। তবে হ্যাঁ তারা প্রকাশ্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা।

مُبَيِّنَةٍ، فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ،

তেমন কিছু করলে বিছানায় তাদেরকে পরিত্যাগ কর, তাদেরকে এমন মারধর করবে যাতে কোন চিহ্ন না পড়ে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، اَلَا اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَآئِكُمْ حَقًّا

আনুগত্য করে তবে তাদের বিরুদ্ধে আর কোন পথ সন্ধান কর না। জেনে রাখ তোমাদের নারীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلِنِسَآئِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَآئِكُمْ فَلَا يُوَطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَّنْ
তোমাদের নারীদেরও তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে। তোমাদের নারীদের উপর তোমাদের অধিকার হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দিবে না যাকে তোমরা অপছন্দ কর,
تَكْرَهُوْنَ وَلَايَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ وَاَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا
তারা তোমাদের গৃহে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দিবে না যাকে তোমরা খারাপ জান। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হল
اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، لَاتُنْفِقُ اِمْرَأَةٌ شَيْئًا مِّنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلَّا
তাদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে তোমরা তাদের প্রতি সদয় হবে। কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার স্বামীর গৃহ থেকে কোন কিছু ব্যয় করবে না।
بِاِذْنِ زَوْجِهَا.

(খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

www.maktabatulabrar.com

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা - ৭

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ
আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার
لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।
السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,
نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ: اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ خَيْرُ مَآ اَوْصٰى
সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর- আমি তোমাদেরকে তাকওয়া তথা খোদাভীতির উপদেশ দিচ্ছি। বস্তুত একজন মুসলমান
بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ اَنْ يَّحُضَّهٗ عَلَى الْاٰخِرَةِ وَاَنْ يَّاْمُرَهٗ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَاحْذَرُوْا
আরেকজন মুসলমানকে যে উপদেশ প্রদান করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম উপদেশ হল তাকে পরকালের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাকে তাকওয়া তথা খোদাভীতির নির্দেশ দিবে।
مَا حَذَّرَكُمُ اللّٰهُ بِنَفْسِهٖ فَاِنَّ تَقْوَى اللّٰهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهٖ عَلٰى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ مِّنْ
তোমরা ঐসব বিষয় থেকে সাবধান-সতর্ক থাক, যে বিষয়ে আল্লাহ নিজে সাবধান-সতর্ক করেছেন। যারা আল্লাহর ভয় ও শংকা নিয়ে আমল করে
رَّبِّهٖ عَوْنٌ وَّصِدْقٌ عَلٰى مَا يَبْتَغُوْنَ مِنَ الْاٰخِرَةِ، وَمَنْ يَّصِلِ الَّذِيْ
তাদের জন্য তাকওয়া হল একটি সহযোগী বিষয় এবং পরকালের যা কিছু তারা কামনা করে সে ব্যাপারে একটি সত্যায়ন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ اَمْرِهٖ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لَا يَنْوِيْ بِهٖ اِلَّا وَجْهَ اللّٰهِ يَكُنْ لَّهٗ

যে ব্যক্তি গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে আল্লাহ এবং তার মধ্যকার সম্পর্ককে জুড়ে রাখে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সেটা করে,

ذِكْرًا فِيْ عَاجِلِ اَمْرِهٖ وَذُخْرًا فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِيْنَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ اِلٰى مَاقَدَّمَ،

সেটা তার দুনিয়াতে সুনাম এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সঞ্চয় হয়ে থাকে– যখন মানুষের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিবে সেই সব আমলের যা সে পরকালের জন্য অগ্রিম সঞ্চয় করে রেখেছে।

وَمَا كَانَ مِمَّا سِوٰى ذَالِكَ يَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَهٗ اَمَدًا بَعِيْدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ

এ ছাড়া আর যত কাজ রয়েছে সেগুলির অবস্থা হবে এই যে, মানুষ কামনা করবে তার সেই কাজ এবং তার মাঝে যদি দুস্তর ব্যবধান থাকত। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ব্যাপারে সতর্ক করছেন।

نَفْسَهٗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ، هُوَالَّذِيْ صَدَّقَ قَوْلَهٗ وَاَنْجَزَ وَعْدَهٗ لَاخِلَافَ لِذَالِكَ،

আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তিনিই ঐ সত্তা যিনি তার কথা সত্যে পরিণত করেছেন এবং নিজ ওয়াদা পূর্ণ করেছে, যার কোন ব্যতিক্রম হয় না।

وَاِنَّهٗ يَقُوْلُ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ عَاجِلِ

আল্লাহ বলেন, আমার কথার কোন পরিবর্তন হয় না আর আমি বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না। অতএব তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর,

اَمْرِكُمْ وَاٰجِلِهٖ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. فَاِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ وَيُعْظِمْ

গোপনে সদরে সর্বাবস্থায় তাঁকে ভয় কর। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপরাশিকে মোচন করে দেন এবং তার পুরষ্কারকে বৃদ্ধি করে দেন।

لَهٗ اَجْرًا، وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا، وَاِنَّ تَقْوَى اللّٰهِ تَوَقِّى مَقْتَهٗ

আর কেউ আল্লাহর ভয় অর্জন করলে সে তো মহা সাফল্য অর্জন করল। তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা করে,

وَتَوَقِّى عُقُوْبَتَهٗ وَسَخَطَهٗ، وَاِنَّ تَقْوَى اللّٰهِ تُبَيِّضُ الْوَجْهَ وَتُرْضِى الرَّبَّ وَتَرْفَعُ

তাঁর শাস্তি এবং অসন্তুষ্টি থেকে থেকে রক্ষা করে। তাকওয়া মুখমন্ডলকে উজ্জল করে, প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে এবং মর্যাদাকে বুলন্দ করে।

الدَّرَجَةَ، فَخُذُوْا بِحَظِّكُمْ وَلَا تُفْرِطُوْا فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ فَقَدْ عَلَّمَكُمْ

অতএব তোমরা তোমাদের তাকওয়ার অংশকে ধারণ কর। আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে শৈথিল্য কর না। তিনি তো তাঁর কিতাবের মাধ্যমে তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

بِكِتَابِهٖ وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيْلَهٗ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ، فَاَحْسِنُوْا

এবং তোমাদের জন্য তাঁর পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি এটা করেছেন উদ্দেশ্য– কারা সত্যপন্থী এবং কারা অসত্যপন্থী তা তিনি জেনে নিবেন।

كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ، وَعَادُوْا اَعْدَآءَهٗ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ

তোমরা অন্যদের প্রতি সদয় হও, যেমন আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। তোমরা আল্লাহর শত্রুদেরকে শত্রু জান এবং আল্লাহর রাস্তায় যথাযথভাবে জেহাদ কর।

اجْتَبٰكُمْ وَسَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ

তিনি তোমাদেরকে (এসব মেহনত–মোজাহাদার জন্য) মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলমান তথা আত্মসমর্পনকারী। (আল্লাহ যুদ্ধ ঘটিয়ে দেন) যাতে যে ধ্বংশ হওয়ার সে

عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، فَاَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ وَاعْمَلُوْا لِمَا بَعْدَ

যেন নিদর্শন দেখার পর ধ্বংস হয় আর যে জীবিত থাকার সে যেন নিদর্শন দেখার পর জীবিত থাকে। সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ

الْمَوْتِ، فَاِنَّهٗ مَنْ يُّصْلِحْ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ يَكْفِهِ اللّٰهُ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّاسِ

কর আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল কর। যে ব্যক্তি নিজের ও আল্লাহর মাঝের সম্পর্ককে সংশোধন করবে আল্লাহ তার ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের জন্য যথেষ্ট হবেন।

ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يَقْضِيْ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ

এটা এ কারণে যে, আল্লাহ মানুষের সব ব্যাপারে ফয়সালা করে থাকেন, পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে কোন ক্ষমতা রাখে না।

اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আর সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র সমুচ্চ সুমহান আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত হয়।

(খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা - ৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,

نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ: نَسْاَلُ اللّٰهَ رَبَّنَا اَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُّطِيْعُهٗ

সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর– আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আবেদন জানাই তিনি যেন আমাদেরকে ঐসব লোকদের তালিকাভূক্ত করে

وَيُطِيْعُ رَسُوْلَهٗ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهٗ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهٗ. يٰاَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْٓا اِلَى

নেন যারা তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকে। হে লোকসকল! তোমরা

اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا، وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ اَنْ تَشْتَغِلُوْا عَنْهَا

মৃত্যু আসার পূর্বে আল্লাহর কাছে তওবা করে নাও। আর নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও কাঁপুনে বার্ধক্য, নির্ভেজাল মৃত্যু,

هَرَمًا نَاغِصًا وَمَوْتًا خَالِصًا وَمَرَضًا حَابِسًا وَتَسْوِيْفًا مُّوَلِّيًا، وَصِلُوا الَّذِيْ

বাধাদানকারী রোগ–ব্যধি ও ফিরিয়ে রাখা টালবাহানার কারণে আমল থেকে সরে যাওয়ার পূর্বে। তোমাদের ও তোমাদের প্রতিপালকের মধ্যকার সম্পর্ককে

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ تُسْعَدُوْا، وَاَكْثِرُوا الصَّدَقَةَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ تُؤْجَرُوْا

ঠিক করে নাও, তাহলে সৌভাগ্যবান হবে। গোপনে ও প্রকাশ্যে বেশী বেশী দান–সদকা কর, তাহলে পুরষ্কার প্রাপ্ত হবে, রিযিক প্রাপ্ত হবে,

وَتُحْمَدُوْا وَتُرْزَقُوْا وَتُنْصَرُوْا وَتُجْبَرُوْا، وَاْمُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ تُخْصَبُوْا وَانْهَوْا عَنِ

সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আনন্দ প্রাপ্ত হবে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও, তাহলে সজীবতা প্রাপ্ত হবে আর মন্দ কাজ থেকে

الْمُنْكَرِ تُنْصَرُوْا اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اَكْيَسَكُمْ اَكْثَرُكُمْ ذِكْرًا لِّلْمَوْتِ وَاَكْرَمَكُمْ

বারণ কর, তাহলে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। হে লোক সকল, তোমাদের মধ্যে যারা বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করে তারাই তোমাদের মধ্যে বেশী জ্ঞানী।

اَحْسَنُكُمْ اِسْتِعْدَادًا لَّهٗ. وَاِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْعَقْلِ التَّجَافِيَ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ

যারা মৃত্যুর জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানী ব্যক্তি। বুদ্ধিমত্তার আলামত হল এই প্রতারণার জগত থেকে বিমুখ হয়ে চিরস্থায়ী জগতমুখী হওয়া,

وَالْاِنَابَةَ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالتَّزَوُّدَ لِسُكْنَى الْقُبُوْرِ وَالتَّاَهُّبَ لِيَوْمِ النُّشُوْرِ.

কবরে বসবাসের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করা এবং পুনরুত্থান দিবসের জন্য সামান সংগ্রহ করা।

(খুতবাটি خطبات ما ثورہ, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,

وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ: نَسْاَلُ اللّٰهَ رَبَّنَا اَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُّطِيْعُهٗ وَيُطِيْعُ

সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর– আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আবেদন জানাই তিনি যেন আমাদেরকে ঐসব লোকদের তালিকাভূক্ত করে

رَسُوْلَهٗ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهٗ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهٗ. يٰاَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ

নেন যারা তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকে। হে লোকসকল! অবশ্যই তোমাদের

فَانْتَهُوْا اِلٰى مَعَالِمِكُمْ، وَاِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوْا اِلٰى نِهَايَتِكُمْ، فَاِنَّ الْعَبْدَ

একটা প্রাপ্তিস্থান আছে তোমরা সেই প্রাপ্তিস্থানে উপনীত হও, আর অবশ্যই তোমাদের একটা শেষ সীমা রয়েছে তোমরা সেই শেষ সীমায় নীত হও।

الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ، بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضٰى لَايَدْرِيْ مَا اللّٰهُ صَانِعٌ بِهٖ،

মু'মিন বান্দা দুইটি ভয়ের মাঝে অবস্থান করছে। একটি হল জীবনের অতীত হয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপারে ভয়, তার জানা নেই সেই সময়ের ব্যাপারে আল্লাহ তার সাথে কী মোয়ামালা করবেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَايَدْرِيْ مَا اللّٰهُ قَاضٍ بِهٖ، فَلْيَتَزَوَّدِ الْعَبْدُ مِنْ نَّفْسِهٖ

আরেকটি হল তার জীবনের অবশিষ্ট সময়ের ব্যাপারে ভয়, তার জানা নেই সেই সময়ে আল্লাহ তার জন্য কী ফয়সালা করবেন। অতএব বান্দা যেন পাথেয় সংগ্রহ করে নেয় নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে

لِنَفْسِهٖ، وَمِنْ حَيٰوتِهٖ لِمَوْتِهٖ، وَمِنْ شَبَابِهٖ لِكِبَرِهٖ، وَمِنْ دُنْيَاهُ لِاٰخِرَتِهٖ، فَوَ

নিজের জীবনের জন্য, নিজের জীবন থেকে নিজের মৃত্যুর জন্য, নিজের যৌবন থেকে নিজের বার্ধক্যের জন্য এবং নিজের দুনিয়া থেকে নিজের আখেরাতের জন্য।

الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُّسْتَعْتَبٍ وَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارٌ اِلَّا الْجَنَّةُ

কছম ঐ সত্তার, যার হাতে আমার জীবন! মৃত্যুর পর আল্লাহর সন্তুষ্টি সন্ধানের আর কোন সুযোগ থাকবে না। দুনিয়ার পর জান্নাত কিংবা জাহান্নাম ব্যতীত আর কোন গৃহ নেই।

اَوِ النَّارُ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ.

এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (১০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,

وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ: نَسْاَلُ اللّٰهَ رَبَّنَا اَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُّطِيْعُهٗ وَيُطِيْعُ

সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর– আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আবেদন জানাই তিনি যেন আমাদেরকে ঐসব লোকদের তালিকাভুক্ত করে নেন

رَسُوْلَهٗ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهٗ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهٗ. اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَاْكُلُ

যারা তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকে। জেনে রাখ– দুনিয়া হল একটা সাক্ষাত সামান। নেককার বদকার সকলেই তা

مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، اَلَا وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِيْ فِيْهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، اَلَا

থেকে ভোগ করছে। জেনে রাখ– আখেরাত হল একটা সত্য প্রতিশ্রুত সময়, মহা ক্ষমতাধর সম্রাট সেখানে সবকিছুর ফয়সালা করবেন।

وَاِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهٗ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ. اَلَا وَاِنَّ الشَّرَّ كُلَّهٗ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى النَّارِ،

জেনে রাখ– জান্নাতের সবটাই পুরোপুরি কল্যাণ আর জাহান্নামের সবটাই পুরোপুরি অকল্যাণ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

اَلَا فَاعْلَمُوْا وَاَنْتُمْ مِّنَ اللّٰهِ عَلٰى حَذَرٍ. وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مَّعْرُوْضُوْنَ عَلٰى

সাবধান জেনে রাখ– তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সতর্কীকরণের উপর রয়েছো। জেনে রাখ– অবশ্যই তোমরা তোমাদের আমলের মুখোমুখী হবে।

اَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

তখন যে অনু পরিমাণ কোন ভাল কাজ করেছে সে তা দেখতে পাবে, আর যে অনু পরিমাণ কোন বদ কাজ করেছে তাও সে দেখতে পাবে।

يَّرَهٗ. اِنَّكُمْ مَّحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ

অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর নিকট সমবেত করা হবে নগ্ন দেহ নগ্ন পদ অবস্থায়। (আল্লাহ বলেছেন,) যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথবার সৃষ্টি করেছি তদ্রূপ তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাব।

نُّعِيْدُهٗ، وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ، ثُمَّ اِنَّ اَوَّلَ مَنْ يُّكْسٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার দায়িত্ব, আমি তা পালন করবই। অনন্তর কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরিধান করানো হবে তিনি হলেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)।

اِبْرَاهِيْمُ، اَلَا اِنَّهٗ يُجَاْءُ بِرِجَالٍ مِّنْ اُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَا

জেনে রাখ– কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের কিছু লোককে উপস্থিত করা হবে, তাদেরকে বাম দিকে (অর্থাৎ, জাহান্নামের দিকে) নিতে থাকা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! এরাতো

رَبِّ! اَصْحَابِيْ فَيُقَالُ لَا تَدْرِيْ مَآ اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ، فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ

আমার সঙ্গী। তখন বলা হবে, তুমি জান না তোমার দুনিয়া থেকে চলে আসার পর তারা দ্বীনের মধ্যে কত বিদ'আতের প্রচলন ঘটিয়েছিল। তখন আমি বলব যেমন আল্লাহর নেক বান্দা (হযরত ঈসা

الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ

আলাইহিস সালাম) বলবেন, আমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী।

الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ، فَيُقَالُ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَمْ يَزَالُوْا

আর আপনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী। তখন বলা হবে, এই সব লোক থেকে তুমি পৃথক হয়ে যাওয়ার পর থেকে তারা কুফরীর দিকেই ফিরে চলছিল।

مُرْتَدِّيْنَ عَلٰٓى اَعْقَابِهِمْ مُّنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

(খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা (১১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى : نَسْأَلُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে,

اللّٰهَ رَبَّنَآ اَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُّطِيْعُهٗ وَيُطِيْعُ رَسُوْلَهٗ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهٗ وَيَجْتَنِبُ

সে বিভ্রান্ত হয়। (অতঃপর–) আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আবেদন জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে ঐসব লোকদের তালিকাভুক্ত করে নেন যারা তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর রসূলের আনুগত্য

سَخَطَهٗ. اِنَّهٗ لَمْ يَكُنْ نَّبِيٌّ قَبْلِيْ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَّدُلَّ اُمَّتَهٗ عَلٰى مَا يَعْلَمُهٗ

করে, তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকে। আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীরই দায়িত্ব ছিল তাঁর উম্মতকে এমন সব বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা

خَيْرًا لَّهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَّا يَعْلَمُهٗ شَرًّا لَّهُمْ، وَاِنَّ اُمَّتَكُمْ هٰذِهٖ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِيْ

যা নবীর জ্ঞান মতে তাদের জন্য উত্তম, আর এমন সব বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা যা তাঁর জ্ঞান মতে তাদের জন্য মন্দ। জেনে রাখ– এই উম্মতের মুক্তি রাখা হয়েছে পূর্ববর্তীদের যাতে মুক্তি ছিল তার

اَوَّلِهَا وَاِنَّ اٰخِرَهُمْ يُصِيْبُهُمْ بَلَاءٌ وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ثُمَّ تَجِيْءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ

মধ্যে। আর এই উম্মতের পরবর্তীদের উপর এমনসব বালা মুসীবত ও বিষয় আসবে যা তারা অপছন্দ করবে। তারপর আসবে বহু ফিতনা যার একটার সামনে আরেকটা হালকা মনে হবে।

www.maktabatulabrar.com

بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهٖ مَهْلَكَتِيْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيْءُ فِتْنَةٌ

তখন মু'মিনগণ বলবে, এই বুঝি আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম! অনন্তর সেটা কেটে যাবে। আবার এমন ফিতনা আসবে যে, মু'মিনগণ বলতে শুরু করবে,

فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهٖ مَهْلَكَتِيْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ. فَمَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّزَحْزَحَ مِنَ النَّارِ

এবার বুঝি ধ্বংস হয়ে গেলা! অনন্তর সেটাও কেটে যাবে। অতএব কেউ যদি চায় যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক,

وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهٗ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. وَلْيَأْتِ اِلَى

তাহলে তার মৃত্যু যেন হয় এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। সে যেন এমন সব লোকদের কাছে যায়

النَّاسِ الَّذِيْنَ يُحِبُّ اَنْ يَّأْتُوْا اِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِيْنِهٖ

যাদের তার কাছে আসা সে পছন্দ করে। যে ব্যক্তি কোন খলীফার হাতে হাত রেখে বায়আত করবে, তার প্রতি ভক্তি নিবেদন করবে,

وَثَمَرَةَ قَلْبِهٖ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَاِنْ جَآءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهٗ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ

সে যেন যথাসম্ভব তার আনুগত্য করে। তখন যদি আর একজন এসে তার প্রতিপক্ষ দাঁড় হয় তাহলে সেই অপরজনের গর্দান উড়িয়ে দিও।

الْاٰخَرِ قَالَ فَاَدْخَلْتُ رَأْسِيْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اَنْتَ سَمِعْتَ

বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আমি মানুষের মাঝ থেকে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে আমার কাছে বর্ণনাকারী উস্তাদকে বললাম, আল্লাহর কছম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আপনি কী নিজে

هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَشَارَ بِيَدِهٖ اِلٰى اُذُنَيْهِ فَقَالَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা শুনেছেন? তখন তিনি নিজের দুই কানের দিকে ইশারা করে বললেন,

سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ.

আমার দুই কান এটা শুনেছে এবং আমার অন্তর সেটা স্মরণ রেখেছে।

(খুতবাটি خطبات ما ثورہ، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা - ১২ [বিদায় হজ্জের ভাষণ]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করি।

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যার

لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

গোমরাহীর ফয়সালা করেন কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই।

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করেছেন সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও কেয়ামত সম্বন্ধে সতর্ককারী রূপে।

السَّاعَةِ. مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না বরং

نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَمَّا بَعْدُ: اَيُّهَا النَّاسُ! اِسْمَعُوْا مِنِّيْ اُبَيِّنْ لَكُمْ،

নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। অতঃপর– হে লোকসকল! তোমরা আমার বক্তব্য শ্রবণ কর, আমি তোমাদের সামনে বয়ান করছি।

فَاِنِّيْ لَآ اَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَآ اَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا فِيْ مَوْقِفِيْ هٰذَا. اَيُّهَا النَّاسُ!

আমার জানা নেই সম্ভবতঃ এই স্থানে এ বৎসরের পর আর তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটবে না। হে লোকসকল! তোমাদের রক্ত,

اِنَّ دِمَآئَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ اِلٰى اَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا

তোমাদের ধন–সম্পদ কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তোমাদের কাছে হারাম তথা পবিত্র ও সম্মানিত। যেমন পবিত্র ও সম্মানিত তোমাদের এই দিন এই মাসে এবং এই শহরে।

فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا. اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ.

আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهٗ اَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَآ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَهٗ عَلَيْهَا. وَاِنَّ رِبَا

যার কাছে কারও আমানত রয়েছে সে যেন অবশ্যই আমানতকারীর নিকট তা ফিরিয়ে দেয়। জাহিলী যুগের সূদ রহিত করা হল।

الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَلٰكِنْ لَّكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ، قَضَى

তবে তোমাদের মূলধন তোমরা পাবে। তোমরা জুলুম করবে না, তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। আল্লাহ ফয়সালা করেছেন যে, সূদ চলবে না।

اللّٰهِ اَنْ لَّارِبَا، وَاِنَّ اَوَّلَ رِبًا اَبْدَأُ بِهٖ رِبَا عَمِّي الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَاِنَّ

সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব–এর সূদ মাফ করে দিলাম। তোমাদের জাহিলী যুগের রক্তের দাবীও রহিত করা হল।

دِمَآئَكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ مَوْضُوْعَةٌ. وَاِنَّ مَاْثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ غَيْرَ السَّدَانَةِ

জাহিলী যুগের সব প্রথা রহিত করা হল। তবে আল্লাহর ঘরের হেফাজত–সংরক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করানোর ব্যবস্থা পূর্বের মত

وَالسِّقَايَةِ وَالْعَمْدُ قَوَدٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ مَاقُتِلَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ.

বহাল রাখা হল। ইচ্ছাকৃত হত্যার প্রতিবিধান হল কেসাস। আর লাঠি ও পাথর দ্বারা হত্যা করা হলে সেটা হল । (এর প্রতিবিধান হল দিয়াত বা রক্তপণ।)

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ اَنْ يُّعْبَدَ فِيْ اَرْضِكُمْ هٰذِهٖ، وَلٰكِنَّهٗ

হে লোকসকল! তোমাদের এই ভূমিতে আবার শয়তানের পূজা হবে– এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু

قَدْ رَضِيَ اَنْ يُّطَاعَ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِمَّا تَحْقِرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ.

এ ছাড়া যেসব বিষয়কে তোমরা ক্ষুদ্র মনে কর সে রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তোমরা তার অনুসরণ করবে এতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে।

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ لِنِسَآئِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، لَكُمْ

হে লোকসকল! তোমাদের নারীদের তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে।

عَلَيْهِنَّ اَلَّا يُوَطِّئْنَ فُرُشَكُمْ غَيْرَكُمْ وَلَا يُدْخِلْنَ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهٗ بُيُوْتَكُمْ اِلَّا

তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল তারা তোমাদের বিছানায় অন্য কাউকে আসতে দিবে না, তোমরা অপছন্দ কর এরকম কাউকে তোমাদের অনুমতি ব্যতীত তোমাদের গৃহে প্রবেশ করতে দিবে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

بِاِذْنِكُمْ، وَلَا يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، فَاِنْ فَعَلْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذِنَ لَكُمْ اَنْ

আর তারা কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হবে না। তারা এরূপ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন তাদেরকে আটক করার,

تَعْضُلُوْهُنَّ، وَتَهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ، وَتَضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَاِنِ

তাদেরকে বিছানায় পরিত্যাগ করার ও তাদেরকে হালকা এমন মারধর করার যার কোন আছর প্রকাশ পাবে না। এসব পদক্ষেপ নেয়ার পর

انْتَهَيْنَ وَاَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى

যদি তারা বিরত হয় এবং তোমাদের আনুগত্যে ফিরে আসে, তাহলে নিয়মনীতি অনুযায়ী তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া তোমাদের দায়িত্ব। অতএব নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর

النِّسَآءِ، وَاسْتَوْصُوْا بِهِنَّ خَيْرًا اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ.

এবং তাদের কল্যাণ সাধনের বিষয়ে তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ কর। আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ، فَلَايَحِلُّ لِاِمْرِئٍ مَالُ اَخِيْهِ اِلَّا عَنْ

হে লোকসকল! মু'মিন মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। অতএব কারও সম্পত্তি- যদি সে স্বেচ্ছায় না দেয় তাবে তা অন্য কারও জন্য হালাল নয়।

طِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ. اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ. فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِيْ كُفَّارًا

আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। অতএব আমার পরে তোমরা এক জন আরেক জনকে হত্যা করার মত

يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فَاِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّآ اِنْ اَخَذْتُمْ بِهٖ لَنْ

কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ো না। শোন, আমি তোমাদের কাছে এমন দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা গোমরাহ হবে না।

تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ، كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِيْ. اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ.

সে দুটো হল আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ। আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

اَيُّهَا النَّاسُ: اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لِاٰدَمَ، وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ،

হে লোকসকল! তোমাদের প্রতিপালক একজন। তোমাদের পিতা একজন। তোমরা সকলেই আদম সন্তান আর আদমকে তৈরি করা হয়েছে মাটি থেকে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ، وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ اِلَّا بِالتَّقْوٰى. اَلَا

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়ার অধিকারী। তাকওয়া ব্যতীত কোন অনারবের উপর কোন আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

هَلْ بَلَّغْتُ: اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ.

আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছে, যারা উপস্থিত নেই তাদের নিকট যেন তারা এ পয়গাম পৌঁছে দেয়।

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

(এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।) আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

(খুতবাটি الادب نصوصه وتاريخه থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খুতবা (১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْمَدُه وَاَسْتَعِيْنُه، وَنَسْأَلُهُ الْكَرَامَةَ فِيْمَا

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর কাছে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মর্যাদা লাভের আবেদন জানাচ্ছি।

بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّه قَدْ دَنَا اَجَلِيْ وَاَجَلُكُمْ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا

কেননা, আমার ও আপনাদের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।

شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন সু-সংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে।

وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ، وَمَنْ يُّطِعِ

যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন আর কাফেরদের বেলায় শাস্তির বাণী প্রযোজ্য হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

আনুগত্য করল সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল। আর যে তাঁদের নাফরমানী করল সে নিশ্চিতই সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ হল।

اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْاِعْتِصَامِ بِاَمْرِ اللّٰهِ الَّذِيْ شَرَعَ لَكُمْ وَهَدَاكُمْ بِهٖ،

(হে লোকসকল!) আমি আপনাদেরকে তাকওয়া এবং আল্লাহর ঐসব বিধান শক্তভাবে ধারণ করার উপদেশ দিচ্ছি, যা তিনি আপনাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এবং যে বিষয়ে আপনাদেরকে দিক

فَإِنَّ جَوَامِعَ هَدْيِ الْاِسْلَامِ بَعْدَ كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِمَنْ وَّلَّاهُ اللّٰهُ

নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বস্তুত তাওহীদের বাণীর পর ইসলাম যত বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক কথা হল আল্লাহ যার উপর আপনাদের খেলাফতের দায়িত্বভার

اَمْرَكُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَدْ

অর্পন করেছেন তার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা। কেননা, যে ব্যক্তি আনুগত্য করল আল্লাহর এবং ভাল কাজের আদেশদাতা ও মন্দ কাজ থেকে বারণকারীদের,

اَفْلَحَ وَاَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، وَاِيَّاكُمْ وَاتِّبَاعَ الْهَوٰى فَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ حَفِظَ

সে সফলতা লাভ করল এবং তার কর্তব্য আদায় করল। আপনারা খাহেশাতে নফসানী থেকে বেঁচে থাকুন। যে ব্যক্তি খাহেশাতে নফসানী,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

مِنَ الْهَوٰى وَالطَّمَعِ وَالْغَضَبِ، وَاِيَّاكُمْ وَالْفَخْرَ، وَمَا فَخْرُ مَنْ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ

লোভ ও ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকল সে সফলতা লাভ করল। আপনারা অহংকার থেকে বেঁচে থাকুন। সেই ব্যক্তি অহংকার করতে পারে না যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে,

ثُمَّ اِلَى التُّرَابِ يَعُوْدُ ثُمَّ يَأْكُلُهُ الدُّوْدُ ثُمَّ هُوَ الْيَوْمَ حَيٌّ وَغَدًا مَّيِّتٌ، فَاعْمَلُوْا

তারপর মাটিতেই ফিরে যাবে, অনন্তর পোকা মাকড় তাকে খাবে। তদুপরি আজ সে জীবন্ত আগামীকাল মৃত। অতএব প্রতি দিন,

يَوْمًا بِيَوْمٍ وَسَاعَةً بِسَاعَةٍ، وَتَوَقَّوْا دُعَاءَ الْمَظْلُوْمِ، وَعُدُّوْا اَنْفُسَكُمْ فِى

প্রতি মুহূর্তে আমল অব্যাহত রাখুন। মাজলূমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থাকুন। নিজেদেরকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করুন। ধৈর্য ধারণ করুন।

الْمَوْتٰى، وَاصْبِرُوْا فَإِنَّ الْعَمَلَ كُلَّهُ بِالصَّبْرِ، وَاحْذَرُوْا وَالْحَذَرُ يَنْفَعُ، وَاعْمَلُوْا

কেননা, ধৈর্য ধারণ ব্যতীত কোন আমল হয় না। সতর্কতা অবলম্বন করুন, সতর্কতা উপকার দেয়। আমল করতে থাকুন, আমল কবূল করা হয়।

وَالْعَمَلُ يُقْبَلُ، وَاحْذَرُوْا مَا حَذَّرَكُمُ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِهٖ، وَسَارِعُوْا فِيْمَا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ

আল্লাহ যে বিষয়ের শাস্তি থেকে সাবধান করেছেন, তা থেকে সাবধান থাকুন আর আল্লাহ যে কাজের ভিত্তিতে তাঁর রহমতের ওয়াদা করেছেন সে দিকে দ্রুত অগ্রসর হোন।

مِنْ رَّحْمَتِهٖ، وَافْهَمُوْا وَتَفَقَّهُوْا وَاتَّقُوْا وَتَوَقَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ مَّا اَهْلَكَ

আপনারা বুঝুন, ধীরে ধীরে ভাল করে বুঝুন আর পরহেযগারী অবলম্বন করুন এবং নিজেদেরকে রক্ষা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করে দিয়েছেন এমন সব বিষয়,

بِهٖ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَمَا نَجٰى بِهٖ مَنْ نَّجٰى قَبْلَكُمْ، قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ فِيْ كِتَابِهٖ

যা না মানার কারণে পূর্ববর্তী যাদের ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হয়েছে আর যা মেনে পূর্ববর্তী যাদের মুক্তি পাওয়ার তারা মুক্তি পেয়েছে। তিনি আপনাদের জন্য তাঁর কিতাবে কোন্‌টা হালাল, কোন্‌টা

حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَمَا يُحِبُّ مِنَ الْاَعْمَالِ وَمَا يَكْرَهُ، فَإِنِّيْ لَاٰلُوْكُمْ وَنَفْسِيْ نُصْحًا،

হারাম এবং কোন্ আমল পছন্দনীয় এবং কোন্ আমল অপছন্দনীয় তা স্পষ্ট করে বয়ান করে দিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে এবং আমাকেও নসীহত করতে ত্রুটি করছি না।

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

আল্লাহর কাছেই সব বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আর আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি সামর্থ কারও নেই।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مَّآ اَخْلَصْتُمْ لِلّٰهِ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَرَبَّكُمْ اَطْعَمَكُمْ وَحَظَّكُمْ

আর জেনে রাখুন– আপনাদের যে আমল আপনারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে এখলাসের সাথে করেছেন, সে ব্যাপারে কথা হল আপনারা আপনাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করেছেন, আপনাদের

حَفِظْتُمْ وَاغْتَبَطْتُمْ، وَمَا تَطَوَّعْتُمْ بِهٖ لِدِيْنِكُمْ فَاجْعَلُوْهُ ذَا اَفَلٍ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ

ভাগ্য আপনারা সংরক্ষণ করেছেন, আপনারা সৌভাগ্যবান হয়েছেন। দ্বীনের জন্য আপনারা যে আমল স্বেচ্ছায় করছেন সেটাকে আপনাদের ভবিষ্যতের সৌভাগ্য সাব্যস্ত করে রাখুন,

تَسْتَوْفُوْا لَسَلَفِكُمْ وَتُعْطَوْا جِزَايَتَكُمْ حِيْنَ فَقْرِكُمْ وَحَاجَتِكُمْ اِلَيْهَا، ثُمَّ

এই নেক আমলের পুরোপুরি বদলা আপনাদেরকে দেয়া হবে, আপনাদের পাথেয় আপনাদেরকে প্রদান করা হবে যখন সেটার প্রয়োজন ও অভাব দেখা দিবে।

تَفَكَّرُوْا عِبَادَ اللّٰهِ فِيْٓ اِخْوَانِكُمْ وَصَاحِبَتِكُمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا قَدْ وَرَدُوْا عَلٰى مَا

তারপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আপনাদের ভাই ও সাথী সংগী যারা অতিবাহিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে চিন্তা করুন। তারা যে আমল পরকালের জন্য অগ্রিম পাঠিয়েছে

قَدَّمُوْا فَاَقَامُوْا عَلَيْهِ وَحَلُّوْا فِى الشَّقَآءِ وَالسَّعَادَةِ فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اِنَّ

এবং তার উপর কায়েম থেকেছে, সেখানে গিয়ে তারা উপনীত হয়েছে। তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যে প্রবেশ করেছে।

اللّٰهَ لَيْسَ لَهٗ شَرِيْكٌ وَلَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ نَسَبٌ يَّعِيْهِ بِهٖ خَيْرًا،

অবশ্যই আল্লাহর কোন শরীক নেই। আল্লাহ ও তাঁর কোন সৃষ্টির মাঝে বংশের সম্পর্ক নেই যে, সেই সুবাদে তিনি কারও কল্যাণ করবেন।

وَلَا يَصْرِفُ عَنْهُ سُوْءً اِلَّا بِطَاعَتِهٖ وَاتِّبَاعِ اَمْرِهٖ، فَاِنَّهٗ لَا خَيْرَ فِيْ خَيْرٍ بَعْدَهُ

আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ ব্যতীত কারও বিপদ হটবে না। নিশ্চয় সেই কল্যাণে কোন কল্যাণ নেই যার পরে রয়েছে জাহান্নাম।

النَّارُ وَلَا شَرَّ فِيْ شَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ،

আর সেই অকল্যাণেও কোন অকল্যাণ নেই যার পরে রয়েছে জান্নাত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারা নবী

وَصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর প্রতি দুরূদ পাঠ করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

(খুতবাটি خطبات با ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

www.maktabatulabrar.com

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খুতবা (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِيْنُهٗ، وَنَسْاَلُهُ الْكَرَامَةَ فِيْمَا

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর কাছে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মর্যাদা লাভের আবেদন জানাচ্ছি।

بَعْدَ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ قَدْ دَنَآ اَجَلِيْ وَاَجَلُكُمْ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا

কেননা, আমার ও আপনাদের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।

شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সু–সংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে।

وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا، لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ، وَمَنْ يُّطِعِ

যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন আর কাফেরদের বেলায় শাস্তির বাণী প্রযোজ্য হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

আনুগত্য করল সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল। আর যে তাঁদের নাফরমানী করল সে নিশ্চিতই সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ হল।

اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَاَنْ تَثْنُوْا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهٗ اَهْلٌ، وَاَنْ تَخْلِطُوا

(হে লোকসকল!) আমি আপনাদেরকে নসীহত করছি আল্লাহকে ভয় করার, আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করার এবং আল্লাহর ভয়ের সাথে সাথে তাঁর প্রতি আশা রাখার।

الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ، فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَثْنٰى عَلٰى زَكَرِيَّا وَاَهْلِ بَيْتِهٖ فَقَالَ اِنَّهُمْ كَانُوْا

কেননা, আল্লাহ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ.) ও তাঁর পরিবারের প্রশংসা করে বলেছেন, তাঁরা নেক কাজে দ্রুত অগ্রসর হত অর্থাৎ,

يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ.

নেক কাজে প্রতিযোগিতা করত এবং তাঁরা আমাকে ডাকত আশা ও ভয় সহকারে। আর তাঁরা ছিল আমার কাছে বিনীত।

ثُمَّ اعْلَمُوْا عِبَادَ اللّٰهِ! اَنَّ اللّٰهَ قَدِ ارْتَهَنَ بِحَقِّهٖ اَنْفُسَكُمْ، ، وَاَخَذَ عَلٰى

তারপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা জেনে রাখুন– আল্লাহ তাঁর প্রতি আপনাদের করণীয় দায়িত্ব পালনের জন্য আপনাদের জীবনকে বন্ধক নিয়েছেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ذَالِكَ مَوَاثِيْقَكُمْ، وَاشْتَرٰى مِنْكُمُ الْقَلِيْلَ الْفَانِيَ بِالْكَثِيْرِ الْبَاقِيْ، هٰذَا

আর এ ব্যাপারে আপনাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন। তিনি পরিমাণে অধিক ও চিরন্তন জিনিসের বিনিময়ে আপনাদের থেকে পরিমাণে অল্প ও ক্ষণস্থায়ী জিনিসকে ক্রয় করে নিয়েছেন।

كِتَابُ اللهِ فِيْكُمْ لَايَطْفَأُ نُوْرُهٗ وَلَا تَنْقَضِيْ عَجَآئِبُهٗ فَاسْتَضِيْئُوْا بِنُوْرِهٖ،

আপনাদের মধ্যে আল্লাহর এই কিতাব কুরআন বিদ্যমান। তার নূর কখনও নির্বাপিত হবে না। তার বিস্ময় কখনও খতম হবে না। তার আলোতে আলোকিত হোন।

وَانْتَصِحُوْا كِتَابَهٗ وَاسْتَضِيْئُوْا مِنْهُ لِيَوْمِ الظُّلْمَةِ، فَإِنَّهٗ إِنَّمَا خَلَقَكُمْ لِعِبَادَتِهٖ

আল্লাহর কিতাবের নসীহত কবূল করুন, অন্ধকার দিবসের জন্য তার থেকে আলো গ্রহণ করুন। তিনি আপনাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য।

وَوَكَّلَ بِكُمْ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

তিনি আপনাদের সাথে কিরামান কাতিবীন ফিরিশতাদেরকে নিযুক্ত রেখেছেন। তারা জানেন যা কিছু আপনারা করেন।

ثُمَّ اعْلَمُوْا عِبَادَ اللهِ! اَنَّكُمْ تَغْدُوْنَ وَتَرُوْحُوْنَ فِيْ اَجَلٍ قَدْ غُيِّبَ عَنْكُمْ

তারপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা সকাল-সন্ধা অতিবাহিত করছেন এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যার শেষ আপনাদেরকে জানানো হয়নি।

عِلْمُهٗ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْقَضِيَ الْاٰجَالُ وَاَنْتُمْ فِيْ عَمَلِ اللهِ فَافْعَلُوْا، وَلَنْ

অতএব যদি আল্লাহর আমলের মধ্য দিয়ে সেই সময়টার পরিসমাপ্তি ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে তা-ই করুন। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত

تَسْتَطِيْعُوْا ذٰلِكَ اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ، سَابِقُوْا فِيْ اٰجَالِكُمْ قَبْلَ اَنْ تَنْقَضِيَ اٰجَالُكُمْ

তা করা সম্ভব নয়। আপনারা আপনাদের পাওয়া সময়ের মধ্যে নেক আমলে দ্রুত অগ্রসর হোন এর পূর্বে যে, আপনাদের সময় শেষ হয়ে যাবে

فَتَرُدَّكُمْ اِلٰى اَسْوَءِ اَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا جَعَلُوْا اٰجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسُوْا

তারপর আপনাদেরকে আপনাদের আমলের মন্দ পরিণামের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। কোন কোন সম্প্রদায় তাদের সময়কে অন্যদের কাজে লাগিয়েছে,

اَنْفُسَهُمْ، فَاَنْهَاكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا اَمْثَالَهُمْ، فَالْوَحَا الْوَحَا ثُمَّ النَّجَآءَ النَّجَآءَ!

তারা নিজেদের পরিণামকে ভুলে গেছে। আমি আপনাদেরকে তাদের মত হওয়া থেকে বারণ করছি। অতএব জলদি করুন! জলদি করুন!! নিজেদেরকে বাঁচান! নিজেদেরকে বাঁচান!!

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

فَإِنَّ وَرَآئَكُمْ طَالِبًا حَثِيْثًا اَمْرُهٗ سَرِيْعٌ. اَيْنَ الْوُضَاةُ الْحَسَنَةُ وُجُوْهُهُمْ

আপনাদের পশ্চাতে রয়েছে ত্বরিত আহবানকারী, যার কর্ম অত্যন্ত দ্রুত। কোথায় সেই সুন্দর চেহারার লোকেরা,

الْمُعْجَبُوْنَ بِشَبَابِهِمْ؟ اَيْنَ الْمُلُوْكُ الَّذِيْنَ بَنَوُا الْمَدَآئِنَ وَحَصَّنُوْهَا؟ اَيْنَ الَّذِيْنَ

যারা তাদের যৌবন নিয়ে আত্মমুগ্ধ ছিল? কোথায় সেই সম্রাটরা, যারা বহু নগরের পত্তন ঘটিয়েছিল, বহু নগর বিনির্মাণ করেছিল?

كَانُوْا يُعْطَوْنَ الْغَلَبَةَ فِيْ مَوَاطِنِ الْحَرْبِ قَدْ تَضَعْضَعَ اَرْكَانُهُمْ حِيْنَ اَخْنٰى

কোথায় সেই সব লোকেরা, যারা যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ী হত? কালক্রমে তাদের লোকজন দুর্বল হয়ে পড়েছে আর তারা

بِهِمُ الدَّهْرُ وَاَصْبَحُوْا فِيْ ظُلُمَاتِ الْقُبُوْرِ؟ اَلْوَحَا اَلْوَحَا ثُمَّ النَّجَا اَلنَّجَا.

কবরের অন্ধকারে গিয়ে উপনীত হয়েছে। অতএব জলদি করুন! জলদি করুন!! নিজেদেরকে বাঁচান! নিজেদেরকে বাঁচান!!

(খুতবাটি خطبات ، ثوره، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হযতর ওমর (রা.)-এর খুতবা (১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْمَدُه وَاَسْتَعِيْنُه، وَنَسْاَلُهُ الْكَرَامَةَ فِيْمَا

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর কাছে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মর্যাদা লাভের আবেদন জানাচ্ছি।

بَعْدَ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ قَدْ دَنَا اَجَلِيْ وَاَجَلُكُمْ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا

কেননা, আমার ও আপনাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।

شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সু-সংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে।

وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ، وَمَنْ يُّطِعِ

যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন আর কাফেরদের বেলায় শাস্তির বাণী প্রযোজ্য হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

আনুগত্য করল সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল। আর যে তাঁদের নাফরমানী করল সে নিশ্চিতই সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ হল।

اَيُّهَا النَّاسُ! اَلَا اِنَّ اَصْحَابَ الرَّاْيِ اَعْدَاءُ السُّنَّةِ اَعْيَتْهُمُ الْاَحَادِيْثُ اَنْ

হে লোক সকল! জেনে রাখুন– যারা নিজস্ব মত ও যুক্তিতে চলে, তারা হাদীছের শত্রু। তারা হাদীছের হক আদায়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে,

يَحْفَظُوْهَا وَتَفَلَّتَتْ مِنْهُمْ اَنْ يَّعُوْهَا وَاسْتَحْيُوْا اِذَا سَاَلَهُمُ النَّاسُ اَنْ يَّقُوْلُوْا

হাদীছ কবুল করা তাদের ভাগ্যে জোটেনি। মানুষে যখন তাদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, তখন জানি না বলতে তাদের শরম লেগেছে।

لَا نَدْرِيْ فَعَانَدُوا السُّنَنَ بِرَاْيِهِمْ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا. وَالَّذِيْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهٖ مَا

যে কারণে তারা নিজেদের মত ও যুক্তির ভিত্তিতে হাদীছের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। ফলে তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়েছে, অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করেছে। ঐ সত্তার কছম, যার হাতে ওমরের জীবন!

قَبَضَ اللّٰهُ نَبِيَّهٗ وَلَارَفَعَ الْوَحْيُ عَنْهُمْ حَتّٰى اَغْنَاهُمْ عَنِ الرَّاْيِ، وَلَوْ كَانَ الدِّيْنُ

আল্লাহ ততক্ষণ তাঁর নবীকে দুনিয়া থেকে তুলে নেননি, ততক্ষণ তাদের কাছে ওহীর ধারা আগমন বন্ধ হয়নি যতক্ষণ আল্লাহ তাদেরকে নিজের মত ও যুক্তিতে চলার অভাব থেকে মুক্ত না করেছেন। যদি যুক্তির ভিত্তিতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

يُؤْخَذُ بِالرَّاْيِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَهْرِهٖ،فَاِيَّاكَ فَاِيَّاهُمْ،

ধর্ম-কর্ম নির্ণিত হত, তাহলে অবশ্যই মোজার উপরিভাগে মসেহ করার চেয়ে মোজার তলভাগে মসেহ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ছিল। অতএব আপনারা ঐ সব লোকদের থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখুন।

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, সমস্ত আমলের বুনিয়াদ হল নিয়ত। মানুষ যেমন নিয়ত করবে তেমনই পাবে।

لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ

সেমতে যে ব্যক্তির হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে পরিগণিত হবে।

وَرَسُوْلِهٖ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى

আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন নারীকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে,

مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

সেভাবেই পরিগণিত হবে।

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ، وَاِنَّ بَعْضَ الْيَاْسِ غِنًى، وَاِنَّكُمْ تَجْمَعُوْنَ

হে লোক সকল! লোভ হচ্ছে অভাব। আর কোন কোন নির্লোভ হচ্ছে ধনাঢ্যতা। তোমরা এমনসব ধন-সম্পদও সঞ্চয় কর যা তোমরা ভোগ করতে পার না।

مَا لَا تَاْكُلُوْنَ وَتَاْمُلُوْنَ مَا لَا تُدْرِكُوْنَ، وَاَنْتُمْ مُؤَجَّلُوْنَ فِيْ دَارِ غُرُوْرٍ، وَاعْلَمُوْا

তোমরা এমন সব বিষয়ের আশাও কর যার নাগাল পাও না। তোমরা প্রতারণার জগতে পিছে পড়ে আছ। জেনে রাখ অবশ্যই কোন কোন বিষয়ে

اَنَّ بَعْضَ الشُّحِّ شُعْبَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، فَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ، وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ

কার্পণ্য করা মোনাফেকী। (আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন,) অতএব তোমরা নিজেদেরই কল্যাণে ব্যয় কর।

نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَيُّهَا النَّاسُ! اَطِيْبُوْا مَثْوٰىكُمْ، وَاَصْلِحُوْا اُمُوْرَكُمْ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَلَا

হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের আসল ঠিকানাকে সুন্দর কর, তোমরা তোমাদের সব বিষয়ের এসলাহ–সংশোধন কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর।

تُلْبِسُوْا نِسَآئَكُمُ الْقَبَاطِيَ، فَاِنَّهٗ اِنْ لَّمْ يَشِفَّ فَاِنَّهٗ يَصِفُ. وَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا

আর তোমরা তোমাদের নারীদেরকে কুবাতী কাপড় (এক ধরনের রেশমের কাপড়) পরিধান করাবে না। কেননা সেটা একপাশ থেকে আরেক পাশ দেখার মত পাতলা না হলেও সেটা শরীরের অবস্থা

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةُ الرَّجْمِ

বর্ণনা করে দেয়। আর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। তাঁর উপর কিতাব প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি

فَقَرَاْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهٗ،

যা কিছু নাযেল করেছেন তার মধ্যে রয়েছে "রজম"–এর আয়াত। বস্তুতঃ আমরা রজমের আয়াত পাঠ করেছি, সেটা বুঝেছি এবং সংরক্ষণ করেছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের

فَاَخْشٰٓى اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَّقُوْلَ قَآئِلٌ وَاللّٰهِ مَا نَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فِيْ كِتَابِ

বিধান কার্যকরী করেছেন, তাঁর দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে আমরাও রজম করেছি। অতঃপর আমার আশংকা হচ্ছে একটা দীর্ঘ কাল চলে যাওয়ার পর মানুষের মধ্যে কেউ না আবার বলে বসে

اللّٰهِ. حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى اِذَآ اَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ

আমরা আল্লাহর কিতাব কুরআনে রজমের আয়াত দেখতে পাই না। পুরুষ নারীদের মধ্যে বিবাহিত/বিবাহিতা কেউ যেনা করলে যখন সে ব্যাপারে দলীল কায়েম হবে কিংবা গর্ভ দেখা যাবে

الْحَبَلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ. ثُمَّ اِنَّا كُنَّا نَقْرَاُ فِيْمَا نَقْرَاُ مِنْ كِتَابٍ اَنْ لَّا تَرْغَبُوْا عَنْ

অথবা স্বীকারোক্তি থাকবে, তখন রজম করার বিধান সত্য। তারপর আমরা কিতাবে যা কিছু পাঠ করে জানি তা হল তোমরা কেউ তোমাদের পিতৃ–বংশকে অস্বীকার করবে না। কেননা, তোমাদের

اٰبَآئِكُمْ فَاِنَّهٗ كُفْرٌ بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَآئِكُمْ. اَلَا ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

পিতৃ–বংশকে অস্বীকার করা হল তোমাদের কুফরী কাজ। জেনে রাখ তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত কিছু বল না,

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَآ اُطْرِيَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ.

যেমন ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত বলা হয়েছিল (যে, তিনি আল্লাহর পুত্র।) বরং বল, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

www.maktabatulabrar.com

হযতর ওমর (রা.)-এর খুতবা (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِيْنُهٗ، وَنَسْاَلُهُ الْكَرَامَةَ فِيْمَا

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর কাছে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মর্যাদা লাভের আবেদন জানাচ্ছি।

بَعْدَ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ قَدْ دَنَآ اَجَلِيْ وَاَجَلُكُمْ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا

কেননা, আমার ও আপনাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।

شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সু–সংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে।

وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا، لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ، وَمَنْ يُّطِعِ

যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন আর কাফেরদের বেলায় শাস্তির বাণী প্রযোজ্য হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

আনুগত্য করল সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল। আর যে তাঁদের নাফরমানী করল সে নিশ্চিতই সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ হল।

اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ وَبِحَمْدِهٖ قَدِ اسْتَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الشُّكْرَ، وَاتَّخَذَ

আমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। তিনি তোমাদের থেকে শোকর পাওয়ার হকদার। তিনি তোমাদের উপর শোকর আদায় করাকে

عَلَيْكُمُ الشُّكْرَ، وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فِيْمَآ اٰتٰكُمْ مِّنْ كَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

ওয়াজেব করেছেন ঐ সব ব্যাপারে, যা তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদা বিষয়ে তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে কোন রকম আবেদন

مِنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ مِّنْكُمْ وَلَا رَغْبَةٍ مِّنْكُمْ فِيْهِ اِلَيْهِ، فَخَلَقَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَلَمْ

ও তোমাদের পক্ষ থেকে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করা ছাড়াই দান করেছেন। তিনি তোমাদের উপর হজ্জকেও ফরয করেছেন। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন,

تَكُوْنُوْا شَيْئًا لِّنَفْسِهٖ وَعِبَادَتِهٖ، قَدْ كَانَ قَادِرًا عَلٰى اَنْ يَّجْعَلَكُمْ لِاَهْوَنَ

অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের জন্য, তাঁর ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তাঁর কোন অধঃস্তন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

خَلْقِهٖ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ لَكُمْ عَامَّةَ خَلْقِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْكُمْ لِشَيْءٍ غَيْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمْ

তোমাদেরকে বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সমস্ত মাখলূককে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য আর তোমাদেরকে বানিয়েছেন তাঁর নিজের জন্য–অন্য কারও জন্য নয়।

مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

তিনি তোমাদের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুকে অনুগত বানিয়েছেন, তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব রকম নেয়ামতকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন,

وَحَمَلَكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. ثُمَّ

তোমাদেরকে পানি ও স্থলভাগে বাহন দিয়েছেন, তোমাদেরকে পবিত্র রিযিক দান করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

جَعَلَ لَكُمْ سَمْعًا وَّبَصَرًا، وَمِنْ نِّعَمِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ نِعَمٌ عَمَّ بِهَا بَنِيْٓ اٰدَمَ، وَمِنْهَا

তারপর তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত-সমূহের কতক আছে যা তিনি সাধারণভাবে সকল বনী আদমকে দান করেছেন।

نِعَمٌ اخْتَصَّ بِهَآ اَهْلَ دِيْنِكُمْ ثُمَّ صَارَتْ تِلْكَ النِّعَمُ خَوَاصُّهَا فِيْ دَوْلَتِكُمْ

আর কতক নেয়ামত আছে যা শুধু তোমাদের ধর্মাবলম্বীদেরকে বিশেষভাবে দান করেছেন। অনন্তর সেই নেয়ামতসমূহের মধ্যে বিশেষ বিশেষটা

وَطَبَقَتِكُمْ وَلَيْسَ مِنْ تِلْكَ النِّعَمِ نِعْمَةٌ وَصَلَتْ اِلٰى امْرِءٍ خَآصَّةً. اَلَا لَوْ

তোমাদের রাজ্যে এবং তোমাদের শ্রেণীর মধ্যে প্রদত্ত হয়েছে। সেগুলির কোনটাই বিশেষভাবে কোন ব্যক্তিকে দেয়া হয়নি। জেনে রাখ (সেগুলি এক একটা এত বড় নেয়ামত যে,)

قَسَمْتُمْ مَّا وَصَلَ اِلَيْهِ مِنْهَا بَيْنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ اَتْعَبَهُمْ شُكْرُهَا وَقَدْ حَكَّمَ

তার মধ্য থেকে কোনটা যদি তোমরা সমস্ত মানুষের মাঝে বণ্ঠন করে দাও, তাহলে তার শোকর আদায় সকলকে ক্লান্ত করে দিবে,

حَقُّهَآ اِلَّا بِعَوْنِ اللّٰهِ مَعَ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ، فَاَنْتُمْ مُّسْتَخْلَفُوْنَ فِى

তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানের শর্তে আল্লাহর সাহায্য হলে ভিন্ন কথা। অথচ সেই নেয়ামে-তর হক আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। তোমাদেরকে পৃথিবীর রাজত্ব দেয়া হয়েছে,

الْاَرْضِ قَاهِرُوْنَ لِاَهْلِهَا، قَدْ نَصَرَ اللّٰهُ دِيْنَكُمْ فَلَمْ تُصْبِحْ اُمَّةٌ مُّخَالِفَةً

তোমরা তার অধিবাসীদেরকে পরাভূত করে আছ। আল্লাহ তোমাদের দ্বীনকে সাহায্য করেছেন। ফলে দুই জাতি ব্যতীত কোন জাতি তোমাদের ধর্মের

www.maktabatulabrar.com

لِّدِيْنِكُمْ اِلَّا اُمَّتَانِ اُمَّةٌ مُّسْتَعْبَدَةٌ لِّلْاِسْلَامِ وَاَهْلُهٗ يَتَحَرَّوْنَ لَكُمْ

বিরুদ্ধ অবস্থানে নেই। তন্মধ্যে এক জাতিকে ইসলাম ও মুসলমানদের গোলাম বানানো হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য যেটা ভাল সেটা সন্ধান করে।

يَسْتَضْعِفُوْنَ مَعَايِشَهُمْ وَكَدَآئِحَهُمْ وَرَشَحَ جِبَاهَهُمْ عَلَيْهِمُ الْمَؤُنَةُ وَلَكُمُ

তাদের জীবিকা ও জীবন সংগ্রাম দুর্বল। জীবিকার জন্য তাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে। আর তোমাদের তাতে কল্যাণ।

الْمَنْفَعَةُ، وَاُمَّةٌ يَّنْتَظِرُوْنَ وَقَائِعَ اللّٰهِ وَسَطْوَاتِهٖ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ قَدْ مَلَأَ اللّٰهُ

আর এক জাতি দিবারাত্র আল্লাহর আঘাত ও পাকড়াওয়ের অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহ তাদের অন্তরকে ভীতি দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন।

قُلُوْبَهُمْ رُعْبًا، فَلَيْسَ لَهُمْ مَّعْقِلٌ يَّلْجَأُوْنَ اِلَيْهِ وَلَا مَهْرَبٌ يَّتَّقُوْنَ بِهٖ،

তাদের এমন কোন আশ্রয়স্থল নেই যেখানে গিয়ে তারা আশ্রয় নিবে, আর না এমন কোন পালাবার স্থান আছে যেখানে পালিয়ে গিয়ে তারা প্রাণে রক্ষা পাবে।

وَهَمَّتُهُمْ جُنُوْدُ اللّٰهِ وَنَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ مَّعَ رِفَاهَةِ الْعَيْشِ وَاسْتِفَاضَةِ الْمَالِ

আল্লাহর বাহিনী তাদের শংকার কারণ হয়ে আছে। আল্লাহর বাহিনী তাদের আঙ্গিনায় অবতীর্ণ হয়েছে উন্নত জীবিকা, সম্পদের প্রাচুর্য, একের পর এক মিশন ও শ্রেষ্ঠ কামড় নিয়ে।

وَتَتَابُعِ الْبُعُوْثِ وَسَيِّدِ الثُّغُوْرِ بِاِذْنِ اللّٰهِ فِى الْعَاقِبَةِ الْجَلِيْلَةِ الْعَآمَّةِ الَّتِى لَمْ

আর আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের এমন সুপরিণতি ও ব্যাপকভিত্তিক উপকারিতা দাঁড় হয়েছে যে, ইসলা-মের সূচনা লগ্ন থেকে কোন জাতি

تَكُنِ الْاُمَّةُ عَلٰى اَحْسَنَ مِنْهَا مُنْذُ كَانَ الْاِسْلَامُ وَاللّٰهُ الْمَحْمُوْدُ مَعَ الْفُتُوْحِ

এর চেয়ে সুন্দর অবস্থানে দাঁড় হয়নি। প্রত্যেকটা দেশে দেশে এই মহা বিজয়ের জন্য আল্লাহরই প্রশংসা। তারপরও শোকরকারীদের শোকর পূর্ণ হবে না,

الْعِظَامِ فِيْ كُلِّ بَلَدٍ، فَمَا عَسٰى اَنْ يَّبْلُغَ شُكْرُ الشَّاكِرِيْنَ وَذِكْرُ الذَّاكِرِيْنَ وَاجْتِهَادُ

আল্লাহর স্মরণকারীদের স্মরণ পূর্ণ হবে না এবং তাঁর জন্য সাধনাকারীদের সাধনা পূর্ণ হবে না। কেননা, তিনি এতসব নেয়ামত দিয়েছেন,

الْمُجْتَهِدِيْنَ مَعَ هٰذِهِ النِّعَمِ الَّتِيْ لَا تُعَدُّ وَلَا يُحْصٰى عَدَدُهَا وَلَا يُقَدَّرُ قَدْرُهَا

যা গণনা করে পারা যায় না, যার পরিসংখ্যান করা যায় না, যার পরিমাণ নির্ধারণ করে বলা যায় না এবং আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর রহমত ও

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَا يُسْتَطَاعُ اَدَاءُ حَقِّهَا اِلَّا بِعَوْنِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ وَلُطْفِهٖ، فَنَسْأَلُ اللّٰهَ الَّذِيْ اَبْلَانَا

মেহেরবানী ছাড়া যার হক যথাযথভাবে আদায় করা যায় না। যে আল্লাহ আমাদের সামনে এতকিছু পেশ করেছেন, সেই আল্লাহর কাছে

هٰذَا اَنْ يُّرْزُقَنَا الْعَمَلَ لِطَاعَتِهٖ وَالْمُسَارَعَةَ اِلٰى مَرْضَاتِهٖ.

আমরা আবেদন জানাই তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর আনুগত্যে আমল করার এবং তাঁর সন্তুষ্টির দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন।

وَاذْكُرُوْا عِبَادَ اللّٰهِ بَلَاءَ اللّٰهِ عِنْدَ كُمْ، وَاسْتَتِمُّوْا نِعَمَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَفِيْ

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর এই পরীক্ষার ইতিহাস স্মরণ রাখ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতসমূহের হক পূর্ণভাবে আদায় কর।

مَجَالِسِكُمْ مَّثْنٰى وَفُرَادٰى، فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اُخْرُجْ

তোমাদের মজলিসগুলোতে সম্মিলিতভাবে এবং একাকী সেগুলিকে স্মরণ কর। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ وَقَالَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকারপুঞ্জ থেকে আলোর দিকে বের করে আন এবং তাদেরকে জাতিসমূহের উত্থান-পতন ও জয়-পরাজয়ের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দাও।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ، فَلَوْ كُنْتُمْ اِذْ

আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, তোমরা স্মরণ কর যখন তোমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলে। তোমরা যখন দুর্বল ছিলে,

اَنْتُمْ مُسْتَضْعَفِيْنَ مَحْرُوْمِيْنَ خَيْرَ الدُّنْيَا عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ الْحَقِّ تُؤْمِنُوْنَ بِهَا

দুনিয়ার সম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিলে- এই অবস্থায় থেকে যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে, সত্যের প্রতি ঈমান রাখতে, সত্যের কাছে আশ্রয় নিতে,

وَتَسْتَرِيْحُوْنَ اِلَيْهَا مَعَ الْمَعْرِفَةِ بِاللّٰهِ وَبِدِيْنِهٖ وَتَرْجُوْنَ الْخَيْرَ فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

সেই সঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের সাথে পরিচিতি থাকত এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কল্যাণ পাওয়ার আশায় থাকতে, তাহলে সেটা ভাল হত।

ذَالِكَ، وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ اَشَدَّ النَّاسِ عِيْشَةً وَاَعْظَمَ النَّاسِ بِاللّٰهِ جَهَالَةً،

কিন্তু তোমাদের জীবন-জীবিকা অন্য লোকদের তুলনায় বেশী মজবূত হয়ে গেছে এবং অন্য লোকদের তুলনায় আল্লাহর সাথে তোমাদের অপরিচিতি বেড়ে গেছে!

www.maktabatulabrar.com

فَلَوْ كَانَ هٰذَا الَّذِيْ اِسْتِسْلَامُكُمْ بِهٖ لَمْ يَكُمْ مَّعَهٗ حَظٌّ فِيْ دُنْيَاكُمْ غَيْرَ اَنَّهٗ

যদি ইসলামের প্রতি তোমাদের এই আনুগত্যের সাথে পার্থিব জীবনের সুখ-প্রাচুর্যের সমন্বয় না ঘটত, তোমরা জীবন জীবিকার কষ্টে পূর্ববৎ সাহসিকতার সাথে অটল থাকতে,

ثِقَةٌ لَّكُمْ فِيْ اٰخِرَتِكُمُ الَّتِيْ اِلَيْهَا الْمَعَادُ وَالْمُنْقَلَبُ وَاَنْتُمْ مِّنْ جَهْدِ

আর আল্লাহর কাছে পাওয়ার আগ্রহ পোষণ করতে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমরা উত্তম বদলা প্রাপ্ত হতে।

الْمَعِيْشَةِ عَلٰى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرِيَآءَ وَاَنْ تَشْخُصُوْا عَلَى اللّٰهِ تُصِبْكُمْ مِّنْهُ

তবে তোমাদের প্রতি আস্থা আছে যে, তোমরা পরকালে প্রাপ্ত হবে, যে পরকালের দিকে সকলকেই ফিরে যেতে হবে। জেনে রাখ,

غَرْبَلَةٌ، اَمَا اِنَّهٗ قَدْ جَمَعَ لَكُمْ فَضِيْلَةَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الْاٰخِرَةِ اَوْ لِمَنْ شَآءَ اَنْ

আল্লাহ তোমাদের জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আখেরাতের মর্যাদা উভয়টিই রেখেছেন অথবা তোমাদের মধ্য থেকে তিনি যার জন্য উভয়টি চান তার জন্য রেখেছেন।

يَّجْمَعَ لَهٗ ذَالِكَ مِنْكُمْ، فَاُذَكِّرُهُمُ اللّٰهَ الْحَآئِلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ قُلُوْبِكُمْ اِلَّا مَا

আমি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। (সেমতে ভাল মানুষের অন্তরে তিনি খারাপ চেতনা আসতে দেননা আর খারাপ মানুষের অন্তরে ভাল চেতনা

عَرَفْتُمْ حَقَّ اللّٰهِ فَعَمِلْتُمْ لَهٗ وَيَسَّرْتُمْ اَنْفُسَكُمْ عَلٰى طَاعَتِهٖ وَجَمَعْتُمْ مَّعَ

প্রবেশ করতে দেননা।) তবে তোমরা আল্লাহর হক যা জানতে পেরেছ, অতঃপর তার জন্য আমল করেছ এবং তাঁর আনুগত্য করার জন্য নিজেদের মনকে প্রস্তুত করেছ আর আল্লাহ নেয়ামতসমূহ পেয়ে আনন্দিত

السُّرُوْرِ بِالنِّعَمِ خَوْفًا لِّزَوَالِهَا وَانْتِقَالِهَا وَوَجَلًا مِّنْ تَحْوِيْلِهَا فَاِنَّهٗ لَا شَيْءَ

হওয়ার সাথে সাথে সেগুলি স্থানচ্যুত হওয়ার ও স্থানান্তরিত হওয়ার ভয় রেছে চলেছো এটা ভাল কথা। জেনে রাখ আল্লাহর নেয়ামতের না শোকরী করার চেয়ে আর কোন কিছু সেই নেয়ামতকে অধিক নষ্টকারী নেই।

اَسْلَبُ لِنِعْمَةٍ مِّنْ كُفْرَانِهَا وَاِنَّ الشُّكْرَ اَمْنٌ لِّلْعِزِّ وَنُمَآءٌ لِّلنِّعْمَةِ وَاسْتِجْلَابٌ

শোকর হল ইজ্জত-সম্মানের জন্য নিরাপত্তা, নেয়ামত বৃদ্ধিকারী ও সমৃদ্ধি আনয়নকারী। এই পর্যন্ত তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দেয়া

لِّلزِّيَادَةِ، وَهٰذَا عَلٰى مَا فِيْ اَمْرِكُمْ وَنَهْيِكُمْ وَاجِبٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করার যে গুরু দায়িত্ব ছিল আল্লাহ চাহেন তো তা আমি আদায় করলাম।

(খুতবাটি خطبات ما ثورہ، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হযতর উছমান (রা.)-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِيْنُهٗ، وَنَسْأَلُهُ الْكَرَامَةَ فِيْمَا

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর কাছে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মর্যাদা লাভের আবেদন জানাচ্ছি।

بَعْدَ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ قَدْ دَنَا اَجَلِيْ وَاَجَلُكُمْ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا

কেননা, আমার ও আপনাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।

شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সু-সংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে।

وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ، وَمَنْ يُّطِعِ

যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন আর কাফেরদের বেলায় শাস্তির বাণী প্রযোজ্য হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

আনুগত্য করল সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল। আর যে তাঁদের নাফরমানী করল সে নিশ্চিতই সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ হল। (অতঃপর কথা হল-)

اِذَا قَامَ الْاِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا فَاِنَّ

জুমুআর দিন ইমাম যখন খুতবা দিতে শুরু করেন, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে সে খুতবা শ্রবণ করবে এবং চুপ থাকবে।

لِلْمُنْصِتِ الَّذِيْ لَايَسْمَعُ مِنَ الْخَطِّ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ، فَاِذَا قَامَتِ

যে ব্যক্তি খুতবা শুনতে পায় না তবুও চুপ থাকে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ছওয়াব প্রাপ্ত হবে যে খুতবা শুনতে পায় আর চুপ থাকে।

الصَّلٰوةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوْفَ، حَاذُوْا بِالْمَنَاكِبِ فَاِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوْفِ مِنْ

তারপর নামায দাঁড়ানোর সময় কাতারগুলি সোজা করে নিবে। কাঁধে কাঁধে বরাবর করে দাঁড়াবে। অবশ্যই কাতার সোজা করা নামায পূর্ণাঙ্গ হওয়ার অংশ।

تَمَامِ الصَّلٰوةِ.

(খুতবাটি خطبات ما ثوره، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হযতর আলী (রা.)-এর খুতবা (১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِيْنُهٗ، وَنَسْأَلُهُ الْكَرَامَةَ فِيْمَا

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর কাছে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মর্যাদা লাভের আবেদন জানাচ্ছি।

بَعْدَ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ قَدْ دَنَا اَجَلِيْ وَاَجَلُكُمْ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا

কেননা, আমার ও আপনাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।

شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সু-সংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে।

وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ، وَمَنْ يُّطِعِ

যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন আর কাফেরদের বেলায় শাস্তির বাণী প্রযোজ্য হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

আনুগত্য করল সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল। আর যে তাঁদের নাফরমানী করল সে নিশ্চিতই সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ হল। (অতঃপর কথা হল-)

ظَهَرَ عَلَيْنَا اَبُوْ طَالِبٍ وَاَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ

একবার আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। আমরা "বাতনে নাখলা" নামক স্থানে নামায পড়ছিলাম।

نُصَلِّيْ بِبَطْنِ نَخْلَةَ فَقَالَ مَاذَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ اَخِيْ؟ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

ইতিমধ্যে আবূ তালেব আমাদের কাছে এল। জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি করছ হে ভাতিজা? তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْاِسْلَامِ، فَقَالَ مَا بِالَّذِيْ تَصْنَعَانِ بَأْسٌ اَوْ بِالَّذِيْ تَقُوْلَانِ

তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন। তখন সে বলল, তোমরা যা করছ তাতে কোন অসুবিধা নেই অথবা বলল, তোমরা যা বলছ তাতে কোন দোষ নেই।

بَأْسٌ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَا تَعْلُوْنِيْ اِسْتِيْ اَبَدًا، وَضَحِكَ تَعَجُّبًا لِقَوْلِ اَبِيْهِ، ثُمَّ قَالَ

কিন্তু আল্লাহর কছম, তোমরা আমার নিতম্বের উপর চড়ে বসতে পারবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথায় বিস্মিত হলেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَللّٰهُمَّ لَا اَعْتَرِفُ اَنَّ عَبْدًا لَّكَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ عَبَدَكَ قَبْلِيْ غَيْرَ نَبِيِّكَ ثَلٰثَ
তারপর আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহ! আমি স্বীকার করি না যে, আপনার নবীর পূর্বে আপনার বান্দাদের কেউ আমার পূর্বে আপনার ইবাদত করেছে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন।
مَرَّاتٍ، لَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ النَّاسُ سَبْعًا، وَاللّٰهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ
আমি তো সমস্ত মানুষের সাত দিন পূর্বে নামায শুরু করেছি। আল্লাহর কছম, আল্লাহর কিতাব কুরআন ব্যতীত আমার কাছে আর কোন কিতাব নেই যা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাব। শুধু আছে আল্লাহর
نَّقْرَءُهٗ عَلَيْكُمْ اِلَّا كِتَابَ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ مُعَلَّقَةٌ بِسَيْفِهٖ اَخَذْتُهَا مِنْ
কিতাব আর এই সহীফা –যা তাঁর তলোয়ারের সাথে লটকানো ছিল।– আমি এই সহীফা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছি।
رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَرَآئِضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَةٌ بِسَيْفٍ
এতে লেখা আছে সদকা বণ্টনের পদ্ধতি। এই সহীফাটি তলোয়ারের সাথে লটকানো থাকত, যে তলোয়ারের গহনা বা হাতল ছিল লোহার।
وَّحِلْيَتُهٗ حَدِيْدٌ اَوْ قَالَ بَكْرَاتُهٗ حَدِيْدٌ اَيْ حَلَقُهٗ، وَعَنْ وَهَبٍ نِ السُّوَائِيِّ قَالَ
ওয়াহাব আস–সাওয়ায়ী বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন রাখলেন,
خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ فَقُلْتُ اَنْتَ
নবীর পর এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি। তিনি বললেন, না বরং
يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ لَا، خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ، وَمَا
নবীর পর এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ বকর (রা.), তারপর হযরত ওমর (রা.)। আর প্রায়শঃই
نَبْعُدُ اَنَّ السَّكِيْنَةَ تُنْطَقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ.
হযরত ওমরের জবানে সান্ত্বনা–বাণী উচ্চারিত হত।

(খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হযতর আলী (রা.)-এর খুতবা (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِيْنُهٗ، وَنَسْاَلُهُ الْكَرَامَةَ فِيْمَا بَعْدَ
সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর কাছে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মর্যাদা লাভের আবেদন জানাচ্ছি।
الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ قَدْ دَنَا اَجَلِيْ وَاَجَلُكُمْ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا
কেননা, আমার ও আপনাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।
شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সু–সংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে।
وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ، وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ
যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন আর কাফেরদের বেলায় শাস্তির বাণী প্রযোজ্য হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের
وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.
আনুগত্য করল সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল। আর যে তাঁদের নাফরমানী করল সে নিশ্চিতই সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ হল। (অতঃপর কথা হল–)
يَاْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوْضٌ يَعَضُّ الْمُوْسِرُ عَلٰى مَا فِيْ يَدَيْهِ قَالَ
একবার আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাথে ছিলাম। আমরা "বাতনে নাখলা" নামক স্থানে নামায পড়ছিলাম।
وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَالِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَيُنْهَدُ الْاَشْرَارُ
ইতিমধ্যে আবূ তালেব আমাদের কাছে এল। জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি করছ হে ভাতিজা? তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
وَيُسْتَذَلُّ الْاَخْيَارُ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّوْنَ قَالَ وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন। তখন সে বলল, তোমরা যা করছ তাতে কোন অসুবিধা নেই অথবা বলল, তোমরা যা বলছ তাতে কোন দোষ নেই।
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّيْنَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ
কিন্তু আল্লাহর কছম, তোমরা আমার নিতম্বের উপর চড়ে বসতে পারবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথায় বিস্মিত হলেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَنْ تُدْرِكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَاِنَّهٗ مَنْ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার প্রতি কোন মিথ্যা কথা সম্পৃক্ত করো না। কেননা, যে আমার প্রতি কোন মিথ্যা সম্পৃক্ত করবে,

يَّكْذِبُ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ. اَيُّهَا النَّاسُ! اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। হে লোকসকল! আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, উযূ হীন হওয়া ব্যতীত নামায ভঙ্গ হয় না।

وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ اِلَّا الْحَدَثُ لَآ اَسْتَحْيِيْكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَحْيِيْ مِنْهُ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলতে শরম করেননি আমারও তা বলতে কোন শরম নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْحَدَثُ اَنْ يَّفْسُوَا اَوْ يَضْرِطَ. يٰاَيُّهَا

উযূ হীন হওয়ার অর্থ হল, শব্দ সহকারে বায়ু ত্যাগ করা অথবা নিঃশব্দে বায়ু ত্যাগ করা। হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের

النَّاسُ! اَقِيْمُوْا عَلٰى اَرِقَّآئِكُمُ الْحُدُوْدَ مَنْ اَحْصَنَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُحْصِنْ، فَاِنَّ

দাসদের উপর "হদ" তথা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ কর, চাই তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

اَمَةً لِّرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَاَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

এক বান্দী যেনা করেছিল অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার উপর হদ প্রয়োগ করতে।

وَسَلَّمَ اَنْ اُقِيْمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَاَتَيْتُهَا فَاِذَا هِيَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ

আমি তার উপর হদ প্রয়োগ করতে যেয়ে দেখি তার সদ্য সন্তান প্রসব হয়েছে। তাই আমার আশংকা হল এ অবস্থায় তাকে বেত্রাঘাত করা হলে

فَخَشِيْتُ اِنْ اَنَا جَلَدْتُّهَا اَنْ تَمُوْتَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তখন আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বৃত্তান্ত শুনালে তিনি বললেন, ভালই করেছ।

فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهٗ فَقَالَ اَحْسَنْتَ.

(খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হযতর আলী (রা.)-এর খুতবা (৩) [জেহাদ বিষয়ক]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِيْنُهٗ، وَنَسْاَلُهُ الْكَرَامَةَ فِيْمَا

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি তাঁর কাছে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মর্যাদা লাভের আবেদন জানাচ্ছি।

بَعْدَ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ قَدْ دَنَا اَجَلِيْ وَاَجَلُكُمْ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا

কেননা, আমার ও আপনাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।

شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সু-সংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে।

وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا، لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ، وَمَنْ يُّطِعِ

যাতে তিনি জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারেন আর কাফেরদের বেলায় শাস্তির বাণী প্রযোজ্য হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

আনুগত্য করল সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল। আর যে তাঁদের নাফরমানী করল সে নিশ্চিতই সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ হল।

اَمَّا بَعْدُ: فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ

(অতঃপর কথা হল–) জেহাদ হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের একটা দুয়ার। আল্লাহ তাঁর খাস বান্দাদের জন্য এই দুয়ার খুলেছেন।

اَوْلِيَآئِهٖ، وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوٰى، وَدِرْعُ اللهِ الْحَصِيْنَةُ، وَجُنَّتُهُ الْوَثِيْقَةُ، فَمَنْ

জেহাদ হচ্ছে তাকওয়ার ভূষণ, জেহাদ হচ্ছে আল্লাহর শক্ত বর্ম, জেহাদ হচ্ছে তাঁর আত্মরক্ষার মজবুত ঢাল। যে ব্যক্তি জেহাদ থেকে বিমুখ হয়ে জেহাদ পরিত্যাগ করবে,

تَرَكَهٗ رَغْبَةً عَنْهُ اَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ الذُّلِّ، وَشَمِلَهُ الْبَلَاءُ، وَدُيِّثَ بِالصَّغَارِ

আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার ভূষণ পরিধান করাবেন, সে বিপদে আক্রান্ত হবে, অপমান ও পতনে আক্রান্ত হবে, তার অন্তরে বাঁধন এঁটে দেয়া হবে।

وَالْقَمَآءَةِ، وَضُرِبَ عَلٰى قَلْبِهٖ بِالْاَسْدَادِ، وَاُدِيْلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيْعِ الْجِهَادِ،

জেহাদ নষ্ট করার কারণে তার থেকে হককে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেয়া হবে। তাকে লাঞ্ছিত করা হবে এবং তাকে ইনসাফ থেকে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَسِيْمَ الْخَسَفُ، وَمُنِعَ النَّصْفُ. اَلَا وَاِنِّيْ قَدْ دَعَوْتُكُمْ اِلٰى قِتَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ

বঞ্চিত করা হবে। জেনে রাখ আমি তোমাদেরকে এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য দিনে রাতে, গোপনে সদরে

لَيْلًا وَّنَهَارًا، سِرًّا وَّاِعْلَانًا، وَقُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوْهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّغْزُوَكُمْ، فَوَاللّٰهِ مَا غُزِيَ

সবভাবে আহবান জানিয়েছি। আমি বলেছি, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করার পূর্বে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। আল্লাহর কছম কোন সম্প্রদায়ের গৃহের অভ্যন্তরে

قَوْمٌ قَطُّ فِيْ عُقْرِ دَارِهِمْ اِلَّا ذَلُّوْا، فَتَوَاكَلْتُمْ وَتَخَاذَلْتُمْ حَتّٰى شَنَّتْ عَلَيْكُمُ

এসে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হলে তারা লাঞ্ছিতই হয়। তবুও তোমরা একে অপরের উপর ভরসা করে বসে আছ, একে অপরের সহযোগিতা পরিত্যাগ করে বসে আছ। এমনকি তারা চারদিক থেকে

الْغَارَاتُ، وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الْاَوْطَانُ. هٰذَا اَخُوْ غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْاَنْبَارَ، وَقَدْ

তোমাদের উপর লুটতরাজ শুরু করেছে এবং তোমাদের ঘর-বাড়ি দখল করা শুরু করেছে। এই যে গামেদ-এর ভাই (সুফইয়ান গামিদী)-এর নেতৃত্বে অশ্বারোহী বাহিনী আম্বার শহরের উপর এসে

قَتَلَ حَسَّانَ الْبِكْرِيَّ، وَاَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَّعَاقِلِهَا. وَلَقَدْ بَلَغَنِيْ اَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ

পড়েছে, তারা (আম্বারের আমীর) হাস্‌সান বিকরীকে হত্যা করেছে, দুর্গ থেকে তোমাদের ঘোড়া নিয়ে গেছে। আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে,

كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْاَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْاُخْرٰى الْمُعَاهِدَةِ، فَيَنْزِعُ حَجْلَهَا وَقُلْبَهَا،

তাদের এক ব্যক্তি এক মুসলিম নারী ও এক যিম্মী নারীর গৃহে প্রবেশ করে তাদের পায়ের মল, তাদের হাতের চুড়ি, তাদের গলার হার ও

وَقَلَآئِدَهَا وَرُعَاثَهَا، مَا تَمْنَعُ مِنْهُ اِلَّا بِالْاِسْتِرْجَاعِ وَالْاِسْتِرْحَامِ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا

তাদের কানের দুল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তারা ইন্না লিল্লাহ পড়ে, দয়া প্রার্থনা করেও তাকে ঠেকাতে পারেনি। এইভাবে সবকিছু

وَافِرِيْنَ، وَمَا نَالَ رَجُلًا مِّنْهُمْ كَلْمٌ، وَلَا اُرِيْقَ لَهُمْ دَمٌ، فَلَوْ اَنَّ امْرَءًا مُّسْلِمًا مَّاتَ

ছিনিয়ে নিয়ে তারা সকলে নিরাপদে নির্বিঘ্নে ফিরে গেছে– তাদের কেউ আহতও হয়নি, তাদের কারও এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি।

مِنْ بَعْدِ هٰذَا اَسَفًا مَا كَانَ بِهٖ مَلُوْمًا، بَلْ كَانَ بِهٖ عِنْدِيْ جَدِيْرًا.

এই ঘটনার পর কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি আফসূস করে মারা যায়, তাহলে সে নিন্দনীয় নয় বরং এটাই আমার কাছে যথাযথ মনে হয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

فَيَا عَجَبًا وَاللّٰهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ، وَيُجْلِبُ الْهَمَّ، اِجْتِمَاعُ هٰٓؤُلَآءِ عَلٰى

হায় বিস্ময়! আল্লাহর কছম, এই সব লোকদের অন্যায়ের উপর ঐক্য আর তোমাদের হক আদায়ে তোমাদের কাপুরুষতা

بَاطِلِهِمْ، وَفَشْلُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، فَقُبْحًا لَّكُمْ وَتَرِحًا حِيْنَ صِرْتُمْ غَرْضًا

আত্মার মৃত্যু ঘটাবে, দুশ্চিন্তা টেনে আনবে। তোমাদের মন্দ হোক! তোমাদের সর্বনাশ হোক!! যখন দেখি তোমরা তাদের তীর তলোয়ারের নিশানা হলে!

يُّرْمٰى، يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِيْرُوْنَ، وَتُغْزَوْنَ وَلَا تَغْزُوْنَ، وَيُعْصَى اللّٰهُ وَتَرْضَوْنَ.

তারা তোমাদেরে লুটতরাজ করল আর তোমরা নির্বিকার থাকলে! তোমাদের সাথে লড়াই করা হল আর তোমরা লড়াই করলে না এবং আল্লাহর নাফরমানী করা হল আর তোমরা তাতে সন্তুষ্ট থাকলে!

فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ اِلَيْهِمْ فِيْ اَيَّامِ الصَّيْفِ قُلْتُمْ هٰذِهٖ حَمَارَّةُ الْقَيْظِ،

যখন আমি গরমের মওসূমে তাদের দিকে অভিযানে বের হতে বলি, তখন তোমরা বল, এখন যে প্রচন্ড গরম! গরম কেটে যাওয়া

اَمْهِلْنَا يَنْسَلِخْ عَنَّا الْحَرُّ، وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ اِلَيْهِمْ فِى الشِّتَآءِ قُلْتُمْ

পর্যন্ত আমাদেরকে অবকাশ দিন। আর যখন শীতের মওসূমে তাদের দিকে অভিযানে বের হতে বলি তখন বল, এখন যে প্রচন্ড শীত!

هٰذِهٖ صَبَارَّةُ الْقَرِّ، اَمْهِلْنَا يَنْسَلِخْ عَنَّا الْبَرْدُ، كُلُّ هٰذَا فِرَارًا مِّنَ الْحَرِّ وَالْقَرِّ،

শীত কেটে যাওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অবকাশ দিন। আল্লাহর কছম, এই গরম আর শীত থেকে ভাগার আদলে মূলত

فَاَنْتُمْ وَاللّٰهِ مِنَ السَّيْفِ اَفَرُّ.

তোমরা তলোয়ার থেকেই ভাগতে চাইছ।

يَا اَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلَارِجَالَ، حُلُوْمُ الْاَطْفَالِ، وَعُقُوْلُ رَبَاتِ الْحِجَالِ،

হে পুরুষ সদৃশ লোকেরা, যারা আসলে পুরুষ নও!! তোমাদের বুদ্ধি শিশু সদৃশ, তোমাদের আকল নারীদের মত। আমার মনে চায়

لَوَدِدْتُ اَنِّيْ لَمْ اَرَكُمْ وَلَمْ اَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَاللّٰهِ جَرَّتْ نَدَمًا، وَاَعْقَبَتْ سَدَمًا،

যদি আমি তোমাদেরকে না দেখতাম! যদি তোমাদের সাথে আমার পরিচয়ই না হত! আল্লাহর কছম সে পরিচয় অনুশোচনায় রূপ নিয়েছে, সে পরিচয় অনুতাপ বয়ে এনেছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَاتَلَكُمُ اللّٰهُ، لَقَدْ مَلَاْتُمْ قَلْبِيْ قَيْحًا، وَشَحِنْتُمْ صَدْرِيْ غَيْظًا، وَجَرَّعْتُمُوْنِيْ نَغْبَ
আল্লাহ তোমাদেরে ধ্বংস করুন, তোমরা আমার অন্তরকে পূঁজ দিয়ে ভরে দিয়েছ! আমার সীনাকে ক্রোধ দিয়ে পূর্ণ করেছ! শ্বাসে শ্বাসে
التَّهْمَامِ اَنْفَاسًا، وَاَفْسَدْتُمْ عَلَى رَأْيِيْ بِالْعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ، حَتّٰى لَقَدْ قَالَتْ
আমাকে দুশ্চিন্তা গলাধঃকরণ করিয়েছ, অবাধ্যতা ও সহযোগিতা পরিত্যাগ করে আমার সিদ্ধান্তকে ধ্বংস করেছ। এমনকি কুরায়শগণ বলতে শুরু করেছে,
قُرَيْشٌ اِنَّ ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ، وَلٰكِنْ لَّا عِلْمَ لَهٗ بِالْحَرْبِ، لِلّٰهِ اَبُوْهُمْ!
আবূ তালিবের পুত্র বাহাদুর বটে, তবে যুদ্ধ সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই। তাদের পিতৃপুরুষ আল্লাহর জন্য কুরবান হোক! তাদের কারও কি
وَهَلْ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَشَدُّ لَهَا مِرَاسًا، وَاَقْدَمُ فِيْهَا مَقَامًا مِّنِّيْ؟ لَقَدْ نَهَضْتُ بِهَا وَمَا
আমার চেয়ে যুদ্ধের অনুশীলন বেশী আছে? যুদ্ধে তাদের কারও অবস্থান কি আমার চেয়ে অগ্রে আছে? আমি তো বিশ বৎসর বয়স হওয়ার পূর্বেই
بَلَغْتُ الْعِشْرِيْنَ، وَهٰاَنَذَا قَدْ ذَرَفْتُ عَلَيَّ السِّتِّيْنَ، وَلٰكِنْ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ.
যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি, আর এখন তো আমার বয়স ষাটের উর্ধে। কিন্তু যার মতামত মানা হয় না তার মতের কোন মূল্য থাকে না।

খুতবাটি نصوصه وتاريخه الادب। থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হযতর ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি,
وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، اِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ،
আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের মনের অনিষ্টতা হতে এবং আমাদের আমলের খারাবী থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,) মুহাম্মাদ
مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ غَوٰى.
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে, সে গোমরাহ হয়।
اِتَّقُوا اللّٰهَ اَيُّهَا النَّاسُ وَاَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، فَاِنَّهٗ اِنْ كَانَ لَكُمْ رِزْقٌ فِيْ
(হে লোকসকল!) তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সৎভাবে রিযিক অন্বেষণ কর। কেননা, তোমাদের রিযিক যদি কোন পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা মাটির অভ্যন্তরেও থাকে,
رَأْسِ جَبَلٍ اَوْ حَضِيْضِ اَرْضٍ يَأْتِهٖ اَلَا اِنَّ مَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
তবুও তোমাদের কাছে তা আসবে। জেনে রাখ– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দুই সঙ্গী (হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর) যে আদর্শ রেখে গেছেন
وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاهُ فَهُوَ دِيْنٌ وَنَنْتَهِيْ اِلَيْهِ وَمَا سَنَّ سِوَاهُمَا فَاِنَّا نُرْجِئُهٗ.
সেটাই দ্বীন। আমরা সেটাই গ্রহণ করব। আর তাঁরা ব্যতীত অন্যরা যে আদর্শ দাঁড় করেছে, অবশ্যই আমরা তাকে পিছনে রেখে দেব।
اَيُّهَا النَّاسُ! اَصْلِحُوْا اَسْرَارَكُمْ تَصْلُحْ عَلَانِيَتُكُمْ، وَاعْمَلُوْا لِاٰخِرَتِكُمْ تُكْفَوْا دُنْيَاكُمْ،
হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের গোপনটাকে সংশোধন কর, তোমাদের প্রকাশ্যটা সংশোধন হয়ে যাবে। তোমরা তোমাদের আখেরাতের জন্য আমল কর, তোমাদের দুনিয়ার বিষয়টার
وَاعْلَمُوْا اَنَّ رَجُلًا لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اٰدَمَ حَيٌّ لِّعِرْقٍ لَّهٗ فِي الْمَوْتِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হবেন। আর জেনে রাখ– মৃত্যুর সময় গোটা বনী আদমের কেউই কারও কোন উপকারে আসবে না। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,
يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
হে আমার সেই বান্দাগণ যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَ اَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ

তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে অভিমুখী হও এবং তার কাছে আত্মসমর্পন কর এর পূর্বে যে,

اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ وَ اتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ

তোমাদের নিকট আযাব আসবে তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। আর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যে উত্তম কথা নাযেল হয়েছে

قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى

তারা অনুসরণ কর এর পূর্বে যে, তোমাদের নিকট আযাব আসবে অতর্কিতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যাতে কাউকে বলতে না হয় যে, হায়!

عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ

আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি আর আমিতো বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কিংবা কেউ না বলে যে,

هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ

আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত করতেন তাহলে অবশ্যই আমি পরহেযগারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিংবা যখন আযাব দেখবে তখন বলবে, যদি আর একবার আমাকে (দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া

مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ

হয়, তাহলে আমি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব। (আল্লাহ বলবেন,) প্রকৃত ব্যাপার হল তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে আর

الْكٰفِرِيْنَ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِيْ

তুমি অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলে। আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন তুমি তাদের মুখমন্ডল কালো দেখবে। উদ্ধত লোকদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়?

جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ وَ يُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ

আর মুত্তাকী পরহেযগার লোকদেরকে আল্লাহ উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ। অকল্যাণ তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ.

তারা দুঃখীতও হবে না। আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সব বিষয়ের তত্বাবধায়ক।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) রচিত জুমাআর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَقَدْ اَتٰى عَلَيْهِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যে মানুষের উপর কালপ্রবাহে এমন একটা সময় গিয়েছে যখন সে উল্লেখ্য করার মত কিছু ছিল না।

يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوْرًا، فَسَوَّاهُ وَعَدَّلَهٗ وَعَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ فَضَّلَهٗ وَجَعَلَهٗ

অতঃপর তিনি তাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করে তৈরি করেছেন। আর তাঁর সৃষ্টির অধিকাংশের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাকে করেছেন শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

سَمِيْعًا بَصِيْرًا. ثُمَّ هَدَاهُ السَّبِيْلَ وَنَصَبَ لَهُ الدَّلِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا اَمَّا

অনন্তর তাকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তার জন্য দলীল স্থাপন করেছেন। এখন হয় সে কৃতজ্ঞ বান্দা হবে নতুবা হবে নাফরমান।

الْكَافِرُوْنَ فَاَعْتَدْنَا لَهُمْ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَّسَعِيْرًا. يُعَذَّبُوْنَ بِاَصْنَافِ الْعَذَابِ

নাফরমানদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন যে, আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও জ্বলন্ত আগুন। তাদেরকে বিভিন্ন রকম শাস্তি প্রদান করা হবে।

يُنَادُوْنَ وَيْلًا وَيَدْعُوْنَ ثُبُوْرًا. وَاَمَّا الشَّاكِرُوْنَ فَنَعَّمَهُمْ وَكَرَّمَهُمْ وَلَقَّاهُمْ

শাস্তির প্রচন্ডতায় তারা ধ্বংশ ও বিনাশ কামনা করতে থাকবে। আর কৃতজ্ঞদেরকে তিনি অনুগ্রহ দান করবেন, তাদেরকে সম্মানীত করবেন এবং

نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا. اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا. فَسُبْحَانَ مَنْ

তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। (তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে,) অবশ্যই এটা তোমাদের পুরষ্কার। তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়েছে।

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ لَّمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ عَلِيْمًا قَدِيْرًا. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا

মহান ঐ সত্তা, যার হাতে সবকিছুর আধিপত্য। তিনি সর্বদা আছেন মহাজ্ঞানী, মহা ক্ষমতাধর এবং সর্বদা এমনই থাকবেন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ بَعَثَهٗ بَيْنَ يَدَيِ

এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।

السَّاعَةِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا. وَاٰتَاهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَمَنَابِعَ الْحِكَمِ

কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি তাঁকে জগৎবাসীর জন্য সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁকে ব্যাপক অর্থবহ বাণী ও সুষ্ঠু জ্ঞানের উৎস দান করেছেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَوَعَدَهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا وَّجَعَلَهُ سِرَاجًا مُّنِيْرًا.

তিনি তাঁকে "মাক্বামে মাহমূদ" দান করেছেন এবং তাঁকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল প্রদীপ। (মাক্বামে মাহমূদ হল ঐ স্থান, যেখানে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে শাফাআত তথা সুপারিশ করবেন।)

اَمَّا بَعْدُ: فَاِنِّيْ اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ اَوَّلًا بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَاُحَذِّرُكُمْ يَوْمًا عَبُوْسًا

(অতঃপর কথা হল–) আমি সর্ব প্রথম আপনাদেরকে এবং আমার নিজেকে তাকওয়া তথা খোদাভীতি অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি।

قَمْطَرِيْرًا، يَوْمَ تُبْلٰى كُلُّ نَفْسٍ وَّلَايُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ

আমি তোমাদেরকে মহাসংকটময় ভীতিপ্রদ দিবসের ভয় দেখাচ্ছি। যেদিন প্রত্যেকের পরীক্ষা নেয়া হবে। কারও থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না,

وَّلَاتَجِدُ نَصِيْرًا، يَوْمَئِذٍ يَّنْدَمُ الْاِنْسَانُ وَلَا يَنْفَعُهُ النَّدَمُ، وَيَطْلُبُ الْعَوْدَ اِلَى

কারও থেকে মুক্তিপণ গ্রহীত হবে না আর কেউ কোন সাহায্যকারীও পাবে না। সেদিন মানুষ (তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে কিন্তু সেই অনুতাপ তার কোন উপকারে আসবে না।

الدُّنْيَا وَهَيْهَاتَ اَنْ يَّعُوْدَ، وَيُخْرَجُ لَهُ كِتَابٌ يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا.

সেদিন মানুষ দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে চাইবে কিন্তু প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত। সেদিন তার আমলনামা বের করে দেয়া হবে, সে তা সন্মুখে খোলা অবস্থায় পাবে।

يَا ابْنَ اٰدَمَ! مَنْ اَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيْنًا لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا وَفِى

হে আদম সন্তান! যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয় সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়, দুনিয়াতে তার দুঃখ এবং আখেরাতে কষ্ট বৃদ্ধি পায়।

الدُّنْيَا اِلَّا كَدًّا وَفِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا جُهْدًا وَّلَمْ يَزَلْ مَمْقُوْتًا مَّهْجُوْرًا. يَا ابْنَ اٰدَمَ تُرْزَقُ

সে সর্বদা আল্লাহর গযবে নিপতিত এবং তাঁর রহমতের দৃষ্টি হতে বিদূরিত থাকে। হে আদম সন্তান! তোমার জন্য নির্ধারিত রিযিক তোমাকে দেয়া হবে।

بِالرِّزْقِ فَاِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُوْمٌ وَّالْحَرِيْصَ مَحْرُوْمٌ وَالْاِسْتِقْصَاءَ شُؤْمٌ وَالْاَجَلَ مَحْتُوْمٌ

কেননা, রিযিক বণ্ঠিত হয়ে আছে। লোভীগণ বঞ্চিত আর সর্বগ্রাসের চেষ্টা হচ্ছে কুলক্ষণ। মৃত্যু মোহরাঙ্কিত তথা নির্ধারিত।

وَقَدْ فَازَ مَنْ لَمْ يَحْمِلْ مِنَ الظُّلْمِ نَقِيْرًا. يَا ابْنَ اٰدَمَ خَيْرُ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ اللّٰهِ

সেই ব্যক্তি কামিয়াব যে কারও প্রতি বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা থেকেও বিরত থাকে। হে আদম সন্তান! সর্বোত্তম হেকমত হল আল্লাহর ভয়,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

وَخَيْرُ الْغِنٰى غِنَى الْقَلْبِ، وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوٰى وَخَيْرُ مَا اُعْطِيْتُمُ الْعَافِيَةُ

সর্বোত্তম প্রাচুর্য হল মনের প্রাচুর্য আর সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়া তথা খোদাভীতি। তোমাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম দান হল সুস্থ্যতা।

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا. وَخَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى

তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান। আর সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কথা এবং সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর দিক নির্দেশনা।

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا. لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ

সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল ধর্মের নামে নতুন আবিষ্কার তথা বিদ'আত। যার মধ্যে আমানতদারী তথা বিশ্বস্ততা নেই, তার ঈমান নেই।

وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا.

যার ওয়াদা ঠিক নেই তার ধর্ম নেই। আর (আল্লাহ বলেন,) তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের পাপ সম্বন্ধে সম্যক অবগত ও সম্যক দ্রষ্টা হিসেবে যথেষ্ট।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। (আল্লাহ বলেন,) কেউ দুনিয়ার সুখ–সম্ভোগ কামনা করলে আমি তাকে ত্বরিত দিয়ে দেই– যা চাই, যার জন্য চাই।

مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَدْحُوْرًا. وَمَنْ اَرَادَ

তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে দেই। যাতে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও আল্লাহর রহমত থেকে ধিকৃত অবস্থায়। আর যারা ঈমানের সাথে পরকাল কামনা করে

الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا. اَللّٰهُمَّ

এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের চেষ্টার কদর করা হবে। হে আল্লাহ! আমাদের গোনাহরাশি ক্ষমা করে দিন, আমাদের দোষ–ত্রুটি মোচন করে দিন, আমাদের ঋণসমূহ পরিশোধের ব্যবস্থা করে

اغْفِرْ ذُنُوْبَنَا وَامْحُ عُيُوْبَنَا وَاَدِّ دُيُوْنَنَا وَكُنْ لَنَا مُعِيْنًا وَّظَهِيْرًا. وَاقْضِ حَاجَاتِنَا

দিন এবং আপনি আমাদের জন্য সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে যান। আপনি আমাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করে দিন, আমাদের বিপদাপদ দূর করে দিন এবং আমাদের লজ্জাকর বিষয়গুলোকে গোপন করে

وَاشْفِ عَاهَاتِنَا وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَكَفٰى بِكَ مُجِيْبًا قَرِيْبًا عَلِيْمًا خَبِيْرًا.

দিন। আর আপনার দুআ কবূল করা, সান্নিধ্য, জ্ঞান ও অবগতিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

(খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف على تهانوى থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.) রচিত জুমুআর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلِيِّ الذَّاتِ عَظِيْمِ الصِّفَاتِ سَمِيِّ السِّمَاتِ كَبِيْرِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার সত্তা সমুচ্চ, যার গুণাবলী মহান, যার বৈশিষ্ট্য অনন্য, যার শান বড়, যার সম্মান-মর্যাদা মহীয়ান।

الشَّانِ، جَلِيْلِ الْقَدْرِ رَفِيْعِ الذِّكْرِ مُطَاعِ الْاَمْرِ جَلِيِّ الْبُرْهَانِ، فَخِيْمِ الْاِسْمِ

যার আলোচনা অনেক উর্দ্ধের বিষয়, যার আদেশ পালনীয়, যার দলীল প্রমাণ সুস্পষ্ট। যার নাম গৌরবময়, যার জ্ঞান অপ্রতুল, যার সহনশীলতা ব্যাপক,

غَزِيْرِ الْعِلْمِ وَسِيْعِ الْحِلْمِ كَثِيْرِ الْغُفْرَانِ، جَمِيْلِ الثَّنَآءِ جَزِيْلِ

যার ক্ষমা প্রচুর। যিনি সুন্দরতম প্রশংসার অধিকারী, যিনি প্রচুর দানশীল, যিনি দুআ কবূলকারী, যিনি পরিব্যাপ্ত অনুগ্রহের অধিকারী।

الْعَطَآءِ مُجِيْبِ الدَّعَآءِ عَمِيْمِ الْاِحْسَانِ، سَرِيْعِ الْحِسَابِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ

যিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, যিনি কঠিন শাস্তিদাতা, যিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাবদাতা, যিনি প্রবল ক্ষমতাধর তথা দাপটশীল সম্রাট।

اَلِيْمِ الْعَذَابِ عَزِيْزِ السُّلْطَانِ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ فِى

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, সৃষ্টি ও আদেশ দানে তাঁর কোন শরীক নেই।

الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَلْمَبْعُوْثُ

আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সাইয়্যেদিনা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। লাল কালো নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট তাঁকে রসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ، اَلْمَنْعُوْتُ بِشَرْحِ الصَّدْرِ وَرَفْعِ الذِّكْرِ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

যার বক্ষ প্রসারিত করা ও যার খ্যাতিকে সমুন্নত করা হয়েছে বলে কুরআনে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। আল্লাহর রহমত বর্ষণ করেন তাঁর

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ خُلَاصَةُ الْعَرَبِ الْعَرْبَآءِ، وَخَيْرُ الْخَلَآئِقِ بَعْدَ

পরিবার-পরিজনের উপর এবং তাঁর সেইসব সাহাবীর উপর যারা খাঁটি আরবদের মধ্যে বিশিষ্ট এবং নবীগণের পর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

الْاَنْبِيَآءِ.

www.maktabatulabrar.com

اَمَّا بَعْدُ: فَيَآ اَيُّهَا النَّاسُ! وَحِّدُوا اللّٰهَ فَاِنَّ التَّوْحِيْدَ رَاْسُ الطَّاعَاتِ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ

অতঃপর (কথা হল-) হে লোকসকল! আপনারা তাওহীদ তথা খোদার একত্বে বিশ্বাস করুন। কেননা, তাওহীদ তথা একত্বে বিশ্বাসই হচ্ছে সমস্ত ইবাদতের মূল।

فَاِنَّ التَّقْوٰى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ، فَاِنَّ السُّنَّةَ تَهْدِيْ اِلَى

আপনারা তাকওয়া তথা খোদাভীতি অবলম্বন করুন। কেননা, খোদাভীতি হচ্ছে সমস্ত নেকীর উৎস। আপনারা সুন্নাতের পাবন্দী করুন। কেননা, সুন্নাত আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের

الْاِطَاعَةِ، وَمَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدٰى. وَاِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ، فَاِنَّ

আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করল সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল এবং সঠিক পথে পরিচালিত হল।

الْبِدْعَةَ تَهْدِيْ اِلَى الْمَعْصِيَّةِ، وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوٰى.

আপনারা বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা, বিদ'আত আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নাফরমানির দিকে পরিচালিত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নাফরমানী করল,

وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ. فَاِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِيْ وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ. وَعَلَيْكُمْ

সে নিশ্চিত গোমরাহ হল এবং বিপথগামী হল। আপনারা সত্যকে আঁকড়ে থাকুন। কেননা, সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে দেয়।

بِالْاِحْسَانِ، فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. وَلَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ، فَاِنَّهُ

আপনারা নেক কাজ করতে থাকুন। কেননা, অবশ্যই আল্লাহ নেক আমলকারীদেরকে ভালবাসেন। আপনারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না।

اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. وَلَا تُحِبُّوا الدُّنْيَا فَتَكُوْنُوْا مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. اَلَا وَاِنَّ نَفْسًا لَّنْ

কেননা, তিনি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু। আপনারা দুনিয়ার মোহে পড়বেন না, তাহলে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ، وَتَوَكَّلُوْا

জেনে রাখুন, রিযিক পূর্ণ গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত কারও মৃত্যু ঘটে না। অতএব আল্লাহকে ভয় করুন এবং সৎভাবে রিযিক অন্বেষণ করুন।

عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ. وَادْعُوْهُ فَاِنَّ رَبَّكُمْ مُّجِيْبٌ

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। অবশ্যই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহর কাছে দুআ করুন। অবশ্যই আপনাদের প্রতিপালক

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) রচিত জুমুআর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هٰدَانَا لِخَيْرِ الْاَدْيَانِ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا
সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে সর্বোত্তম দ্বীনের দিকে হেদায়াত করেছেন। যদি তিনি আমাদেরকে হেদায়াত না করতেন তবে আমরা হেদায়াত পাওয়ার ছিলাম না।
اللّٰهُ، وَاَكْمَلَ لَنَا دِيْنَنَا وَاَتَمَّ عَلَيْنَا نِعْمَتَهٗ وَرَضِيَ لَنَا الْاِسْلَامَ دِيْنًا، فَلَا نَعْبُدُ
এবং যিনি আমাদের জন্য আমাদের দ্বীনকে কামেল তথা পূর্ণ করে দিয়েছেন, তাঁর নেয়ামত আমাদের উপর পূর্ণ করেছেন আর ইসলামকে আমাদের দ্বীনরূপে মনোনীত করেছেন।
وَلَا نَسْتَعِيْنُ اِلَّا اِيَّاهُ، اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ فَاَصْبَحُوْا بِنِعْمَتِهٖ
আমরা তাঁর ব্যতীত আর কারও ইবাদত করি না, তাঁর নিকট ব্যতীত আর কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি না। তিনি ঈমানদারদের অন্তরে পরস্পরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তারা
اِخْوَانًا، وَحَثَّهُمْ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا كَاَعْضَاءِ جَسَدٍ وَّاحِدٍ اَنْصَارًا وَّاَخْدَانًا.
ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়েছে। তিনি তাদেরকে একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত একে অপরের সাহায্যকারী ও বন্ধু হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন।
نَهَاهُمْ عَنْ مُّوَالَاةِ اَعْدَآئِهِ اَعْدَآءِ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ. وَاَوْعَدَهُمْ بِمَسِّ النَّارِ
তিনি তাদেরকে তাঁর শত্রু তথা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন এবং জালেমদের দিকে ঝুঁকে পড়লে
وَالْخُذْلَانِ عَلَى الرُّكُوْنِ اِلَى الظَّالِمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى شَمْسِ
জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এবং লাঞ্ছনা হবে বলে তাদেরকে ধমক প্রদান করেছেন। দুরূদ ও সালাম হোক সেই নবীর প্রতি, যিনি ঈমান ও হেদায়াতের সূর্যমণী,
الْهِدَايَةِ وَالْيَقِيْنِ. اَلْمُمَيِّزِ بَيْنَ الطَّيِّبِ وَالْخَبِيْثِ الْمَهِيْنِ. اَلْمَامُوْرِ بِالْغِلْظَةِ
যিনি পবিত্র ও অপবিত্র লাঞ্ছিতদের মধ্যে প্রভেদকারী, যিনি আদিষ্ট হয়েছেন কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার
وَالْجِهَادِ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاِعْدَادِ الْمُسْتَطَاعِ مِنَ الْقُوَّةِ الْمُرْهِبَةِ
ও যুদ্ধ পরিচালনা করার এবং সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর দুশমন লাঞ্ছিতদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টিকারী অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করার।
قُلُوْبَ اَعْدَآءِ اللّٰهِ الْمَخْذُوْلِيْنَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً
তিনি সাইয়্যেদিনা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যাকে প্রেরণ করা হয়েছে জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ ও

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

الدَّاعِيْنَ. وَاسْتَغْفِرُوْهُ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ.
দুআকারীদের দুআ কবূল করে থাকেন। আর আল্লাহর কাছে এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন, তিনি আপনাদেরকে ধনবল ও জনবল দ্বারা সাহায্য করবেন।
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ،
আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাই। (কুরআনে আছে–) তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমার কাছে দুআ কর আমি তোমাদের দুআ কবূল করব।
اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ. بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا
(আল্লাহ আরও বলেছেন,) নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত হতে গর্বভরে বিরত থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে ঢুকবে।
وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ.
আল্লাহ পাক মহা গ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে ও আপনাদেরকে বরকত দান করুন এবং তার আয়াতসমূহ ও হেকমতপূর্ণ বাণীসমূহ দ্বারা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে উপকৃত করুন।
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ
আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার জন্য, আপনাদের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য। আপনারাও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অবশ্যই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।
الرَّحِيْمُ.

খুতবাটি الخطب اللكنوية. محمد عبد الحى لكهنوى থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لِّلْعَالَمِيْنَ وَمُنْقِذًا لِّلْخَلَآئِقِ مِنْ غَضَبِ اللهِ ذِى الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ. وَعَلٰى اٰلِهٖ

মাখলুকাতকে মহা পরাক্রমশালী মহা শক্তিমান আল্লাহর আযাব-গযব থেকে উদ্ধারকর্তা রূপে। (দুরূদ সালাম) আরও হোক তাঁর পরিবার-পরিজন

وَصَحْبِهِ الْاَشِدَّآءِ عَلَى الْكُفَّارِ الرُّحَمَآءِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَعَلٰى اَتْبَاعِهٖ

ও তাঁর সাহাবীদের উপর, যারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং মু'মিনদের মাঝে পরস্পরে নম্রতা অবলম্বনকারী। (দুরূদ সালাম) আরও হোক

وَتَابِعِيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلْحُمَاةِ بَيْضَةَ الْاِسْلَامِ وَالدِّيْنِ الْمُبِيْنِ.

তাবিয়ী, তাবে তাবিয়ী ও কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীবৃন্দের উপর যারা ইসলামের বর্ম ও দ্বীনে মুবীনের হেফাজতকারী।

اَمَّا بَعْدُ: فَيَاَيُّهَا النَّاسُ! اِلَامَ هٰذَا التَّنَاعُسُ الْفَظِيْعُ وَلَمْ يَزَلِ الْقُرْاٰنُ

অতঃপর কথা হল– হে লোকসকল! আর কতকাল এই জঘন্ন তন্দ্রাভাব চলবে, অথচ মহাগ্রন্থ কুরআন তোমাদেরকে সতর্ক করে চলেছে?

الْعَظِيْمُ يُنَبِّهُكُمْ؟ وَاِلَامَ هٰذَا التَّنَاوُمُ الشَّنِيْعُ وَلَمْ يَبْرَحِ الدَّهْرُ الْيَقْظَانُ

আর কতকাল এই কদর্য নিদ্রাভাব চলবে, অথচ জাগ্রত যুগ তোমাদেরকে জাগিয়ে দিচ্ছে?

يُوْقِظُكُمْ؟ اَمَا بَانَ لَكُمْ اَنَّ الْاُمَمَ قَدْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمْ تَدَاعِيَ الْاٰكِلَةِ عَلَى

তোমাদের সামনে কি পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি যে, অন্যান্য জাতি তোমাদের পার্শ্বে সমবেত হয়েছে যেমন খাদ্য ভোজীরা খাবারপূর্ণ থালার পার্শ্বে সমবেত হয়।

الْقَصْعَةِ وَاجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ تَبْلَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَبِلَادَهُمْ فَتَمْضَغُهَا مُضْغَةً

তারা সকলে মুসলমান ও মুসলমানদের দেশগুলিকে চিবিয়ে চিবিয়ে গ্রাস করার জন্য সমবেত ও একতাবদ্ধ হয়েছে।

حَتَّامَ تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ، وَحَتَّامَ تَتَوَلَّوْنَ الْاَعْدَآءَ وَاللهُ

আর কতদিন তোমরা মানুষকে ভয় করতে থাকবে, অথচ আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে? আর কতদিন তোমরা দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব রেখে চলবে,

وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ تَوَلَّوْهُ، اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْاَمَدُ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ فَقَسَتْ

অথচ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই এর বেশী হকদার যে, তাঁর সাথে তোমরা বন্ধুত্ব রাখবে? তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মত তোমাদের কাছেও শেষদিন তথা কেয়ামত দূর বলে মনে হচ্ছে আর এজন্যই কি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

قُلُوْبُكُمْ اَمْ زَالَ عَنْكُمُ الْخُشُوْعُ لِذِكْرِ اللهِ فَتَحَجَّرَتْ اَفْكَارُكُمْ وَعُقُوْلُكُمْ؟

তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে? না কি আল্লাহকে স্মরণ করার মত তোমাদের দিলের নম্রতা অপসারিত হয়ে গেছে? এ জন্যই কি তোমাদের চিন্তা ও তোমাদের বোধশক্তি পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে?

اَلَا تَرَوْنَ اَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ عَنْ مَخَافَةِ اللهِ، وَاَنَّ مِنْهَا

তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহর ভয়ে কতক পাথর ফেটে তা থেকে নহরসমূহ ফুটে বের হয়? কতক পাথর ফেটে তা থেকে পানি বের হয়,

لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ اَوْ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ! اَفَحَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا

আর কতক পাথর আল্লাহর ভয়ে স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ে! তোমরা কি মনে করেছ যে, মুখে "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তোমাদেরে ছেড়ে দেয়া হবে

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَاَنْتُمْ لَا تُفْتَنُوْنَ. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا

আর তোমাদের (সত্যতার) পরীক্ষা নেয়া হবে না? অথবা তোমরা কি মনে করেছে যে, তোমরা এমনিই জান্নাতে চলে যাবে অথচ

يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَتُبْتَلُوْا بِمِثْلِ مَاكَانُوْا يُبْتَلُوْنَ. فَوَاللهِ

এখনও তোমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের মত কঠিন অবস্থা আসেনি এবং তারা যেমন পরীক্ষার সন্মুখীন হয়েছিল তোমরা তেমন পরীক্ষার সন্মুখীন হওনি। আল্লাহর কছম!

لَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ، وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ

অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিবেন কারা তাদের ঈমানের দাবিতে সত্য এবং জেনে নিবেন কারা মিথ্যা। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে তাদেরকেও জেনে নিবেন

جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الصّٰبِرِيْنَ. فَقَدْ وَرَدَ فِى الْخَبَرِ، عَنِ النَّبِيِّ الصَّادِقِ

এবং কারা ধৈর্যশীল তাদেরকেও জেনে নিবেন। মহাসত্যবাদী, সবচেয়ে বড় নেককার, কবরে বসবাসকারী মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

اَلْاَبَرِّ صَاحِبِ الْقَبْرِ الْاَعْظَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ : سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ

থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমার পরে এমন সব শাসকদের আবির্ভাব হবে যে, যে ব্যক্তি তাদের কাছে

اُمَرَآءُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

গমন পূর্বক তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করবে এবং অত্যাচারমূলক কাজে তাদের সহযোগিতা করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ
এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই। এমন ব্যক্তি হাউযে কাউছারে আমার কাছে যেতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের নিকট গমন করবে না,
يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ
তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করবে না এবং তাদের অত্যাচারমূলক কর্মকান্ডে তাদের সহযোগিতা করবে না, সে আমার দলভুক্ত এবং আমিও তার দলভুক্ত।
الْحَوْضَ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَاتَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا
এরূপ ব্যক্তি হাউযে কাউছারে আমার কাছে যেতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, তোমরা পরস্পরে হিংসাহিংসী কর না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রেখ না,
وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كِتَابِهِ الْعَظِيْمِ بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِاَنَّ
একে অপরের পিছে লেগ না। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাগ্রন্থ কুরআনে ইরশাদ করেছেন,
لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا، اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَيَبْتَغُوْنَ
(হে নবী!) তুমি ঐ সব মুনাফেকদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সু-সংবাদ শুনিয়ে দাও, যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে।
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا.
তারা কি ঐসব কাফেরদের নিকট সম্মান তালাশ করে? বস্তুত সমস্ত সম্মান আল্লাহরই অধিকারে।
بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ
আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য মহাগ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে বরকত দান করেন আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে যেন
الْحَكِيْمِ.
কুরআনের আয়াত ও হেকমতপূর্ণ বাণীসমূহের দ্বারা উপকৃত করেন।
(খুতবাটি خطبات ما ثوره, اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হযতর মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) রচিত জুমুআর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيْمِ الْخَبِيْرِ. اَلْمُتْقِنِ نِظَامَ الْعَالَمِ بِلَا مُعِيْنٍ وَنَصِيْرٍ، فَسُبْحَانَ
সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ও খবর রাখেন। যিনি কারও সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকেই গোটা জগতের শৃঙ্খলা সুদৃঢ়ভাবে কায়েম রাখেন। অতঃপর সেই
اللّٰهِ الَّذِيْ حِكْمَتُهُ بَالِغَةٌ وَعِلْمُهُ غَزِيْرٌ، وَنِعَمُهُ وَاصِلَةٌ اِلٰى كُلِّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ.
খোদার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি চূড়ান্ত হেকমতের অধিকারী, যার জ্ঞান অত্যন্ত গভীর এবং যার নেয়ামত ছোট-বড় সকলের নিকট পৌঁছে থাকে।
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ فِيْ نَقِيْرٍ وَّلَا قِطْمِيْرٍ. وَنَشْهَدُ اَنَّ
আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, ক্ষুদ্রস্ব ক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁর কোন শরীক নেই।
سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ هَدَانَا بِكِتَابٍ مُّبِيْنٍ، وَدَعَانَآ اِلٰى
আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের মহামান্য নেতা ও সরদার মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল, যিনি আলোকিত কিতাবের মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়াত প্রদান করেছেন এবং
اللّٰهِ بِالْاِنْذَارِ وَالتَّبْشِيْرِ. صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَا دَامَتِ
জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের সুসংবাদের মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন
الْكَوَاكِبُ تَسِيْرُ.
যতদিন (আকাশে) তারকারাজি চলতে থাকবে অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত।
اَمَّا بَعْدُ: فَاِنَّ تَرْجَمَةَ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ فِيْ كَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ الَّتِيْ هِيَ
অতঃপর কথা হল- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস-এর ভাষ্য দুটো কালেমায়ে শাহাদাতের মধ্যে ব্যাক্ত হয়েছে,
اِحْدٰى مَعَانِى الْاِسْلَامِ. فَمَعْنَى الْكَلِمَةِ الْاُوْلٰى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى هُوَ الْمُبْدِعُ لِلْعَالَمِ
যে দুটো ইসলামী ভাবধারাসমূহের অন্যতম। সে দুটো কালেমার প্রথমটার অর্থ হল- আল্লাহ তা'আলাই কোন নমুনা ছাড়া বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা।
اَلْوَاحِدُ الْقَدِيْمُ، اَلْحَيُّ الْقَادِرُ الْعَلِيْمُ، اَلسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ، اَلشَّاكِرُ الْمُرِيْدُ
তিনি একক, অদ্বিতীয় ও অনাদি। তিনি চিরঞ্জীব, শক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি কৃতজ্ঞতার প্রতিফল দানকারী, ইচ্ছার মালিক

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

الْكَاتِبُ لِلْمَقَادِيْرِ، لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ شَيْءٌ. وَهُوَ

ও সবকিছুর তাকদীর নির্ধারণকারী। কোন কিছু তাঁর সমতুল্য নয়। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান ও শক্তির বাইরে যেতে পারে না।

الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ، وَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى، وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى

তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদানকারী ও মৃত্যুদাতা। উৎকৃষ্ট নামসমূহ একমাত্র তাঁরই। উন্নত স্বরূপের একমাত্র অধিকারী তিনিই।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. وَمَعْنَى الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، وَاَنَّهٗ

তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। আর দ্বিতীয় কালেমার অর্থ হল– মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।

صَادِقٌ فِيْ جَمِيْعِ مَا جَآءَ بِهٖ مِنَ الْاَخْبَارِ وَالْاَحْكَامِ. وَاَنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى.

তিনি যেসব খবর ও বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন, সবটাতেই তিনি সত্য। আর কুরআন হল আল্লাহর কালাম বা বাণী।

وَكُلٌّ مِّنَ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْمَلٰئِكَةِ حَقٌّ، وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَكَرَامَاتُ الْاَوْلِيَآءِ

যাবতীয় আসমানী কিতাব, প্রেরিত রসূলগণ ও ফেরেশতা সত্য। মে'রাজ সত্য। ওলী-আল্লাহাগণের কারামত তথা তাঁদের থেকে প্রকাশিত অলৌকিত বিষয়াদি সত্য।

حَقٌّ، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ، وَاَفْضَلُهُمُ الْاَرْبَعَةُ الْخُلَفَآءُ عَلٰى تَرْتِيْبِ

সাহাবাগণের সকলেই ন্যায়পরায়ণ। সকল সাহাবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চার খলীফা, যেভাবে তাঁরা পর্যায়ক্রমে খলীফা হয়েছেন সেই পর্যায়ক্রম অনুসারে।

الْخِلَافَةِ. وَسُؤَالُ الْقَبْرِ حَقٌّ، وَالْبَعْثُ حَقٌّ، وَالْوَزْنُ حَقٌّ، وَالْكِتَابُ حَقٌّ،

কবরে (মুনকার-নাকীরের) সওয়াল (জওয়াব) সত্য। পুনরুত্থান সত্য। (নেকী-বদীর) ওজন সত্য। আমলনামা সত্য।

وَالْحِسَابُ حَقٌّ، وَالْحَوْضُ حَقٌّ، وَالصِّرَاطُ حَقٌّ، وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ، وَرُؤْيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى

(নেকী-বদীর) হিসাব-নিকাশ সত্য। হাউযে কাউছার সত্য। পুলসিরাত সত্য। শাফাআত সত্য। আল্লাহ তা'আলার দীদার সত্য।

حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَهُمَا بَاقِيَتَانِ لَاتَفْنَيَانِ. وَلَا يَفْنٰى اَهْلُهُمَا.

জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। জান্নাত জাহান্নাম সর্বদা বিদ্যমান থাকবে, কখনও বিলীন হবে না। এতদুভয়ের অধিবাসীরাও কখনও ধ্বংস হবে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। (আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,) হে মু'মিনগণ তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং

رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ

ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর নাযেল করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযেল করেছেন।

يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا.

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করল, সে সুদূর গোমরাহীতে পতিত হল।

(খুতবাটি خطبة الاحكام، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী (রহ.) রচিত জুমুআর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ شَرَّفَ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهٖ بَنِيْ اٰدَمَ، وَزَيَّنَهُمْ بِحُلِيِّ

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি বনী আদমকে তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে মর্যাদাবান বানিয়েছেন, তাদেরকে মাহাত্মের ভূষণে সজ্জিত করেছেন,

الْكَمَالِ، وَبَعَثَ مِنْهُمْ رُسُلًا وَّاَنْبِيَآءَ وَاجْتَبٰى مِنْهُمُ الْاَوْلِيَآءَ وَالْاَصْفِيَآءَ

তাদের মধ্য থেকে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাদের মধ্য থেকে ওলী-আউলিয়া ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে মনোনীত করেছেন।

وَخَصَّهُمْ بِمَزِيْدِ الْاَفْضَالِ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِيْرًا، وَاَشْكُرُهٗ شُكْرًا كَبِيْرًا فِيْ

আর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের অনন্যতায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন। দিবারাত্রির সারাক্ষণ আমি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করি এবং তাঁর মহা শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

لَمْحَاتِ الْاَيَّامِ وَاللَّيَالِ، وَاَشْهَدُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَلَا نِدَّ

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। যিনি হলেন মাহাত্ম ও প্রতাপের অধিকারী।

لَهٗ، وَهُوَ ذُو الْكَرَمِ وَالْجَلَالِ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَاحِبُ

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। যিনি হলেন সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী।

الْعِزِّ وَالْاِقْبَالِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ خَيْرِ صَحْبٍ وَّخَيْرِ اٰلٍ.

আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের প্রতি রহমত বর্ষিত করেন, যারা ছিলেন উত্তম সাহাবী ও উত্তম পরিবার।

اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا النَّاسُ! اِتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا اجْتَرَحْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْمَاضِيَةِ،

অতঃপর কথা হল– হে লোকসকল! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। আর অতীতে যেসব পাপ হয়ে গেছে তা বর্জন করুন এবং

وَحَاسِبُوْا نُفُوْسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا فِي الْاَيَّامِ الْبَاقِيَةِ، لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْحَمُكُمْ

ভবিষ্যতে আপনাদের যে হিসাব নেয়া হবে তার পূর্বে নিজেরাই নিজেদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করুন। এভাবে আশা করা যায় আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহমত করবেন

وَيُنْجِيْكُمْ مِنْ اَصْحَابِ الشِّمَالِ، فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلَآ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ

এবং জাহান্নামীদের থেকে আপনাদেরকে রক্ষা করবেন। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক রূপ দেখেন না, তোমাদের ধন-সম্পদও দেখেন না,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

وَاِنَّمَا الْعِبْرَةُ عِنْدَهٗ لِحُسْنِ الْاَعْمَالِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْاِحْتِيَاطِ فِيْ كَسْبِ الْاَمْوَالِ،

তাঁর নিকট একমাত্র লক্ষ্যণীয় বিষয় হল আমলের সৌন্দর্য। আপনারা সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

فَلَا يَزُوْلُ قَدَمُ عَبْدٍ حَتّٰى يُسْاَلَ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَآ اَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ

কেয়ামতের দিন কোন মানুষের এক কদম পা আগে বাড়ানোর ক্ষমতা হবে না যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার জীবন সম্বন্ধে কিসের মধ্যে সে তার জীবনকে শেষ করেছে, জিজ্ঞাসা করা

اكْتَسَبَهٗ، وَفِيْ مَآ اَنْفَقَهٗ فِى الْحَرَامِ اَوِ الْحَلَالِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا وَّجَمَلًا، وَلَمْ

হবে তার সম্পদ সম্বন্ধে কোত্থেকে সে তার সম্পদ উপার্জন করেছিল এবং কোথায় তা ব্যয় করেছিল– হালাল ক্ষেত্রে না হারাম ক্ষেত্রে। যে ব্যক্তি সম্পদ ও সৌন্দর্য সঞ্চয় করল

يُمَيِّزْ بَيْنَ مَا كَانَ حَرَامًا وَبَيْنَ مَا كَانَ حَلَالًا، لَمْ يَنْفَعْهُ جَمَالٌ وَلَا مَالٌ، وَقَدْ

আর হালাম হারামের মধ্যে তফাৎ করল না, তার সৌন্দর্য ও সম্পদ তার কোন উপকারে আসবে না। মানবকূলের সরদার

وَرَدَ فِى الْخَبَرِ عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ، اِنَّ مَنْ اَكَلَ لُقْمَةً مِّنْ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهٗ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে– যে কেউ এক লোকমা হারাম খাদ্য গ্রহণ করবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন

صَلَاةٌ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَ وَقَعَ فِى النَّكَالِ، وَعَلَيْكُمْ بِتَصْفِيَةِ الْبَالِ مِنَ الْحَسَدِ

নামায কবূল হবে না, সে শাস্তিতে পতিত হবে। আপনারা অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভসহ যাবতীয় বিধ্বংসী চরিত্র থেকে পবিত্র করুন।

وَالْحِقْدِ وَالْبُغْضِ والْحِرْصِ وَسَائِرِ الْمُهْلِكَاتِ الْمُوْرِثَةِ اِلَى الضَّلَالِ، فَقَدْ

এসব চরিত্র মানুষকে বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, (জেনে রাখ) অবশ্যই মানুষের দেহে একটা

وَرَدَ: اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ

মাংসপিন্ড আছে যদি সেটা ঠিক থাকে, তাহলে গোটা দেহ ঠিক থাকে, আর যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় এবং তার গোটা কর্ম খারাপ হয়ে পড়ে।

فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ، وَخَبُثَتْ مِنْهُ الْاَفْعَالُ. وَعَلَيْكُمْ بِحِفْظِ اللِّسَانِ مِنَ الْغِيْبَةِ

(তদ্রূপ মন ঠিক না থাকলে গোটা চরিত্র ও কর্ম নষ্ট হয়ে যায়।) আপনারা জবানকে রক্ষা করুন গীবত থেকে, চোগলখোরী থেকে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَالنَّمِيْمَةِ وَالسَّبِّ وَالْفُحْشِ وَالْخُصُوْمَةِ وَالْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ، وَسَائِرِ الْمُوْبِقَاتِ

গালী-গালাজ থেকে, অশ্লীল কথা-বার্তা থেকে, ঝগড়া-বিবাদ থেকে এবং যাবতীয় বিধ্বংসী মৌখিক বুলিবচন থেকে, যা জাহান্নামের শৃঙ্খল

الْمُهْلِكَةِ الْمُوْرِثَةِ اِلَى السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ، فَمَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا

ও বেড়ীর দিকে উপনীত করে। (হাদীছে এসেছে–) যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ তথা জবানকে এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ তথা

بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَنَجَا مِنَ النَّكَالِ. وَاِيَّاكُمْ ثُمَّ اِيَّاكُمْ مِنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ

যৌনাঙ্গকে হেফাজত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। আপনারা নিজেদেরকে বিরত রাখুন, আবারও বলছি, বিরত রাখুন বেশী বেশী হাত পাতা থেকে,

وَاِضَاعَةِ الْاَمْوَالِ، وَالْاِشْتِغَالِ بِمَا قِيْلَ وَمَا يُقَالُ، فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا فِيْ

সম্পদ নষ্ট করা তথা সম্পদকে অন্যায় স্থানে ব্যয় করা থেকে এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তার পেছনে পড়া থেকে। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসব ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

صِحَاحِ الْاَقْوَالِ. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالْاِنَابَةِ اِلَى خَالِقِ الْبَرِيَّةِ فِى الْبُكُوْرِ وَالْاٰصَالِ،

আপনারা সকাল-সন্ধায় সর্বদা সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা–এস্তেগফার করতে থাকুন, তাঁর দিকে ধাবিত হতে থাকুন।

فَطُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا وَّخُفِّفَتْ عَنْهُ الْاَثْقَالُ، وَدَاوِمُوْا

বস্তুত সেই ব্যক্তির জন্য রয়েছে সৌভাগ্য, যে তার আমলনামায় বেশী বেশী তওবা-এস্তেগফার পাবে এবং তার বোঝা লঘু করা হবে।

عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ فِيْ كُلِّ صَبَاحٍ وَّمَسَاءٍ وَعَلٰى كُلِّ اَحْوَالٍ، فَاِنَّ ذِكْرَهُ دَوَآءٌ مِنْ كُلِّ

আপনারা সদা সর্বদা সকাল-সন্ধায় আল্লাহর যিকির করতে থাকুন। কেননা, আল্লাহর যিকির হচ্ছে সকল রোগের ঔষধ,

دَاءٍ وَّشِفَاءٌ مِّنْ جَمِيْعِ الْاَمْرَاضِ وَالْاَغْلَالِ، وَهُوَ حِصْنٌ حَصِيْنٌ مِّنَ الشَّيَاطِيْنِ،

সকল ব্যধির চিকিৎসা। আল্লাহর যিকির হচ্ছে শয়তান থেকে রক্ষার এক মজবূত দুর্গ। (হাদীছে এসেছে–) শয়তান পুরুষ ও নারীদের

فَاِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خُرْطُوْمِهٖ عَلٰى قُلُوْبِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، فَاِذَا

অন্তরে তার শূড় স্থাপন করে রাখে। অতঃপর যখন সেই পুরুষ বা নারী গাফেল থাকে, তখন শয়তান ওয়াছওয়াছা দিতে থাকে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

غَفِلُوْا وَسْوَسَ وَاِذَا ذَكَرُوا اللّٰهَ خَنَسَ وَرَجَعَ بِشَرٍّ مَآلٍ، وَاَكْثِرُوا الدُّعَآءَ اِلٰى

আর যখন তারা যিকির করে তথা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন সে পিছে হটে যায় এবং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। আপনারা বেশী বেশী আল্লাহর কাছে দুআ করুন।

قَاضِي الْحَاجَاتِ الْمُنْجِيْ مِنَ الدَّآءِ الْعُضَالِ، فَاِنَّ الدُّعَآءَ مُخُّ الْعِبَادَاتِ وَرَأْسُ

তিনি সমস্ত প্রয়োজন পুরণকারী, তিনি দূরারোগ্য ব্যধি থেকে মুক্তিদানকারী। দুআ হল সমস্ত ইবাদতের মগজ এবং সমস্ত আনুগত্যের মূল।

الطَّاعَاتِ وَهُوَ الْمُنْجِيْ مِنْ هَلَكَاتِ الضَّلَالِ، وَقُوْلُوْا مِنْ صَمِيْمِ الْبَالِ، اَللّٰهُمَّ

দুআ গোমরাহীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষাকারী। আপনার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলুন, ইয়া হান্নানু (হে অনুগ্রহশীল), ইয়া রহমানু (হে পরম দয়ালু),

يَاحَنَّانُ يَا رَحْمٰنُ يَا كَبِيْرُ يَا مُتَعَالُ! اِغْفِرْ ذُنُوْبَنَا، وَاسْتُرْ عُيُوْبَنَا، وَوَفِّقْنَا

ইয়া কাবীরু (হে মহান), ইয়া মুতাআলি (হে সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী)! আমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের দোষগুলি ঢেকে দিন

لِتَزْكِيَةِ الْقُلُوْبِ وَصِدْقِ الْمَقَالِ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ

এবং আমাদের অন্তরকে পবিত্র করার ও কথাকে সত্য করার তাওফীক দান করুন। সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ:

আর দুরূদ ও সালাম হোক তাঁর রসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজনের প্রতি। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। (আল্লাহ তা'আলা

اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ. هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلَالٍ.

কেয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন,) আজ জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। তারা এবং তাদের সঙ্গিনীগণ থাকবে সুশীতল ছায়ায়।

(খুতবাটি الخطب الكنوية. محمد عبد الحى لكهنوى থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَعَلٰى سَيِّدَىْ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْاِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ اَبِىْ مُحَمَّدِ نِ الْحَسَنِ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا، وَعَلٰى اُمِّهِمَا سَيِّدَةِ النِّسَآءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَآءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا، وَعَلٰى عَمَّيْهِ الْمُكَرَّمَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ اَبِىْ عُمَارَةَ الْحَمْزَةِ وَاَبِى الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ. اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ، اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ وَانْصَارَهٗ، وَاَذِلَّ الشِّرْكَ وَاَشْرَارَهٗ، اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى، وَاجْعَلْ اٰخِرَتَنَا خَيْرًا مِّنَ الْاُوْلٰى، اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

عِبَادَ اللّٰهِ! رَحِمَكُمُ اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. اُذْكُرُوا اللّٰهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ، وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَاَعْظَمُ وَاَكْبَرُ.

খুতবাটি خطبات ماثورہ، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.)–এর জুমুআর ছানী খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ، وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

فَاِنِّىْٓ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ، اَلَا خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ، وَاَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ، وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ. مَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ غَوٰى. رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ، وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. اَللّٰهُمَّ اَمْطِرْ شَآبِيْبَ رِضْوَانِكَ عَلَى السَّابِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ. خُصُوْصًا عَلَى الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِى الْغَارِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ، وَعُثْمَانَ ذِى النُّوْرَيْنِ كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْوَقَارِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ، وَ عَلِيِّ نِ الْمُرْتَضٰى اَسَدِ اللّٰهِ الْجَبَّارِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ،

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর জুমুআর ছানী খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهُ وَاَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ اَبُوْ بَكْرٍ، وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ، وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَاَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَحَمْزَةُ اَسَدُ اللّٰهِ وَاَسَدُ رَسُوْلِهٖ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَ وَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً لَّا تُغَادِرُ ذَنْبًا. اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ، لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ، فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ، وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ، وَخَيْرُ اُمَّتِيْ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللّٰهُ.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

খুতবাটি الخطب اللكنوية . عبد الحى لكنوى থেকে গৃহীত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

শাইখুল ইসলাম সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর জুমুআর ছানী খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

اَمَّا بَعْدُ :

فَيَاَيُّهَا النَّاسُ! اِتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِى السِّرِّ وَالْعَلَنِ، وَذَرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَحَافِظُوْا عَلَى الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَةِ، وَ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ . وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِاَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهٖ، ثُمَّ ثَنّٰى بِمَلٰٓئِكَةِ قُدْسِهٖ، ثُمَّ ثَلَّثَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ بَرِيَّةِ جِنِّهٖ وَاِنْسِهٖ، فَقَالَ وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا كَرِيْمًا، تَبْجِيْلًا لَّقَدْرِ حَبِيْبِهٖ وَتَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ فِىْ قَبْرِهٖ حَيٌّ : اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَكَفٰى بِهٖ ابْتِهَاجًا وَفَخْرًا : مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. اَللّٰهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى اَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَيْكَ، وَاَكْرَمِهِمْ لَدَيْكَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَتَابِعِيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى يَا كَرِيْمُ، وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ صِدِّيْقِ نَبِيِّكَ وَصَدِيْقِهٖ، وَاَنِيْسِهٖ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقِهٖ، مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهٖ سَيِّدُ مَنْ جَاءَ مِنْكَ بِالنَّهْيِ وَالْاَمْرِ : وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّيْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

بَكْرٍ، رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ، اَلْفَارِقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ الْاَوَّاهِ الْاَوَّابِ، مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهٖ سَيِّدُ الْجِنِّ وَالْبَشَرِ: لَوْكَانَ بَعْدِىْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ، رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ كَامِلِ الْحَيَآءِ وَالْاِيْمَانِ، مُحْيِى اللَّيَالِىْ قِيَامًا وَّدِرَاسَةً وَّجَمْعًا لِّلْقُرْاٰنِ، مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهٖ اَكْمَلُ الْخَلَائِقِ وَسَيِّدُ وُلْدِ عَدْنَانَ : لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ رَفِيْقِىْ فِيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ مَرْكَزِ الْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ، وَبَابِ مَدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَالْبَهَآءِ، لَيْثِ بَنِىْ غَالِبٍ، اِمَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهِ النَّبِيُّ الْاَوَّاهُ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَّوْلَاهُ، رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ السَّيِّدَيْنِ الشَّهِيْدَيْنِ، اَلْقَمَرَيْنِ الْمُنِيْرَيْنِ، رَيْحَانَتَىْ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ، مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهِمَا مُنِيْرُ فِضَآءِ الدَّارَيْنِ : سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ اُمِّهِمَا الْبُتُوْلِ الزَّهْرَآءِ، بِضْعَةِ جَسَدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْعَزِيْزَةِ الْغَرَّآءِ، مَنْ قَالَ فِىْ حَقِّهَا مُنْقِذُ الْخَلَائِقِ عَنِ النَّارِ الْحَاطِمَةِ : سَيِّدَةُ نِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ، رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ عَمَّىْ نَبِيِّكَ الْمَخْصُوْصَيْنِ بِالْكَمَالَاتِ بَيْنَ النَّاسِ، اَبِىْ عُمَارَةَ الْحَمْزَةِ وَاَبِى الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ، رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ بِالْجَنَّةِ الْكِرَامِ، وَعَنْ سَآئِرِ الْبَدْرِيِّيْنَ وَاَصْحَابِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ اللُّيُوْثِ الْعِظَامِ، وَعَنْ سَائِرِ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَاَتْبَاعِهِمْ وَتَابِعِيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর জুমুআর ছানী খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجَا، قَیِّمًا لِّیُنْذِرَ بَاْسًا شَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا، مَاكِثِیْنَ فِیْهِ اَبَدًا، وَیُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا، مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّ لَا لِاٰبَآئِهِمْ، كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ یَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ، یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا.

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَالَّذِیْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَی الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا، سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ، ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ، كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰی عَلٰی سُوْقِهٖ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِیْمًا. وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ اَبَدًا. اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیْرًا. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ وَلَا

لِاَحَدٍ مِنْهُمْ فِیْ غُنُقِنَا ظَلَامَةً، وَنَجِّنَا بِحُبِّهِمْ عَنْ اَهْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَاجْعَلْهُمْ شُفَعَآءَ لَنَا وَمُشَفَّعِیْنَ بَیْنَ یَدَیْكَ یَوْمَ الْمَحْشَرِ . اَللّٰهُمَّ یَا مَنْ اَمْرُهٗ بَیْنَ الْكَافِ وَالنُّوْنِ، وَمَنْ اِذَآ اَرَادَ شَیْئًا قَالَ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ! نَتَوَسَّلُ اِلَیْكَ بِجَاهِ نَبِیِّكَ الْاَمِیْنِ الْمَاْمُوْنِ، اَنْ تَنْصُرَ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِیْنَ، وَتُنْجِزَ الْوَعْدَ وَكَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُالْمُؤْمِنِیْنَ، وَوَفِّقْ وُلَاةَ الْاِسْلَامِ وَسَلَاطِیْنَهُمْ لِمَا تُحِبُّهٗ وَتَرْضَاهُ، وَاَعْصِمْهُمْ عَنِ الضَّلَالِ وَالْغَیِّ وَالْمَیْلِ اِلَی الشَّیْطٰنِ وَمَا یَهْوَاهُ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَالدِّیْنَ الْقَوِیْمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِیْنَ وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ. وَاغْفِرِ اللّٰهُمَّ جَمِیْعَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اَلْاَحْیَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ، اِنَّكَ سَمِیْعٌ قَرِیْبٌ مُّجِیْبُ الدَّعْوَاتِ، یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ. رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ.

عِبَادَ اللّٰهِ! رَحِمَكُمُ اللّٰهُ. اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَاءِ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ، اُذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰی یَذْكُرْكُمْ، وَادْعُوْهُ یَسْتَجِبْ لَكُمْ. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰی اَعْلٰی وَاَوْلٰی وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَهَمُّ وَاَكْبَرُ.

খুতবাটি খুতবাত-ই-মাছুরা, আশরাফ আলী থানবী থেকে গৃহীত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঈদুল ফিতরের প্রথম খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهٗ وَاَسْتَغْفِرُهٗ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ، وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ :كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَغْدُوْا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَاْكُلُهُنَّ وِتْرًا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّص قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى، فَاَوَّلُ شَيْءٍ يَّبْدَأُ بِهِ الصَّلٰوةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُ بِشَيْءٍ اُمِرَ بِهٖ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَرض قَالَ :كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ، فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

খুতবাটি خطبات ماثوره، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَّيَرْجِعُ مَاشِيًا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ اِلَى الْعِيْدِ رَجَعَ فِىْ غَيْرِهٖ. وَعَنْهُ اَنَّهٗ اَصَابَهُمْ مَّطَرٌ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ عَطَآءٍ مُرْسَلًا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلٰى عَنَزَتِهٖ اِعْتِمَادًا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنِ الْبَرَآءِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُزُوْلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ اَبِى الْحُوَيْرِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلٰى عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ عَجِّلِ الْاَضْحٰى وَاَخِّرِ الْفِطْرَ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض اَشَهِدْتَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ؟ قَالَ نَعَمْ، خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلَآ اِقَامَةً ثُمَّ اَتَى النِّسَآءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ

وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ : شَهِدْتُّ الصَّلٰوةَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ، فَبَدَاَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَامَ مُتَّكِئًا عَلٰى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَ وَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلٰى طَاعَتِهٖ، وَمَضٰى اِلَى النِّسَآءِ وَمَعَهٗ بِلَالٌ فَاَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَ وَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَآءِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَآءِ! تَصَدَّقْنَ، فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، مَا رَاَيْتُ مِنْ نَّاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدٰكُنَّ. قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ بَلٰى. قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُّقْصَانِ عَقْلِهَا، قَالَ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلٰى. قَالَ فَذَالِكَ مِنْ نُّقْصَانِ دِيْنِهَا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঈদুল আযহার প্রথম খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهٗ وَاَسْتَغْفِرُهٗ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ، وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

عَنْ بُرَيْدَةَ رضـ قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ، وَلَايَطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّيَ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِيْ اَيَّامِ مِنٰى تُدَفِّفَانِ وَفِيْ رَوَايَةٍ تَغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ فَانْتَهَرَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَّجْهِهٖ فَقَالَ : دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ، فَاِنَّهَا اَيَّامُ عِيْدٍ، وَفِيْ رَوَايَةٍ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

وَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رضـ قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ

ب/১ *

www.maktabatulabrar.com

بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِيْنَ اِلٰى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ اِلٰى بِلَالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ اِلٰى بَيْتِهٖ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ اَنْ لَّا اَذَانَ لِلصَّلٰوةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْاِمَامُ وَلَابَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا اِقَامَةَ وَلَااِذَآءَ وَلَاشَيْءَ لَا اِذَآءَ يَوْمَئِذٍ وَلَآ اِقَامَةَ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَاَمَرَ بِهَآ اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرًا لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ اَلَا اِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْكَبِيْرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ اَوْسِوَاهُ اَوْصَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

খুতবাটি خطبات ماثورہ، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।

ক/১ *

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى، فَاَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسَ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يُّقْطِعَ بَعْثًا قَطَّعَهُ اَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ اَمَرَ بِهِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَامَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلَآ اِقَامَةٍ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ :كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَآءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَّدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدٰكُنَّ. قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ بَلٰى. قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. قَالَ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلٰى. قَالَ فَذَالِكَ مِنْ نُقْصَانِ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

دِيْنِهَا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ اَنَسٍ رض قَالَ : قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنِ الْبَرَآءِ رض اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْوِلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ. وَعَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلٰى عَنَزَتِهِ اِعْتِمَادًا. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ وَعَنِ الْبَرَآءِ رض قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُّصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ نُّصَلِىَ فَاِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِىْ شَيْءٍ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَآ اُخْرٰى، وَمَنْ لَّمْ يَذْبَحْ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَّاُمَّتِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ : ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهٖ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ، قَالَ رَاَيْتُهٗ وَاضِعًا قَدَمَهٗ عَلٰى صَفَاحِهِمَا وَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. وَعَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُضَحِّيَ بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ. وَعَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ وَاَنْ لَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَّلَامُدَابَرَةٍ وَّلَاشَرْقَاءَ وَّلَاخَرْقَاءَ. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقٰى مِنَ الضَّحَايَا، فَاَشَارَ بِيَدِهٖ فَقَالَ : اَرْبَعًا اَلْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَآءُ الَّتِيْ لَا تُنْقِيْ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

খুতবাটি খুতবাত-ই-মাছুরা, আশরাফ আলী থানবী থেকে গৃহীত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

حَتّٰى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى. وَعَنْ اَبِى الْحُوَيْرِثِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلٰى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَّهُوَ بِنَجْرَانَ عَجِّلِ الْاَضْحٰى وَاَخِّرِ الْفِطْرَ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَذْبَحُوْٓا اِلَّا مُسِنَّةً اِلَّآ اَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جِذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ. وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَّالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَ اَرَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلَايَمَسُّ مِنْ شَعْرِهٖ وَبَشَرِهٖ شَيْئًا، وَفِيْ رِوَايَةٍ اِذَا رَاٰى هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ وَاَرَادَ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلَا يَاْخُذْ مِنْ شَعْرِهٖ وَلَا مِنْ اَظْفَارِهٖ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. وَعَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছানী খুতবা

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (৭ বার একাধারে)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ، اَلْمُتَعَالِيْ عَنِ التَّشْبِيْهِ وَالنَّظِيْرِ، لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقَدِيْرُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْبَشِيْرُ النَّذِيْرُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ صَلَاةً تَلِيْقُ بِجَنَابِهِ الْقَدِيْرِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُولِى الْمَنَاقِبِ وَالْفَضْلِ الْكَبِيْرِ.

وَبَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِى السِّرِّ وَالْعَلَنِ، وَحَافِظُوْا عَلٰى اَدَآءِ الْفَرَآئِضِ وَالسُّنَنِ. اَلَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ هٰذِهِ الْاَعْيَادَ اِقَامَةً لِّذِكْرِهٖ وَتِذْكَارًا لِّلْجِنَانِ، فَاَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَزَكُّوْآ اَنْفُسَكُمْ بِالتَّوْبَةِ وَطَهِّرُوْهَا، وَ اَيْقِظُوْهَا مِنْ سِنَةِ الْغَفْلَاتِ وَذَكِّرُوْهَا، فَاِنَّ لَكُمْ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفُوْهُ، وَمَوْقِفًا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا بُدَّ اَنْ تَقِفُوْهُ. وَاِيَّاكُمْ وَحُبَّ الدُّنْيَا، فَاِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ، وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّهَا ضَلَالَةٌ، وَعَلَيْكُمْ بِامْتِثَالِ السُّنَّةِ، فَاِنَّ فِى امْتِثَالِهَا فَلَاحَ الْاُمَّةِ، وَاِنَّ السُّنَّةَ تَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ، لَا تَتَّخِذُوْهُمْ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ، فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ، وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِيْ اَبُوْ بَكْرٍ، وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ، وَاَصْدَقُهُمْ حَيَآءً عُثْمَانُ، وَاَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ. رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْبَاقِيْنَ مِنَ الْعَشَرَةِ، وَعَنِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ عَمِّ نَبِيِّكَ حَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ، وَعَنْ زَوْجَاتِ نَبِيِّكَ الطَّاهِرَاتِ مِنَ الْاَرْجَاسِ.

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَانْصُرْ مَنْ نَّصَرَ الدِّيْنَ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَاخْتِمْ لَنَا بِخَاتِمَةِ السَّعَادَةِ اَجْمَعِيْنَ. اٰمِيْنَ !

عِبَادَ اللّٰهِ! اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (১৪ বার একাধারে)

খুতবাটি লেখক কর্তৃক রচিত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

وَالْعِبَادِ وَالْبَهَآئِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّاوَاءِ وَالْجُهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَانَشْكُوْهُ اِلَّا اِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ اَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَاَدِرَّلَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَآءِ، وَاَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ، اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرْىَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَآءِ مَا لَايَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَاَرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا، اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى اَرْضِنَا زِيْنَتَهَا وَسَكَنَهَا، اَللّٰهُمَّ ضَاحَتْ جِبَالُنَا وَاغْبَرَّتْ اَرْضُنَا وَهَامَتْ دَوَآبُّنَا، مُعْطِيَ الْخَيْرَاتِ مِنْ اَمَاكِنِهَا وَمُنْزِلَ الرَّحْمَةِ مِنْ مَّعَادِنِهَا وَمُجْرِىَ الْبَرَكَاتِ عَلٰى اَهْلِهَا بِالْغَيْثِ الْمُغِيْثِ، اَنْتَ الْمُسْتَغْفِرُ الْغَفَّارُ، فَنَسْتَغْفِرُكَ لِلْخَاصَّاتِ مِنْ ذُنُوْبِنَا، وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا، اَللّٰهُمَّ فَاَرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا، وَاَوْصِلْ بِالْغَيْثِ، وَاكْفِ مِنْ تَحْتِ عَرْشِكَ حَيْثُ يَنْفَعُنَا، وَيَعُوْدُ عَلَيْنَا غَيْثًا عَامًّا طَبَقًا غَبَقًا مُجَلِّلًا غَدَقًا حَصْبًا رَائِعًا مُمْرِعَ النَّبَاتِ.

از خطبات ماثورہ عن حصن حصین

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পঠিত এস্তেস্কার খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهُ وَاَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ، مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا.

اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تَدْعُوْهُ وَ وَعَدَكُمْ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ لَكُمْ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَآ اَنْزَلْتَهُ عَلَيْنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُرِيْعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَآرٍ، اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَرِيْئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَآرٍ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ، اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مُرِيْعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا عَامًّا طَبَقًا سَحًّا دَآئِمًا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّ بِالْبِلَادِ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পঠিত বিবাহের খুতবা (১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ، وَنَعُوْذُ بِهٖ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

খুতবাটি ابو داود ، ترمذى ونسائى থেকে গৃহীত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পঠিত বিবাহের খুতবা (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَحْمُوْدِ بِنِعْمَتِهٖ، اَلْمَعْبُوْدِ بِقُدْرَتِهٖ، اَلْمُطَاعِ بِسُلْطَانِهٖ، اَلْمَرْهُوْبِ مِنْ عَذَابِهٖ وَسَوْطِهٖ، اَلنَّافِذِ اَمْرُهٗ فِىْ سَمَآئِهٖ وَاَرْضِهٖ اَلَّذِىْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهٖ، وَاَمَرَهُمْ بِاَحْكَامِهٖ وَاَعَزَّهُمْ بِدِيْنِهٖ، وَاَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَتَبَارَكَ اسْمُهٗ وَتَعَالَتْ عَظْمَتُهٗ جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ سَبَبًا لَاحِقًا، وَاَمْرًا مُفْتَرِضًا، اَوْشَجَ بِهِ الْاَرْحَامَ، وَاَلْزَمَ الْاَنَامَ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا، فَاَمْرُ اللّٰهُ يَجْرِىْ اِلٰى قَضَآئِهٖ، وَقَضَآئُهٗ يَجْرِىْ اِلٰى قَدْرِهٖ، لِكُلِّ قَضَآءٍ قَدْرٌ، وَلِكُلِّ قَدْرٍ اَجَلٌ، وَلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ، يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ عِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتَابِ.

খুতবাটি خطبات ماثورہ، اشرف علی تھانوی থেকে গৃহীত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী (রহ.) রচিত বিবাহের খুতবা

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَنَا مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ بِقُدْرَتِهِ الْكَامِلَةِ، وَجَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ سَبَبًا لِكَثْرَةِ الْاُمَمِ وَبَقَائِهَا مَا دَامَتِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةُ، وَدَبَّرَ اَمْرَنَا، وَاَحْكَمَ نَظْمَنَا، وَشَرَعَ لَنَآ اَحْكَامًا تُصْلِحُنَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَبَعَثَ عَلَيْنَا رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَجَعَلَنَا مِنْ اُمَّةِ سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ صَاحِبِ الْاٰيَاتِ الْبَاهِرَةِ.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ، وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ ! اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامِ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ اَمْرَ اللّٰهِ يَجْرِىْ اِلٰى قَضَائِهٖ، وَقَضَائُهٗ يَجْرِىْ اِلٰى قَدَرٍ، وَلِكُلِّ قَدَرٍ اَجَلٌ، وَلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ، يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ، وَاِنَّ جَمْعَنَا هٰذَا مِمَّا قَدَّرَ اللّٰهُ، وَاَذِنَ فِيْهِ اِقَامَةً لِلسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَالشَّرِيْعَةِ الْقَدِيْمَةِ، فَقَدْ وَرَدَ فِى الْخَبَرِ عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ : اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ. وَوَرَدَ عَنْهُ : تَنَاكَحُوْا تَكْثُرُوْا، فَاِنِّىْ اُبَاهِىْ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فَنَسْأَلُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُّطِيْعُهٗ وَيُطِيْعُ رَسُوْلَهٗ، وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهٗ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهٗ، فَاِنَّمَا نَحْنُ بِهٖ وَلَهٗ، وَاَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُّبَاهِىْ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الخطب اللكنوية থেকে গৃহীত।

www.maktabatulabrar.com

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেবের রচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

❐ আহকামে যিন্দেগী

জীবনের সব রকমের বিধি-বিধান সম্বলিত একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। একজন মুসলমানের ইসলামী যিন্দেগী পরিচালনার জন্য যত ধরনের বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক, সংক্ষেপে সে সবকিছু এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

❐ ফিক্হুন নিছা

নারী জীবনের ব্যাপক বিধি-বিধান জানার জন্য। নারীদের সিলেবাস রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য। বিশেষ বিশেষ মাসআলার দলীল জানার জন্য। এবং মীরাছ, পর্দা, বহুবিবাহ, তারাবীহ কয় রাকআত ইত্যাদি যেসব বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা রয়েছে, সেগুলোর দলীল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব জানার জন্য।

❐ ফাযায়েলে যিন্দেগী

নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও কুরআনের আলোকে রচিত জীবনের সব বিষয়ের ফাযায়েল সম্বলিত। ঘরে মসজিদে ও মজলিসে তালীমের উপযোগী। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোন হাদীছ এ গ্রন্থে আনা হয়নি।

❐ ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

এ গ্রন্থে ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা এবং এ সব আকীদা থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। দেশী বিদেশী, নতুন পুরাতন সব ধরনের ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

❐ ইসলামী ভূগোল

এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী ভূগোলকে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়া হলো। এতে এ শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত সব বিষয়ই মোটামুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে বিষয়গুলোর সঙ্গে দ্বীনি বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সেগুলো বিশদ আকারে আলোচনা করা হয়েছে। ক্লাসে পাঠদানের উপযোগী করেই তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিত্র ও মানচিত্র।

❐ মিসরে কয়েক দিন

এটি একটি মিসরের সফরনামা। এতে মিসরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদিসহ মিসর সম্পর্কে জানার উৎসুক্য আছে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দর্শনীয় স্থানসমূহের প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি মিসর সফরে আগ্রহীদের জন্য গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।

❐ কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র

এক পৃষ্ঠার এ মানচিত্রে কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত স্থানসমূহের বর্তমান অবস্থান ও বর্তমান নাম উলেখসহ সংশিষ্ট স্থানসমূহের প্রাচীন সীমানা ও বর্তমান সীমানা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

❒ হজ্জ ম্যাপ

হজ্জ ম্যাপে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওয়ারার হজ্জ-জিয়ারত সংশ্লিষ্ট এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

❒ নামায ও রোযার স্থায়ী ক্যালেন্ডার

নামায এবং রোযার সাহরী ও ইফতার ইত্যাদির সময় বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে নতুনভাবে তাহকীক করে তৈরি করা হয়েছে।

❒ তাফসীরে বুরহানুল কুরআন (১-৪ খণ্ড)

বৈশিষ্ট্যাবলি : ● তাহকীকী তরজমা। ● তরজমার বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। ● প্রয়োজনীয় শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির উল্লেখ। ● প্রতি আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে নম্বরবদ্ধ করে উল্লেখ।

লেখক : বিশিষ্ট কয়েকজন আলেম কর্তৃক রচিত ও মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত

❒ বয়ান ও খুতবা ১- ৩ খণ্ড

এ গ্রন্থে একজন ইমামের জন্য সারা বৎসর নিয়মিত বিষয়াদিসহ ইসলামের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বয়ান করার মত সব ধরনের বয়ান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবালিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন।

❒ যদি জীবন গড়তে চান

শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের জীবন গড়ার পদ্ধতি। সুখী-সমৃদ্ধ, টেনশনমুক্ত, নিরাপদ, বরকতময় ও নূরানী জীবন গড়ার পদ্ধতি। সব বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক আলোচনায় সমৃদ্ধ, সকল বয়সের সবশ্রেণীর লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় এক অনবদ্ধ গ্রন্থ।

❒ আহকামে হজ্জ

এ গ্রন্থে সব প্রকার হজ্জ এবং উমরা ও যিয়ারতের মাসায়েল বর্তমান যুগের পেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জ ও যিয়ারত সংশিষ্ট স্থানসমূহের মানচিত্র এবং ছবিও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

❒ ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ

এতে মৌলিক রচনা ও অনুবাদ-এর নিয়ম-নীতিসহ লেখালেখি সম্পর্কে সার্বিক দিক নির্দেশনামূলক বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। শেষে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য শিখতে আগ্রহীদের জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সিলেবাস।

❒ কথা সত্য মতলব খারাপ

রম্য রচনায় উগ্র আধুনিকতা এবং সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে বদ মতলব সিদ্ধি করা ও প্রতারণা করার অপপ্রয়াসের সমালোচনা।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com

❒ ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ

এতে লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। মৌলিক রচনার নিয়ম-নীতি ও অনুবাদের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। বর্ণের নাম ও উচ্চারণ থেকে শুরু করে ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য সমালোচনা, কবিতা ও ছড়া রচনার নিয়ম-নীতি, সংবাদ, কলাম ও ফিচার লেখা এবং বাংলা ভাষার অলংকার ইত্যাদি সব বিষয়ের আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলীর উচ্চারণ সম্পর্কিত একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে। আর শেষে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য শিখতে আগ্রহীদের জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সিলেবাস।

❒ الاستفادة بشرح سنن ابن ماجه

এটি সুনানে ইবনে মাজা-র এক অনন্য শরাহ। আরবীতে রচিত এ শরাহর বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ :

١. بيان من أخرج الحديث مسندًا غير ابن ماجه.
٢. كلام موجز حول أحوال الحديث ورواته.
٣. شرح المفردات.
٤. الشرح الإجمالي للحديث ليقرب معنى الحديث وغرضه إلى الأذهان.
٥. بيان المباحث المتعلقة بالحديث.
٦. بيان ما يستفاد من الحديث موجزًا.
٧. بيان مطابقة الحديث للترجمة.

গ্রন্থনায়:
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

❒ নফছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

নফ্ছের যত ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, মনের মধ্যে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলামের বিভিন্ন আমল ও আখলাক সম্বন্ধে যত ধরনের কুট প্রশ্ন ও ওয়াছওয়াছা জাগে এ গ্রন্থে সেসব ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের কৌশল এবং সেসব প্রশ্নের প্রশান্তিমূলক জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

❒ চিন্তা-চেতনার ভুল

এ গ্রন্থে জানা যাবে– হ চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি। হ চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব। হ চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়। হ চিন্তা-চেতনার মৌলিক গলদসমূহ। হ চিন্তা-চেতনার ভুল কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তার বিবরণ। হ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কি কি ভুল চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে তার বিবরণ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.